হিমালয়

শঙ্কু মহারাজ



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

হিমালয় তৃতীয় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৯১

প্রচ্ছদপট :
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন : মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস : পূর্ণেন্দু রায়

HIMALAYA VOL-III
A collection of travelogues on Himalayas, Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ইউনিক কালার প্রিন্টার্স, ২০এ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী একই সঙ্গে চোখে-দেখার ক্ষুধা এবং জ্ঞানে-জানার তৃষ্ণা মেটায়। দুপায়ে হাঁটতেন সেকালের পর্যটক, আর একালের পর্যটক দুহাতে তথ্য সঞ্চয় করেন। হিমালয় তো শুধু দ্রষ্টব্য নয়, জ্ঞাতব্যও। হিমালয় জ্ঞানের বিশ্বকোষ। তার জনপদ-বৈচিত্র্য, ভূপ্রকৃতির শতসহস্র বিশিষ্টতা, পদে পদে রম্য-ভয়ংকরের সহাবস্থান, তার আবহাওয়ার অঞ্চলগত পরিবর্তন, শীতাতপের রূপান্তর, লোকালয়ের সংস্কৃতি, ভাষা, পরিধেয়, আহার্যের বিভিন্নতা—এগুলি সমতলবাসীর কাছে অবজ্ঞাত ভুবনের রহস্যগ্রন্থের মলাট খুলে দেয়। একই সঙ্গে হিমালয়ের দুর্গম পথের ইতিহাস, জনবসতি স্থাপনের ইতিহাস, মনুষ্য-অধ্যুষিত এক একটি সভ্যতাখণ্ডের ইতিহাস, শিখরআরোহণ, সড়কনির্মাণ, সেতুস্থাপন, দেবস্থান গড়ে তোলা, রাজ্যস্থাপন, যুদ্ধবিগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা, সীমান্ত-বিরোধ, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সংযোগরক্ষা— বহু শত বৎসরের ইতিহাসের এমন অজস্র তথ্য সন্ধানী-কুশলী হাতে চয়ন করেন পর্যটক শঙ্কু মহারাজ। কেবল দৃষ্টিক্ষুধা তৃপ্ত করার ভ্রমণসাহিত্য শঙ্কু মহারাজের কৃত্য নয়—তিনি মননের সম্ভারও একই সঙ্গে পরিবেশন করেন। তাই লাদাখ কিংবা বৈষ্ণোদেবীর তীর্থস্থান—যেখানেই তিনি পরিক্রমা করেছেন, গিয়েছেন তার নাড়িনক্ষত্র জেনে, আর ফিরে এসেছেন ততোধিক উপার্জনসহ, যা উত্তরকালের পথিক-পর্যটকদের জিজ্ঞাসা নিবারণ করবে।

আরও বিশেষত্ব আছে এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে। এ পর্যন্ত যাঁরা হিমালয়ের দূরদুর্গম স্থানগুলি পরিক্রমা করেছেন এবং মনোজ্ঞ ভাষায় সে-সবের বিবরণ লিখেছেন, জলধর সেন থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত, এঁরা অনেকেই ছিলেন নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক। পথে ক্ষণকালের সঙ্গী পেয়েছেন, কিন্তু দল বেঁধে শফর করতে বেরোননি। সেকালে ভ্রমণের দুর্গমতার কারণে নিঃশঙ্ক অভিযাত্রীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কারণ সহিষ্ণুতার মূল্যে রুদ্রসুন্দরের উপাসনায় সকলে অংশ নিতে পারতেন না। তাই অনেক অভিযাত্রীই প্রায় একক উদ্যোগে সামান্য পাথেয় ও পথচলতি ক্ষণকালীন সঙ্গীসাথীর সাহচর্যে দুরধিগম্য অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। একালে পথঘাট অনেক বেশি সুগম হওয়ায়, যানবাহনের সহজ প্রাচুর্যে এবং আর্থিক ব্যয় সাধ্যসীমায় নেমে আসায় যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে। ভ্রমণের উৎসাহও আমাদের মনে বহুগুণিত হয়েছে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে। এছাড়াও দলবদ্ধ ভ্রমণের একটা পদ্ধতিবিদ্যা গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে বহু ব্যবসায়ী ভ্রমণোদ্যোগ-প্রতিষ্ঠান, যাদের আয়োজন-সতর্কতার উপর ভরসা রাখলে ভ্রমণের আনন্দ নিবিড়ভাবে উপভোগ করা যায়, অথচ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার দায় থাকে না।

দীর্ঘদিন ধরে ভ্রমণে পর্যটনে ও অভিযানে অংশগ্রহণ করতে করতে শঙ্কু মহারাজের

ক্ষেত্রে, একক, নিঃসঙ্গ ভ্রমণ থেকে দলবদ্ধ সফর, দুই ধরনের অভিজ্ঞতাই ঘটেছে। তাই তাঁর ভ্রমণসাহিত্যে বাড়তি একটা মাত্রা যোগ হয়ে যায়। তিনি সহযাত্রীদের উষ্ণ সঙ্গ ও সরব সান্নিধ্যের বাতাবরণ সঙ্গে নিয়েই শফরে বেরোন। তাই তাঁর ভ্রমণ নিছক গন্তব্যের কাহিনী হয় না, তা চলন্তের সজীব ধারাপাত হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের দিনলিপির মতো তিনি চারপাশের মানুষজন সঙ্গীসজনের কলরব নিয়ে যাত্রা করেন, তাদের সংলাপ ও সন্তাপ, পরিহাস ও পরিতাপ সমস্তই তিনি পাঠকদের উপহার দেন। প্রকৃতি আর মানুষ তাঁর বইতে সমান গুরুত্ব পায়। কেবল পর্যটকের নির্দেশনামার জন্যে তো টুরিস্ট দপ্তর আছে, আর গল্পতোষ পাঠকের জন্যে আছে কল্প-ভ্রমণসাহিত্য। শঙ্কু মহারাজের বই ট্যুরিজমের বিজ্ঞাপন নয়—তা কথাসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। তাই তাঁর ভ্রমণে নদী যেমন গুরুত্ব পায় তেমনি পায় নারী। লাদাখের পথে পথে সিন্ধু যেন তাঁরই লীলাবিস্তারিকা সখী, সুন্দরের অভিসারে যেমন তিস্তা। আবার লেখকের বাল্যকৈশোর-থেকে-পরিচিত সেই তিস্তার উৎসসন্ধানে যাত্রার বিবরণেও আমাদের নজর কাড়েন তিনি চুংথাং-এর পাশের দোকানের সেই আধুনিকা মালিকানির কথায়, সিনিয়লচু্র পথে লজেন্স-চাওয়া সেই সুদর্শনা মালবাহিকার মুখের হাসিতে, বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরপথে তপশিলি বাসন্তী ও মেদবতী রাজস্থানী মহিলার বর্ণনায়।

হিমালয় যেমন ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণভূমি, তার শৃঙ্গগুলি তেমনি পর্বতারোহীদের আমন্ত্রণগিরি। একালে পর্বতশৃঙ্গারোহণের জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অনেক বিদ্যালয়েও পর্বতারোহণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেক তরুণ পর্বতারোহীই মাঝারি মাপের পর্বতশিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শঙ্কু মহারাজও কেবল ভ্রমণযোগী নন, তিনি অভিযাত্রীও বটে। তিনি একাধিক পর্বতশৃঙ্গারোহণের উদ্যোগী অংশীদার। তাঁর এইসব অভিযানের সান্নিধ্যজনিত অভিজ্ঞতা সবিস্তারে লিখেছেন তিনি এবং শৃঙ্গবিজয়ের জন্যে তরুণ অভিযাত্রীদের যাবতীয় করণীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়েছেন।

এই কারণেও তাঁর গ্রন্থগুলি আমাদের ভ্রমণসাহিত্যে, বিশেষত হিমালয়-বিষয়ক ভ্রমণসাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, "সুন্দরের অভিসারে" সিনিয়লচু পর্বতশৃঙ্গারোহণ-উদ্যোগের একটি ডকুমেন্টারি। এই ডকুমেন্টেশনের জন্যে তাঁর নিবিড় অধ্যয়ন, মননের সুদীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব, নেপথ্যের তথ্যসংকলন আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করে। পর্বতারোহীকে দৈনন্দিন ও প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনের সমস্ত খুঁটিনাটি সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করতে হয়। একটি আপাততুচ্ছ সামান্য বস্তু বা পদার্থের অভাবে অকস্মাৎ সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। "সুন্দরের অভিসারে" পড়েই তো জানা গেল, একটি দেশলাই-এর অভাবে একটি অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল (৫ম পরিচ্ছেদ)। শঙ্কু মহারাজ তাই ভ্রমণপথের সমস্ত অঞ্চলের দ্রষ্টব্য-সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্যের সংস্থান রেখে দেন পাঠকের জন্যে। এই সুবিন্যস্ত অন্বেষা, এই সাবধানী সঞ্চয়ন, এই ব্যাপক জরিপ ও দরকারমতো সেগুলি চিত্রকল্প করে তোলা— এই সব গুণ তাঁর ভ্রমণগ্রন্থগুলিকে বস্তুতই ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-অভিজ্ঞতামূলক রচনাগুলির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করে বলে বর্তমান ভূমিকাকার বিশ্বাস করেন।

হিমালয়ের প্রতি অভিযানমনস্ক আকর্ষণ বিদেশীদের মধ্যেই বেশি ও বার বার

এযাবৎ আর কোনো বাংলা ভ্রমণগ্রন্থে আমরা পাই না।

আগেই জেনেছি 'বৈষ্ণোদেবীর দরবারে' মূলত তীর্থপরিক্রমার বিবরণ, কিন্তু লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যেরই গৌরব। জম্মু শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কাটরা জনপদ থেকে বৈষ্ণো দেবীর উদ্দেশে পদযাত্রার সূচনা—আর সে পথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন নয়নাভিরাম, মানুষের তৈরি স্বাচ্ছন্দ্যে তেমনি স্বস্তিদায়ক। সমগ্র উত্তরভারতের সর্বত্র-পূজিতা এই দেবীর গুহাতীর্থে প্রায় সারা বৎসরই চলেছে যাত্রীবাহিনী। সেই লোকপ্রবাহের ভিতরই তো প্রকৃত দৈবমহিমা উদ্ভাসিত হয়। বৈষ্ণোদেবীর দরবারে ভ্রমণগ্রন্থে সেই দেবতীর্থ ও মানবতীর্থ এককেন্দ্রে মিলিত হয়েছে।

শঙ্কু মহারাজ বৈষ্ণোদেবীর দরবারে প্রবেশ করেছিলেন লাদাখ ভ্রমণ শেষ করে। লাদাখভ্রমণ যে কোনো হিমালয়-পর্যটকের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ভারতের প্রতীটি হিমালয়ের সীমান্তে তিব্বত স্পর্শ করে, সিন্ধুনদের লীলাভূমি লাদাখে যেতে হয় হিমালয় পেরিয়ে। এই অঞ্চলের জলবায়ু পর্বতশিখর তরুলতা আবহাওয়া হিমালয়ের শীতকম্পিত অঞ্চলের তুলনায় বিচিত্রভাবে স্বতন্ত্র। তিব্বতে প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি অধ্যায় লাদাখের গুহা-গুম্ফায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। এই অঞ্চলে একদা স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট পদস্থাপন করেছিলেন, সেই মিথ-এর সত্যতাই বা কে প্রমাণ করবে? মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের বাণিজ্যপথ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। লাদাখ চাঁদের দেশ, রঙিন পাথরের দেশ, পৃথিবীর প্রাচীনতম মনুষ্যবসতির প্রাক্‌ভূমি, এই জাতীয় ইতিহাস-ভূগোলের প্রভূত উপকরণে 'লাদাখের পথে' বইটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শ্রীনগর যেতে লাদাখের জেলা শহর লে পর্যন্ত সুদীর্ঘ বাসযাত্রার পথে পাঠককে বারবার বিরাম নিতে হয়—অমরনাথ, বলতাল, সোনামার্গ, জোজি লা, দ্রাস, কারগিল, জাসকার, মুলবেখ, রিজং গুম্ফা, ফিয়াংগুম্ফা, স্পিতুক গুম্ফা, লে গুম্ফা, তিকসে গুম্ফা, হেমিস গুম্ফা—এইসব মনোহর বিশ্রামনিকেতনে। এই মানসভ্রমণে এই ভূমিকালেখক যে অপরিসীম তৃপ্তি পেয়েছেন এবং স্বশরীরে লাদাখ-ভ্রমণের অক্ষমতায় যে আর তিনি ক্ষুণ্ণ নন, এই আনন্দঘন অভিজ্ঞতার পাঠ্যস্মৃতি নিবেদন করে সর্বশ্রেণীর ভ্রমণরসিক পাঠককে সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে আমন্ত্রণ জানাই।

সুন্দরের অভিসারে

যাঁর কাছে হিমালয়ের প্রথম পাঠ নিয়েছি, বাংলা সাহিত্যের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ও পরমপ্রিয় পথিকৃৎ

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালের

করকমলে

মানুষ সুন্দর, মাটি সুন্দর, সাগর সুন্দর। আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর আর পাহাড় সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুন্দর কি?

বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা যখন মহাকাশ পরিক্রমার পরে পৃথিবীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায়?

—সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। সে সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

—পৃথিবীর কোন অংশ সবচেয়ে সুন্দর?

—তুষারাবৃত হিমালয়।

১৯৬২ সাল। গাড়োয়াল হিমালয়ের নীলগিরি পর্বত (২১,২৬৪′) অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা আমাদের সেই অভিযানের সংবাদস্বত্ব ক্রয় করেছিলেন। অভিযানের নেতা অমূল্য সেন ও আমরা কয়েকজন একদিন ঐ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ডেসমণ্ড ডয়েগ-এর চেম্বারে বসে গল্প করছিলাম। ডেসমণ্ড কেবল শিল্পী সাংবাদিক ও সুলেখক নন, তিনি একজন অভিজ্ঞ হিমালয় অভিযাত্রী। তাই সেদিন কথায় কথায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর শৃঙ্গ কি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন ডেসমণ্ড—সিকিমের সিনিয়লচু।

তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বের প্রায় প্রান্তে পৌঁছেছি। ইতিমধ্যে বহুবার হিমালয়ের গহনগিরি-কন্দরে পরিক্রমা করেছি। কয়েকটি পর্বতাভিযানে অংশ নিয়েছি। দর্শন করেছি অনেক অনিন্দ্যসুন্দর পর্বতশৃঙ্গ। কিন্তু ভুলতে পারিনি সিনিয়লচুর কথা।

যখনই নিভৃতে হিমালয়ের কথা ভাবতে বসেছি, তখুনি মনে পড়েছে ডেসমণ্ড ডয়েগ-এর সেই মন্তব্য। মনে পড়েছে সিনিয়লচু সম্পর্কে সেকালের প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিমালয়-লেখক ফ্র্যাসিন্স সিডনী স্মাইথের সেই অমর উক্তি—

'The most rationally minded of men ......will gaze on Siniolchu and reflect that if there is a God of Inaccessibility, his unapproachable halls and palace must be fashioned beneath the icy flutings and sweeping scimitar-like ridges of that amazing peak'.*

বহু বছর ধরে আমি তাই সিনিয়লচুর স্বপ্ন দেখেছি। হিমালয়ের পথে পথে প্রচুর পদচারণা করেও সেই অনভিগমনের অধীশ্বরের দুরধিগম্য দেবালয় আর তার বাঁকা তলোয়ারের মতো গিরিশিরা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। কিন্তু যাওয়া হয় নি সিকিম, দেখা হয় নি সিনিয়লচু।

মাত্র মাস ছয়েক আগের কথা। অফিসে বসে কাজ করছি। হঠাৎ তরুণ পর্বতারোহী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনীত দাশগুপ্ত এসে হাজির। ওরা মাঝে মাঝে আসে।

* 'The Kanchenjunga Adventure' by F. S. Smythe— London 1930

কাজেই ওদের আগমনকে কোন গুরুত্ব দিলাম না। বসতে বললাম। কিন্তু কুশল বিনিময়ের পরে সহসা অরুণ বলে বসল—আমরা একটা এক্সপিডিশান করছি। অমূল্যদা নেতৃত্ব করছেন। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—না, না! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছি। বলেছি—তোরা তো জানিস, আমি ঠিক করেছি আর কখনও কোনো অভিযানে যাব না।

—কিন্তু কেন? বিনীত প্রশ্ন করেছে।

উত্তর দিয়েছি—আমার আর পর্বতাভিযান ভাল লাগে না। ওতে বড় ঝামেলা আর দুশ্চিন্তা। ওর চেয়ে পদযাত্রা অনেক ভাল। কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যেখানে খুশি যতদিন খুশি বসে যাও আর নইলে এগিয়ে চলো।

ওরা আমার আপত্তি কানে তোলে নি। অরুণ বলে উঠেছে—অমূল্যদা কিন্তু বলেছেন, আপনাকে আর সুশান্তদাকে নিয়ে যাবেনই। আমরা শুধু আপনাকে সেই কথাটি জানাতে এসেছি।

সুশান্তদা মানে মানবতত্ত্ব বিভাগের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।†

অমূল্য যখন সাব্যস্ত করেছে, তখন ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তাই জিজ্ঞেস করেছি—তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

বিনীত উত্তর দিয়েছে—সিকিমে। আপনি তো কখনও সিকিম যান নি!

কথাটা মিথ্যে নয়। আর এই না-আসার জন্য মাঝে মাঝেই মনে বেদনা অনুভব করতাম। সিকিম আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য, কতবার দার্জিলিং এসেছি কিন্তু কখনও সিকিমে আসা হয় নি আমার। তাই বলে ফেলেছি—বেশ, অমূল্যকে বলিস, আমি যেতে পারি তোদের সঙ্গে, যদি তোরা জেমু হিমবাহ অঞ্চলে অভিযান করিস।

একটু হেসে অরুণ জিজ্ঞেস করেছে—কেন বলুন তো?

উত্তর দিয়েছি—আমি একবার সিনিয়লচুকে দেখতে চাই।

এবারে ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বিনীত বলেছে—শুধু আপনি নন শঙ্কুদা, আমরা সবাই সিনিয়লচুকে দেখতে চাই, অমূল্যদা তো বটেই। আর তাই এবারের এই আয়োজন।

চমকে উঠেছি। প্রশ্ন করেছি—মানে?

—আমরা সিনিয়লচু অভিযানের আয়োজন করছি। আপনাকে যেতে হবে সঙ্গে।

—বেশ যাবো।

তারপরে কি ভাবে যে কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছে, এখন আর তা মনে করতে পারছি না। টাকা-পয়সা, খাবার-দাবার, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিসপত্র যোগাড় করা। ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারমিটের ব্যবস্থা করা। শিলিগুড়ি ও গ্যাংটকে গাড়ি ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা।

সকলের শুভেচ্ছা ও সাহায্যে সবই হয়ে গিয়েছে। আমার বহু বছরের স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। আমি আজ সুন্দরী সিকিমে চলেছি। সুন্দরের অভিসারে সেই পদযাত্রাই আমার এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

কিন্তু পদযাত্রা আরম্ভ হবার এখনও দেরি রয়েছে। তার আগে আমাদের কিছু কথা আছে। সেটুকু বলে নেওয়া দরকার।

---

† লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' দ্রষ্টব্য।

কলকাতার ডায়না এসোসিয়েশন এই অভিযানের আয়োজন করেছেন। এটি তাঁদের প্রথম পর্বতাভিযান। তবে ইতিপূর্বে তাঁরা কয়েকটি রক্-ক্লাইম্বিং শিবির ও হিমালয় পদযাত্রা পরিচালনা করেছেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি অমূল্য সেন আমাদের নেতা আর তরুণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ অভিযানের সদস্য। ডায়নার সহ-সভাপতি থেকে সদস্য এবং বিধানসভা ভবনের অধ্যক্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পর্যন্ত অনেকেই এই অভিযানের জন্য অসামান্য সাহায্য করেছেন। আমরা তাঁদের সবার প্রতি সমান কৃতজ্ঞ। তবু তাঁদের কয়েকজনের কথা একটু পৃথকভাবে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

প্রথমেই মনে পড়ছে বিধানসভার মার্শাল জয়ন্ত মজুমদারের কথা। এই সদাহাস্যময় পরোপকারী ও পরিশ্রমী যুবকটি সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন আমাদের। সাহায্য করেছেন বিধানসভার সচিব প্রতাপকুমার ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব রথীন সেনগুপ্ত। এঁদের সঙ্গে আরও দুটি নামের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তাঁরা হলেন—তাপস কর ও সমরজিৎ গোস্বামী।

বলতে হবে শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তীর কথা। সে ডায়নার সহ-সম্পাদিকা এবং বিধানসভার কর্মচারী। সুশ্রী ও শিক্ষিতা যুবতী। বিবাহিতা ও আড়াই বছরের একটি কন্যার জননী। স্বপ্নার নিরলস পরিশ্রম আমাদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সবিশেষ সাহায্য করেছে।

আরও তিনটি মানুষের কথা আজ আমার বার বার মনে পড়ছে। তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ্, প্রবীণ বিপ্লবী শ্যামানন্দ সেন ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

আমরা যারা পাহাড়-পর্বতে পদচারণা করি, তারা রাজনীতির সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখি না। তবু এঁরা আমাদের অতি আপনজন। হবিবুল্লাহ্ সাহেব আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর দেওয়া জাতীয় পতাকাটি নিয়েই আমরা এই অভিযানে চলেছি। শ্যামানন্দবাবু স্বেচ্ছায় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। আর প্রফুল্লবাবু অসুস্থ শরীর নিয়েও হাওড়া স্টেশনে এসে আমাদের বিদায়-শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ১৯৬২ সালে নীলগিরি পর্বত অভিযানে যাবার সময়ও তিনি হাওড়ায় আশীর্বাদ করেছিলেন। সেবার থেকেই আমাদের সিনিয়লচুর ভাবনা শুরু হয়েছে।*

এবারে নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক। 'আনলাকি থার্টিন্' কথাটা আমাদের অজানা নয়, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমরা এখন তেরোজন। অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত ডাঃ স্বপন রায়চৌধুরী, অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধুবর অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় আসতে পারে নি।* এরা তিনজনেই যথাসাধ্য করেছে। বিশেষ করে অসীম এগিয়ে না এলে আমাদের তথ্যচিত্র প্রযোজনার প্রস্তাবটি বাতিল করতে হত। অথচ সে নিজেই শেষ পর্যন্ত আসতে পারল না। আর তাই আমরা তেরোজন।

এখন কিন্তু আর তেরো নই। কলকাতা থেকে তেরোজন রওনা হলেও এখন

---

* লেখকের 'নীল-দুর্গম', 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে', 'গঙ্গা-যমুনার দেশে' ও 'অমরতীর্থ অমরনাথ' গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

আমরা সতেরোজন। দার্জিলিঙের চারজন 'হাই অল্‌টিচ্যুড পোর্টার (HAP) শিলিগুড়িতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তিনজন শেরপারও আসার কথা ছিল, কিন্তু আসে নি।

পর্বতারোহণ আজ ভারতে একটি শ্রেষ্ঠ 'স্পোর্টস' বলে সমাদৃত। সরকারও বিশেষ ভাবে পর্বতারোহণের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। তবু ইদানীং দুটি কারণে পর্বতাভিযান প্রায় দুরূহ হয়েছে। প্রথমটি সাজ-সরঞ্জামের সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্ধিত সাজ-সরঞ্জামের তহবিল প্রায় শূন্য। আর দ্বিতীয়তঃ ভাল চাকরি পেয়ে শেরপারা তাদের বৃত্তি বদলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর ও দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিতকুমার চৌধুরীর সাহায্যে আমাদের সাজ-সরঞ্জামের অভাব মিটেছে। কিন্তু অগ্রিম টাকা দিয়ে এখনও শেরপা পাই নি। শেরপা ক্লাইম্বার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা তেনজিংকন্যা মিসেস পেম্‌ অবশ্য বলেছেন—শেরপারা সিকিমেই একটি অভিযানে এসেছে। তারা গ্যাংটকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

আমরা ১১ই মে কামরূপ এক্‌সপ্রেসে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে ১২ মে শিলিগুড়ি পৌঁছেছি। স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী যুবক স্টেশনে আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অমল পাল, তমাল দে, রবীন ঘোষ, অমলেশ গোস্বামী, অনিমেষ বসু, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ও দীপক মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। উল্লেখ করতে হবে তমালের বাবা শীতলচন্দ্র দে মহাশয়ের কথা। তিনি সেচ বিভাগের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। ইরিগেশন বাংলোতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আমাদের তরফ থেকে স্থানীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গাড়ির ব্যবস্থাটি পাকা করে রেখেছিলেন। প্রতিরক্ষা দপ্তর শিলিগুড়ি থেকে আমাদের দুখানি শক্তিমান ট্রাক্‌ দিয়েছেন। সেই গাড়িতে করেই আজ ১৩ই মে আমরা শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক চলেছি। তেরোজন অভিযাত্রীর সঙ্গে তেরো তারিখটাও যুক্ত হল আজ।

কিন্তু ১৩ই মের কথা পরে হবে। আগে ১২ই মে অর্থাৎ গতকালের কথা শেষ করে নিই। গতকাল আমরা নির্দিষ্ট সময়ের দু-ঘণ্টা পরে শিলিগুড়ি পৌঁছেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি কামরূপ এক্সপ্রেসের পক্ষে দু-ঘণ্টা লেট কিছুই নয়। এ পথে একমাত্র দার্জিলিং মেল সাধারণত ঠিক সময়ে আসে। কিন্তু আমরা সে ট্রেনে জায়গা পাই নি। এ ট্রেনেও রিজার্ভেশান পাওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিল কিন্তু ডেকার্স লেনের হিমালয়-প্রেমিক 'ইউনাইটেড ট্র্যাভেল সার্ভিস' বহু চেষ্টায় আমাদের তেরোখানি বার্থ রিজার্ভ করে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

ট্রেন দু-ঘণ্টা লেট হওয়ায় কোনো ক্ষতি হয় নি। গতকাল আমাদের শিলিগুড়িতে বিশ্রাম নেবার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্রাম হয় নি, কারণ তিনজন সারাদিন রেলে চড়েছে আর দশজন গভীর রাত পর্যন্ত তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করেছি। এটি একটি নূতন অভিজ্ঞতা আর তা সঞ্চয় করেছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে।

রেলওয়ে বোর্ড আমাদের 'সিঙ্গল ফেয়ার ডাবল জার্নি' ও 'হাফ পার্সেল রেট' কনসেশান দিয়েছেন। সাজ-সরঞ্জাম, রেশন ও 'প্রভিশন' অর্থাৎ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়া বাকি সমস্ত মালপত্র আমরা 'লাগেজ'-এ 'বুক' করে দিয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে

গাড়ি থেকে নামার পরে শুনলাম—'লাগেজ'-এর কুলিরা বেলা দুটো পর্যন্ত ধর্মঘট করেছে, তারা ব্রেক্‌ভ্যান্ থেকে মালপত্র নামাবে না।

অতএব সদলবলে ছুটে এলাম অকুস্থলে। এসে দেখি তুমুল কাণ্ড। ব্রেক্‌ভ্যানের খোলা দরজার সামনে ফেস্টুন বাঁধা। তারই সামনে দাঁড়িয়ে জন তিরিশেক লোক শ্লোগান দিচ্ছেন—ইনক্লাব....জিন্দাবাদ, আমাদের দাবী...মানতে হবে। রেল বোর্ডের জুলুম...চলবে না চলবে না। আমাদের বিপ্লব....চলছে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদের বিপ্লব চলতে দিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এমনকি ব্রেক্‌ভ্যান্ থেকে এঁরা যদি আমাদের মাল নামিয়ে না দেন, তাহলেও আমরা অসন্তুষ্ট হব না। আমাদের শুধু প্রয়োজন কয়েক মিনিটের জন্য ঐ পতাকাটিকে দরজা থেকে খুলে নেওয়া।

সেই কথাই বলি জনৈক বিপ্লবীকে। তিনি জানান—আমাদের নেতাকে বলুন।

—তিনি কোথায়?

—এই তো আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

তাকিয়ে দেখি পায়জামা-পাঞ্জাবি-পরা জনৈক স্বাস্থ্যবান মাঝারী গড়নের যুবক। তাড়াতাড়ি তাঁকে নমস্কার করি। মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলি। কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই তিনি গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন—আপনার বক্তব্য শুনেছি, সম্ভব নয়।

—মানে? আমি অপ্রস্তুত।

নেতা প্রায় ধমক লাগান আমাকে—এই সহজ কথাটার মানে বুঝতে পারছেন না? আমার লোক আপনাদের মাল নামাতে পারবে না।

হালে পানি পাই। তাড়াতাড়ি সবিনয়ে বলি—আজ্ঞে আপনাদের নামিয়ে দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই নামিয়ে নেব। আমরা শুধু আপনার অনুমতি চাই। আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। একটা পর্বতাভিযানে চলেছি, কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন আমাদের কথা। ভিক্ষে করে ও ভাড়া করে এই সব মালপত্র এনেছি। আগামীকাল সকালে আমাদের গ্যাংটক রওনা হতে হবে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

এতক্ষণে নেতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মৃদু হেসে তিনি বলেন—মুশকিল কি জানেন?

—আজ্ঞে...আবার বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

তবু এবারে তিনি আমাকে ধমক লাগান না। শুধু বলেন—সহযোগিতা চাইছেন, কিন্তু আপনারা আমাদের সঙ্গে মানে খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করছেন না।

—আজ্ঞে করব। আপনাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও দাবীর কথা লিখে দিন, আমরা পরশুদিনের পত্রিকায় সব কথা প্রকাশ করে দেব। দেশের মানুষ জানতে পারবেন আপনাদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা। রেলওয়ে বোর্ডের নজর পড়বে আপনাদের দিকে। বিনিময়ে আপনি দয়া করে আমাদের মালগুলো ছেড়ে দিন।

প্রস্তাবটি নেতার বোধকরি অপছন্দ হয় না। তিনি বলেন—মুশকিল কি জানেন,

আমার একার ইচ্ছায় আমি আপনাদের মাল নামিয়ে নেবার অনুমতি দিতে পারি না। আমাদের প্রেসিডেন্টের পারমিশান নিতে হবে।

—তিনি কোথায়?

—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনারা দুজন আমার সঙ্গে আসুন।

অতএব আমি ও রমেন সম্পাদকের সঙ্গে সভাপতির কাছে আসি। ভদ্রলোকের পরনে সার্ট-প্যান্ট, হাতে ব্রীফকেস, চোখে কালো চশমা।

সবিনয়ে ভদ্রলোককে সব কথা বলি। তিনি একটুকাল চুপ করে থাকেন, তারপরে প্রশ্ন করেন—কোন কাগজে ছাপাবেন আমাদের কথা?

রমেন তাড়াতাড়ি পত্রিকার নাম বলে ওঠেন।

—হবে না। সভাপতি প্রায় গর্জে ওঠেন।

আমি বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। কিন্তু ডঃ রমেন মজুমদার জার্নালিস্ট। এ পরিস্থিতিতে সামলে নেবার মতো বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা তার আছে। সুতরাং সে অকম্পিত স্বরে বলে—আপনি তো জানেন যে আমাদের পত্রিকার বর্তমান সার্কুলেশন তিন লাখের ওপরে....

—জানি। সভাপতি তাকে শেষ করতে দেন না। বলেন—বুর্জোয়া পত্রিকাগুলোর সার্কুলেশন তাই হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা আপনাদের প্রস্তাবে রাজী নই।

—কারণটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কারণ, সভাপতি ঘোষণা করেন—আপনার পত্রিকা আমার মালিকপক্ষের দালাল।

অতএব পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। শিলিগুড়ির ছেলেরা আমাদের নিয়ে এসেছে স্টেশন মাস্টারের কাছে। চমৎকার মানুষটি। সমস্ত কাজ ফেলে তিনি ছুটে এসেছেন কুলিদের কাছে। হাতজোড় করে আমাদের মালগুলো ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রহরীদের প্রাণে সেই বুর্জোয়া আবেদন কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি।

ব্যর্থ হয়ে আমরা আবার ফিরে এসেছি স্টেশন মাস্টারের চেম্বারে। অনেক ভাবনা চিন্তার পরে তিনি বলেছেন—মাল উদ্ধারের জন্য এখন দুটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। একটি বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ আর. পি. এফ.-এর সাহায্যে জোর করে মাল নামানো। কিন্তু ওদের যা মনোভাব দেখলাম, তাতে একটা রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

—আর দ্বিতীয় পথটি? প্রশ্ন করি।

মাস্টার মশাই উত্তর দেন—এদের এই আন্দোলন চলবে আজ বেলা দুটো পর্যন্ত। আপনাদের জনদুয়েক সদস্য এই ট্রেনে করে চলে যান। আমি তাদের গার্ডের গাড়িতে বসিয়ে দিচ্ছি। বেলা দুটো বেজে যাবার পরে প্রথম যে স্টেশন আসবে, সেখানেই গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হবে, 'স্টপেজ' না থাকলেও গাড়ি থামবে। আপনারা মাল নামিয়ে নেবেন। লোক্যাল ট্রেনে করে রাতে এখানে চলে আসবেন। আমি কন্ট্রোলকে বলে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই মেনে নিতে হয়েছে। অসিত বোস, অসিত মৈত্র ও বিনীত কামরূপ এক্সপ্রেসে আসামের পথে রওনা হয়ে গিয়েছে এবং রেল কর্তৃপক্ষের সাহায্যে রাত একটায় মাল নিয়ে ডাকবাংলোয় পৌঁছেছে।

না, শুধু রেল কর্তৃপক্ষের সাহায্যেই মাল নিয়ে নিরাপদে আসা সম্ভব হয় নি। শিলিগুড়ি সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র ধারণা আছে, তাঁরা সবাই জানেন—নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পথটি সন্ধ্যার পরে মোটেই নিরাপদ নয়। ছিনতাই ও ডাকাতি লেগেই আছে। তাই শিলিগুড়ির নর্থবেঙ্গল এক্সপ্লোরারস ক্লাবের ছেলেরা আমাদের গতকাল স্টেশনে যেতে দেয় নি। তারাই দল বেঁধে নিউ জলপাইগুড়ি গিয়েছে। নিজেরাই ঘাড়ে করে মাল নিয়ে এসেছে স্টেশনের বাইরে। তারপরে দশখানি রিক্সায় করে মালপত্র এবং অসিতবাবুদের নিয়ে এসেছে শিলিগুড়ি। আজ তারাই আমাদের গ্যাংটক রওনা করে দিয়েছে। তাছাড়া গতকাল শিলিগুড়ি 'বাস ওনার্স এসোসিয়েশন' আমাদের 'ডিনার' খাইয়েছেন।

এবারে একটা দিন শিলিগুড়িতে কাটিয়ে আমরা একই সঙ্গে সহযোগিতা ও অসহযোগিতার যে নিদর্শন দেখে গেলাম, তা সত্যিই স্মরণীয়। এ সহযোগিতার কথা, বিশেষ করে শিলিগুড়ির যুবকদের সাহায্যের কথা, আমাদের বহুদিন মনে থাকবে।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম প্রতিরক্ষা দপ্তরের দেওয়া দুখানি 'শক্তিমান' ট্রাকে করে আমরা এখন শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক চলেছি। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. চৌধুরীর সাহায্যে এই গাড়ি দুখানি পাওয়া গেছে। ফেরার সময়ও এঁরা গাড়ি দেবেন। এতে আমাদের প্রায় হাজার দশেক টাকার সাশ্রয় হচ্ছে।

শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক ১১৪ কিলোমিটার। প্রথম ১৯ কিলোমিটার অর্থাৎ সেবক পর্যন্ত আমরা পুবে এসেছি, তারপর থেকে চলেছি উত্তর-পূর্বে। মোটামুটি এই দিকেই পথ চলে আমরা গ্যাংটক পৌঁছব।

গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী এবং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শহর। ক্রমবর্ধমান শৈল শহর। উচ্চতা ৫,৮০০ ফুট। আয়তন আড়াই হাজার হেক্টর। জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতো। সিকিমের আর কোনো শহরে ভাল হোটেল-রেস্তরাঁ কিংবা স্টেডিয়াম নেই। চীনের তিব্বত অধিকারের আগে গ্যাংটক ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের একটি প্রধান সঙ্গম ছিল। আজও গ্যাংটকের একটি প্রধান ভাষা তিব্বতী। অপর তিনটি স্থানীয় ভাষা হল সিকিমী, লেপ্চা ও নেপালী। হিন্দীও প্রায় সকলেই বুঝতে পারেন। তবে ইংরেজী অথবা বাংলা জানলেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্যাংটকে পর্যটকদের ঋতু। সিকিম ন্যাশনালাইজড্ ট্রান্সপোর্ট, শিলিগুড়ি দার্জিলিং ও ক্যালিম্পং থেকে গ্যাংটকে নিয়মিত বাস চালান। উত্তরবঙ্গ পরিবহনের বাসও গ্যাংটকে যাতায়াত করে।

গ্যাংটকের প্রধান দর্শনীয় স্থান সরকারী কুটিরশিল্প বিদ্যালয়, রাজ পরিবারের মন্দির, ডীয়ার (হরিণ) পার্ক, তিব্বতীয় গবেষণা বিদ্যালয়, অর্কিড স্যাংকচুয়ারী এবং রাজপ্রাসাদ।

গ্যাংটকের ভাবনা থেমে যায়। গাড়ি থেমেছে। ইতিমধ্যে আমরা কালিঝোরা ও বিরিক পেরিয়ে এসেছি। এবারে গাড়ি থেমেছে তিস্তা বাজারে। তার মানে শিলিগুড়ি থেকে ৫৩ কিলোমিটার এসেছি। পথের ডানদিকে অনেকটা নিচে তিস্তা নদী। এই তিস্তার উৎসে চলেছি আমরা।

সামনে ডানদিকে পুল। ঐ পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ডানদিকে কালিম্পঙের পথ আর বাঁদিকে গ্যাংটকের। কিন্তু আপাতত পুল পার হওয়া নিষেধ। কারণ রাজ্যপাল ক্যালিম্পং যাচ্ছেন। তাই পুলের দু-পারেই গাড়ির মিছিল।

সকালের চা-সিঙাড়া বহুক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছে। দল বেঁধে নেমে আসি গাড়ি থেকে। চা ও পকোরা খেয়ে আবার উঠে আসি গাড়িতে। রাজ্যপালের পথ চেয়ে বসে থাকি।

"আচ্ছা, আপনারা কি সিনিয়লচু অভিযানে যাচ্ছেন?"

তাকিয়ে দেখি সাদা টুপি মাথায় একটি ছিপছিপে তরুণ পথে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে। উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করে, "আপনারা আজ গ্যাংটকে থাকবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে শঙ্কু মহারাজ আছেন কি?"

এবারে আমাকে নীরব হতে হয়। মৃদু হেসে হিমাদ্রির দিকে তাকাই। হিমাদ্রিও একটু হাসে। সে বলে, "আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই শঙ্কু মহারাজ।"

ছেলেটি বলে, "দাদা, আপনার মনে আছে কিনা জানি না। আমার নাম কমল চৌধুরী। আমি আপনার 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়ে আপনাকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম, আপনি উত্তরও দিয়েছিলেন।"

কথাটা মনে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমাদের এই অভিযানের প্রসঙ্গে তিনি একদিন বললেন—গ্যাংটকে যদি আপনাদের কোনো সাহায্যের দরকার হয় তাহলে টেলিফোনের এস. ডি. ও. এস. এস. সেন এবং হাইকোর্টের একাউন্ট্যান্ট কমল চৌধুরীকে দুখানি চিঠি লিখুন। ওঁরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবেন।

আমি চিঠি লিখেছিলাম। মিঃ সেন যথাসময়ে উত্তর দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন তিনি নাকি আমার পরিচিত। কিন্তু কমল চৌধুরী চিঠির উত্তর দেন নি। এই কি সেই কমল চৌধুরী?

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি গ্যাংটকে থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হাইকোর্টে চাকরি করি।"

তাহলে তো আমার অনুমান মিথ্যে নয়। এবারে বলি চিঠির কথা। কমল জানায়, "মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। বহু চেষ্টা করেও মাকে ধরে রাখতে পারলাম না। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পরে এই আড়াই মাস পর গ্যাংটকে ফিরছি। আজ গ্যাংটক পৌঁছে বোধ হয় আপনার চিঠি পাবো।"

পুলিশের বাঁশি সরব হয়ে উঠেছে। তার মানে রাজ্যপাল এলেন বোধ হয়। কমল বলে, "দাদা, আপনাদের গাড়িতে অনেক জায়গা, আমি কি বাস থেকে ব্যাগটা নিয়ে এ গাড়িতে চলে আসব?"

"নিশ্চয়ই।" অমূল্য বলে, "আপনাকে যে আমাদেরও দরকার।"

কমল ছুটে চলে যায় তার বাসের দিকে। রাজ্যপাল তাঁর দলবল নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সেই সঙ্গে আমাদের পথ মুক্ত হল। গাড়ি ছাড়বার আগেই কমল তার ব্যাগ নিয়ে এসে গেল।

গাড়িতে উঠে এসেই সে বলে, "আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতে হবে দাদা!"

"বেশ বলুন!"

"আপনারা যাঁরা আমার থেকে বয়সে বড়, তাঁরা দয়া করে আমাকে 'তুমি' বলবেন।"

আমরা কমলের দাবী মেনে নিই। গাড়ি তিস্তার পুল পেরিয়ে আসে। এখনও আমরা সিকিমে প্রবেশ করি নি। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছি। তবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই অঞ্চল সিকিমের অন্তর্গত ছিল। তৎকালীন সিকিমের দেওয়ান নামগুয়ের গোয়ার্তুমির খেশারত স্বরূপ সিকিমকে এই অঞ্চল হারাতে হয়েছে। মনে মনে সেই সব কথাই ভাবতে থাকি। ইতিহাসের কথা—সিকিমের ইতিহাস। আমি যে আজ সিকিমে চলেছি।

লেপ্‌চারা হচ্ছেন সিকিমের আদিবাসী। কিন্তু আজও তারা নিজেদের 'রং-পা' (Rong-Pa) অর্থাৎ গিরিসঙ্কটের বাসিন্দা বলে থাকেন। তাঁরা সম্ভবতঃ পুবদিক অর্থাৎ আসামের দিক থেকে এদেশে আসেন তাই তাঁদের সঙ্গে তিব্বতীদের আকারগত মিল নেই। অনেকের ধারণা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাঁরা তখন যে সমস্ত দূর-দুর্গম উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, তার অনেকাংশ এখনও আমাদের কাছে অপরিচিত বলা চলে।

প্রায় পাঁচ শ' বছব ধরে লেপ্‌চারা কাঞ্চনজঙ্ঘা উপত্যকার চারিদিকে বসবাস করেন। ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে খেই-বুম্‌সা (Khye Bumsa) নামে তিব্বতের খাম্ (Kham) রাজপরিবারের একজন রাজপুত্র তীর্থদর্শনে সিকিমে আসেন। তাঁর সঙ্গে লেপ্‌চা সর্দার থেকংটেকের (Thekongtek) খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তিনি আর দেশে ফিরে যান নি। থেকংটেকের মৃত্যুর পরে খেই-বুম্‌সার ছেলে লেপ্‌চাদের সর্দার হন। তাঁরই বংশধরগণ প্রায় সাত শ' বছব সিকিমের সিংহাসনে রাজত্ব করেছেন।

সেকালে লেপচারা চাঁদের উপাসক ছিলেন। তারপরে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য লামারা তিব্বত থেকে সিকিমে আসেন। তাঁরাই বুম্‌সার জনৈক বংশধরকে চোগিয়াল উপাধিতে ভূষিত করে সিকিমের সিংহাসনে আসীন করে দেন।

পরবর্তীকালে ভুটিয়ারা সিকিমে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁরাও লেপচাদের মতো মঙ্গোলীয় এবং চাঁদের উপাসক।

দ্বিতীয় চোগিয়াল তেনসুং নামগিয়ালের রাজত্বকাল থেকে সিকিম নামটি প্রচলিত হয়েছে। তখন সিকিমের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। চোগিয়াল নেপালের রাজার সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। নেপালী রানী স্বামীর রাজ্য দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন—আমি তোমার রাজ্যের নাম রাখব 'সু-হিম' মানে সুখের ঘর। সিকিম নামটি সেই সু-হিম শব্দের অপভ্রংশ। সিকিম শব্দটিও নেপালী। অর্থ নূতন রাজ্য।

১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চোগিয়ালের মৃত্যুর পরে ভূটান ও নেপাল সিকিম আক্রমণ করে। এবং এক শ' বছর ধরে সিকিমকে সেই সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়।

১৮১৫ সালে চোগিয়ালের অনুরোধে বৃটিশরা সিকিমের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরা অনায়াসে ভূটানী ও নেপালীদের সিকিম থেকে তাড়িয়ে দেন। এই

অভিযানের নেতৃত্ব করেন মালদহের কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট্ জে. ডাব্লু. গ্রান্ট্ ও বৃটিশ সেনাপতি জি. ডাব্লু. এ. লয়েড। অভিযানকালে একটি পাহাড়ী গ্রাম দেখে তাঁদের বড়ই পছন্দ হয়। গ্রামটির অবস্থান যেমন সুন্দর, তেমনি অপরূপ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাঁরা গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে আবেদন করলেন—সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে এই গ্রামটি চেয়ে নিতে পারলে বড়ই ভাল হয়। ভবিষ্যতে সীমন্তরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অসুস্থ সৈন্যদের স্বাস্থ্যবাসরূপে গ্রামটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বেন্টিঙ্ক তাঁদের অনুরোধ অনুমোদন করলেন। বৃটিশ সরকার অন্য কোনো সীমান্তবর্তী গ্রামের সঙ্গে বিনিময় করতে কিংবা টাকা দিয়ে কিনতে চাইলেন ঐ গ্রামটি। প্রথমে সিকিমের মহারাজা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু পরে রাজ্যরক্ষায় বৃটিশ সাহায্য অপরিহার্য বুঝতে পেরে গ্রামটি দিতে সম্মত হলেন। ১৯৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী একটি দানপত্র (Grant-deed) করে সিকিমের মহারাজা ঐ গ্রামটি বৃটিশ সরকারকে দিয়ে দিলেন। দানপত্রে গ্রামটির চৌহদ্দি সম্পর্কে লেখা হয়—

'All the land south of the Great Rangeet river, east of Balasun, Kahil and the little Rangeet river, and west of Rungno, and Mahanadi rivers.'

এই গ্রামটির জন্য ১৮১৪ সাল থেকে বৃটিশরা সিকিমকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনা দিতে শুরু করেন। ১৮৪৬ সালে তাঁরা সেই খাজনার পরিমাণ ছ' হাজার টাকায় বৃদ্ধি করেন। সেদিনের সেই পাহাড়ী গ্রামটি, আজকের দার্জিলিং—হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈলাবাস।

বৃটিশরা কিন্তু সিকিমের মহারাজাকে বেশিদিন খাজনা দেন নি। সিকিমের অবিমৃষ্যকারী দেওয়ান নামগুয়ে নিজেই তাঁদের এই খাজনা বন্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে সিকিমকে এই অঞ্চলটিও হারাতে হয়েছে। আর তা ঘটে মাত্র তিন বছর পরে ১৮৪৯ সালের ৭ই নভেম্বর।

সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদসম্পদের কথা শুনে স্যার জোসেফ হুকার নামে জনৈক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ বৃটেন থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৮৪৮ সালে সিকিমে এলেন। তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীর বন্ধু। সুতরাং সিকিমে ভ্রমণ ও উদ্ভিদ-সমীক্ষা করবার জন্য সিকিম দরবারের অনুমতি পেতে তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি সিঙ্গালি-লা গিরিশিরার ইসুম্বো গিরিপথ পেরিয়ে নেপাল থেকে সিকিমে প্রবেশ করেন। ইয়াক্‌সাম, পেমিওংচি হয়ে তিস্তার উপকূলে অবস্থানরত দার্জিলিঙের সুপারিন্টেনডেন্ট ডঃ ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলিত হন। হাতে সময় থাকায় ক্যাম্বেলও হুকারের সহযাত্রী হলেন। তাঁরা তাশীডিং ও পেমিওংচিসহ উত্তর-পশ্চিম সিকিম ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে সিকিমের দেওয়ান বদল হয়েছে। প্রাক্তন দেওয়ানের মৃত্যুর পরে রাজমহিষীর তিব্বতবাসী ধূর্ত ভাই নামগুয়ে নূতন দেওয়ান হয়েছেন। তিনি বৃটিশদের পছন্দ করতেন না।

হুকার সংবাদটি জেনেও চুংথাং হয়ে জেমু হিমবাহ সমীক্ষা করলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ডোঙকিয়া হিমবাহ ভ্রমণ করে পূর্ব-সিকিমে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পূর্ব-সিকিম

সমীক্ষা শেষ করে চো-লা (১৪,৫০০') ও ইয়াক্-লা (১৪,৪০০') পেরিয়ে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় চলে যাবেন। কিন্তু পথে সিঙটাম্ তহশিলের চামান্যাকো (১২,৫০০') রেস্টহাউসের সামনে সিকিমের সেপাইরা তাঁদের বন্দী করে। সিকিম দরবারের অনুমতিপত্র থাকা সত্ত্বেও দেওয়ানের আদেশে সেপাইরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রহার করে সেই ঠাণ্ডায় সারারাত বাইরে বেঁধে রাখে। তারপর তাঁদের সিঙটামে নিয়ে আসা হয়। সেখানে এই সম্মানিত অতিথিদের আরেকবার মারধোর করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।*

বারো দিন বাদে অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর (১৮৪৯) তারিখে তাঁদের মালবাহক ও সহকারীদের মুক্তি দেওয়া হয়। হুকার তাদের হাত দিয়ে গোপনে লর্ড ডালহাউসীর কাছে একখানি চিঠি পাঠান।

চিঠি পেয়েই লর্ড ডালহাউসী কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সিকিমের দেওয়ানকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক চরমপত্র পাঠান। বলেন—ডাঃ ক্যাম্বেল ও স্যার জে. ডি. হুকারের ওপর আর কোন অত্যাচার হলে বৃটিশরা সমস্ত সিকিম দখল করে নেবেন।

খবরটা সিকিমের মহারাজার কানে আসে। তিনি শালাবাবুর (দেওয়ান) এই অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম অনুমান করতে পারেন। তবু শালাবাবুর জন্য ক্যাম্বেল ও হুকারকে মুক্তি দিতে তাঁর বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। ২৩শে ডিসেম্বর তাঁরা দার্জিলিঙে ফিরে আসেন।†

ততদিনে যা হবার হয়ে গিয়েছে। বৃটিশসৈন্য বিনা বাধায় দার্জিলিঙের তরাই এবং মোরাঙের পাহাড়ী অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে বৃটিশরা ছ'হাজার টাকার খাজনাও বন্ধ করে দেন। দার্জিলিং ও কালিম্পং বৃটিশ-ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। এখন অবশ্য এসব কথা শুধুই অতীতের ইতিহাস। কারণ এখন সারা সিকিমই স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং সিকিমবাসীরা সবাই ভারতীয়।

দুই

আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হল। সিকিমের মাটি স্পর্শ করলাম। আমরা রংপো পৌঁছলাম অর্থাৎ শিলিগুড়ি থেকে ৭৫ কিলোমিটার আসা গেল। এটি তিস্তা উপত্যকায় সিকিমের সীমান্ত শহর। পথের পাশে মদের একখানি সুবিরাট বিজ্ঞাপন সিকিমের মাটিতে আমাদের প্রথম স্বাগত জানালো। বীরেন মানে আমাদের সহকারী নেতা ও সুলেখক বীরেন্দ্রনাথ সরকার সহাস্যে বলে, "খুবই স্বাভাবিক। সিকিমের মানুষ যে মদ বড়ই ভালোবাসেন এবং বিখ্যাত সিকিম ডিস্টিলারি এখানেই অবস্থিত।"

গাড়ি থেকে নেমে আসি। সামনেই অন্নপূর্ণা হোটেল—বাঙালীর প্রতিষ্ঠান।

---

* Hooker's 'Himalayan Journal'

† বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'সিকিম' বইখানি দ্রষ্টব্য।

একতলায় রেস্তোরাঁ, দু-তলায় থাকার ঘর। ভাত-ডাল ও মিষ্টিসহ বিবিধ খাবার পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের হাতে একদম সময় নেই। বেলা একটা বাজে। এখনও ৩৯ কিলোমিটার পথ বাকি। বড় গাড়ি, চড়াই পথ—কম করেও আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে। অফিস ছুটি হয়ে যাবার আগে গ্যাংটকে পৌঁছনো দরকার। আজই ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারমিট যোগাড় না করতে পারলে, কালকের দিনটি গ্যাংটকে বসে থাকতে হবে। নষ্ট হবে একটি অমূল্য দিন আর বেশ কিছু টাকা। তাই চা-বিস্কুট খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসি গাড়িতে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

ছোট শহর রংপো। বাড়ি-ঘর প্রায় সবই একতলা। ঘরই বেশি। ঘরের চালগুলো প্যাগোডা গড়নের, ভারী সুন্দর। বীরেন বলে, "এটা সিকিমের নিজস্ব নির্মাণ-কৌশল।"

পথগুলিও বড় সুন্দর—আঁকাবাঁকা মসৃণ ও ছায়াশীতল। সুন্দরের অভিসারে এসেছি। প্রথম দর্শনেই সুন্দরী সিকিমকে ভালোবেসে ফেললাম।

তিস্তার তীরে তীরে পথ চলেছি। তিস্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শৈশবের। জ্ঞানলাভের পরে প্রথম যাকে নদী বলে চিনেছিলাম, তার নাম তিস্তা। শৈশবের সেই খেলাঘর রহমতপুর গাঁয়ে যাবার আমার এখন অধিকার নেই। সেদিনের খেলার সাথী আনোয়ার আর আমিনাও এখন আমাকে চিনতে পারবে না। আমি আজ তাদের কাছে বিদেশী।

তবু আমি আজ সেই তিস্তার তীরে তীরে পথ চলেছি। এ আমার এক মস্ত সান্ত্বনা। ছোটবেলায় কতদিন তার তীরে বসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতই প্রশ্ন করেছি—তিস্তা, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

সে প্রশ্নের উত্তর পাই নি। জগদীশচন্দ্রের মতো তিস্তার উৎস সন্ধানের কথা তখনও বালকমনের ভাবনায় আসে নি। অথচ আমি আজ সত্যই তার উৎস দর্শনে চলেছি। হোক না জীবনের মধ্যাহ্ন, তবু তো শৈশবসাথীর জন্মভূমি দর্শন করতে পারব! আমি ভাগ্যবান।

পাহাড়ের গা দিয়ে বনময় উৎরাই পথ দিয়ে আমরা সিঙটাম পৌঁছলাম। পথটা এখানে অনেকখানি সমতল। পথের দু-পাশে দোকান-পাট, পেট্রোল পাম্প, থানা, পোস্ট অফিস এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। শুনিছি এখানে খুব কমলালেবু হয়। আমরা শিলিগুড়ি থেকে ৮৫ কিলোমিটার এসেছি।

চেক্ পোস্টের ঝামেলা মিটবার পরে আবার গাড়ি চলল এগিয়ে। এবারে চড়াই পথ। পথের পাশে সেই তিস্তা—আমার শৈশবসাথী তিস্তা।

সিঙটাম থেকে ১৭ কিলোমিটার এগিয়ে রাণীপুল—ছোট জনপদ। তারপরে ১২ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে গ্যাংটক। বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমরা গ্যাংটক পৌঁছলাম।

মিঃ সেন আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই অসিত, কেশব ও কমলকে নিয়ে অমূল্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ছুটল। মিঃ সেন এখানে টেলিফোনের এস. ডি. ও.।

একটু বাদে অমূল্যরা একটা ট্যাক্সিতে ফিরে আসে। অমূল্য বলে, "তোমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে গাড়ি নিয়ে চলে যাও। সেনদা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশেই শান্তিভবন। সেখানেই আমরা রাতে থাকব। তিনতলায় থাকতে হবে। কাজেই মালপত্র গাড়িতেই থাকবে। শুধু রুক্স্যাক ও স্লীপিং ব্যাগ ওপরে নিয়ে যেও।

রাতে ড্রাইভারদের সঙ্গে হ্যাপ্রাও গাড়িতে ঘুমোবে। আমরা পুলিস অফিসে যাচ্ছি। তোমরা সবাই হোটেলে খেয়ে নিও।”

অসিত নেমে আসে ট্যাক্সি থেকে। অমূল্য সুশান্তবাবুকে ট্যাক্সিতে তুলে নেয়, সে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলে।

জায়গাটা খুবই কাছে। তাই আমি ও অসিত আর গাড়িতে উঠি না। গাড়ির পেছনে হেঁটে চলি শান্তিভবনের দিকে।

বাঁক ফিরতেই বাঁদিকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। তারই সামনে আমাদের গাড়ি থেমেছে। সদস্যরা নেমে পড়েছে। মাল-পত্র নামছে।

কিন্তু ওখানে ঐ ভদ্রলোক কে? ঐ যে অসিতবাবু ও বীরেনের সঙ্গে কথা বলছেন! খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! কোথায় দেখেছি?

হ্যাঁ মনে পড়েছে। সুখেন্দুশেখরবাবু আমার খুড়তুতো ভাই দেবতোষের স্ত্রী মালার বড়দা। ওদের বিয়ের সময় আলাপ হয়েছে, নানা কথা হয়েছে।

হ্যাঁ, তিনি তো এখানেই থাকেন—এই গ্যাংটকে। আমাকে বেড়াতে আসতেও বলেছিলেন। আসা হয় নি। যাক্ গে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু বীরেন আর অসিতবাবু সুখেন্দুবাবুকে চিনল কেমন করে? বেশ জমিয়ে গল্প করছে মনে হচ্ছে। কি জানি, হয়তো বাঙালী পেয়ে, বাংলার সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছে। কিন্তু আমাদের ‘host-cum-liason’ মিঃ সেন কোথায়? তিনি নাকি এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেই কথাই জিজ্ঞেস করি অসিতকে।

অসিত যেন অবাক হয়। বলে, “সে কি! আপনি সেনদাকে চিনতে পারছেন না, অথচ সেনদা যে বললেন, আপনি তাঁকে চেনেন! ঐ তো তিনি কথা বলছেন বীরেনদা আর অসিতদার সঙ্গে।”

“উনিই সেনদা!” আমি বিভ্রান্ত।

“হ্যাঁ।” অসিত উত্তর দেয়।

এবারে মনে পড়ে আমার—দেবতোষের শ্বশুরবংশ তো সেন। সুখেন্দুশেখর সেন যে এস. এস. সেন কিংবা সেনদা হতেই পারেন। আর তাই আমাদের চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন—তিনি আমার পরিচিত।

পরিচিত বৈকি, সিকিমের সবচেয়ে উপকারী মানুষটি আমার পরিচিত, আমার আত্মীয়।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তাঁর কাছে আসি। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বলি, “দেবতোষের বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করেছিলেন, দেখুন ঠিক এসে গিয়েছি।”

“এসেছেন, খুবই খুশী হয়েছি। কিন্তু এ আসা তো আমার নেমন্তন্নে নয়।” সেনদা সহাস্যে বলেন।

প্রশ্ন করি, “তাহলে কার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছি?”

“সিনিয়লচুর।”

সবাই হেসে উঠি। তারপরেই মনে হয়। তিনি ঠিকই বলেছেন। সিনিয়লচুর আহ্বানে আমরা আজ গ্যাংটকে এসেছি, সুন্দরের অভিসারে চলেছি। কিন্তু সিনিয়লচু কি সেনদার মতো উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে আমাদের?

বড় রাস্তার ওপরেই শান্তিভবন—মন্দির ও অতিথি নিবাস। দুখানি বড় বড় ঘর পাওয়া গিয়েছে। মেঝেতে মোটা গদি পাতা রয়েছে। তার ওপরে স্লীপিং ব্যাগ পেতে শুয়ে পড়া যাবে। এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলাবার প্রয়োজন পড়বে না। পাশেই গুটিতিনেক করে শৌচাগার ও স্নানাগার।

ঘর গুছিয়ে নেমে আসি নিচে। আর তখুনি দেখা হয়ে যায় দীপালির সঙ্গে—বাংলার প্রথম মহিলা পর্বতাভিযানের (রোণ্টি—১৯,৮৯৩′) সফলকাম নেত্রী। শুনেছিলাম সে গ্যাংটকে স্বামীর ঘর করছে এবং একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছে। শুধু দীপালি নয়, সঙ্গে তার স্বামী ও ছেলে রয়েছে। সত্যি বড় ভাল লাগল। হিমালয়ের মেয়ে হিমালয়ে এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা সুখী হোক।

ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি বাজারের দিকে। আমরা খেতে চলেছি। দীপালি বলে, "অমূল্যদারা ফিরে এলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলবেন। এখানে কিন্তু রাত আটটার মধ্যে সব খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।"

"কেন এখানেও কি লোড শেডিং আছে নাকি?

"না।" দীপালি বলে, "পাছে মাতালরা এসে ঝামেলা করে, তাই কেউ বেশি রাত পর্যন্ত দোকান খুলে রাখতে সাহস পান না।"

"এখানে সবাই বুঝি খুব মদ খায়?"

"তা আর বলতে। একে ঠাণ্ডা জায়গা, তার ওপরে এক্সাইজ ডিউটি কম হওয়ায় মদ এখানে বেশ সস্তা। স্থানীয়রা অবশ্য দিশী পদ্ধতিতে তৈরি মদই বেশি খেয়ে থাকেন।"

সত্যি বড় দুঃখের কথা। মদ খাওয়া কোন অপরাধ নয়। সুরা বিশ্বের প্রাচীনতম পানীয়। মদ মানুষেই খায়। কিন্তু বিপদ হয় যখন মদ মানুষকে খায় আর তখনই যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমরা এত আইন পাশ করেছি কিন্তু তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করছি না যে মানুষ মদ না খেলেও বেঁচে থাকতে পারে এবং বেশি মদ খেলে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয়।

সারাদিন খাওয়া হয় নি, তাই বোধহয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলি। দীপালিরা বসে বসে খাওয়া দেখে। তারপরে বিদায় নেয়। বিদায় বেলায় দীপালি বলে, "অমূল্যদাকে বলবেন আমাকে ফোন করতে। আর ফেরার পথে আপনাদের সবার ডিনারের নেমন্তন্ন রইল আমার বাসায়। কবে আসছেন আগে জানাবেন কিন্তু।"

"তা না হয় জানালাম," অসিতবাবু সহাস্যে বলে, "কিন্তু একে তো আমরা তেরোজন, তার ওপরে পাহাড়ে যাবার সময়েই তো খাবার নমুনা দেখলে, ফেরার পথের পরিমাণটা অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়।"

"পারছি বৈকি," দীপালি মৃদু হাসে। বলে, "তবু নেমন্তন্ন রইল।"

"অবশ্যই রক্ষা করব।" সমস্বরে সবাই বলে উঠি।

"ধন্যবাদ।"

ওদের স্কুটার চলতে শুরু করে।

ফিরে আসি ঠাকুরবাড়িতে। সংক্ষেপে সবাই শান্তিভবনকে ঠাকুরবাড়ি বলেন। এসে দেখি অমূল্যরা এসে গিয়েছে।

অমূল্য বলে, "কাজ হয় নি, তবে খানিকটা এগিয়েছে। সেনদা ফোন করে

দিয়েছিলেন, আমরা দেখা করেছি আই. জি. মিঃ গ্যাডগিলের সঙ্গে।...."

"চমৎকার লোক", সুশান্তবাবু মাঝখান থেকে বলেন, "মারাঠী হয়েও বাংলাতেই কথাবার্তা বললেন। তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনের ছাত্রী, শুনেছি খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন।"

অমূল্য পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসে। বলে, "আমরা 'ক্যামেরা' পারমিটের দরখাস্ত করে 'ইনারলাইন' পাসপোর্টের ফর্ম নিয়ে এসেছি। ফর্মগুলো লিখে সবাইকে দিয়ে সই করিয়ে কাল সকাল দশটায় পুলিস অফিসে জমা দিতে হবে।"

"তার মানে পাসপোর্ট পেতে কাল সারাদিন কেটে যাবে।" অসিতবাবু বলে ওঠে।

কেশব আপত্তি করে, "না। আই. জি. সাহেব নিজে ফোন করে দুজন অফিসারকেই বলে দিয়েছেন, আগামীকাল বেলা এগারোটার মধ্যে যেন আমাদের পারমিট ও পাসপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়।"

"সুশান্তদা, অসিতদা ও কেশবকে নিয়ে আমি সকাল আটটায় আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে চলে যাবো, তোমরা বাজার সেরে ঠিক দশটায় পুলিস অফিসে যাবে। এবং আশা করছি আমরা বেলা বারোটা নাগাদ চুংথাং রওনা হতে পারব।"

"তবে ক্যামেরা পারমিট কিন্তু 'কন্‌ডিশন্যাল' হবে।" সুশান্তবাবু বলে ওঠেন।

"কি রকম?" বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

অমূল্য বুঝিয়ে দেয়, "আমরা দরখাস্তে আমাদের সবক'টি ক্যামেরা ও ফিল্মের 'ডিটেল্‌স' দিয়ে এসেছি। ফেরার পথে 'এক্‌সপোজড' ফিল্মগুলো চুংথাং চেক্‌পোস্টে জমা দিয়ে আসতে হবে। তাঁরা সেগুলো এখানে পাঠাবেন। এখান থেকে ফিল্মগুলো দিল্লি যাবে, ডিফেন্‌স ল্যাবরেটরীতে 'ডেভেলপ্‌ড' হবে। মিলিটারী ইনটেলিজেন্স ছবিগুলো পরীক্ষা করে আমাদের ফেরত দেবেন।

"তার বোধকরি আর দরকার পড়বে না।"

"একথা কেন বলছেন দাদা?" কমল আমার দিকে তাকায়।

ওকে বলি, "তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো, আমরা এই অভিযানের একটা 'সিক্‌সটিন মিলিমিটার কালারড মুভি' তুলব বলে সুশান্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এই চলচ্চিত্র প্রযোজনা করতে আমাদের প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ পড়বে। সেই ফিল্মের কি গতি হতে চলেছে, তা তো শুনলে। আমরা যেসব ফিল্ম কিনে এনেছি, সেগুলো ডেভেলপ্‌ করাবার জন্য বম্বে হংকং ও জর্মানীতে পাঠাবার কথা। দিল্লীর ডিফেন্‌স ল্যাবরেটরীর পক্ষে এ ফিল্ম ডেভেলপ্‌ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুশান্তবাবুর সকল শ্রম ও এই দরিদ্র অভিযানের কয়েক হাজার টাকা যে সমূলে নষ্ট হবে, এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।"

"তুমি চিন্তা করো না শঙ্কুদা!" অমূল্য আমাকে আশ্বস্ত করে তুলতে চায়। বলে, "আমরা এখন এই কন্‌ডিশন্যাল পারমিট নিয়েই চলে যাবো। তবে কোন coloured film ওদের হাতে দেব না। কি ভাবে কি করব, তা তখন ভেবে দেখা যাবে।"

কথাটা খারাপ বলে নি অমূল্য, এখন এ নিয়ে দরবার করতে হলে এখানে দেরি হয়ে যাবে। আই. জি. ভাল লোক, যা করার ফেরার সময় করা যাবে।

তাই ওকে বলি, "এবারে তোরা খেয়ে আয়। কমলকে সঙ্গে নিয়ে যা। ফিরে এলে সেনদার বাড়িতে যাবো।"

কমলই সেনদার বাড়িতে নিয়ে আসে আমাদের। বেচারী আড়াই মাস পরে গ্যাংটক এসেছে, এখন পর্যন্ত ঘরে যায় নি। মালপত্র আমাদের গাড়িতে রেখে সেই থেকে অমূল্যর সঙ্গে ঘুরছে। ওকে পেয়ে খুবই সুবিধে হয়েছে। অপরিচিত জায়গা তবু আমাদের সময় নষ্ট হয় নি। কিন্তু কমল এখানে একা থাকে, এতদিন ওর ঘর বন্ধ রয়েছে, এবারে ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটু আগে সেই কথাই বলেছিলাম ওকে। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে—ঘর-দোর ঠিক করার অনেক সময় পাবো দাদা, কিন্তু আপনাদের সঙ্গলাভের সুযোগ যে আর পাবো না। কালই তো আপনারা চলে যাচ্ছেন।

সেনদার বাড়িতে এসে পরিচয় হল তাঁর তিন ছেলের সঙ্গে। বড় দুই ছেলে এখানেই থাকে, চাকরি করে। সেজ ছেলে কলকাতায় থাকে, ছুটিতে বাবার কাছে এসেছে। বৌদি ছোট তিন ছেলে ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকেন। মেয়েটি ছোট, স্কুলে পড়ে। বড় ছেলে সুপ্রকাশ বিয়ে করেছে, তার স্ত্রী স্নিগ্ধা এখানে গৃহকর্ত্রী। বয়সে তরুণী হলেও পাকা গিন্নী। খুবই কাজের মেয়ে। তিনজন মানুষ অফিস করে, তার ওপর সেনদার সমাজসেবার কল্যাণে দৈনিক সকাল-সন্ধ্যো আর ছুটির দিনে সর্বক্ষণ এ বাড়িতে লোকের ভিড় লেগেই আছে। তাকেই হাসিমুখে তাঁদের চা-জলখাবার সরবরাহ করে যেতে হয়।

ক্যামেরা পারমিটের ব্যাপারে সেনদা আমাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। বললেন, "যা পাচ্ছেন, তাই নিয়ে চলে যান। এক্সপোজড্ ফিল্ম নিয়ে এখানে চলে আসুন, তখন যা করার করা যাবে।"

গাড়ি ও পথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য সেনদা আগামীকাল সকালে ব্রিগেডিয়ার খেরা ও লেঃ কর্নেল বালির সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, "কলকাতায় কার কার সঙ্গে কথা বলতে চান বলুন।"

ব্যাপরটা যেন কিছুই নয়, ভাবখানা পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার মতো। সেই ভাবেই একটার পরে একটা লাইন পাওয়া যেতে থাকল। সুশান্তবাবু ও অমূল্য বাড়ির সঙ্গে কথা বলল, রমেন যুগান্তরে আমাদের পৌঁছনো সংবাদ দিয়ে দিল আর আমি শিলিগুড়িতে অমল ও তমালের সঙ্গে কথা বললাম।

সব কাজ মিটে যাবার পরে চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম সেনদার বাড়ি থেকে। রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। সন্ধ্যের সময় দুপুরের খাবার খেয়েছি। আজ রাতে আর খাবার পাট নেই। পথে মানুষজন খুবই কম। গ্যাংটকের জনবিরল পথ দিয়ে আমরা ফিরে চলেছি ঠাকুরবাড়িতে। সারাদিনের ক্লান্তির অবসান আসন্ন।

তবু সিকিমের ভাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই না। আর তা পাবার প্রয়োজনই বা কি? তার চেয়ে গ্যাংটকের নির্জন পথে পদচারণা করতে করতে সুন্দরী সিকিমের ভাবনার মাঝে হারিয়ে যাওয়া মন্দ কি? আমি ভেবে চলি—

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-সীমান্তে, যেখানে হিমালয়ের মূল-গিরিশিরা দক্ষিণমুখী হয়েছে, সেখানে সিঙ্গালি-লা ও চো-লা নামে দুটি পর্বতশ্রেণী রয়েছে। তারা অভেদ্য পর্বতপ্রাচীরের মতো এক ডিম্বাকৃতি ভূ-খণ্ডের তিনদিক বেষ্টন করে আছে। ভূখণ্ডটির চতুর্থ দিকটা

আস্তে আস্তে নিচু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমতলে মিশেছে। এই পার্বত্যরাজ্যটিই সিকিম—সুন্দরী সিকিম।

সিকিম পূর্ব-হিমালয়ের অন্তর্গত একটি পার্বত্যপ্রদেশ। সিকিমের পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে তিব্বত, পূর্বে ভূটান আর দক্ষিণে দার্জিলিং জেলা। সিকিমের আয়তন ৭১০৭ বর্গকিলোমিটার। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। আমি এখন সেই গ্যাংটকের পথে পদচারণা করতে করতে সুন্দরী সিকিমের কথা ভাবছি। আমি যে সুন্দরের অভিসারে এসেছি।

হিমালয়ের কয়েকটি অতিকায় ও অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ সিকিমে অবস্থিত। আর তাই ফ্র্যাঙ্ক এস. স্মাইথ সিকিমকে বলেছেন—'The playground of the eastern Himalayas'.

প্রখ্যাত হিমালয় বিশারদ কেনেথ ম্যাশন ভারতীয় হিমালয়কে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছিলেন—পাঞ্জাব, কুমায়ুঁ, নেপাল, সিকিম ও আসাম হিমালয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল সিকিম-হিমালয়।

আয়তনে ছোট হলেও সিকিম হিমালয়ের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো বিচিত্র-সুন্দর সুবিশাল ও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী এই রাজ্যে অবস্থিত। ২৮,১৪৬ ফুট উঁচু কাঞ্চনজঙ্ঘা-১ শিখরটি বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শিখর।*

কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীর অপর দুটি অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ হল ২২,৩৬০ ফুট উঁচু সিম্বু এবং আমাদের সিনিয়লচু। তবে সে তো সবচেয়ে সুন্দর আর তার জন্যই আমার এই সিকিমে আসা।

অতএব তার কথা এখন থাক। আমি অন্য কথা ভেবে চলি। সিকিম-হিমালয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গ হল—সুগারলোফ্ (২১,১২৮'), টুইনস (২৩,৩৬০'), নেপাল (২৩,৫৬০'), টেন্ট্ (২৪,০৮৯'), পিরামিড (২৩,৪০০'), ল্যাংপো (২২,৮০০'), জংসং (২৪,৩৪৪'), তালুং (২৩,০৮২'), কাব্রু (২৪,০০২'), ও কাঞ্চনঝাউ (২২,৭০০') প্রভৃতি।

উত্তরের কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে দক্ষিণের সমতল পর্যন্ত সারা রাজ্যটি অসংখ্য গিরিশিরায় বিভক্ত। দুই গিরিশিরার মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু দেখতে পাওয়া যাবে। গাছপালার প্রকৃতিও ভিন্ন।

সিকিমের প্রধান নদী তিস্তা। এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। সিকিম মৌসুমীবায়ুর প্রধান পথের ওপরে অবস্থিত। ফলে নিম্নাঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪০ ইঞ্চির মতো। মৌসুমী বায়ু উপত্যকাগুলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রায় উত্তরের স্থায়ী হিমরেখা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে সিকিম হিমালয়ের আর্দ্রতম প্রদেশ।

অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য সিকিমের উপত্যকাগুলি যেমন উর্বর, পাহাড়গুলি তেমনি বনময়। তাই সিকিমের প্রাচীন নাম বি-উল-দেনজং (Be-yul-Denzong) অর্থাৎ ধানের লুকানো উপত্যকা—'The hidden valley of Rice.'

---

* বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯,০২৮'), তার পরেই কে-টু ২৮,২৫০' ফুট উঁচু।

বন বোধকরি সিকিমের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর তার বনে বনে বাস করে বহু পশু ও পাখি।

পশুদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাদামী এবং কালো ভালুক। বাঘ, লেপার্ড, সম্বর ও বিভিন্ন জাতের হরিণ, বন-বিড়াল, বন-ছাগল, বুনো-শুয়োর, খরগোশ ও ভোঁদড় প্রভৃতি সিকিমের বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিকিমে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় পাখি। সাড়ে পাঁচশো রকমের পাখি আছে এই রাজ্যে। রয়েছে প্রায় ছশো রকমের প্রজাপতি। অর্কিড সিকিমের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এত বিচিত্র ধরনের অর্কিড ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ছশো এক রকমের অর্কিড রয়েছে এখানে।

আগেই বলেছি, সিকিমের ভূপ্রকৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এখানে আঠাশ হাজার ফুট উঁচু তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ থেকে সাতশো ফুট উঁচু সুজলা ও সুফলা সমতল রয়েছে। তার ওপরে সিকিমে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি উপত্যকাগুলির মাটি উর্বরা। সুতরাং এখানে এ্যালপাইন গাছপালা থেকে শুরু করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসল পর্যন্ত সবই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

আমাদেব ডেসমণ্ড ডয়েগ সিকিমকে বড়ই ভালোবাসেন। জীন পেরিন-এর (Jean Perrin) সঙ্গে তিনি 'সিকিম' নামে একখানি ভারী সুন্দর বই লিখেছেন। এই বইতে তাঁরা সিকিমের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'What is Sikim today is everywhere beautiful, a country of mountains, lush valleys, fast flowing rivers and a serenity that must have come from the gods themselves.'

সেই নির্মল ও শান্ত দেবভূমি সিকিমের পথে পথে পদচারণা করছি, আমি ভাগ্যবান।

আমরা গ্যাংটকে এসেছি, সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। এই শহরের অবস্থান সম্পর্কে ডেসমণ্ড লিখেছেন—

'Gangtok is built on the flank of a ridge considered sacred, and on the spine of the ridge itself are important buildings that influence and sanctify each other.'

এই পথটিই সেই পবিত্র গিরিশিরার মেরুদণ্ড। এরই দুপাশে সব বড় বড় বাড়ি। পথটি গিয়ে জাতীয় সড়কে মিশেছে। আর সেখানেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি।

সিকিমের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই নেপালী, তাঁরা হিন্দু। আদিবাসী লেপ্‌চা ও ভোটিয়ারা এখন সংখ্যালঘু। তাঁরা সবাই বৌদ্ধ। এখন সিকিমে বিশেষ করে গ্যাংটকে কিছু মুসলমান ও খ্রীষ্টানও বসবাস করেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সমতল থেকে এসেছেন। এখানে চাকরি কিংবা ব্যবসা করছেন।

বৌদ্ধ সিকিমের সনাতন ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ভারতের ধর্ম। কিন্তু ভারতীয় হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যের মতো সিকিমেও বৌদ্ধধর্ম এসেছে তিব্বত থেকে। কথিত আছে মহাপণ্ডিত ও প্রখ্যাত ধর্মগুরু পদ্মসম্ভব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বত থেকে সিকিমে আসেন। তিনিই এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচারক। সিকিমের রাজপরিবার পরবর্তীকালে তাঁর মহাযান বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। পদ্মসম্ভব তিব্বত ও সিকিমের

মতো ভূটান এবং পূর্ব-নেপালেও মহাযান-বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ভারতীয় সন্ন্যাসী এ অঞ্চলে 'বিম্‌পোচে' নামে খ্যাত। গ্যাংটকে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত একটি সুপ্রাচীন মন্দির রয়েছে।

সিকিমের প্রধান উৎসব দশেরা। বলা বাহুল্য এটি নেপালী হিন্দুদের উৎসব। অক্টোবর মাসে পনেরো দিন ধরে এই উৎসব চলে। বলিদান এবং নাচ-গান উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব দুটি—কাঞ্চনজঙ্ঘা ও লোহসার উৎসব। সিকিমের আদিবাসীদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেবল একটি পর্বতশ্রেণী নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা তাঁদের রক্ষক-দেবতা। গাড়োয়াল ও কুমায়ূঁতে যেমন নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫), সিকিমে তেমনি কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেখানকার মতো এখানেও কাঞ্চনজঙ্ঘা সমাজ-জীবনে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। তবে সিকিমে নন্দাজাতের মতো কোন কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রার প্রচলন নেই। এখানে কেবল কাঞ্চনজঙ্ঘার উদ্দেশে নাচ-গানের উৎসব হয় সেপ্টেম্বর মাসে।*

লোহসার হচ্ছে সিকিমের নববর্ষ উৎসব। এটি অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর মাসে। দিব্যজ্ঞানের দেবতা মহাকালের সম্মানে এই উৎসব। তিব্বতীরা মহাকালকে বলেন ইয়েশে গণ্‌পো (yeshe gonpo) অথবা গুরু দ্রাগ্‌মার (dragmar)। দ্রাগ্‌মার মহানগুরু পদ্মসম্ভবের ভয়ঙ্কর রূপ।

এই দুটি উৎসবই বর্ণাঢ্য এবং সঙ্গীত-নৃত্যমুখর। লামারাই উৎসবের প্রধান কুশীলব। সিকিমের তৃতীয় রাজা চাদর (Chador) নার্মগয়াল সপ্তদশ শতাব্দীতে এই উৎসব দুটির প্রচলন করেন। তাই আজও গ্যাংটক রাজপ্রাসাদের মন্দিরাঙ্গনে উৎসবের প্রধান আসর বসে।

ডেসমণ্ড ডয়েগ অবশ্য নাচ-গানের চেয়ে সিকিমের বাজনাই বেশি পছন্দ করেন। তিনি লিখেছেন—

'....there is nothing so evocative of the country as the Lepcha band in its fur-trimmed and canchats decorated with peacock feathers, its homespun Kilts and its motley of instruments that contrives to sound like cacophony of birds in storm.'

তিন

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। গ্যাংটকে এখন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং এখানে লোড শেডিংয়ের শঙ্কা নেই। সুতরাং সবাই নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমোবার সুযোগটি সদ্ব্যবহার করেছি।

সত্যি বলতে কি আমরা গতকাল বড়ই শ্রান্ত ছিলাম। বিপ্লবের শিকার হয়ে

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' (হিমালয়-২) কিংবা বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' দ্রষ্টব্য। এক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে একদল নন্দাজাতের যাত্রী রূপকুণ্ডে (১৮,৫০০') শহীদ হয়ে রয়েছেন।

পরশু সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত মনে মনে দুশ্চিন্তার জাল বুনেছি। রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছি। আর গতকাল তো প্রায় সারাদিন শক্তিমানের ঝাঁকুনি হজম করতে হয়েছে। দুদিন শরীর ও মনের ওপর দিয়ে খুবই ধকল গিয়েছে। কাল রাতে তাই বড় আরামে ঘুমিয়েছি।

কিন্তু আরাম মানেই 'হারাম'। ফলে ঘুম ভাঙতেই তাড়াহুড়া লেগে গেল। অমূল্য কেশব সুশান্তবাবু ও অসিতবাবু যাবে মিলিটারী হেডকোয়ার্টার্সে। চুংথাং থেকে লাচেন যাবার ব্যবস্থা করে শেরপাদের খোঁজ করবে। শিলিগুড়িতে আমরা যে দুখানি শক্তিমান অর্থাৎ 'থ্রি-টনার' পেয়েছি, তারা আমাদের চুংথাং পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে। চুংথাঙের পরে রাস্তা সরু, শক্তিমান যেতে পারে না। কাজেই চুংথাং থেকে লাচেন এই ২৮ কিলোমিটার পথ যাবার জন্য পাঁচখানি 'ওয়ান-টনার' চাই।

বীরেন অসিত ও অরুণকে যেতে হবে বাজারে আর আমাদের বেলা ঠিক দশটার সময় হাজিরা দিতে হবে পুলিস অফিসে।

অমূল্যরা চলে যাবার পরে হিমাদ্রি ও দুজন হ্যাপ্‌কে ঠাকুরবাড়িতে রেখে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম পথে। বীরেনরা বাকি দুজন হ্যাপ্‌কে নিয়ে বাজারে চলে গেল। আমরা এলাম পুলিস অফিসে।

কাঁটায় কাঁটায় বেলা এগারোটার সময় পারমিট পাওয়া গেল। সরকারী দপ্তরে এমন সময়নিষ্ঠা বড় একটা দেখা যায় না। সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলাম আস্তানায়।

বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে হোটেল থেকে খেয়ে আসা গেল। সেনদা ও কমল আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে। কিন্তু আমরা বিদায় নিতে পারছি না।

অমূল্যদের দেখা নেই।

শুরু হল প্রতীক্ষা। সেই সঙ্গে শঙ্কা—আশঙ্কা বলাই বোধকরি উচিত হবে। যদি গাড়ি না পাওয়া যায়? এত মালপত্র নিয়ে ২৮ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। দুটি দিন ও হাজার কয়েক টাকা বেশি খরচ হয়ে যাবে।

আর শুধু গাড়ির কথাই বা ভাবছি কেন? যদি শেরপারা না এসে থাকে? এভারেস্ট বিজয়ী সোনাম ওয়াঙ্গিল গত বছর প্রথম সফলকাম ভারতীয় সিনিয়লচু অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন। তিনি অমূল্যকে লিখেছেন—ভাল শেরপা ছাড়া সিনিয়লচু শিখরের পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

আমাদের শেরপারা প্রতিরক্ষা দপ্তরের একদল অভিযাত্রীর সঙ্গে আরেকটি অভিযানে গিয়েছে। তাদের এতদিনে ফিরে আসার কথা। তারা এখানেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। মিলিটারী হেড-কোয়ার্টার্সে নিশ্চয় তাদের খবর পাওয়া যাবে।

বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করতে হল না। সোয়া একটার সময় ওরা ফিরে এলো। কর্তৃপক্ষ খুবই খাতির করেছেন। অসিতবাবুর সঙ্গে তার সহকর্মী অরবিন্দবাবুর দাদা লেঃ কঃ শান্তনু ব্যানার্জীর দেখা হয়েছে। তিনি খুবই সাহায্য করেছেন। চুংথাং থেকে পাঁচখানি ওয়ান-টনার পাওয়া যাবে। তবে আজ নয়, আগামীকাল। আজ অবশ্য পাওয়া গেলেও কোন লাভ হত না। আজ চুংথাং পৌঁছতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। চুংথাঙে আজ রাতে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার খেরা। এমনকি ফেরার সময় গাড়ির বন্দোবস্ত করার নির্দেশ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ক্যামেরা পারমিট প্রসঙ্গে ওঁরা বলেছেন—এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার। তবে

আপনারা যদি লাচেন পৌঁছবার আগে ক্যামেরা না বের করেন, তাহলে আমরা আপনাদের হয়ে আই. জি.-কে অনুরোধ করতে পারি।

"অতএব আমরা লাচেন পর্যন্ত ক্যামেরা বের করব না।" সুশান্তবাবু বললেন।

শরদিন্দু প্রশ্ন করে, "বের করলেই বা ব্রিগেডিয়ার টের পাবেন কেমন করে?"

"পাবেন।" সুশান্তবাবু বলেন, "তোমাদের সঙ্গে গোয়েন্দা রয়েছে।"

"গোয়েন্দা! আমাদের সঙ্গে!" অরুণও বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" অসিতবাবু বলে, "ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা মিলিটারী ট্রাকে যাচ্ছি। ড্রাইভারদের কাছ থেকেই ওঁরা সঠিক খবর পেয়ে যাবেন।"

সব কাজই ঠিকমত হয়েছে, তবু শেষরক্ষা হয় নি। ওরা শেরপাদের কোন খবর পায় নি। তবে ব্রিগেডিয়ার ভরসা দিয়েছেন—চুংথাং পৌঁছে তাদের পাত্তা পেয়ে যাবেন।

অতএব আবার আশায় বুক বাঁধতে হয়। মন বলে—সবই যখন ঠিকমত হল, শেরপাদের সঙ্গেও যথাসময়ে দেখা হয়ে যাবে।

অমূল্যরা খেয়ে আসতেই গাড়ি ছাড়ে। এখন বেলা দুটো। রাস্তা শুনেছি কালকের চেয়ে খারাপ। বড় গাড়ি, ৯৫ কিলোমিটার পথ, পাঁচ-ছ' ঘণ্টার আগে পৌঁছনো যাবে না।

নর্থ সিকিম হাইওয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। খানিকটা এগিয়েই নাথু-লার পথ। নাথু-লা গ্যাংটক থেকে মাত্র ৫৬ কিলোমিটার। ১৪,৪০০ ফুট উঁচু এই গিরিবর্ত্ম পেরিয়েই ভারত থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাবার সংক্ষিপ্ত ও সহজতম পথ। এই পথটি সেকালে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। আর শুধু বাণিজ্য পথই বা বলি কেন? এই পথ দিয়েই পদ্মসম্ভব সিকিমে এসেছিলেন। এটি ভারত-তিব্বত ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনপথও বটে। কিন্তু সে পথ আজ আমাদের কাছে নিষিদ্ধ পথ আর আমাদের পরমপ্রিয় তিব্বত এখন নিষিদ্ধ দেশ। সমভোগতন্ত্রের কি অপার মহিমা!

সুতরাং নাথু-লা'র কথা থাক, আমাদের পথের কথায় ফিরে আসা যাক। গ্যাংটক শহব ছাড়িয়ে এসেছি। অদৃশ্য হয়ে গেছে সুন্দরী সিকিমের সেই পরম-রমণীয় রাজধানী। এখন পথেব পাশে শুধু পাহাড় আর বন। দুই-ই সুন্দর। এখানে-ওখানে পাশের পাহাড় থেকে ধস নেমেছে। পথের ওপরে পাথর আর মাটি রয়েছে জমে। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে অক্লেশে। সার্থক নাম শক্তিমান।

পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝেই ঝরণা নেমেছে, গিয়ে মিশেছে পাশে পথের পাহাড়ী নদীতে। কোথাও পথের পাশে, কোথাও বা খানিকটা দূরে। কিন্তু তিস্তার সঙ্গে দেখা হল না এখনও। গতকাল সিংটাম থেকে সেই যে সে পালিয়ে গেল এখনও তার দেখা নেই। তবে আবার তাকে আসতে হবে আমাদের কাছে। তিস্তা হারিয়ে যাবে কেমন করে? আমরা যে তারই উৎসে চলেছি। তিস্তা হারিয়ে গেলে আমরাও পথ হারিয়ে ফেলব।

পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে নানা রঙের নানা রকমের জানা-অজানা অসংখ্য ফুল। আর রয়েছে নানা জাতের অর্কিড। বীরেন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে ওর উৎসাহ অসীম। 'হিমালয়ের ফুল' নামে বীরেনের একখানি বই আছে।

পাহাড় বন ঝরণা ফুল ও উপত্যকা সবই দেখতে পাচ্ছি, কেবল দেখছি না বাড়ি-ঘর ও খেত-খামার। মনে হচ্ছে এ অঞ্চলে বসতি বড়ই ক্ষীণ। প্রকৃতি তার অজস্র সম্পদ উজাড় করে রেখেছে। কিন্তু মানুষ আজও তা আহরণ করতে আসে নি। এটি হিমালয়ের অনেক অঞ্চলের পক্ষেই সত্য। তবে সিকিমে বোধকরি একটু বেশি সত্য।

কিন্তু সিকিমের কথা বলার আগে নিজেদের কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার আর এই কথাটা গতকাল থেকেই বার বার বলব বলব করেও বলা হয়ে ওঠে নি।

আমাদের নেতা অমূল্য সেন। ভারতীয় পর্বতারোহণের একটি সুপরিচিত নাম। এই নিয়ে আটটি পর্বতাভিযানে নেতৃত্ব এবং চারটি শিখরে আরোহণ করছে। বয়স বছর চল্লিশ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনের পাবলিক রিলেশন্‌স অফিসার। বিবাহিত এবং একটি পুত্রের জনক। আগামী শীতে অমূল্য আবার গাড়োয়ালের রুদ্রগঙ্গা অভিযানের নেতৃত্ব করবে। পর্বতারোহী বিভাস দাস এই অভিযানের আয়োজন করছে।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার আমাদের সহনেতা। দশটি পর্বতাভিযানে অংশ নিয়েছে এবং তার মধ্যে তিনটির নেতৃত্ব করেছে। বয়স তেতাল্লিশ বছর। পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী। বিবাহিত, একটি পুত্রের পিতা। বীরেন সুলেখক, হিমালয়ের ওপরে পাঁচখানি বই লিখেছে।

অসিত মৈত্র আমাদের একজন কুশলী পর্বতারোহী সদস্য। কলকাতার একটি বড় বাণিজ্যিক সংস্থায় ভাল চাকরি করে। বয়স আঠাশ বছর। ছ'টি অভিযানের নেতৃত্ব করেছে এবং দুটি শিখরে আরোহণ করেছে। অসিত বিয়ে করে নি। এই অভিযান থেকে ফিরে গিয়েই গাড়োয়ালের 'ব্ল্যাক পিক্' (২০,৯৫৬) অভিযানের নেতৃত্ব করবে। *

অসিতবাবু অর্থাৎ অসিত বসু একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। ন'টি অভিযানে অংশ নিয়ে তিনটি শিখরে আরোহণ করেছে। সেও কলকাতার এক নামকরা বাণিজ্য সংস্থায় ভাল চাকরি করে। বয়সে আমার থেকে বড় হলেও তার শারীরিক দক্ষতা যে কোন তরুণ পর্বতারোহীর ঈর্ষার বস্তু। তিন ছেলের জনক, বড়টি চাকরি করে।

হিমাদ্রি ভট্টাচার্য একজন দক্ষ পর্বতারোহী। সে আটটি অভিযানে অংশ নিয়ে দুটি শিখরে আরোহণ করেছে। সে বীরেনের সহকর্মী। বয়স সাঁইত্রিশ বছর।

বিনীত দাশগুপ্ত একজন সুদক্ষ পর্বতারোহী। ছ'টি অভিযানে অংশ নিয়েছে ও দুটি শিখরে আরোহণ করেছে। বিনীত কলকাতা পোর্টকমিশনার্সে চাকরি করে। বয়স চৌত্রিশ বছর। সেও অবিবাহিত। *

---

* ১৯৮১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরে শ্যামবরণ হিমবাহের ২০, ১২৫ ফুট উঁচু অনামী শিখরে আরোহণের পরে নেমে আসার সময় অসিত শহীদ হয়েছে। বিনীতও কয়েক বছর আগে অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

অসিত মৈত্র সম্পর্কে নেতা অমূল্য সেনের একটি প্রতিবেদন এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"...সিনিয়লচু-র কয়েকমাস পরেই অসিত আবার সফল ব্ল্যাক পিক্ (২০,৯৫৬ ফুট) অভিযানের নেতৃত্ব দিল। অভিযানের নেশা যেন ওর রক্তে। তাই প্রতিবছরই ছুটে যেতে হত কতকগুলি দামাল ছেলের সঙ্গে। শিখর জয়ের সফল ও সার্থক নেতা অসিত।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনীতের সহকর্মী। এটি তার প্রথম পর্বতাভিযান। অরুণ বিবাহিত। মাত্র কয়েকদিন আগে তার একটি ছেলে হয়েছে। বউ ও ছেলেকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসে সেদিনই আমাদের সঙ্গে অভিযানে রওনা হয়েছে। অরুণের বয়স ৩৭ বছর।

১৯৮১ সালে হঠাৎ একদিন আমায় এসে বলল, "অমূল্যদা, এবার একটা বেশ মজা হয়েছে। দুটি অভিযান একই এলাকায় হচ্ছে। মোটামুটি একই সময়ে।" একটু থেমে গোঁফের ফাঁকে লাজুক হাসি হেসে বলল, "জান, এই দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি।"

ছেলেটা বলে কি! অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, "খাচ্ছ ভাল কথা কিন্তু স্ট্রেইন পড়বে খুব।"

"আসলে দুটো দলের কাউকেই না করতে পারছি না। ভেবে রেখেছি প্রথম অভিযানটার পর গঙ্গোত্রী ফিরে আসব। তারপর ওখানেই আবার দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটার সঙ্গে যোগ দেব।"

.... প্রথম অভিযান চলাকালীন ওর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম ২/৯/৮১ তারিখে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তরুণ চক্রবর্তী, শংকর দে-র সাথে সুন্দরবন বেসক্যাম্প থেকে অসিত ওর শেষ চিঠিটা আমাকে পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখেছিল—"প্রিয় অমূল্যদা, রাস্তায় অনেক আলোচনা তোমাকে কেন্দ্র করে করেছি। কারণ হিমালয় আর অমূল্যদা আমার কাছে অভিন্ন। তোমার অকৃত্রিম আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয়।...."

তারপর নানাভাবে জানতে পেরেছিলাম ওর প্রথম অভিযানের কথা। জীবন আর মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে সবাই কিভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ অভিযাত্রীদলের সাথে ওর যোগ দেবার খবরও পেয়ে গিয়েছিলাম।

তিরিশে সেপ্টেম্বর রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ আমার বাড়ীর ফোনটা বেজে উঠল। অসিতের দুর্ঘটনার খবর শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। দুরুদুরু বুকে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি—'নিশ্চয় অসিত বেঁচে আছে।'

রাত দুটোয় আবার ফোন। সুভাষ রায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া গলা—"অসিতদা আর নেই। ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ হিমবাহের ২০,১২৫ ফুট অনামী শিখরে আরোহণের পর, নামার পথে প্রায় দুহাজার ফুট নিচে পড়ে গিয়ে....।"

দুঃসংবাদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

তবু বলি, একদিক থেকে অসিত ভাগ্যবান। হিমালয়ের শিখরে শিখরে আরোহণের সময় কোন পর্বতারোহীর মৃত্যু হলে তার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সেখানেই করা হয়ে থাকে। নিচে মৃতদেহ আনার অসুবিধার জন্যই ঐ ব্যবস্থা। কিন্তু আশিস রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্যামবরণ অভিযানের সদস্যরা যেভাবে অসিতের মৃতদেহ ঐ দুর্গম অঞ্চল থেকে গঙ্গোত্রীতে নিয়ে এসে তড়িঘড়ি অসিতের আত্মীয়স্বজনদের খবরটা পৌঁছে দিতে পেরেছিল, তাতে অসিতকে ভাগ্যবানই বলা চলে। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বিরল।

গঙ্গোত্রী ভগীরথের তপভূমি, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর পদরেণুধন্য। এই গঙ্গোত্রী থেকেই শুরু হয়েছিল অসিতের প্রথম পর্বতাভিযান। আর এই গঙ্গোত্রীতেই বিগলিত করুণা ভাগীরথীর তীরে স্রোতের মূর্ছনা আর পাহাড়ী গাছের আকুল নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে অভিযাত্রী বন্ধু ও সহোদর ভাইদের চোখের জলের ধারায় অসিতের দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল।

হিমালয়প্রেমিক অসিতের ভস্মীভূত শরীরের অণু পরমাণু মিশে গেল তুষারমৌলী হিমালয়ের আবহমণ্ডলে।

কিন্তু শরীর হারিয়ে গেলেও, আমার মন থেকে অসিত হারিয়ে যাবে না। যেমন ছিল তেমনই থাকবে। থাকবে চিরকাল।

ভবিষ্যতে যখনই হিমালয়ে যাব, যখনই অভিযানের কথা ভাবব, তখনই অসিত আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। হয়ত বলবে, "চল না একসঙ্গে যাই অমূল্যদা....।"

মৃত্যুহীন-প্রাণ অসিত আমৃত্যু আমার জীবনে, আমার কর্মে ভাস্বর হয়ে থাকবে।"

[লেখকের 'ব্রহ্মলোকে' বই থেকে]

কেশব মৈত্র আর একজন পর্বতারোহী সদস্য। তারও এই প্রথম পর্বতাভিযান। কেশব পুলিস বিভাগে চাকরি করে, বয়স সাতাশ বছর।

আমাদের দলে এই আটজন 'ট্রেন্ড মাউন্টেনীয়ার'। অমূল্য, বীরেন, অসিত, হিমাদ্রি ও বিনীত 'এ্যাড্‌ভান্স ট্রেন্ড', বাকি তিনজন 'বেসিক ট্রেনিং' নিয়েছে।

আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য হল ডাক্তার—চন্দন পাল। বয়স ছাব্বিশ। এর আগে সে কখনও এমন দুর্গম হিমালয়ে আসে নি। কিন্তু সে খুবই উৎসাহী, কর্তব্যপরায়ণ এবং কষ্টসহিষ্ণু চিকিৎসক।

ডায়না এসোসিয়েশনের সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ বয়সে ডাক্তারের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। তারও এটি প্রথম পর্বতাভিযান। সেও একজন উৎসাহী পর্বতপ্রেমিক।

যুগান্তর পত্রিকার ডাঃ রমেন মজুমদার আমাদের অভিযানের সাংবাদিক। কয়েক বছর আগে এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে লাহুল হিমালয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্তমান বয়স আটত্রিশ বছর।

স্বনামধন্য ক্যামেরাম্যান সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য। তিনি এ বছরই এ্যানথ্রপলোজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া থেকে 'রিটায়ার' করেছেন। *

হিমাদ্রি দার্জিলিং থেকে যে চারজন উচ্চ-হিমালয়ের মালবাহক নিয়ে এসেছে, তাদের নাম শেরিং, নওয়াং, সাঙ্গো ও লাক্‌পা। বয়স যথাক্রমে চল্লিশ, পঁচিশ, চব্বিশ ও কুড়ি। এরা সবাই নেপালী এবং বর্তমানে দার্জিলিঙের বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত গাড়িতে মাল বোঝাই করা ছাড়া এরা আর কিছু করে নি। কাজেই এদের সম্পর্কে এখুনি কিছু বলতে পারছি না।

আর তার সময়ও নেই। এইমাত্র আমাদের গাড়ি মঙ্গন পৌঁছল। তিনটি জেলা নিয়ে সিকিম—গ্যাংটক, ইয়াক্‌সাম ও মঙ্গন। উত্তরসিকিম জেলার সেই জেলাসদরে এসেছি আমরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সিনিয়লচু এই জেলায় অবস্থিত।

মঙ্গন ছোট শহর। কিন্তু এখানে দেখছি কয়েকটি বেশ বড় বড় চায়ের দোকান রয়েছে। সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। অথচ এখনও পেটে চা পড়ে নি। তাই ড্রাইভাররা গাড়ি থামিয়েছে। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ি।

চা খেয়ে গাড়িতে উঠে আসি। তিস্তার তীরে তীরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এই মঙ্গনে এসে আবার দেখা হল তার সঙ্গে।

গতকাল শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে মাত্র ১৫ কিলোমিটার পথ এসেই তিস্তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপরে তার তীরে তীরে পথ চলে সিকিমে প্রবেশ করেছি—রংপো পৌঁছেছি। রংপোর পরেও তিস্তা ছিল, প্রায় সত্তর কিলোমিটার পথ আমরা তার সঙ্গে এসেছি। সিংটাম পর্যন্ত সে ছিল আমাদের পাশে, তারপরে পালিয়ে গিয়েছিল পশ্চিমে। আমাদের পথ দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয়ে গ্যাংটক পৌঁছেছে। কিন্তু তিস্তা আর কাছে আসে নি। হিমালয়ের প্রায় সমস্ত বড় শহর সেই অঞ্চলের কোন বড় নদীর তীরে। গ্যাংটক তার ব্যতিক্রম। গ্যাংটকে কোন বড় নদী নেই।

আজ গ্যাংটক থেকে রওনা হবার পরেও দেখা হয় নি তিস্তার সঙ্গে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই মঙ্গনে এসে আবার দেখা হল।

---

* লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' ও 'তসমার তীরে তীরে' দ্রষ্টব্য।

এর পরেও শুনেছি সে কিছুক্ষণের জন্য দূরে চলে যাবে। অবশেষে টঙ নামে একটা জায়গায় আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। তারপরে আর তিস্তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে না আমার। সেখান থেকে সে আমার পাশে পাশে পথ চলবে চুংথাং পর্যন্ত।

চুংথাং তিস্তার জন্মস্থান। আমরা এখন সেখানেই চলেছি। বলা বাহুল্য চুংথাঙে পৌঁছেও তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হবে না। কেনই বা হবে? আমরা যে তার প্রধান উৎস জেমু হিমবাহে যাবো।

কিন্তু জেমুর কথা এখন নয়, এখন তিস্তার কথা হোক। সিকিমের বৃহত্তম নদী তিস্তা। প্রায় সমস্ত সিকিমের জলবিভাজিকা এই নদী। উত্তর-পূর্বের পওহুন্‌রী হিমবাহ থেকে পশ্চিমের ইয়ালুং হিমবাহ পর্যন্ত, সারা সিকিম-হিমালয়ের তুষারবিগলিত ধারা তিস্তার বুক বেয়ে বাংলা দেশে চলে যাচ্ছে।

তাহলেও তিস্তা মূলত তিনটি প্রধান পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মিলিতধারা। তাই এর নাম ত্রিস্রোতা। তিস্তা নামটি তিস্রোতা শব্দের অপভ্রংশ।

এই তিনটি স্রোতস্বিনীর নাম—লাচুং চু, থাঙ্গু চু ও জেমু চু। 'চু' মানে নদী।

লাচুং চু সৃষ্ট হয়েছে পওহুন্‌রী হিমবাহ থেকে। লাচুং গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে বলে এর নাম লাচুং চু।

থাঙ্গু গ্রাম বিধৌত থাঙ্গু চু সৃষ্ট হয়েছে কাঞ্চনঝাউ হিমবাহ থেকে। তবে এটি সমগ্র উত্তর-পূর্ব সিকিম-হিমালয়ের জলবিভাজিকা। এই উপনদী দিয়ে তিস্তায় সবচেয়ে বেশি জল আসছে বলেই বোধহয় ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে এই নদীকে তিস্তা বলে দেখানো হয়েছে।

জেমু চু সৃষ্ট হয়েছে লোনাক ও জেমু হিমবাহে। অর্থাৎ এটি উত্তর-পশ্চিম সিকিম-হিমালয়ের জলবিভাজিকা।

থাঙ্গু চু ও জেমু চু লাচেন গ্রামের উপকণ্ঠে এসে মিলিত হয়েছে। সেই মিলিত ধারাব নাম লাচেন চু। লাচেন চু নেমে এসেছে নিচে। চুংথাঙে এসে মিলেছে লাচুং চুয়ের সঙ্গে। জন্ম নিয়েছে তিস্তা। আমি আজ আমার শৈশবসাথী তিস্তার জন্মভূমি দর্শন করব।

সিকিমে তিস্তা ও তার উপনদীরা মোটামুটি দক্ষিণপ্রবাহিনী। কিন্তু সমতলে তিস্তা দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিনী। দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চল ও কুচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। ফুলবাড়ির কাছে ব্রহ্মপুত্রে বিলীন হয়েছে।

এখন তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে সে করতোয়া ও আত্রাই-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হত। তখন সমতলের তিস্তাও ছিল দক্ষিণবাহিনী।

তিস্তা চিরকাল অশান্ত ও দুর্বার, সে কোশীর মতই বন্যার জন্যে কুখ্যাত। তাই তিস্তা-বাঁধ প্রকল্প। আমাদের শীতলচন্দ্র দে মহাশয় এই প্রকল্পের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। অমল পালও এই প্রকল্পে চাকরি করে।

১৭৮৭ সালের মতো ভয়ঙ্করী বন্যা তিস্তায় কিন্তু আর কখনও দেখা দেয় নি। এই বন্যার পরেই তিস্তা তার দক্ষিণমুখী গতিপথ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত

হয়। আর তাই এখন সে ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। সমতলে তিস্তার দৈর্ঘ্য ২৭০ কিলোমিটার। আর তিস্তাবাজার থেকে চুংথাং ১৫৬ কিলোমিটার। তার মানে হিমবাহ অঞ্চল বাদ দিয়ে তিস্তার দৈর্ঘ্য চারশো কিলোমিটারের মতো।

তিনটি হিমবাহ অঞ্চলে সৃষ্ট তিন স্রোতস্বিনীর মিলিতধারা তিস্তা। তাহলে কোন্ হিমবাহটিকে তিস্তার মূল উৎস বলব! অলকানন্দা মন্দাকিনী ও ভাগীরথীর মিলিতধারা গঙ্গা। তবু আমরা ভাগীরথীর উৎস গোমুখী বা গঙ্গোত্রী হিমবাহকেই গঙ্গার উৎস বলে থাকি। কারণ গঙ্গোত্রী গাড়োয়াল-হিমবাহের বৃহত্তম হিমবাহ। ১৬ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৩ মাইল প্রশস্ত জেমু সিকিম-হিমালয়ের সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যময় হিমবাহ। সুতরাং জেমু হিমবাহকেই তিস্তার উৎস বলা উচিত। আমরা সেখানেই চলেছি। আমি আমার শৈশবসাথী তিস্তার উৎস দর্শন করতে পারব।

বীরেনের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। সেও আমার মতো তিস্তার দিকে তাকিয়েছিল। সহসা বলে উঠেছে, "তিস্তা খুবই পুরনো নদী।"

"কি রকম?" হিমাদ্রি প্রশ্ন করে।

বীরেন উত্তর দেয়, "পুরাণে তিস্তার উল্লেখ রয়েছে। তার মানে হাজার দেড়েক বছর আগেও আর্যাবর্তের মানুষ তিস্তার কথা জানতেন।" একবার থামে বীরেন। তারপর আবার বলে, "পুরাণে তিস্তাকে বলা হয়েছে তৃষ্ণা। বলা হয়েছে, পার্বতীর স্তনধারা মর্তের সন্তানদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে স্বর্গ থেকে তিস্তারূপে নেমে এসেছে। তাই এই স্বর্গধারার নাম তৃষ্ণা—তৃষিতজনের শান্তিবারি তিস্তা।"

রাত আটটার কয়েক মিনিট আগে চুংথাং পৌঁছনো গেল। ইংরেজি মতে এখনও 'ইভ্নিং' কিন্তু আমি রাত বলছি কারণ এটা পূর্ব-হিমালয়। এখানে অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। তার ওপরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জন্য আঁধার যেমন ঘন হয়েছে, তেমনি শীত বেড়ে গিয়েছে। অথচ আজ আমরা আর উঁচুতে উঠি নি, বরং গতকালের চেয়ে প্রায় সাতশো ফুট নেমে এসেছি। চুংথাঙের উচ্চতা মাত্র ৫,১২০ ফুট।

কর্তৃপক্ষ তাঁদের রিক্রিয়েশন রুম-এ আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছেন। টিনের চাল ও টিনের বেড়ার প্রকাণ্ড একখানা হলঘর। বেশ উঁচু বাঁধানো মেঝে। ঘরের এক কোণে সশব্দে একটা জেনারেটার চলছে।

না, লোডশেডিং নয়। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই। সুতরাং লোডশেডিংয়ের প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেটার চালিয়ে কয়েকটি গাড়ির ব্যাটারীকে 'চার্জ' করা হচ্ছে। প্রশ্ন হল—জেনারেটার কি আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেল? যেখানে লোডশেডিং নেই সেখানেও জেনারেটার!

ঘরে একটি দরজা আর কয়েকটি কাচের জানলা। কোন আসবাব-পত্র নেই। কেবল একপাশে বিছানা বিছিয়ে দুজন মানুষ শুয়ে আছেন।

আমাদের ড্রাইভারদের কাছে চুংথাং অপরিচিত জায়গা নয়, তবু অন্ধকার ও সংকীর্ণ কাঁচা পথ বলে তারা বড় রাস্তা থেকে একজন স্থানীয় সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে শুধু পথপ্রদর্শক নয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিও বটে। তাই বোধকরি আশ্বাস দেয়—আমি এখুনি জেনারেটার বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করছি। তবে যারা শুয়ে রয়েছে, তারা কিন্তু এ-ঘরেই থাকবে।

তা থাকুক গে। ওঁরা এক কোণে রয়েছেন। ঘরে অনেক জায়গা। আমরা তো শুধুই শোব, আজ রাতেও মালপত্র গাড়িতেই থাকবে। আপাতত জেনারেটার নামক লাউড-স্পীকারের এই বুক-কাঁপানো শব্দটা শুধু বন্ধ হওয়া দরকার।

না, দরকার আরও অনেক কিছু। প্রথমতঃ এক কাপ গরম চা তারপরে কিছু খাবার। শীত এবং খিদে দুই-ই সজাগ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। অন্ধকারে গাড়ির ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে রান্নার সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র বের করতে হবে। সবচেয়ে বড় বিপদ স্টোভে কেরোসিন তেল ভরা দরকার।

কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক কি অন্তর্যামী? নইলে সে সহসা কেন বলে উঠল—ব্রিগেডিয়ার খেরাসাহেব ফোনে বলেছেন, আজ আপনারা আমাদের মেহমান। আরাম করে বসুন। একটু বাদেই চা আসছে। রাত দশটায় ডিনার পাবেন। আমি নিজে এসে আপনাদের কিচেনে নিয়ে যাবো।

লোকটি আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টর্চ হাতে কোথায় যেন চলে গেল। বোধকরি চা ও ডিনাবের ব্যবস্থা করতে। অতএব মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সোচ্চার স্বরে বলে উঠি—ব্রিগেডিয়ার খেরা জিন্দাবাদ।

কয়েক মিনিট বাদেই কেটলি বোঝাই গরম চা এলো। আমরা এরই মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘবের আঁধার দূর করে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে যাবার আগেই তিনি আবির্ভূত হলেন—জনৈক সরকারী কর্মচারী। মানুষ হয়েও তিনি স্বয়ং ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ভদ্রলোক জেনারেটারটা বন্ধ করে দিলেন। বুক কাঁপানো কর্কশ শব্দটা স্তব্ধ হল। কান দুটি এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

আর সেই সঙ্গে জেগে উঠল নদীর কলগান। জেনারেটারেব দাপটে হিমালয় পথের প্রাণসঙ্গীতটি গিয়েছিল হারিয়ে।

আমাদের আশ্রয়ের সামনেই তিস্তা। তিস্তার তীবে তীরে পথ চলে আমি তার জন্মভূমি চুংথাঙে পৌঁছেছি। কিন্তু আজই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হচ্ছে না।

আগামীকাল আমরা লাচেন চু-য়ের প্রবাহকে অবলম্বন করে লাচেন পৌঁছব। তারপরে জেমু চু-য়ের পাশে পাশে পথ চলে সিনিয়লচুর পাদদেশে। কিন্তু আমার কাছে লাচেন চু কিংবা চু-য়ের কোন পৃথক সত্তা নেই। আমার কাছে সবই তিস্তা, শুধুই তিস্তা।

শৈশবসাথী তিস্তা আজ আমার পথের সাথী। সে-ই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সুন্দরের অভিসারে। তিস্তার কলগান এই দুর্গম ও দুস্তর পথের আবহসঙ্গীত। আমি সেই প্রাণধ্বনির সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাই।

চার

সকালে ঘুম ভাঙল তিস্তার কলগানে। গতকাল রাতে ক্যান্টিন থেকে ফিরে আমরা এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম। এইমাত্র ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই তিস্তার কলতান কানে এলো।

দরজা খুলে বাইরে আসি। রিক্রিয়েশন রুমের সামনে রাস্তা—পাথুরে কাঁচা পথ, আমাদের গাড়ি দুখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপরেই জায়গাটা সহসা ঢালু হয়ে অনেকটা নিচে নেমে নদীর বেলাভূমিতে মিশেছে। প্রস্তরময় সংকীর্ণ বেলাভূমির শেষে নদী—তরঙ্গিনী তিস্তা। ওপারে সবুজ পাহাড় আর সুনীল আকাশ।

গাড়ি থেকে লাক্‌পাকে ডেকে তুলি। তাকে চা বানাতে বলে নেমে আসি নিচে। নদীর ধারে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আবার উঠে আসি ওপরে। ইতিমধ্যে লাক্‌পা জল এনে স্টোভ জ্বেলে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

মুখের সামনে গরম চা পেয়ে সঙ্গীরা একে একে উঠে বসে। কিছুক্ষণ বাদে সুশান্তবাবু, অসিতবাবু, অমূল্য, বীরেন ও অসিতকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়ে পড়ি।

একটা বাঁক ফিরতেই দেখা হয় সর্দারজীর সঙ্গে। সর্দারজী এখানকার টেলিফোন অপারেটার। গতকাল রাতে আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে। প্রথমেই তিনি সুসংবাদ দিলেন—পাঁচখানি 'ওয়ান-টনার' দুপুরের আগেই এখানে পৌঁছে যাবে।

'ওয়ান-টনার' মানে একটন মাল বইতে পারে, জীপের চেয়ে একটু বড় ট্রাক্। আগেই বলেছি, আমরা শিলিগুড়ি থেকে দুখানি শক্তিমান অর্থাৎ থ্রি-টনার নিয়ে এই পর্যন্ত এসেছি। এখান থেকে রাস্তা সরু। কাজেই খানপাঁচেক ওয়ান-টনার চাই। অতএব সর্দারজীর সন্দেশে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সর্দারজী বয়সে যুবক, কিন্তু খুব ধার্মিক মানুষ। মানুষটি পরিশ্রমীও বটে। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে এখানে নির্মিত হয়েছে গুরুদোয়ারা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দির ও ধরম্‌শালা। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে। দর্শন করলাম, প্রসাদ পেলাম।

একখানি প্রকাণ্ড পাথরে একটি ছোট গর্ত দেখিয়ে সর্দারজী জানালেন—গুরু নানক এখানে এসেছিলেন। এটি তাঁর পায়ের ছাপ। এই পবিত্র পদচিহ্নকে অবলম্বন করেই আমরা এই গুরুদোয়ারা গড়ে তুলেছি।

গুরুদোয়ারা থেকে বাজারে এলাম। পথের ধারে অনেকগুলি ছোট-বড় দোকান। পান ও শাক-সবজি থেকে মুদি মনিহারী ও রোস্তোরাঁ পর্যন্ত সব রকমের দোকানই আছে। প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া গেল। না, কথাটা বোধকরি বলা ঠিক হল না। চিনি ছাড়া সব কিছুই পাওয়া গেল। এমন কি সুশান্তবাবুর পান পর্যন্ত। অথচ গ্যাংটকে সবাই বলেছেন—এখানে নাকি কন্ট্রোল দরে চিনি পাওয়া যাবে। আমরা গ্যাংটকেও প্রয়োজনীয় সব চিনি পাই নি। এবারে সত্যি বিপদে পড়া গেল।

জনৈক দোকানী জানালো—পাওয়া নাকি সত্যই যেত। কিন্তু রেশনের বাবু দিন ছয়েক আগে গ্যাংটক গিয়েছেন। গতকাল তাঁর ফিরে আসার কথা ছিল। ফিরে এলে আমরা জনপ্রতি এক কিলোগ্রাম করে চিনি পেতাম। কিন্তু তিনি ফিরে আসেন নি।

অসিতবাবু ও অসিত বাজার নিয়ে ফিরে যায়। অমূল্য ও সুশান্তবাবু শেরপাদের খোঁজ এবং সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য অফিসের দিকে রওনা হয়ে যান। যাবার সময় সুশান্তবাবু বলেন—ওপরের ঐ পানের দোকানে আমার পানগুলো রয়েছে, ফেরার পথে চেয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা যখন ফিরব তখন যদি দোকান বন্ধ হয়ে যায়!

আমি ও বীরেন বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই বাঁদিকে কুটিরশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র। আমরা সেটি দেখতে চলেছি।

সিকিমের প্রধান কুটিরশিল্প উল ও কার্পেট তৈরি। লেপ্‌চারা পুরুষানুক্রমে এ কাজ করে চলেছেন। এছাড়া বাঁশ ও বেতের জিনিস বানাতেও সিকিমের মানুষ সিদ্ধহস্ত। এই শিক্ষাকেন্দ্রে সবই শেখানো হয়। কয়েকখানি চমৎকার কার্পেট তৈরি করেছেন এঁরা।

শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে স্কুলে এলাম। ছেলে-মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল। বেশ ভাল লাগল।

চুংথাং দর্শনে বেরিয়ে যেখানে যার সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, সবাইকেই বলছি চিনির কথা। চিনি না পেলে যে আমরা বড়ই বিপদে পড়ব। উষ্ণ পানীয় উচ্চ-হিমালয়ের প্রধান খাদ্য। আমরা চা, কফি, গুঁড়োদুধ, হরলিক্‌স ড্রিঙ্কিং চকোলেট, বোর্ণভিটা প্রভৃতি প্রচুর নিয়ে এসেছি। চিনি ছাড়া এর কোনটাই খাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ চিনি যোগাড় করে দিতে পারলেন না। চিনি পাওয়া গেল না।

পানের দোকানে এসে দেখি সেই সুশ্রী যুবকটি নেই, একটি সুন্দরী পাহাড়ী যুবতী বসে আছে। এখন সে দোকান চালাচ্ছে। এ জায়গায় এমন ফিট-ফাট আধুনিকা দেখব বলে আশা করি নি। আমরা দুজনেই একটু বিস্মিত হই।

মেয়েটি মৃদু হেসে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের কি দেব?"

বীরেন পাল্টা প্রশ্ন করে, "আপনার দাদা কোথায় গেলেন?"

"দাদা!" মেয়েটি যেন অবাক হয়।

"হ্যাঁ, যিনি কিছুক্ষণ আগে দোকানে বসেছিলেন।"

"ও! তিনি তো পোস্ট-অফিসে চলে গিয়েছেন।"

"তা তিনি, মানে আপনার দাদা কখন ফিরে আসবেন?"

আবার মেয়েটি মৃদু হাসে। বলে, "তাঁর তো দেরি হবে। সেই বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফিরবেন। তিনি যে পোস্টমাস্টার।"

"পোস্টমাস্টার!" আমরা বিস্মিত।

তরুণীটি বলে, "হ্যাঁ, উনি এখানকার পোস্টমাস্টার।"

"পোস্টমাস্টার পানের দোকান দিয়েছেন!"

"কি করবেন বলুন," মেয়েটি বলে, "যা মাইনে পান সংসার চালাতে পারেন না। তাই এই 'সাইড বিজনেস্'।"

"তা ভালই করেছেন।" বীরেন বলে, "কিন্তু আপনার দাদা অফিসে চলে যাওয়ায় যে আমরা একটু বিপদে পড়ে গেলাম দিদি!" এদেশে ছোট-বড় সব মেয়ে দিদি বললে ভারী খুশী হয়।

"তাঁকে আপনাদের কি দরকার দাদা? আমাকে বলতে কোন বাধা আছে কি?" মেয়েটি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে।

"না বাধা নেই।" বীরেন বলে, "কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক সহযাত্রী আপনার দাদার কাছ থেকে পান কিনে এখানেই রেখে গিয়েছেন। আমরা সেগুলো নিতে এসেছি।"

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপরে বলে, "তাই আপনারা এত দ্বিধা করছেন। এই নিন পানের প্যাকেট।" সে ঠোঙাটি বীরেনের হাতে দেয়।

"ধন্যবাদ দিদি! অশেষ ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা দাদা, আপনারা কি কলকাতা থেকে এসেছেন, কোন এক্সপিডিশানে যাচ্ছেন?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। আমরা সিনিয়লচু এক্সপিডিশনে যাচ্ছি।"

"সিনিয়লচু!" মেয়েটি রীতিমত পুলকিতা।

আর তার পরেই সে সহসা ভাঙা বাংলায় বলে ওঠে, "শুনেছি সবচেয়ে সুন্দর 'পিক্'।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বাংলা বলছেন?"

"বলবই তো, আমরা যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, কার্সিয়াঙে বাড়ি।"

"কার্সিয়াং থেকে আপনার দাদা এখানে চাকরি করতে এসেছেন?"

"কি করব বলুন, বদলীর চাকরি।"

"আচ্ছা, তাহলে এবারে আসি।" আমরা হাতজোড় করি।

মেয়েটিও দু হাত জড়ো করে বলে, "নমস্কার। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।"

চলতে শুরু করি।

"দাদা!" মেয়েটি আবার ডাক দেয়।

ঘুরে দাঁড়াই।

মেয়েটি মুচকি হাসছে। বলে, "কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতাম।"

"বেশ তো বলুন না।" বীরেন তাকে ভরসা দেয়।

মেয়েটি বলে, "আপনারা আমার দাদা, কিন্তু পোস্টমাস্টার আমার দাদা নন।"

"তাহলে?" আমি বিস্মিত।

বীরেন জিজ্ঞেস করে, "পোস্টমাস্টার আপনার কে?"

মেয়েটি মুখ নিচু করে। সলাজ স্বরে কোনমতে জবাব দেয়, "আমার স্বামী।"

বেলা দুটোয় গাড়ি এলো। বড় গাড়ি থেকে ছোট গাড়িতে মাল বোঝাই করতে আধঘন্টা লেগে গেল। বেলা আড়াইটে নাগাদ যাত্রা শুরু হল।

প্রত্যেক মিলিটারী ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন করে বসতে পারে। এখন পাঁচখানি গাড়ি, সুতরাং পাঁচজন সামনে বসতে পেরেছি। আমার গাড়িটি দ্বিতীয়। ড্রাইভার এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার পরেই সহসা সে বিশুদ্ধ বাংলায় বলে ওঠে, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?"

মাথা নেড়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "আপনি বাঙালী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম প্রভাত দত্ত। আমি গোবরডাঙার ছেলে।" একবার

থামে সে তারপরে আবার জিজ্ঞেস করে, "পশ্চিমবঙ্গের কি খবর দাদা? শুনলাম নাকি বাস-ধর্মঘট হয়েছিল?"

উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি, "আপনি কতদিন এখানে আছেন?"

"প্রায় বছর তিনেক।"

"কেমন লাগছে এ চাকরি?"

"ভাল, খুব ভাল। বেশ একটা thrill আছে। আর তা ছাড়া সাধ্যমতো দেশের জন্য কিছু করছি।"

"নিশ্চয়। আপনাদের চাকরি তো সর্বদাই দেশসেবা।"

প্রভাত নিশ্চয় আমার কথায় খুশী হয়েছে। আমিও খুশী হই। একটি বাঙালী তরুণ হিমালয়ের এই দূর-দুর্গম পথে গাড়ি চালাচ্ছে। কে বলে বাঙালী ভীতু, ঘরকুনো এবং শ্রমবিমুখ?

বাজার ছাড়িয়ে পথটা একটু চড়াই হয়ে পুলে উঠল। পুলের ওপর থেকে লাচেন ও লাচুং নদীর সঙ্গম অর্থাৎ তিস্তার জন্মভূমি দর্শন করলাম।

মোটর চলাচলের উপযোগী এই পথ ও পুল হালে নির্মিত। পথটি কিন্তু নূতন নয়, তবে তখন ছিল পায়ে-চলা পথ। পুলও একটা ছিল এখানে—কাঠের সাঁকো। তবে সেটিকে বোধহয় পুল না বলে ফাঁসির মঞ্চ বলাই বেশি উচিত হবে।

বেশিদিনের কথা নয়। ডেভিড্ ম্যাকডোনাল্ড নামে জনৈক ইংরেজ ছিলেন তিব্বতের বৃটিশ এজেন্ট। তিনি এ অঞ্চলে প্রচুর পদ-পরিক্রমা করেছেন। তিনিও গ্যাংটক থেকে চুংথাং হয়ে এই পথে লাচেন গিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Touring in Sikkim' বইতে তিনি লিখেছেন—অতীতকালে এই পুলের ওপর থেকে অপরাধীদের (criminals) নিচের নদীতে ফেলে দেওয়া হত। এটা ছিল একটা বিচারপ্রণালী (trial by ordeal)। যাকে ফেলে দেওয়া হত, সে যদি মরে যেত, তাহলে ধরে নেওয়া হত, লোকটি দোষী। আব কেউ যদি কোনক্রমে বেঁচে যেত, তাহলে সাব্যস্ত হত সে নির্দোষ।

আমার অবশ্য মনে হচ্ছে এত উঁচু থেকে ঐ প্রস্তরময় বিক্ষুব্ধ নদীতে ফেলে দিলে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার সুযোগ পেতেন না।

পুল পেরিয়ে আমাদের কনভয় লাচেন নদীর বাঁ তীরে এসেছে। বাঁদিকে অনেক নিচে নদী আর ডানদিকে খাড়া পাহাড়। পথও খাড়া চড়াই। পাথুরে কাঁচা রাস্তা। সংকীর্ণ এবং জলসিক্ত। সকাল থেকে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

প্রভাত বলে, "পথ আগাগোড়াই এরকম। এ অঞ্চলে প্রায় বারো মাস বৃষ্টি লেগেই আছে। তবে ধস না নামলে ভয়ের কিছু নেই। আস্তে আস্তে যেতে হবে এই যা। ২৮ কিলোমিটার যেতে আড়াই ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।"

ক্রমাগত ওপরে উঠছি। এ যেন আর এক জগৎ। পাহাড় তো দেখছি আজ ক'দিন ধরেই। কিন্তু এ পাহাড় ঠিক আগের মতো নয়। পাহাড়ের প্রকৃতি পালটে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে গাছপালা ও ফুল। সিল্‌ভার-ফার, স্প্রস্, লারচ, জুনিপার, রডোডেনড্রন, আরও কত গাছ ও ফুল। ভিন্ন তাদের গড়ন, বিভিন্ন তাদের রং—কোনটি সোনালী, কোনটি লাল, কোনটি সাদা কিংবা বেগুনী।

পাহাড়ের গায়ে দেবদারু গাছের সারি। তাদের গায়ে ধূসর-সবুজ শেওলা। হাওয়া উঠলেই পেঁজা তুলোর মতো উড়ে এসে পথে পড়ছে।

আটাশ কিলোমিটারে প্রায় চার হাজার ফুট উঠতে হবে আজ। মোটরপথের পক্ষে ঢালটা বেশ চড়াই বলতে হবে। সেই চড়াই বেয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

নিচের নদীকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে পথ থেকে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা নেমেছে। তাদের স্বচ্ছ-শীতল জলধারা পথের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নিচের নদীতে লাফিয়ে পড়ছে।

আবার বৃষ্টি নামল। গাড়ির গতিবেগ আরও কমল। আমরা ধীরে ধীরে পথ চলেছি।

বৃষ্টি বন্ধ হল। সূর্যদেব মেঘের আড়াল থেকে মুখ বাড়ালেন। ঝলমলে রোদে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারিদিক। আর তখুনি আকাশের কোলে দেখা দিল রামধনু। আমরা দেখি, দু চোখ ভরে দেখি। আবার মনে পড়ে যায়—আমি সুন্দরী সিকিমে এসেছি, সুন্দরের অভিসারে চলেছি।

আনন্দ-ভাবনা মুহূর্তে নিরানন্দে পরিণত হয়। মনে পড়ে আজও শেরপা পাওয়া যায়নি। অমূল্যরা শূন্যহাতে ফিরে এসেছে। সেই মিলিটারী এক্সপিডিশান এখনও ফিরে আসে নি। তবে কর্তৃপক্ষ ভরসা দিয়েছেন—তাদের ফিরে আসার দিন পেরিয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে শেরপাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। অদৃষ্ট ভাল হলে হয়তো আজই ছাতেনে দেখা হয়ে যাবে। লাচেনের ৪ কিলোমিটার আগে ছাতেন একটি ছোট গ্রাম।

কিন্তু যদি দেখা না হয়? কেন হবে না! তারা গতমাসের প্রথম দিকে পাহাড়ে গিয়েছে। আর কতদিন থাকবে পাহাড়ে? হয়তো ইতিমধ্যেই তারা ছাতেন এসে গিয়েছে। ওরা জানে আমরা ওদের ভরসায় অভিযানে এসেছি।

পথের পাশে খানিকটা নিচে চমৎকার একফালি সবুজ সমতল। সেদিকে নজর পড়তেই প্রভাত বলে, "এই মাঠে একবার তিব্বতীদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।"

"কবে?" জিজ্ঞেস করি।

প্রভাত উত্তর দেয়, "সে বহু বছর আগের কথা। সেবারে সিকিমের সেনাপতি আগেই তিব্বতী আক্রমণের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এখানে এসে চারিদিকের পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলেন। তিব্বতীরা আসতেই তাঁরা আড়াল থেকে তীর মারতে শুরু করেছিলেন। তিব্বতীরা সেবারে বড় বিপাকে পড়েছিল। তাদের অনেক সৈন্য মারা যায়, বাকিরা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।"

সবুজ সমতলের পরে আবার গাছপালা ও ফুল। কয়েকটি ম্যাগনোলিয়া গাছ আর ছোট ছোট পাখির দল। চোখ ফেরাতে পারি না। পাখিগুলো গাড়ির শব্দে বোধকরি বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। তারা ঝরনা আর ফুলের সঙ্গে সমানে লুকোচুরি খেলছে।

পর পর দুটি ঝরনা পেরিয়ে এলাম। ঝরনার ওপরে কাঠের পুল। এবারে আবার

একটা খাড়া চড়াই, পথটা ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। পথের পাশে কোথাও কোথাও ধস নেমেছে, কিন্তু তাতে প্রভাতের কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে এই পথ, তার ওপর মাঝে মাঝেই লা বা নরম পাহাড়, তাই এমন ধস। ধীরে ধীরে গাড়ি চলেছে বটে কিন্তু আমরা তো গাড়িতে বসে লাচেন চলেছি। বিগত যুগের বিশ্ববিখ্যাত বহু পর্বতারোহী পায়ে হেঁটে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে লাচেন পৌঁছেছেন, গিয়েছেন তিস্তার উৎস জেমু হিমবাহে।

জেমু হিমবাহ কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণ করতে হলে এটি হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পথ। জেমু কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘার আকর্ষণে যারা এই পথে লাচেন এসেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করতে হবে সেই স্যার জোসেফ্ ডাল্টন হুকারের নাম। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিস্তা উপত্যকায় এসেছিলেন। তাঁরা লাচেন থেকে জেমু হিমবাহে পৌঁছবার চেষ্টা করেন কিন্তু পথে বরফ ও তুষারপাতের জন্য সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। *

হুকার সাহেবের পরেই প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস উত্তর সিকিমে পদচারণা করেছেন। শরৎচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অধ্যয়ন শেষ করে দার্জিলিঙের তিব্বতী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়ে আসেন। স্কুলের তিব্বতীভাষা শিক্ষক উগায়েন গিয়াৎসোর কাছে তিনি অবসর সময়ে তিব্বতী শিখতে শুরু করেন। তাছাড়া তিনি নেপালী ও সিকিমী ভাষাও শিখে ফেলেন। তারপরে তাঁর তিব্বত দর্শনের প্রবল বাসনা হয়।

১৮৭৯ সালের জুন মাসে বন্ধু উগায়েন গিয়াৎসোর সঙ্গে তিনি দার্জিলিং থেকে রওনা হন। তাঁরা একজন পথপ্রদর্শক ও দুজন মালবাহক সঙ্গে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছিল একটি করে পকেট সেক্সট্যান্ট, প্রিজম্যাটিক কম্পাস ও থার্মোমিটার, দুটি হিপসোমিটার, কয়েকটি ফিল্ড গ্লাশ ও দেড়শ টাকা।

তাঁরা দার্জিলিং থেকে সিকিমের ইয়াক্সামে আসেন। তারপরে বাকিম পেরিয়ে ১৭ই জুন জোংরীতে পৌঁছন। ২০শে জুন কাঙ লা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে নেপালে উপস্থিত হন। তারপরে কাংবাচেন গ্রাম ও উপত্যকা পেরিয়ে ২০,০৮০ ফুট জংসং লা (গিরিবর্ত্ম) অতিক্রম করে আবার সিকিমে আসেন। অবশেষে ১৯,০৩৭ ফুট উঁচু চোর্তেন নিয়ামা লা পেরিয়ে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে পদার্পণ করেন।

তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিযান প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক্ স্মাইথ বলেছেন—'This is one of the boldest journeys on record in that part of the world, and crossing the Jongsong La, a high glacier pass, was a great feat.'

শরৎচন্দ্র তিব্বতের শিগাৎসে জনপদে উপস্থিত হন, সেখান থেকে রাজধানী লাসায় পৌঁছন। তিনি তিন মাস সেখানে ছিলেন। ফেরার পথে তিনি সম্ভবতঃ

---

* Himalayan Journal or Notes of a Naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, The Khasi Mountains & etc., by Sir Joseph Dalton Hooker, London 1859. হুকার সাহেব তাঁর এই বইখানি চার্লস ডারউইনকে উৎসর্গ করেছেন। ডারউইন সাহেব তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

আর জংসং লা পার হতে চান না। তাই লোনাক্ উপত্যকা থেকে সোজা লাচেন নেমে আসেন। এবং এই পথে দার্জিলিং ফিরে যান।

১৮৮১ সালে শরৎচন্দ্র আবার সিকিমে আসেন এবং নেপালের নাঙ লা (১৯,০৫৫) পেরিয়ে তিব্বতে যান। দুটি অভিযানেই তিনি এভারেস্ট শৃঙ্গের ৪০।৪৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছিলেন। তাঁর আগে আর কেউ এভারেস্টের অত কাছে পৌঁছয়নি। তাই পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন জে. বি. নোয়েল তাঁরই উল্লেখিত পথে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে 'the hardy son of soft Bengal' বলে অভিহিত করেছেন।

সে যুগে শরৎচন্দ্র প্রায় বিনা সাজসরঞ্জামেই এমন উচ্চতা অতিক্রম করেছেন, যেখানে তাঁর আগে আর কেউ পৌঁছতে পারেননি। ১৮৮৭ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন। দু'বছর বাদে সোসাইটি তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। ১৯০২ সালে শরৎচন্দ্র তাঁর Tibetan English Dictionary' রচনা শেষ করেন। এই বইখানি আজও হিমালয়-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। ১৯১৭ সালের ৫ই জানুয়ারী বঙ্গগৌরব শরৎচন্দ্র দাশ আটষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

তারপরে সিকিমের 'পলিটিক্যাল অফিসার' ক্লড্ হোয়াইট ১৮৯০ সালে জেমু হিমবাহে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি লাচেন আসেন নি। দক্ষিণ-পশ্চিম সিকিমের জোঙরী থেকে তালুং উপত্যকায় এসেছিলেন। তালুং চু তিস্তার আর একটি উপনদী। হোয়াইট সাহেব লাচেন না এলেও আজ তাঁর কথা আমার বার বার মনে পড়ছে, কারণ তিনি এই যাত্রাবিবরণে সিনিয়লচু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

'The most lovely snow peak....the finest snow peak....' তাঁর সেদিনের সিনিয়লচু দর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'It was very early and as the sun rose the clouds lifted for a few minutes, disclosing a lovely picture. The glacier and the hills immediately behind were in deep shadow, but Siniolchu was flooded with rosy light from the rising sun and no mere photograph can give any idea of the beauty of the scene.'*

সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে অবলোকন করার জন্যই আমার এই যাত্রা—আমি সুন্দরের অভিসারে চলেছি। প্রথম যিনি এই অভিসারে এসেছিলেন তাঁর নাম পল্ বএর। নামটি পর্বতারোহীদের কাছে সুপরিচিত—তিনি একজন প্রখ্যাত জার্মান পর্বতারোহী। কাল উইয়েন, এ. গুট্নার এবং জি. হেপ্ নামে তিনজন জার্মান পর্বতারোহী নিয়ে বএর ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে চুংথাং ও লাচেন হয়ে জেমু হিমবাহে যান। সেবারেই তাঁরা সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করেন।

কিন্তু সে কথা এখন নয়, এখন চুংথাং-লাচেন পথের কথা হোক, যে পথ ধরে আমাদের পাঁচখানি গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ১৮৯৭ সালে প্রখ্যাত পর্বতাভিযাত্রী মেজর ও কনার এই পথে লাচেন হয়ে লোনাক্ উপত্যকায় গিয়েছিলেন। সেখান

* 'Sikkim & Bhutan' by J. Claude White, London, 1909

থেকে চোর্তেন নিয়ামা লা পেরিয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে আর্ল অব্ রোণাল্ডশে এই পথে লাচেন গিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালের জার্মান অভিযাত্রীদের পরে যাঁরা এ অঞ্চলে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে বিপ্ পারেস-এর কথা। তিনি ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে এই পথে লাচেন গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন। ২রা মার্চ গ্যাংটক থেকে রওনা হয়ে ৪ঠা চুংথাং পৌঁছন। ৫ই মার্চ লাচেন আসেন। এই পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে পারেস লিখেছেন—

'The river here is ruggedly beautiful and the road which follows the left bank becomes in many places a narrow track barely a couple of feet wide.'

আজ সেই পথ দিয়ে আমরা মোটরে চড়ে লাচেন চলেছি। তবে পথের সৌন্দর্য বুঝি বা একই রকম রয়েছে। পারেস লিখেছেন—

'Cascading water falls drop in filmy clouds or like suspended silver ribbons to join the river....' তাঁর পাখির মতো উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করেছে। তিনি বলেছেন—'I might fly up and up above the rocks which flank the sides of the streams! Up the peaks....where melting snow starts its descent down these towering rocks, there to see the other snowy summits which have caused this havoc below....'*

পারেস-এর পরে ডেভিড ম্যাক্‌ডোনাল্ড। একটু আগেই তাঁর কথা বলেছি। তাহলেও তাঁর কথা না ভেবে পারছি না। কারণ ম্যাক্‌ডোনাল্ড আরও একটি খবর দিয়েছেন—চুংথাং থেকে ৭ মাইল এসে অর্থাৎ এই পথের মাঝামাঝি জায়গায় পথের ডানদিকে একটি উষ্ণকুণ্ড ছিল। সেকালে স্থানীয়রা নিয়মিত যেখানে স্নান করতে যেতেন। তখন চুংথাং থেকে লাচেনের দূরত্ব ছিল ১৩ মাইল। মোটরপথ নির্মিত হবার জন্য এখন সেই দূরত্ব বেড়ে হয়েছে ২৩ কিলোমিটার অর্থাৎ সাড়ে চোদ্দ মাইলের মতো।

কথাটা জিজ্ঞেস করি প্রভাতকে। সে এ পথে প্রায় প্রতিদিন যাওয়া-আসা করে। তবু সে উষ্ণকুণ্ডের কোন হদিশ দিতে পারে না। অতএব আর কোন প্রশ্ন না করে আমি ভেবে চলি উইলফ্রেড্ নয়সি-এর কথা।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত নয়সি-এর বই থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ও গ্যাংটক হয়ে চুংথাং আসেন। তারপরে লাচুং (৮৬১০) হয়ে থাঙ্গু (১২,৮৬০) চলে যান। সেখান থেকে লাচেন (৮,৯৬০) আসেন এবং এই পথে চুংথাং হয়ে ফিরে যান।

কিন্তু ফিরে যাবার কথা এখন নয়, এখন আসার কথা হোক। একটু আগে আমরা ছাতেন ছাড়িয়ে এসেছি। ছাতেন একটি বড় উপত্যকা কিন্তু ছোট গ্রাম। এখানে একটি সরকারী 'এগ্রিকালচারাল ফার্ম' আছে। তাঁরা যেমন নিজেরা চাষাবাদ করেন, তেমনি স্থানীয় চাষীদের চাষের কাজে সাহায্য করেন—বীজ ও সার সরবরাহ করে থাকেন। ফার্মের ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী কাশীর ছেলে। চমৎকার বাংলা বলেন।

---

* 'Himalayan Honeymoon' by Bip Pares, London, 1940.

ছাতেন থেকে লাচেন ৪ কিলোমিটার। গুটিকয়েক বাঁক পেরুবার পরেই পতাকা-মঞ্চ দেখা গেল। সিকিমের প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশমুখে কোন উঁচু জায়গায় এমনি বড় বড় পতাকার সারি দেখতে পাওয়া যায়। তার মানে গ্রাম এসে গেল।

সত্যই তাই। পতাকামঞ্চটির পরে একটা বাঁক ছাড়িয়েই লাচেন উপত্যকা দেখা গেল। ভাবতে ভাল লাগছে একশ' তিরিশ বছর আগে স্যার জে. ডি. হুকার ও একশ' বছর আগে শরৎচন্দ্র দাশ যেখানে এসেছিলেন, আমিও একটু বাদে সেখানে উপস্থিত হব। তবে আমি গাড়িতে চড়ে এসেছি আর তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল। এখন পর্বতারোহণ একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস আর তখন হিমালয়ে পর্বতারোহণ আরম্ভ হয় নি, এমনকি য়ুরোপেও তার নিতান্ত শৈশব অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে আমার। হিমালয়ের পর্বতারোহণ এই সিকিমেই শুরু হয়েছে। ১৮৮৩ সালে ডাব্‌লু. ডাব্‌লু. গ্রাহাম নামে জনৈক অভিযাত্রী একজন সুইস গাইডকে নিয়ে তালুং হিমবাহ অঞ্চলে পর্বতারোহণ করতে আসেন। যাক গে যেকথা বলছিলাম।

আমার মনে পড়ছে আর্ল অব্ রোণাল্ডশের সেই বর্ণনা—'We were standing on the broader bottom of an upland valley, and in an amphitheatre in the hill-side stood the little village Lachen.... And once more we were brought into intimate contact, with India's absorbing and eternal quest.' *

তবে গ্রামটিকে কিন্তু আমার মোটেই ছোট বলে মনে হচ্ছে না, বেশ বড় গ্রাম। আর তা আজ থেকে নয়, ১৯৩৮ সালের লাচেনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপ পারেস লিখেছেন—

'It is the largest village we have seen outside Gangtok.'

সত্যই বড় গ্রাম। মোটরপথটি পাহাড় থেকে উপত্যকার বুকে নেমে এলো। এগিয়ে চলল প্রায় সমতলের উপর দিয়ে। গ্রামের সীমারেখা থেকে পথটি বাঁধানো। সুতরাং এখন আর আগের মতো ঝাঁকুনি হজম করতে হচ্ছে না।

লাচেন চু ডানদিকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না, তবে এখান থেকে নিশ্চয়ই তার শব্দ শোনা যায়। এখন গাড়ির শব্দের জন্যে নদীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। নদীর ওপারে সবুজ পাহাড়।

পাহাড় আছে এপারেও, আমাদের বাঁদিকে, উপত্যকার শেষে। তবে অত উঁচু কিংবা অমন খাড়া পাহাড় নয়। উপত্যকাটি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে সেই পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু বাড়ি-ঘর। আর রয়েছে গুম্ফা—গ্রামের উচ্চতম স্থানে। এটি একটি সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির। সিকিমের সবচেয়ে বড় প্রার্থনাচক্রটি ঐ মন্দিরে স্থাপিত। কিন্তু গুম্ফার কথা পরে হবে, এখন গ্রামটিকে দেখে নিই।

পথের বাঁদিকে স্কুল। মাইনর স্কুল। ছোট একটি বাড়ি—সামনে একফালি মাঠ।

---

* 'Land of Thunderbolt' by Earl of Ronaldshay, London, 1923.

প্রভাত জানায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে ও হাতের কাজ শেখে।

স্কুলের পরে দু-তিনটি বাড়ি, তারপরেই ডাকবাংলো। ডানদিকে আর কোন বাড়ি নেই। পথের বাঁদিকে উপত্যকার বৃহত্তর অংশ—বাড়ি-ঘরে বোঝাই। প্রভাত বলে—সব মিলিয়ে একশ' ষাটটির মতো ঘর আছে। হাজার খানেক লোকের বাস। তার মানে লাচেন বেশ বড় পাহাড়ী গ্রাম।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চুংথাঙে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে যে দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝেই বিচলিত হয়েছি, এতক্ষণে তার অবসান হল। একে তো শেরপাদের পাত্তা নেই, তার ওপরে যদি মালবাহক না পাওয়া যায়, তাহলে কি উপায় হবে? চুংথাং থেকে রওনা হবার পরে সারা পথে তাই কেবলই গ্রাম খুঁজেছি। কিন্তু এ পথে লোকালয় বড়ই কম। সুতরাং অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এত বড় গ্রাম। চল্লিশ-পঞ্চাশজন মালবাহক যোগাড় করা বোধকরি কঠিন হবে না।

বাঁধানো পথটি ডাকবাংলোর সামনে এসে শেষ হয়েছে। সেখানেই সারি বেঁধে আমাদের গাড়ি থামল। এর পরে পথটি সরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডাকবাংলোর সামনে একফালি উঠোন রয়েছে। এটাই গাড়ি ঘোরাবার জায়গা। প্রভাত আমাদের গাড়িখানি ভেতরে নিয়ে এলো।

গাড়ি থেকে নেমে আসি। চৌকিদার সেলাম করে। পারমিট দেখাতেই সে দরজা খুলে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে।

কাঠের মেঝে, কাঠের সিলিং ও কাঠের দেওয়াল। বেশ বড় বাংলো। ১৯১৮ সালে বৃটিশরা তৈরি করেছেন। অথচ দেখে মনে হচ্ছে হালে তৈরি। প্রথমেই সুবিরাট ড্রয়িংরুম। চেয়ার টেব্‌ল ও সোফা দিয়ে সুসজ্জিত। রয়েছে ফায়ার প্লেস। ড্রয়িং রুমের দুপাশে দুটি লম্বা বারান্দা। তারপরে দুখানি বেডরুম। প্রতিঘরে দুখানি করে ডানলোপিলোর খাট, দেওয়াল আলমারী ও ড্রেসিং টেব্‌ল। ড্রয়িংরুমের মতোই দড়ির কার্পেট পাতা এবং ফায়ার প্লেস রয়েছে। বেডরুমের সঙ্গে বাথরুম ও ক্লোক্‌রুম। বাঁ দিকের বারান্দার পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিচেন। এক কথায় রমণীয় নিবাস, চমৎকার বন্দোবস্ত।

শুধু তাই নয়, ডাকবাংলোর অবস্থানটিও মনোরম। আগেই বলেছি এটি এদিককার শেষ বাড়ি। ডাকবাংলোর দুদিকে অনেকখানি সবুজ সমতল—সমতলের শেষে একদিকে নদী, আরেকদিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের আগামী দিনের পথ—জেমু হিমবাহের পথ, সিনিয়লচুর পথ।

কিন্তু পথের কথা পরে হবে। আপাতত পথ চলা শেষ হয়েছে, আমরা লাচেন পৌঁছে গিয়েছি। এখন অনেক কাজ। মালপত্র সব ধরাধরি করে বাংলোয় আনা দরকার। গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ওরা আজ চুংথাং ফিরে যাবে। বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছে। একে দুর্গম পথ, তার ওপরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। এটা কাশ্মীর নয় যে রাত আটটা পর্যন্ত পথে আলো থাকবে, সিকিম পূর্ব-ভারত। সন্ধ্যে হয়ে এলো বলে। তাই তাড়াতাড়ি হাত চালাই।

তবু পাঁচখানি গাড়ি খালি করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। তারপরেই

বিদায় নেয় ওরা, বিদায় নেয় প্রভাত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, কিন্তু এরই মধ্যে কেমন যেন একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। বিদায় বেলায় মনটা ভারী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে খারাপ লাগছে আমরা ওদের একটু চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারলাম না।

প্রভাত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, "আপনারা কেন চা খাওয়াবেন, আপনারা যে আমাদের 'গেস্ট্'। ফেরার পথে আমরাই চুংথাঙে আপনাদের চা খাওয়াব। সফল হয়ে ফিরে আসুন, আমরা সগৌরবে আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

একে একে গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যন্ত্রযানের সঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক শেষ হল। এখন চরণ দুখানিকে সম্বল করে দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে যেতে হবে এগিয়ে।

বৃষ্টি বন্ধ হতেই আসা শুরু হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি। কেবল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নয়, তাদের সঙ্গে বহু যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রয়েছেন। ডাকবাংলোর সামনে যেন মেলা বসেছে। অনেকে এসে একেবারে সিঁড়ির ওপরে ঠাঁই নিয়েছে। তবে কেউ কোন গোলমাল করছে না। সবাই আমাদের দেখছে, আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

সহযাত্রীদের কেউ কেউ একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি কিন্তু মোটেই বিস্মিত হচ্ছি না। কারণ ১৯৩৮ সালে যখন বিপ্ পারেস এখানে এসেছিলেন তখনও এই একই অবস্থা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পারেস লিখেছেন—'The news that the strangers are now on view brings men, and women from their homes...' তবে তাঁদের মতো কেউ আমাদের কাছে কম্বল কিংবা চামড়া বিক্রি করতে আসে নি।

চৌকিদারের দাদা কালু ও লাক্পার সহায়তায় বীরেন চা বানিয়ে ফেলেছে। আর ইতিমধ্যে অসিত বিস্কুট ও চানাচুর বের করে নিয়েছে। অতএব সান্ধ্য চা-পর্ব বেশ জমে উঠল।

সেনদা বলেছিলেন এখানে মিঃ বি. রায় বলে একজন বাঙালী থাকেন। ভেবেছিলাম খোঁজখবর করে কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁর তিনজন সহকর্মী—মিঃ সিং, মিঃ জর্জ ও মিঃ শর্মা। মিঃ সিং ও মিঃ শর্মা উত্তর প্রদেশের মানুষ আর মিঃ জর্জ কেরালার অধিবাসী। এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। জর্জ সেই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার-কাম-কম্পাউণ্ডার আবার তিনিই লাচেনের পোস্টমাস্টার।

কথায় কথায় মিঃ রায় বলেন, "আমি তিন-চার দিনের মধ্যে ছুটিতে চলে যাচ্ছি। তবে তাতে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আপনারা আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা পাবেন।"

অসিতবাবু বস্তুবাদী মানুষ। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, "আমরা বাড়তি মালপত্র আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই।"

"বেশ তো জানিয়ে দেবেন।" মিঃ সিং বলেন, "আমি গুদামে রেখে দেব।"

"আপনাদের অফিসে তো ওয়্যারলেস আছে?" অমূল্য প্রশ্ন করে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাঝে মাঝেই বিগড়ে যায়। ভাল থাকলে আপনাদের খবর

গ্যাংটকে পাঠিয়ে দেব। আপনারা বেস্‌ক্যাম্প থেকে খবরগুলো আমাকে জানিয়ে দেবেন।"

"আরেকটা কথা," এবারে বীরেন কথা বলে, "আমাদের কিছু আলু ও চিনি যোগাড় করে দিতে হবে।"

"আলুর জন্য কোন অসুবিধে হবে না। তবে চিনি যোগাড় করা সত্যিই মুশকিল। তবু চেষ্টা করব।"

চা খেয়ে বিদায় নিলেন ওঁরা। আর তারপরেই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুলির কন্‌ট্র্যাক্টর এসে হাজির হল। প্রধানের বয়স বোধকরি বছর ষাটেক। প্রধানকে এঁরা বলেন 'পিপুন'—বেশ শান্ত-শিষ্ট লামা-লামা চেহারা। পোশাকটিও তিব্বতী। দেখে মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব হয়। তবে কন্‌ট্র্যাক্টরকে দেখে আমার তাকে ধূর্ত বলেই মনে হচ্ছে। তবু উপায় নেই, এর সঙ্গেই কারবার করতে হবে।

চা-বিস্কুট খাইয়ে কথাবার্তা শুরু করি। প্রথমেই কন্‌ট্র্যাক্টর বলে বসল, "আপনাদের শুনলাম কিচেনের জন্য একজন লোক দরকার?"

"না তো!" আমি বিস্মিত। বলি, "দার্জিলিং থেকে আমরা চারজন 'হ্যাপ্‌' নিয়ে এসেছি, তার ওপর কালু রয়েছে।"

"তাহলেও আমি আপনাকে একটি ছেলে দিচ্ছি। সে বাসন মাজা থেকে জল তোলা পর্যন্ত সবই করবে। আজ ও কালের জন্য তাকে যা ইচ্ছে দেবেন। পরশু থেকে সে কিচেনের মাল বইবে। তখন তাকে দৈনিক পঁচিশ টাকা করে দেবেন।"

"পঁচিশ টাকা!" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ, ওটাই এখানে কুলিদের দৈনিক রেট।"

"কিন্তু আমাদের বেসরকারী অভিযান, আমরা তো অত টাকা দিতে পারব না!"

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি আর কোন কথা বলি না। সে পঞ্চায়েত প্রধানকে কি যেন বলে নিজেদের ভাষায়। প্রধানও তাকে কিছু বলেন।

একটু বাদে কন্‌ট্র্যাক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কত করে দিতে পারেন?"

অমূল্য বীরেন ও অসিতবাবুর সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিয়ে বলি, "আমরা লাচেন থেকে মূল শিবির পর্যন্ত জনপ্রতি দৈনিক বিশ টাকা করে দেব কিন্তু খাবার দেব না। মূল শিবিরে যাদের ছেড়ে দেব, তারা ফিরে আসার জন্য তিরিশ টাকা করে পাবে কিন্তু কোন খাবার পাবে না। যারা মূল শিবিরে থাকবে তাদের খাবার দেব, যারা ওপরে যাবে তারা দৈনিক আরও দু টাকা করে বেশি পাবে।"

বীরেন আবার কথাগুলো বুঝিয়ে দেয় ওদের। তারপরে ওরা দুজনে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যায়। আমরা চুপ করে থাকি।

আলোচনা শেষ করে প্রধান বলেন, "এক কাজ করুন সাব্‌।"

"কী বলুন?"

"দৈনিক একটা করে টাকা বাড়িয়ে দিন।"

"মানে?" ঠিক বুঝতে পারি না তাঁর কথা।

কন্‌ট্র্যাক্টর বুঝিয়ে দেয়, "বেসক্যাম্প্‌ পর্যন্ত জনপ্রতি দৈনিক একুশ টাকা আর তার ওপরে তেইশ টাকা করে দেবেন।"

"মূল শিবির থেকে খালি হাতে ফিরে আসা কিংবা মাল আনতে সেখানে যাবার জন্য জনপ্রতি কত করে দিতে হবে?"

"বত্রিশ রূপেয়া।"

"বেশ তাই পাবে।" আমি সম্মত হই। বলি, "কাল সন্ধ্যাবেলায় প্রধানকে নিয়ে এসো, লেখা পড়া করে অগ্রিম দিয়ে দেব।"

"আবার লেখা পড়া করতে হবে?" প্রধান একটু হাসেন।

বলি, "একটা লেখা পড়া থাকা ভাল, ভবিষ্যতে গোলমাল হতে পারবে না। আপনি দয়া করে কাল একবার আসবেন।"

"নিশ্চয় আসব।" প্রধান উঠে দাঁড়ান। তারপরে জিজ্ঞেস করেন, "আর কি ভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?"

সবিনয়ে বলি, "আর কোন দরকার নেই।"

"কয়েকটা থুম্বা পাঠিয়ে দেব কি?" তিনি আবার আমাদের দিকে তাকান।

আমি পুনরায় সবিনয়ে উত্তর দিই, "আজ্ঞে না, আপনাকে ধন্যবাদ।"

থুম্বা মানে সিকিমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দিশী মদ।

পাঁচ

ঘুম ভেঙে যায়। মনে পড়ে আমার—জোসেফ হুকার ও শরৎচন্দ্রের স্মৃতিধন্য লাচেন গ্রামে রাত কাটিয়েছি আমি। স্যার জন হান্ট যে ডাকবাংলোয় ঘুমিয়ে গিয়েছেন, সেখানে ঘুম ভেঙেছে আমার।

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করি। এ যে দেখছি ছ'টা বেজে গিয়েছে! কাল শোবার আগে শেরিং ও লাক্‌পাকে বার বার বলেছিলাম সাড়ে পাঁচটায় বেড-টি দিতে। ঠাণ্ডা জায়গা। বেড-টি না পেলে কেউ স্লীপিং ব্যাগ ছাড়তে চায় না।

আজ আমরা এখানে থাকছি বটে, কিন্তু হাতে প্রচুর কাজ। অমূল্যকে ছাতেন যেতে হবে শেরপাদের খোঁজে। গতকাল এখানে আসার পথে ছাতেন এগ্রিকালচারাল ফার্মের ম্যানেজার মিস্টার ত্রিবেদীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি আজ কাউকে থলি নিয়ে যেতে বলেছেন। কিছু আলু উপহার দেবেন এবং চিনি যোগাড়ের চেষ্টা করবেন।

সবচেয়ে বড় কথা মালপত্র প্যাক্ করতে হবে। সদস্যদের ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জাম বিলি করে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর পাঠাতে হবে মিস্টার রায়ের কাছে।

অতএব আর শুয়ে থাকা উচিত হবে না। স্লীপিং ব্যাগের 'জিপ্' খুলে উঠে বসি। ঘরের অপর খাটখানিতে শুয়েছেন সাংবাদিক। কথা ছিল বীরেন শোবে, সে সহনেতা। কিন্তু রমেনবাবু একে অতিথি তার ওপরে পি. এইচ. ডি.। সুতরাং সহনেতা নিজে ভূমিশয্যা নিয়ে সাংবাদিককে পালঙ্ক উপহার দিয়েছে।

আগেই বলেছি এই বাংলোয় দুখানি বেডরুম। অন্য ঘরখানির পালঙ্ক পেয়েছে

সুশান্তবাবু ও চন্দন। সুশান্তবাবু বয়সে বড় বলে খাট পেয়েছেন। কথা ছিল অপর খাটখানিতে নেতা শোবে। কিন্তু রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে অমূল্য হঠাৎ ডাক্তারকে বলে বসল—চন্দন, তুমি খাটে শোবে।

ডাক্তার দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। মাত্র গত বছর এম. বি. বি. এস. পাস করেছে। সুতরাং সে প্রতিবাদ করেছে—লীডার ও ডেপুটি লীডার মেঝেতে শোবেন, আর আমি খাটে!

—চন্দন! অমূল্য গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়েছে।

ডাক্তার নেতার দিকে তাকিয়েছে।

নেতা বলেছে—পর্বতারোহণের প্রথম পাঠ নিয়মানুবর্তিতা। পর্বতাভিযানে এসে নেতার নির্দেশ নিয়ে তর্ক করা চলে না।

—তর্ক করছি না নেতা। চন্দন বলেছে—কেবল জানতে ইচ্ছে করছে, আমার ওপরে এই বিশেষ কৃপার কারণ কি?

ডাক্তারের কথা বলার ধরন দেখে আমরা হেসে ফেলেছি। কিন্তু নেতা নিজের কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখেই উত্তর দিয়েছে—কারণ তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং এর আগে কোনদিন এত উঁচুতে আসো নি। তা ছাড়া তুমি সুস্থ না থাকলে আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ব।

—এ্যাজ্ ইয়র লীডারশিপ্ প্লীজেস। উকিল যেমন জজসাহেবকে কুর্নিশ করেন, ডাক্তার তেমনি নেতাকে কুর্নিশ করেছে।

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছি। এবং নেতাও সে হাসির হুল্লোড়ে যোগদান করেছে।

যাক্ গে যে কথা বলছিলাম, আমাদের ক্লোকরুমে শুয়েছে অমূল্য ও অসিত আর সুশান্তবাবুদের ক্লোকরুমে বীরেন ও অসিতবাবু। বাকি সবাই টেবল ও সোফা সরিয়ে ড্রয়িংরুমে এয়ার ম্যাট্রেস পেতেছে। আর হ্যাপ্‌রা ঠাঁই নিয়েছে বারান্দায়।

বাথরুমে আসি। চোখে-মুখে জল দিই। জল তো নয়, বরফ। উপায় নেই, কে এখন আমাকে গরম জল দেবে? যাদের জল গরম করার কথা, তারা যে নিজেরাই স্লীপিং ব্যাগে গরম হচ্ছে।

তাহলেও ডাকতে হয় ওদের—আমাদের উচ্চ-হিমালয়ের পাচক শেরিং ও তার সহকারী লাক্‌পাকে।

বৃথা চেষ্টা। গরম চা-য়ের মগ হাতে না দিলে ওদেরও ঘুম ভাঙবে না। মনে পড়ছে শেরপা পাচক ছুঞ্জের কথা। বিশ হাজার ফুটের ওপরেও বরফ গলিয়ে চা বানিয়ে খাবার তৈরি করে ঠিক সময়টিতে তাঁবুতে ঢুকে বলেছে—গুঠ্ মোর্নিং সাব্। তার সময়ানুবর্তিতা অবিস্মরণীয়। এমন কি তুষার ঝড় পর্যন্ত কোনদিন তাকে এক মিনিট 'লেট' করিয়ে দিতে পারে নি। *

আর এরা আমার ডাক শুনেও বিছানা ছাড়তে চাইছে না! কেন চাইবে? এরা যে হাই-অলটিচ্যুড পোর্টার, শেরপা নয়। এবং এক জায়গার মানুষ হলেও এরা কোনদিন শেরপা হতে পারবে না। সারাজীবন শুধু মাল বয়েই বেড়াবে।

---

* লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দ্রষ্টব্য

আরও দু-একবার ডাকাডাকি করে বুঝতে পারি হ্যাপ্‌দের আশায় বসে থাকা বৃথা। সত্যিই এরা বেড-টি না পেলে বিছানা ছাড়বে না। কি করা যায়? চা আমিও বানাতে পারি কিন্তু আমি যে উনুন ধরাতে পারব না। তার চেয়ে কালুকে ডাকা যাক।

সামনের দরজা খুলে বাইরে আসি। ডাকবাংলোর পাশেই চৌকিদারের কোয়ার্টার্স। দু-বার ডাক দিতেই কালু তার লেদার জ্যাকেট পরে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমাকে নমস্কার করে। বলি, "বেড-টি বানাতে হবে।"

"আসছি সাব্‌।"

কালু আসে। উনোন ধরায়। জল চড়ায়। সাব্‌দের শিয়র থেকে মগগুলো সংগ্রহ করে ধুয়ে ফেলে। আমি চা চিনি ও গুঁড়ো দুধ নিয়ে আসি। আধঘণ্টার মধ্যে কালু চা পরিবেশন করে। সদস্যরা উঠে বসে। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে হিমাদ্রির হ্যাপ্‌রাও।

হিমাদ্রির হ্যাপ্‌ বলছি কারণ, সে-ই তাদের দার্জিলিং থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আর তাই সে তাদের হয়ে ওকালতি করে—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শঙ্কুদা, ওরা ওপরে গিয়ে দেখবেন, কিরকম 'ফিট' হয়ে যায়।"

বলাবাহুল্য কেশব তাকে সমর্থন করে কারণ সেও হিমাদ্রির সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিল। অবশ্য হ্যাপ্‌দের কুঁড়েমি এবং ঘুমকাতুরে স্বভাবের জন্য হিমাদ্রি কিংবা কেশবকে দায়ী করা উচিত হবে না। কারণ ওরা খোদ শেরপা ক্লাইম্বার্স এসোসিয়েশনের অবদান।

চা-য়ের পরে শেরিঙ ও লাক্‌পাকে নিয়ে বীরেন ব্রেক্‌ফাস্ট-এর ব্যবস্থা করতে লেগে যায়। আর কালু জল যোগাড়ের চেষ্টা শুরু করে।

সুবিরাট ডাকবাংলো, চমৎকার বাথরুম ও রান্নাঘর। সব জায়গাতেই একাধিক জলের ট্যাপ্‌। কমোড্‌-এর পায়খানায় ফ্ল্যাস-এর ব্যবস্থা। কিন্তু কোথাও জল নেই। সেই সুদূর অতীতে রাস্তা বাঁধাবার সময় নাকি জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল, সেটি এখনও জোড়া লাগে নি।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমান কালু ভগীরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিরাট একটি পলিথিন পাইপের সাহায্যে রাস্তা থেকে জল নিয়ে আসে ডাকবাংলোয়। আমাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হোক্‌ গে, ন' হাজার উঁচু তুষারশীতল লাচেন। আমরা যে অধিকাংশই বাঙাল। আমাদের কি জল না হলে চলে?

বেড-টি দিতে দেরি হলেও বীরেন কিন্তু ন'টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করে ফেলল। কম তো নয়—আমরা তেরো, দার্জিলিঙের চার আর লাচেনের দুই—কালু ও চেতা সব মিলিয়ে উনিশজন। এতগুলো মানুষের রুটি করা সহজ কর্ম নয়। তবে একটু দেরিতে এলেও চেতা খুব সাহায্য করেছে। ছেলেটার বয়স কম কিন্তু ভারী চট্‌পটে। শ্রীমান চেতা শ্রীযুক্ত কন্‌ট্র্যাক্টরের উপহার।

ব্রেক্‌ফাস্ট করে অমূল্য, কেশব ও সাঙ্গো ছাতেন রওনা হল। ছাতেন লাচেন থেকে গ্যাংটকের দিকে ৪ কিলোমিটার। অর্থাৎ ওদের পেছিয়ে যেতে হবে। আমরা আশা করছি ছাতেনে মেজর সাহেবের কাছে শেরপাদের খোঁজ পাওয়া যাবে। শেরপা সংগ্রহের শেষ চেষ্টা করার জন্য অমূল্য ছাতেন চলেছে। সেই সঙ্গে ত্রিবেদীর কাছ

থেকে আলু ও চিনি নিয়ে আসবে।

কিন্তু যদি শেরপারা অভিযান থেকে এখনও না ফিরে থাকে? তাহলে শেরপা ছাড়াই আমাদের চিনিয়লচু আরোহণের চেষ্টা করতে হবে। কাজটা কেবল কঠিন নয়, অনুচিতও বটে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। এখানে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

অমূল্যদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে আসি বাংলো থেকে। ওদের খানিকটা এগিয়ে দিই। তারপরে ফিরে চলি আস্তানায়।

"নমস্কার দাদা। ভিতরে আসুন।"

তাকিয়ে দেখি পোস্ট্ অফিসের দোতলায় মিস্টার রায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনিই ডাকছেন আমাকে।

এই বাড়িতেই মিস্টার রায় এবং তাঁর সহকর্মীদের অফিস ও কোয়ার্টার্স। এখানেই পোস্ট্ অফিস এবং দাতব্য চিকিৎসালয়। বাড়িটি বড় নয়, তবে এটি বোধ করি লাচেনের একমাত্র দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ইংরেজী ও হিন্দীর সঙ্গে বাংলায় লেখা 'ডাকঘর'।

প্রতিনমস্কার করে মিঃ রায়কে বলি, "না ভাই, এখন আর ভেতরে আসব না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। বরং বিকেলে সবাইকে নিয়ে আসব।"

"তাই ভাল," মিঃ রায় বলেন, "একটা কথা, আজ বাস আসবে, কাল ডাক যাবে। চিঠিপত্র যা দেবার পাঠিয়ে দেবেন।"

মিস্টার রায়কে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। সামান্য চড়াই, বাঁধানো পথ। পথের একপাশে পাকা নর্দমা ও জলের পাইপ। ওপরের পাহাড়ী ঝরণা থেকে পলিথিনের পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে। এই পাইপ থেকেই কালু আমাদের বাংলোয় জল নিয়ে গিয়েছে।

পথের দু-পাশেই বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির সামনের ঘরে দোকান। হিমালয়ের গ্রামে দোকান মানেই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স—পোস্টকার্ড থেকে শষ্যদ্রব্য, চাল আটা থেকে মাংস পর্যন্ত, সব কিছুই পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি তিব্বতীরাই এ অঞ্চলের আদিবাসী। ক্ষেত-খামারের খোঁজে তাঁরা এখানে এসেছেন। পরবর্তীকালে লেপ্চা, ভোটিয়া ও তিব্বতীদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের সমাজ। তাই আজও এ অঞ্চলের প্রধান ভাষা তিব্বতী। তবে আজকাল প্রায় সবাই নেপালী ও হিন্দী বুঝতে পারে।

এঁরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। কিন্তু নিরামিষভোজী নন। গরু-ঘোড়া-ভেড়া সবই খান। গৃহপালিত পশু হিমালয়ে বড়ই মূল্যবান। মাংসের দামও বেশি—চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কিলো। মুরগীর দাম আরও বেশি। আশি টাকার কমে নাকি একটা মুরগী পাওয়া যায় না। তাই প্রতিদিন পশুবধের প্রশ্ন ওঠে না। একবার মাংস কেটে তা কয়েকমাস ধরে বিক্রি করা হয়। বড় বড় টুকরো করে মাংসগুলো দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। ঠাণ্ডা জায়গা, হয়ত নষ্ট হয় না। কেবল মাছি বসে, ধুলো জমে আর কালো হয়ে যায়। কিন্তু দাম কমে না।

আজ সকালে রোদ উঠেছে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে। ছেলে-মেয়েরা পথে খেলা করছে। এরা অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজেও খেলা করে। বৃষ্টিকে

ভয় করলে যে ওদের খেলা ভুলে যেতে হবে। এখানে বারোমাস হয় বৃষ্টি, নয় তুষারপাত। শীতকালে শুনেছি এই পথের ওপর সর্বদা অন্তত হাঁটুসমান বরফ জমে থাকে।

লাচেনের আবহাওয়া ভাল নয়। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রবল তুষারপাত হয়, এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত বর্ষাকাল। আবার সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হালকা তুষারপাত। তবু এখানে এত মানুষ বাস করেন।

এখন বরফ নেই। তার বদলে জমে আছে গোবর। বড়ই নোংরা। কিন্তু তারই ওপরে ছেলে-মেয়েরা সমানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সভ্যতার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এর জন্য তেমন একটা খরচের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রয়োজন শিক্ষার, যে শিক্ষা আজও আমরা দেশবাসীকে দিয়ে উঠতে পারি নি। কবে পারব, তা বোধকরি অন্তর্যামীও বলতে পারবেন না।

ফিরে আসি বাংলোয়। সুশান্তবাবু, বীরেন ও সাংবাদিক ছাড়া আর সকলেই দেখছি প্যাকিং শুরু করার আয়োজন করছে। মালপত্র নিয়ে আসছে সামনের লন-এ। বীরেন লাক্‌পা ও চেতাকে নিয়ে দুপুরের রান্নায় ব্যস্ত। সুশান্তবাবু গ্রামের ছবি তুলতে যাবেন। সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন।

'প্যাকিং' পর্বতারোহণের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পাহাড়ের প্রকৃতি এবং অভিযাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম ও খাবার-দাবার নিয়ে আসতে হয়। কোথায় কোথায় কোন্ উচ্চতায় কয়টি শিবির হবে, কোনন্ শিবিরে কতজন লোক থাকবে, তা হিসেব করে সেই অনুযায়ী প্যাকিং করতে হয়। সাজ-সরঞ্জাম ও রেশনের জন্য পৃথক প্যাকেট। শিবিরের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেট করে ওপরে শিবিরের নম্বর লিখে নিতে হয়, সব কিছু যাতে ঠিকমত শিবিরে পৌঁছয়। তাছাড়া উচ্চতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বহনক্ষমতা কমে যায়। এখান থেকে যে কুলি পঁচিশ কে. জি. মাল নিয়ে ওপরে যাবে, এক নম্বর থেকে দু'নম্বর শিবিরে সে পনেরো কে. জি.-র বেশি মাল বইতে পারবে না। কিন্তু তুষারাবৃত এক নম্বর শিবিরে মাল 'রি-প্যাক্' করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখানেই আমাদের সেই ভাবে প্যাক্ করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে নজর রাখতে হবে যাতে কোন কিছু বাদ না যায়। একটি দেশলাইয়ের অভাবে একটা অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

রওনা দেবার দিন পর্যন্ত কলকাতায় আমাদের জিনিসপত্র যোগাড় করতে হয়েছে। ফলে কোন রকমে বেঁধে-ছেঁদে রেলে চেপেছি। তার ওপরে অমলকে শিলিগুড়িতে চাল-আটা ও আলু এবং বাসন কিনে রাখতে লিখেছিলাম। ঠিক ছিল, শিলিগুড়িতে প্যাকিং সেরে নেব। কিন্তু কুলিদের বিপ্লবের কৃপায় সে সুযোগ পাওয়া যায় নি।

তাই ওরা আজ প্যাকিং শুরু করেছে। হিমাদ্রি অসিত ও বিনীত এই প্যাকিং পর্বের প্রধান হোতা, অসিতবাবু অরুণ শরদিন্দু ও নওয়াং তাদের সাহায্য করছে।

তবে ওরা মোটেই নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারছে না। দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোলের শিশু থেকে লাঠি হাতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত, সব বসসের নারী-পুরুষে ডাকবাংলোর আঙ্গিনা প্রায় ভরে উঠেছে। কেউ কেউ আবার হাত দিয়ে জিনিসপত্র পরীক্ষা করছে। এ অবস্থায় ওরা কাজ করবে কেমন করে?

বাধ্য হয়ে কালুর শরণ নিই। সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দর্শনার্থীদের দূরে সরিয়ে দেয়।

জানি না, কতক্ষণ তারা সুবোধ বালক-বালিকার মতো দূরে সরে থাকবে? তবে কোনমতেই কাউকে কোন কড়া কথা বলা চলবে না। তাই এ কাজের জন্য একজন স্থানীয় লোক দরকার। কিন্তু কালুকে এখন ছেড়ে দিতে হবে।

কালু যাচ্ছে সুশান্তবাবুদের সঙ্গে। একে তো তাকে মুভি ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার ওপর একজন গ্রামবাসী সঙ্গে না নিয়ে কোন পাহাড়ী গাঁয়ের ছবি তোলা নিরাপদ নয়। গ্যাংটকে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, পথের ছবি তুলব না। সে প্রতিশ্রুতি আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

সাংবাদিক ও কালুকে নিয়ে ক্যামেরাম্যান লাচেন গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে গেলেন। আমি যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার যাওয়া হল না। ঘুরে দেখতে পারলাম না তিস্তা তীরের এই মনোরম গ্রামখানি। দেখতে পেলাম না ফল ও শাকসবজির বাগান। অথচ ফলের জন্যই এই গ্রামের নাম লাচেন। সিকিমী ভাষায় 'চেন' শব্দের অর্থ ফল, আর 'লা' মানে স্থান। 'লা চেন' মানে যেখানে প্রচুর ফল পাওয়া যায়।

লাচেন একটি উর্বর উপত্যকা। তাই তিব্বত থেকে দলে দলে মানুষ এখানে এসেছিলেন। তাঁরাই লাচেন গ্রামের আদি অধিবাসী। তাঁরা এখানে আলু আপেল যব ও মূলার চাষ করেছেন। এখনও লাচেন কৃষিসম্পদে সম্পদশালী। অবশ্য কৃষিকার্যে এঁরা শুধু লাচেনের ওপরে নির্ভরশীল নয়। থাঙ্গু এবং তার ওপরে ইয়ংড়ি (Youngdi) উপত্যকায় এরা প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে চাষ করতে যান। সেখানে অনেক চাষের জমি রয়েছে।

বৃত্তি হিসেবে চাষের পরেই পরিবহনের স্থান। তাই এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই পশুপালন করেন। পশু বলতে চমরী গাই, গরু এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণে চরু। তারপরে ঘোড়া ও খচ্চর এবং ভেড়া।

তবে ভেড়ার ভাবনা থাক, আমি ভাবি আমার কথা। সুশান্তবাবুর সঙ্গে আমি লাচেন পরিক্রমায় যেতে পারলাম না। কারণ এখুনি আমাকে চিঠি লিখতে বসতে হবে। স্বপ্না সহ কলকাতায় কয়েকজন কে চিঠি লিখতে হবে। চিঠি লিখতে হবে শিলিগুড়িতে অমল পাল, অনিমেশ বসু ও ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়কে। ওরা আমাদের জন্য অনেক করেছে।

আগামীকাল সকালেই আমরা যাত্রা করছি হিমালয়ের অন্তরলোকে। সেই সঙ্গে সভ্যজগতের সঙ্গে সাময়িক ভাবে সব সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে। তাছাড়া আজ বিকেলে বাস আসছে। কাল সকালেই সে বাস গ্যাংটক রওনা হবে। সেই বাস-এ ডাক যাবে।

এখানে পোস্টমাস্টার নেই কিন্তু একজন বেয়ারা-কাম-ডাকরানার আছে। বাস এলে তাকে আর ছুটোছুটি করতে হয় না। কিন্তু না এলে সপ্তাহে দু'দিন ডাকের থলিটি পিঠে নিয়ে চুংথাং পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। সেখান থেকে প্রতিদিন বাস যায় গ্যাংটক। কালকের ডাক না ধরাতে পারলে কম করেও দিন চারেক দেরি হয়ে যাবে। গ্যাংটক শিলিগুড়ি ও কলকাতায় বহু মানুষ আমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। এখুনি চিঠি লিখতে বসা দরকার। আর তাই লাচেন পরিক্রমা হল না আমার।

চিঠি লেখা শেষ হতেই অসিতবাবু ঘরে আসে। বলে, "এবারে টাকাগুলো গুনে নাও, আমাকে মুক্তি দাও।"

পর্বতাভিযান একটি ব্যয়সাধ্য ক্রীড়া বা Costly Sport. তার চেয়েও বড় বিপদ টাকাটা ছোট ছোট নোটে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়। ফলে টাকার থলিটা সর্বদা বড় হয়ে থাকে।

অসিতবাবু আমাদের সংস্থার কোষাধ্যক্ষ। তাই কলকাতা থেকে টাকার থলিটি সে এই পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আর সে থলিটি বইতে রাজী নয়। এবারে সেটি আমাকে কোমরে বাঁধতে হবে।

থলিটা মোটেই ছোট নয়। সুতরাং কোমরে বাঁধলে সর্বদা একটা অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হবে। তবু আমি নিরুপায়, আমি যে ম্যানেজার অর্থাৎ কুলিদের সর্দার। তাদের টাকা তো আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে।

টাকার ঝামেলা মিটিয়ে আবার বাইরে আসি। এখন আর রোদ নেই তবে বৃষ্টি নামে নি। হিমাদ্রিদের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আর তাই বোধহয় ডেপুটি লীডার-কাম-হেড্ কুক্ বীরেন সরকার আরেকবার চা মঞ্জুর করে ফেলেছে।

চা-য়ের মগটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাংলোর পেছনে আসি। এদিকেও সামনের মতো পাথরকুচি বিছানো একফালি আঙ্গিনা। তবে এদিকে পথ কিংবা বাড়ি-ঘর নয়, ডাকবাংলোর ফেনস্ বা তারের বেড়া। তারপরে অনেকখানি সবুজ সমতল। সমতলের শেষে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ। ঐ পথ দিয়ে আগামীকাল এমন সময়ে আমরা বহুদূর এগিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু আগামীকালের কথা এখন নয়, আজকের কথা হোক। সেই সবুজ পাহাড়টার ওপর থেকে একটি তুষারাবৃত শিখর উঁকি দিচ্ছে। এ যাত্রায় এই আমার প্রথম হিমবন্ত-হিমালয় দর্শন। এখানে রোদ নেই কিন্তু ঐ শৃঙ্গটি সোনালী রোদে ঝলমল করছে। আমি দেখি। দু-চোখ ভরে দেখি। দেখি আর ভাবি।

না, তুষারাবৃত হিমালয়ের কথা নয়। আমি তো তার কাছেই চলেছি। তার সঙ্গে আমার দেখা হবে আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে। আমি ভেবে চলি হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকা এই শান্ত-সুন্দর লাচেন গ্রামটির কথা।

লাচেন খুব প্রশস্ত উপত্যকা নয়, চারিদিকেই পাহাড়। ফলে দিনের আলো খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় গাঁয়ের মাটি থেকে। তাছাড়া বৃষ্টি তো লেগেই আছে। রোদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক নয় লাচেন গাঁয়ের মানুষদের। তাই বোধ করি বৃষ্টি নামলেও বাইরের কাজকর্ম বন্ধ করে না কেউ। এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত খেলা থামায় না।

বাড়িগুলো সবই কাঠের। কোনটির গায়ে খোদাই কাজ, কোনটিতে বা রঙিন কাজ—ফুল-লতা পশু-পাখি আঁকা। বাড়ি তৈরির নিয়মটা এ অঞ্চলে শুনেছি ভারী মজার। সাধারণতঃ ফসল উঠে যাবার পরে অর্থাৎ অবসর সময়ে এঁরা বাড়ি তৈরি করে থাকেন। তবে তার আগে লামার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

লামারা হচ্ছেন সিকিমী সমাজের অভিভাবক। তাঁদের নির্দেশ আইনের মতো অলঙ্ঘনীয়। লামা ভাবী গৃহস্বামীর কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ি তৈরি আরম্ভ করার শুভদিনটি স্থির করে দেন। শুধু তাই নয়, বাড়ি তৈরির স্থানটিও লামা নির্বাচিত

করেন। কারণ যে কোন জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন না এঁরা। এঁদের মতে পুবমুখী বাড়ি সবচেয়ে ভাল। আর বাড়ির সামনে যদি একখানি বড় পাথর এবং উল্টোদিকে একটি ঝরণা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বাড়ির উত্তরদিকে কোন গুহা থাকা খুবই খারাপ, কারণ ঐ গুহায় নাকি ভূত বাস করে।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম। স্থান এবং দিন স্থির হয়ে যাবার পরে, বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়ে যায়। আর এ কাজে সবাই সবাইকে সাহায্য করেন। তবে বিনিময়ে গৃহস্বামীকে তাঁদের পান ও ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়।

তৈরি হয়ে যাবার পরে লম্বা খুঁটির সঙ্গে মন্ত্র লেখা বিরাট সাদা পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির সামনে। এঁদের ধারণা ঐ পতাকা সমৃদ্ধির বাহক।

সাধারণতঃ বাড়িতে দুটি ঘর থাকে—একটি কর্তা ও কর্ত্রীর, অপরটি অন্যদের। কর্ত্রীর ঘরেই রান্না-খাওয়া এবং সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম। অপর ঘরটিতে কর্তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও বড় ছেলে-মেয়েরা বাস করে। এই ঘরটাই ভাল এবং বড়। পরিবারের মূল্যবান জিনিসপত্র থাকে এই ঘরে। লামা কিংবা কোন সম্মানিত অতিথি এলে তাঁরাও এই ঘরে থাকেন। উৎসবাদিও সব এই ঘরে হয়।

হিমালয়ের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মতো সিকিমেও বহুপতি প্রথা প্রচলিত। বড় ভাই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে এবং ছোট ভাইরা সবাই বৌদির স্বামী হয়। ছেলে-মেয়েরাও সব ভাইদের। আমাদের কালু ও চৌকিদার দু ভাই। গতকাল কথায় কথায় কালুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার ক'টি ছেলে-মেয়ে? সে উত্তর দিয়েছে—তিনটি। প্রশ্ন করেছি—চৌকিদারের? কালু বলেছে—একই হ্যায় সাব্।

বহুপতি প্রথা হলেও এদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নয়। বিয়ের পরে কনে শ্বশুরবাড়ি আসে। শাশুড়ীর নির্দেশে সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে। হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিকিমেও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী।

আগেই বলেছি লাচেন স্থায়ী গ্রাম হলেও সারা বছরের গ্রাম নয়। লাচেনের উচ্চতা ৮,৯৬০ ফুট। এখানে শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয়, তবু এটি শীতকালীন গ্রাম। লাচেনবাসীদের গ্রীষ্মকালীন গ্রাম হল থাঙ্গু। সে গাঁয়ের উচ্চতা ১২,৮৬০ ফুট। কাঞ্চনঝাউ শৃঙ্গের (২২,৭০৩) কোলে অবস্থিত একটি রমণীয় উপত্যকা থাঙ্গু। সেখানে অনেক চাষের জমি আছে। তাই প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে লাচেনবাসীরা তাঁদের গরু-ঘোড়া নিয়ে থাঙ্গু চলে যান। শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখানে থাকেন, লাচেন পাহারা দেন।

থাঙ্গু অত্যন্ত উঁচু গ্রীষ্মকালীন গ্রাম হলেও সেকালের য়ুরোপীয় পদযাত্রীরা অনেকেই সেখানে গিয়েছেন। সেখানেই বৃটিশ আমলেই একটি চমৎকার ডাকবাংলো তৈরি হয়েছে। এটি উত্তর সিকিমের শেষ বাংলো।

রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই য়ুরোপীয় পর্যটকগণ থাঙ্গু গিয়েছেন। তবে তাঁদের অনেকেই থাঙ্গুর আবহাওয়ায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। যেমন আর্ল অব্ রোণাল্ডশে বলেছেন—

'A peculiarly sinister atmosphere hangs over Thangu.'

বলা বাহুল্য সেই ক্ষতিকর আবহাওয়া লাচেনবাসীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরং তাঁরা লাভের জন্য থাঙ্গু যান। এবারেও যাবেন, আগামী মাসে। সাধারণতঃ

এঁরা নাকি এই মে মাসের শেষ দিকেই থাঙ্গু চলে যান। এবারে আমরা আসায় ওঁদের যাবার দিন পেছিয়ে গেল। আমরা যাদের মালবাহক করে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত সবাইকে এখানে থাকতে হবে। আমাদের মালবাহকরা ফিরে এলে সভা করে থাঙ্গু যাত্রার দিন স্থির হবে।

কেবল চৌকিদার যেতে পারবে না। সে সরকারী চাকুরে, তাকে এখানে থাকতেই হবে। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কালু চলে যাবে থাঙ্গু। তার বৃদ্ধা মা এখানে থাকছেন। তিনিই তখন ছোট ছেলের দেখাশোনা করবেন।

থাঙ্গুর পথ কঠিন ও চড়াই। যেতে সারাদিন লেগে যায়। তবু মাঝে মাঝে দু-চারজন যুবক-যুবতী লাচেন আসে। বুড়ো-বুড়ীদের খোঁজ-খবর নিয়ে আবার থাঙ্গু ফিরে যায়। বুড়ো-বুড়ীরা এই সময়টা উল বুনে কাটিয়ে দেন। সকাল-সন্ধ্যায় গুম্ফায় গিয়ে পূজা-পার্বণ দেখেন ও গল্পসল্প করেন। গুম্ফার দেখাশোনাও তাঁরাই করে থাকেন।

শরতের শেষে সবাই ফসল সহ থাঙ্গু থেকে ফিরে আসেন। ফিরে আসা গ্রামবাসীদের প্রথম কাজ ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং ঘরদোর গুছিয়ে নূতন করে সংসার পাতা। ঘুমিয়ে থাকা লাচেন আবার জেগে ওঠে। ঘরে-ঘরে আর পথেপ্রান্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ফসল তোলার আনন্দ, মধুর মিলনের আনন্দ।

সুদূর অতীত থেকে সব দেশের সব সমাজে ভূত বিচরণ করছে। পণ্ডিত-মূর্খ বুদ্ধিমান-নির্বোধ ধনী-দরিদ্র কেউ ভূতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না এবং সবাই ভূতকে ভয় করেন। অতি আধুনিকদের মধ্যে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যিনি তেমন পরিবেশে ভূতের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন না।

কিন্তু বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভূত আর সিকিমের ভূত এক নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলনে হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিকিমেও প্রচুর আধুনিকতার আমদানী হয়েছে। কিন্তু সিকিমের সমাজ-জীবনে এখনও সেকালের প্রচুর প্রভাব রয়ে গিয়েছে। উগ্র আধুনিকতার প্রলেপ সিকিমের সামাজিক জীবনের রং ফেরাতে পারে নি।

সিকিমে কেউ যদি কোন সামাজিক অন্যায় করে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ধরে নেওয়া হয়, সেই মানুষটিকে ভূতে পেয়েছে। তাই তাঁরা পুলিস কিংবা ডাক্তারকে না ডেকে গ্রামের লামাকে ডেকে নিয়ে আসেন।

লামা এসে প্রথমেই সেই ভূতে পাওয়া মানুষটির কোষ্ঠী নিয়ে বসেন। বিচার শেষ করে তিনি সেই মানুষটিকে জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি স্বপ্ন দেখেছো?

যদি সে লোকটি কোন স্বপ্ন না-ও দেখে থাকেন, তাহলেও তাঁর রেহাই নেই। মানে স্বপ্ন তাঁকে দেখতেই হবে। এবং সেই স্বপ্নের সব ঘটনা তাঁকে বলতে হবে লামার কাছে। নইলে যে লামা তাঁর রোগ নির্ণয় করতে পারবেন না অর্থাৎ ভূতের পরিচয় পাবেন না। কারণ স্বপ্নের প্রকৃতি থেকেই নাকি কেবল ভূতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচয় পাবার পরে লামা ময়দা দিয়ে ভূতটির একটি মূর্তি তৈরি করেন। তারপরে বাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা করে সেই ভূতের মূর্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় বড় রাস্তার মোড়ে কিংবা কোন বনের ভেতরে। শোভাযাত্রীরা সেখানে মূর্তিটা ফেলে রেখে

ফিরে আসেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, ভূতটিকে যেখানে রেখে আসা হয়েছে, সেখান থেকে সে আর মানুষটির কাছে ফিরে আসতে পারবে না। সুতরাং সেই মানুষটি আর কোনদিন কোন অন্যায় কিংবা পাপ করবে না অথবা অসুস্থ হয়ে পড়বে না।

ভূত তাড়াবার আরও দুটি উপায় আছে। ময়দা দিয়ে ভূতের মূর্তি তৈরি না করে অনেক সময় সেই ভূতে পাওয়া মানুষটির মূর্তি তৈরি করা হয়। বলা বাহুল্য ভূতের মূর্তির সঙ্গে যেমন ভূতের কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি মানুষটির মূর্তির সঙ্গেও তার কোন মিল থাকে না। প্রথমটি কাল্পনিক আর দ্বিতীয়টি উপলক্ষ করে তৈরি।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—মানুষের মূর্তিটি তৈরি করে মানুষটির কাছাকাছি রেখে দেওয়া হয়। ভূত পড়ে যায় গোলমালের মধ্যে। সে কার কাঁধে চাপবে? অবশেষে একদিন সে মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে তার মূর্তিকে আশ্রয় করে। ভূতে পাওয়া মানুষটি হয় ভূতমুক্ত। তাড়াতাড়ি মূর্তিটিকে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

ভূত তাড়াবার তৃতীয় পদ্ধতিটি আরও অভিনব। যাকে ভূতে পায়, সে একটি নূতন নাম নেয়। না, এজন্য কোন 'এফিডেবিট্' করার প্রয়োজন পড়ে না। কেবল তার আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে বার বার নূতন নামে ডাকতে থাকে। সেই নাম শুনে-শুনে তার ভেতরের ভূত একসময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

সিকিমের বহু গ্রামবাসী দাবী করেন তাঁরা ভূত দেখেছেন। তাঁরা কেউ বলেন ভূত হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর ছোট জানোয়ার। কেউবা বলেন, ভূত হল মানুষের আকারে একটা লোমশ দৈত্য। আবার অনেকে বলেন—ভূত হচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন সুবিশাল ছায়ামূর্তি। অনেকেই ভূত দেখেছেন কিন্তু কেউ তাদের কথা শোনেন নি। কেউ কেউ কেবল ভূতের কান্না ও শিস্ শুনে ফেলেছেন।

ভূত রেগে গেলে নাকি পাথর ছুঁড়ে মারে। কখনও যার ওপরে রেগে যায় তার গায়ে, কখনও বা তার ঘরে। কেউ কেউ নাকি এই পাথরের ঘায়ে আহত হয়েছেন। যাঁরা সাহসী তাঁরা অবশ্য পাল্টা পাথর ছুঁড়ে মারেন। আন্দাজেই ছুঁড়তে হয়, কারণ ভূতকে দেখা যায় না।

সিকিমের ভূতরা নাকি মোটেই তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না। তাই সিকিমে ভূতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার সবচেয়ে ভাল উপায় পাথর পড়া শুরু হলেই ছুটে পালানো।

সিকিমে প্রত্যেক ভূতের একটি নিজস্ব আস্তানা আছে—কোন গুহা, বড় পাথর কিংবা গাছ। কেউ যদি সেই গাছটি কেটে দেয়, তাহলে তার মাথা ধরবে। আর কেউ যদি সেই গাছের একখানি ডাল ভেঙে দেয়, তাহলে তার হাতে কিংবা পায়ে ব্যথা হবে।

এই ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় লামাদের জানা আছে। কিন্তু সে প্রক্রিয়াটি বড়ই জটিল। তাই লামারা তাঁদের যযমানদের ভূতের বাড়ি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। এবং সিকিমবাসীরা সাধারণতঃ সে পরামর্শ মেনে চলেন।

আর তাঁদের কথাই বা বলি কেন? এ সংসারে কেই বা স্বেচ্ছায় ভূতের বাড়ি যেতে চায়!

সিকিমে ভূত আছে, অতএব ভূতের রাজাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে কাউকে গুপীর মতো গানের গলা দান করেছে বলে শুনি নি কখনও। তবে সিকিমের ভূত নাকি বাংলার ভূতের মতো ঘাড় মটকায় না। আর তাই ভূতের ভয়ে কারও সিকিম আসতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু এ যে রামায়ণের মধ্যে ভূতের ক্যাঁচ্-ক্যাঁচানি হয়ে যাচ্ছে। ভাবছিলাম লাচেনের কথা আর তার মধ্যে কিনা ভূতের কথা এসে হাজির হল। অবশ্য সিকিমের সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে বসলে ভূতের কথা এসে পড়বেই। কারণ ভূত সিকিমের সমাজজীবনে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে।

তাহলেও ভূতের কথা আর নয়, এবার মানুষের ভাবনায় ফিরে আসা যাক। গতকাল চুংথাং থেকে আসার সময় গাড়িতে বসে লাচেন দর্শনার্থীদের কথা ভাবছিলাম—স্যার জে. ডি. হুকার, শরৎচন্দ্র দাস, ক্লড্ হোয়াইট, মেজর কনার, আর্ল অব্ রোণালড্‌শে, পল্ বওর, বিপ্ পারেস, ডেভিড ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও উইলফ্রিড নঈস-এর কথা কিছু ভেবেছি। ভাবতে ভাল লাগছে আমিও তাঁদেরই মতো এই লাচেনে এসেছি এবং তাঁদের অনেকেই আমার মতো এই ডাকবাংলোয় বাস করে গিয়েছেন।

কিন্তু গতকাল বিদেশী অভিযাত্রীদের লাচেন দর্শন সম্পর্কে অনেক কথাই ভাবা হয় নি। ভাবি নি পল্ বওর-য়ের প্রথম লাচেন আগমনের কথা। ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে বওর প্রথম লাচেন আসেন। সেবারে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেষ্টা করেন। এখান থেকেই তাঁরা জেমু হিমবাহে যান এবং ১৪,৩০০ ফুট উঁচু 'গ্রীণ-লেক্'-এর মালভূমিতে মূল শিবির স্থাপন করেন। পরাজিত অভিযাত্রীরা ২০শে অক্টোবর এই ডাকবাংলোয় ফিরে আসেন।

কেন বলতে পারব না তবে ব্যাপারটা বিস্ময়কর। লাচেনে আসা সবচেয়ে বিখ্যাত বিদেশী মানুষটির কথা গতকাল মনে পড়ে নি আমার। তিনি প্রথম সফলকাম এভারেস্ট অভিযানের নেতা স্যার জন হান্ট্। ১৯৩৭ সালে তিনি সি. আর. কুক্-এর সঙ্গে সস্ত্রীক এই ডাকবাংলোয় বাস করে গিয়েছেন। তাঁরা দার্জিলিং থেকে এখানে আসেন এবং এখান থেকে 'গ্রীণ-লেক'-এ যান। কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখানে সমীক্ষা ও পর্বতারোহণ করেন। সেই অভিযানে কুক্ কাঞ্চনজঙ্ঘার 'নর্থ-কল্' পর্যন্ত আরোহণ করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিপ্ পারেস ১৯৩৮ সালে এই ডাকবাংলোয় থেকে গিয়েছেন। তিনি লাচেন সম্পর্কে একটি নূতন সংবাদ পরিবেশন করেছেন। লিখেছেন—লাচেন 'ফিনিশ মিশনের' (ফিনল্যাণ্ড) প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মিশনারীরা নাকি স্থানীয় লোকদের কাপড় কম্বল ও কার্পেট বোনা প্রভৃতি নানা কুটিরশিল্প শিক্ষা দিতেন। লাচেনে বেশ ভাল আপেল হয়। কালিম্পং ও দার্জিলিঙে সেই আপেলের তখন খুব ভাল বাজার ছিল। তাই মিশনারীরা গ্রামবাসীদের আপেল-সংরক্ষণ শিক্ষা দিতেন।

বিপ্ পারেস লিখেছেন গ্যাংটক থেকে লাচেন আসার পথে তিনি মাত্র পাঁচটি 'মাইল-পোস্ট্' দেখেন। সেই পঞ্চম পোস্ট্‌টি এই ডাকবাংলোর সামনে প্রোথিত

ছিল। তিনি তাঁর বইতে লাচেন গুম্ফার কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, গুম্ফার অনতিদূরে সিকিমের বৃহত্তম প্রার্থনা-চক্রটি স্থাপিত।*

পারেস তাঁর বইতে লাচেন গুম্ফার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি গুম্ফার আকর্ষণে এখানে আসেন নি। তিনি থাঙ্গু যাবার পথে লাচেন এসেছিলেন।

কেবলমাত্র গুম্ফা দেখার জন্য লাচেন এসেছেন উইলফ্রিড নঈস। তিনি চুংথাং থেকে লাচুং যান, সেখান থেকে থাঙ্গু হয়ে লাচেন আসেন। গুম্ফা দেখার জন্য তাঁর এখানে সকাল-সকাল এসে পৌঁছবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। পথের দুর্গমতার জন্য তাঁর এখানে পৌঁছতে বিকেল সোয়া তিনটে বেজে যায়। বিকেল সাড়ে ছটা নাগাদ তিনি সঙ্গীদের নিয়ে গুম্ফায় ওঠেন। পথটা ছিল যেমন চড়াই, তেমনি কাদা। প্রথমেই তাঁরা অতিকায় প্রার্থনা-চক্র দর্শন করেন। চক্রটি রঙীন এবং অসংখ্য প্রার্থনা মন্ত্র খোদিত।

তারপরে তাঁরা মূল গুম্ফা দর্শন করেন। সেটি বেশ বড় এবং বর্গ-ক্ষেত্রাকার মন্দির। চারিদিকের দেওয়ালের সঙ্গে কাঠের আলমারী—কাপ-ডিশ এবং বইতে বোঝাই। আর মূর্তি—মূল মন্দিরে এবং তার দোতলায়। মূর্তিগুলো প্রায় সবই ভয়ঙ্কর। তাই নঈস তাড়াতাড়ি মন্দিরে দুটি টাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এই ডাকবাংলোয়।

সেদিন তাঁরা খুবই ক্লান্ত ছিলেন। তাই সন্ধ্যের পরেই খেয়ে নিয়ে নঈস শুয়ে পড়েছিলেন। এমনকি আগাথা ক্রিস্টি-র একখানি উপন্যাস ডাকবাংলোর টেবিলে পড়ে থাকতে দেখেও সেখানি হাতে নিতে পারেন নি।

এখন আর ঠিক সে গুম্ফা নেই। সরকার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। নূতন গুম্ফা তৈরি হচ্ছে। আমার এখনও দেখা হয়ে ওঠে নি। আগেই বলেছি গুম্ফটি উপত্যকার সবচেয়ে প্রকাশ্য এবং গ্রামের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত। গুম্ফায় উঠবার পথটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছি সুশান্তবাবুদের। তাঁরা নেমে আসছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। ঘড়ি দেখি, একটা বাজে। অমূল্যদেরও ফিরে আসার সময় হয়ে এলো। এবারে ওদিকে যাওয়া যাক।

কিচেনে আসি। বীরেন বলে, "কোথায় গিয়েছিলেন?"

মৃদু হেসে উত্তর দিই, "কোথাও নয়, বাংলোর পেছনে বসে লাচেনকে দেখছিলাম, আর তার কথা ভাবছিলাম।"

"এদিকে আমরা আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।" বীরেনও হাসে। বলে, "রান্না শেষ। এবারে খাবার কি করবেন?"

"ওদের প্যাকিং হয়ে গিয়েছে?"

"না। এখনও দু-তিন ঘন্টা লাগবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"তাহলে ওদের খাবার দিয়ে দে, সুশান্তবাবুরাও আসছেন। অমূল্যরা এলে আমরা বসে।"

একটু বাদেই সুশান্তবাবুরা আসেন। আমি অসিতবাবু ও বীরেন ছাড়া সবাই খেতে বসে।

---

* 'Himalayan Honeymoon'

খেতে খেতে সুশান্তবাবু বলেন, "আবহাওয়া ভাল, সুন্দর গ্রাম—ছবি আশা করি ভালই হয়েছে। তাছাড়া এ তো আমার চেনা জায়গা। আপনারা জানেন ১৯৬৪ সালে আমি অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভের ছবি তুলতে এখানে এসেছিলাম। সেবারে অবশ্য মুভি ক্যামেরা আনি নি...."

আমরা মাথা নাড়ি। সুশান্তবাবু বলে যেতে থাকেন, "শুধু গ্রামের দৃশ্য নয়, লাচেনবাসীদের জীবনযাত্রার কিছু ছবিও নিয়েছি, যেমন—মেয়েদের চুল বাঁধা, ছেলেদের জুয়াখেলা আর স্কুলের সামনে ছোটদের খেলাধূলা। কেবল আপসোস রয়ে গেল, গুম্ফার ছবি তুলতে পারলাম না।"

"কেন?"

"তুলতে দিল না।"

"কারণ?" অসিতবাবু প্রশ্ন করে।

"ওখানে ছবি তোলা নিষেধ। অনেক বোঝালাম লামাজীকে। কিন্তু কোন ফল হল না। তাঁর আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।"

"আর তা করাও উচিত হত না।" বীরেন বলে, "এসব ব্যাপারে এঁরা ভীষণ গোঁড়া।" .

মনটা খারাপ হয়ে যায়, গুম্ফা লাচেন গ্রামের সবচেয়ে প্রচীন ও বিখ্যাত বস্তু। আমাদের ছবিতে সেই গুম্ফা অনুপস্থিত রয়ে গেল।

সুশান্তবাবু বোধকরি একই কথা ভাবছিলেন। কারণ তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনি চিন্তা করবেন না শঙ্কুবাবু, গুম্ফার ছবি আমি নেবই।"

"কেমন করে?"

"কেন, ডাকবাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে টেলিফোটো লেন্স দিয়ে।"

ওদের খাওয়া শেষ হবার আগেই অমূল্যরা এসে যায়। আমরা কৌতূহলী। অমূল্য নিরাশ স্বরে বলে ওঠে, "শেরপারা এখনও ফিরে আসে নি। আবহাওয়া ভাল নয় বলে ওরা মূল শিবিবে বসে আছে।"

"এতদিন! ওরা তো গিয়েছে প্রায় এক মাস!"

"হ্যাঁ।" অমূল্য বলে "দরকাব হলে ওরা আরও এক মাস থাকবে। ওদের লীডার মেজর শেরপা আমার বন্ধু। সে খালি হাতে ফিরে আসার মানুষ নয়।"

"শঙ্কুদা ভুলে যাচ্ছেন কেন, ওঁদের তো আমাদের মতো বেসরকারী পর্বতাভিযান নয় যে দিন গুণে পাহাড়ে থাকতে হবে নইলে খাবার ফুরিয়ে যাবে, টাকায় টান পড়বে।" হিমাদ্রি বলে, "ওঁরা গিয়েছেন সরকারী অভিযানে, যতদিন প্রয়োজন অপেক্ষা করে শিখরে আরোহণ করবেন।"

"এখন আমরা কি করব?" অমূল্যকে জিজ্ঞেস করি।

"আমরা আগামীকাল সকালে যাত্রা করব।"

"কিন্তু শেরপা যে পাওয়া গেল না?"

"না পেলেও যেতে হবে বৈকি।"

"সোনাম ওয়াঙ্গিল যে তোকে লিখেছেন—'Some experienced High altitude Sherpas should be engaged to reconnitor the routes above the Base Camp'."

"আমরা তো engage করেছিলাম শম্ভুদা।" অমূল্য কিছু বলতে পারার আগেই বীরেন বলে ওঠে, "দেড় মাস আগে টাকাসহ হিমাদ্রিকে দার্জিলিং পাঠিয়ে আমরা শেরপা book করেছি। শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা তেনজিং-কন্যা মিসেস পেম্‌পেম্‌ চিঠি লিখে booking confirm করেছেন। অথচ শেষ পর্যন্ত আমরা শেরপা পেলাম না।...."

"কিন্তু এই না-পাওয়ার জন্যই তো এখান থেকে ফিরে যেতে পারি না।" অমূল্য কথা বলে এতক্ষণে। বলে, "শেরপা ছাড়া সিনিয়লচুর আরোহণ খুবই কঠিন। তবু আমরা এগিয়ে যাবো, সিনিয়লচু পদপ্রান্তে পৌঁছব, তাকে প্রাণভরে দর্শন করব। তারপরে তার শিখরে আরোহণ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব। আবহাওয়া ভাল পেলে আমরা সফলকাম হতে পারি বৈকি, নিশ্চয়ই পারি। আর প্রকৃতি যদি একান্তই বিরূপ হন, তাহলে বিদায়বেলায় সেই পরমসুন্দরকে প্রণাম করে বলব—আবার আসিব ফিরে।"

ছয়

সকাল সাতটায় কন্‌ট্রাক্টর মালবাহকদের নিয়ে এলো। গতকাল রাতে পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে তার সঙ্গে আমার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ সকালে আমাকে তার চল্লিশজন কুলি দেবার কথা।

কন্‌ট্রাক্টর এসে সেলাম করে। যথারীতি বলে, "সাব্‌, একটু দেরি হয়ে গেল।" একটু থামে তারপরে আবার বলে, "পাঁচজন কম এনেছি। তারা আজ যেতে পারবে না, কাল যাবে।"

তার মানে আমরাও সবাই আজ যেতে পারব না। সেই পাঁচজন কুলির মাল গুছিয়ে দেবার জন্য কাউকে আজ থাকতে হবে এখানে। কে থাকবে?

কিন্তু অমূল্য সেকথা জিজ্ঞেস করার আগেই অসিত মৈত্র বলে ওঠে, "আমি আর সাঙ্গো এখানে থাকছি। অবশিষ্ট মাল নিয়ে আমরা কাল সকালে রওনা হব।"

ওকে একা এখানে ফেলে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু একজনকে তো থাকতেই হবে। অসিত অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। সে থাকলে আমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারব। অতএব অমূল্য তার প্রস্তাব মেনে নেয়।

'মেট' অর্থাৎ সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় কন্‌ট্রাক্টর। পঞ্চায়েত প্রধানের যুবক পুত্র, নাম সাঙবা। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর দেখতে। ভারী হাসি-খুশি ছেলেটি। বয়স বছর পঁচিশ।

মালবাহকদের মধ্যে সাতজন যুবতী ও একজন কিশোর। কিশোরটির সঙ্গে তার দাদা ও বাবা যাচ্ছে আর মেয়েদের সঙ্গে স্বামী কিংবা কোন আত্মীয় রয়েছে।

তা থাক গে। বিপদসঙ্কুল পথ। আপনজন সঙ্গে থাকাই ভাল। কিন্তু এরা কি ঐ দুর্গম পথে পঁচিশ কিলো মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

কথাটা কন্‌ট্রাক্টরকে জিজ্ঞেস করি। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "ঘাবড়াবেন

না সাব্! দরকার হলে এরা আপনাকে পিঠে নিয়ে পৌঁছে দেবে।"

হিমালয় রক্ষা করুন! তার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। তাই বলে কন্ট্রাক্টরের আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারি না। কিন্তু আর মেয়েদের কিংবা কিশোরটির প্রসঙ্গ তুলি না। তুললে তো লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হবে। এমনিতেই কুলি কম, আরও যদি আটজন কমে যায়, তাহলে যে আজ যাওয়াই যাবে না।

রুটি তরকারী ও চা দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে হ্যাভারস্যাক্ কাঁধে বেরিয়ে আসি বাইরে। হ্যাভারস্যাক্ শুধু সুশান্তবাবু ও আমার, অন্যান্য সবার রুক্‌স্যাক্। পর্বতারোহী সদস্যরা প্রায় পঁচিশ কিলো করে মাল বইছে।

মালবাহকরা লটারী করে নিজেদের মাল ঠিক করে নিচ্ছে। মেট ও কন্ট্যাক্টর লটারীর বিচারক। লটারীর প্রতি এরা খুবই শ্রদ্ধাশীল। ওজন সমান হলেও সব বোঝার গঠন ও আয়তন এক নয়। ফলে কোন-কোনটি বহন করা অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ। তাই এই লটারীর ব্যবস্থা।

অমূল্য বলে, "কুলিদের রওনা হতে এখনও কিছু দেরি হবে। আমরা তো রয়েছি, তোমরা এগিয়ে যাও না। ৬ কিলোমিটার এই রকম ভাল রাস্তা, সেখানে একটা পুল আছে। পুলের গোড়ায় অপেক্ষা করো, আমরা এসে যাবো।"

অতএব আমরা মানে বয়স্ক অথবা দুর্বল সদস্যরা—সুশান্তবাবু, সাংবাদিক, অসিতবাবু, বীরেন, শরদিন্দু, ডাক্তার এবং আমি বেরিয়ে আসি পথে। ডাকবাংলোর সামনে পথের দুধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকে—মিঃ রায় ও তাঁর সহকর্মীরা, চৌকিদার, কালু ও প্রধান সহ গাঁয়ের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বহু নর-নারী ও শিশু। তাঁদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায় নিই অসিত ও সাঙ্গোর কাছ থেকে। তারপরে প্রণাম জানাই গুম্ফার উদ্দেশে। লাচেনের ইষ্ট-দেবতাকে প্রণাম করে বলি—তুমি আমাদের সহায় থেকো ঠাকুর! আমরা যেন সফলকাম হই, সবাই নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারি।

সুন্দরের অভিসারে শুরু হল আমাদের পদযাত্রা। এখন সকাল আটটা। আজ ১৭ই মে, ১৯৮০।

পাথর বাঁধানো পথ। মোটর চলে না। কিন্তু তেমন ড্রাইভার হলে জীপ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এখন সামান্য চড়াই। কিন্তু সামনে উৎরাই দেখতে পাচ্ছি। চড়াই উৎরাই নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছি না। বিচলিত বোধ করছি গোবর আর কাদার জন্য। গরু-ঘোড়ার বিষ্ঠা, মাটি আর বৃষ্টির জল—মিলে-মিশে পথকে যেমন নোংরা তেমনি পিচ্ছিল করে তুলেছে।

গ্রাম ছাড়িয়ে এসে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হল। এখনও কাদা রয়েছে, তবে জৈবিক সারের ভাগটা কমেছে।

গাঁয়ের বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে এসেছি। শুধু তাই নয়, পথের বাঁকে পাহাড়ের আড়ালে লাচেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পথের ডানদিকে অনেক নিচে নদী আর বাঁদিকে বনময় পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ফার্ন ও ফুল—নানা রকমের নানা রঙের ফুল। নদীর ওপারেও এমনি গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। তবে সেগুলো আরও খাড়া এবং অনেক উঁচু।

ফুল দেখতে দেখতে আর নদীর কলগান শুনতে শুনতে আমরা চলেছি এগিয়ে। ফুল কাছে, নদী দূরে। নদীর নাম লাচেন চু। কিন্তু আমার কাছে তিস্তা, শুধুই তিস্তা। শৈশবসাথী তিস্তার পাশে-পাশে পদচারণা করছি আমি। আমি চলেছি তার উৎসে—জেমু হিমবাহে। সেখানেই দেখা হবে সিনিয়লচুর সঙ্গে—চলেছি সুন্দরের অভিসারে।

ডাকবাংলো থেকে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আমরা লাচেন চু-য়ের জন্মস্থানে এলাম। থাঙ্গু চু ও জেমু চু মিলিত হয়েছে এখানে। মিলিতধারার নাম লাচেন চু।

থাঙ্গু চু এসেছে আমাদের উল্টোদিক অর্থাৎ উত্তর থেকে, আর জেমু চু বাঁ দিক মানে পশ্চিম থেকে। আমরা এখন উৎরাই বেয়ে জেমু চু-য়ের বেলাভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। ওখানে পৌঁছে পুল পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। তারপরে জেমু চু-য়ের বাঁ-তীর ধরে পশ্চিমে এগোতে হবে।

সকাল সাড়ে ন'টার সময় অর্থাৎ ডাকবাংলো থেকে দেড় ঘণ্টা হেঁটে আমরা পুলের ওপর পৌঁছলাম। বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি বলা যেতে পারে। কারণ এই দেড় ঘণ্টায় ৬ কিলোমিটার হেঁটেছি। উৎরাই হলেও পেছল পথ, সাবধানে চলতে হয়েছে।

পুল পেরিয়ে এলাম। এখানে একফালি পাথুরে সমতল। তারপরেই একদিকে পাহাড় আরেকদিকে বন। আমরা লাচেন থেকে যে পথ দিয়ে এখানে এলাম, সে পথটি সমতলটুকু পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছে। এটাই থাঙ্গু গ্রামের পথ। এই পথেও জেমু হিমবাহে পৌঁছনো যায়। গতবছরের সিনিয়লচু অভিযাত্রীরা এই পথেই মূল শিবিরে গিয়েছিলেন।

আমরা ওপথে যাবো না। কারণ ওপথে মূল শিবিরে পৌঁছতে সাত-আটদিন লেগে যাবে। এত কুলিভাড়া দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। তাই আমরা যাবো জেমু চু-য়ের তীরে তীরে পাথর আর বরফের ওপর দিয়ে। বনময় দুর্গম পথ পেরিয়ে আমাদের পৌঁছতে হবে মূল শিবিরে। এ পথটি খুবই কষ্টকর এবং বিপজ্জনক। তবু আমরা এই পথ বেছে নিয়েছি, কারণ মাত্র তিনদিনে মূল শিবিরে পৌঁছে যাবো। থাঙ্গুর পথে গতবারের অভিযাত্রীদের মূল শিবিরে যেতে ন'দিন সময় লেগেছিল।

আগেই বলেছি পাথুরে সমতলের একদিকে পাহাড় আরেকদিকে বন। সমতল থেকে একটি পায়ে-চলা পথ বনের ভেতর ঢুকে মিলিয়ে গিয়েছে। এটাই আমাদের পথ।

কিন্তু আমরা এখুনি বনে প্রবেশ করব না। অমূল্যরা আসুক। তারপরে এক-সঙ্গে বনযাত্রা শুরু করা যাবে।

তাছাড়া এর পরেই তো পাথর আর জোঁকের জগতে পদচারণা শুরু হবে। সুতরাং এখানে একটু বসে নিলে মন্দ হয় না। যেমন অমূল্যদের জন্য অপেক্ষা করা হবে, তেমনি তাকিয়ে তাকিয়ে একটু থাঙ্গুর পথটি দেখে নেওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা সহযাত্রীদের পছন্দ হয়। অতএব একখানি পাথরের ওপরে বসে পড়ি। বসে বসে থাঙ্গুর পথটিকে দেখি আর ভাবি—

লাচেন থেকে থাঙ্গু যাবার এই একটাই পথ। প্রথম পড়বে গোফা নামে একটি ছোট জায়গা। উচ্চতা ১০,০৩২ ফুট। তারপরে সামডং, একটি ছোট গ্রাম—শীতকালে

কেউ থাকে না। উচ্চতা ১১,১৫৪ ফুট। সামডঙে একটা পুল পেরোতে হয়। আর এই পুলের জন্যই গ্রামের নাম সামডং। সামডং শব্দের অর্থ পুলের ধারে বসতি।

থাঙ্গুতে কোন স্থায়ী বসতি নেই। কিন্তু একটি গুম্ফা এবং বিশ্রামগৃহ রয়েছে। এ বিশ্রামগৃহটিও বৃটিশদের তৈরি। বহু প্রখ্যাত পর্বতারোহী সেখানে বাস করেছেন। সেকালে পর্বতারোহীদের কাছে থাঙ্গু খুবই জনপ্রিয় ছিল। একালেও অনেকে থাঙ্গু বেড়াতে যান। আমাদের যাওয়া হল না। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য আমরা অন্য পথে সিনিয়লচুর পাদদেশে পৌঁছব।

গত বছরের সফলকাম সিনিয়লচু অভিযাত্রীরা কিন্তু মূল শিবিরে যাবার পথে থাঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ পথে যাবার কারণ তাঁরা ঘোড়াব পিঠে মাল নিয়ে গিয়েছেন। আমাদেরও অনেকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তা মেনে নিতে পারি নি।

হিমালয়ের দুর্গম পথে ঘোড়া বা খচ্চর সবচেয়ে সুলভ পরিবহন। তবু আমরা কুলি নিয়েছি। কারণ গতবছরের অভিযাত্রীদের ঐ পথে মূল শিবিরে পৌঁছতে ন'দিন সময় লেগেছিল। আর এই পথে আমরা তিনদিনে মূল শিবিরে পৌঁছতে পারব বলে আশা করছি।

সময় তিনগুণ লাগলেও পথ কিন্তু তিনগুণ নয়। এমন কি দ্বিগুণও নয়। থাঙ্গুর পথে মূল শিবির ৭২ কিলোমিটার আর আমাদের হাঁটতে হবে ৪৫ কিলোমিটারের মতো। দূরত্বের জন্য নয়, বরফের জন্যই গতবছরের অভিযাত্রীদের পৌঁছতে এত সময় লেগেছিল।

থাঙ্গু থেকে মূল শিবিরে যেতে হলে তিনটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হয়। প্রায় জুন মাস পর্যন্ত সেগুলো তুষারাবৃত থাকে। তাই তাঁদের অত দেরি হয়েছিল। ফেরার পথে অবশ্য তাঁরা আমাদের পথে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু সেই যাত্রাপথের কথা ভাবার আগে অভিযাত্রীদের কথা ভেবে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি এভারেস্ট বিজয়ী প্রখ্যাত পর্বতারোহী সোনাম ওয়াঙ্গিল সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন।

সোনামের বহুকালের আশা তিনি সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করবেন। ভারত সরকার তাঁদের এই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেছেন। অভিযানে আসার আগে তিনি বম্বের এক সমীক্ষকদলের কাছ থেকে কিছু ফটো সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, অভিযানের আগে আকাশপথে সমীক্ষা করারও একটা সুযোগ পেয়ে যান। সোনাম বলেছেন, এই সমীক্ষা থেকে তিনি খুবই উপকৃত হয়েছেন। ওঁদের ছিল সরকারী অভিযান। সুতরাং আমাদের মতো আর্থিক অসুবিধা কিংবা সাজ-সরঞ্জাম ও খাবার-দাবারের কোন অভাব ছিল না। অভিযাত্রীরা ২৪শে এপ্রিল গ্যাংটকে সমবেত হন এবং ২৭শে লাচেন আসেন।

২৯শে এপ্রিল তাঁরা লাচেন থেকে পদযাত্রা শুরু করেন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় থাঙ্গু পৌঁছান। পৌঁছবার পরে শুনতে পেলেন, পরদিন তাঁদের যে ১৬,১১০ ফুট উঁচু লুগ্‌নাক লা (গিরিবর্ত্ম) পেরিয়ে যেতে হবে, সেটি শীতের তুষারে তখনও অগম্য হয়ে আছে। তাই পরদিন তাঁদের পথ তৈরি করতে হয়। আর তারপরে

সহসা আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। ফলে আরও দুটি দিন নষ্ট হয়ে যায়।

৩রা মে সকালে আবার শুরু হয় পদযাত্রা। লাচেন থেকে থাঙ্গু পর্যন্ত তাঁরা উত্তরে এগিয়েছেন, এবারে সোজা পশ্চিমে পদযাত্রা। প্রথমেই তাঁরা একটা কাঠের পুলের ওপর দিয়ে থাঙ্গু চু বা তিস্তার মূল ধারা অতিক্রম করলেন। এই পুলটির উচ্চতা ১২,৫৮০ ফুট। তারপরে তাঁরা লুগ্‌নাক লা-র (গিরিবর্ত্মের) পাদদেশে পৌঁছলেন। হাঁটু সমান বরফ ভেঙে তাঁদের গিরিবর্ত্মে আরোহণ শুরু করতে হল। ১৫,৫১০ ফুটে তাঁরা একটি গুহা দেখতে পেলেন। জায়গাটির নাম শামী থাকুং। স্থানীয়রা এই গিরিবর্ত্ম পেরোবার সময় এখানে রাত্রিবাস করে থাকেন। অভিযাত্রীরাও সেখানে একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলেন। তারপরে আবার আরোহণ আরম্ভ করলেন।

লুগ্‌নাক লা থেকে নামার সময় ১৫,২১৩ ফুট উঁচুতে একটি রমণীয় হ্রদ দেখতে পেলেন। তারপরে বরফ ভেঙে নেমে এলেন মগোথাং—একটি ছোট সীমান্ত গ্রাম। সেদিন তাঁদের ১৮ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে।

মগোথাঙে শ'খানেক তিব্বতী বাস্তুত্যাগী বাস করে। চীনের তিব্বত অধিকারের পরে তাঁরা দেশত্যাগী হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে কিছু চাষের জমি আছে। তিব্বতীরা চাষ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মাল নিয়ে সব ঘোড়া একদিনে গিরিবর্ত্ম না পেরোতে পারায় অভিযাত্রীদের এখানে একদিন বসে থাকতে হয়।

৫ই মে সকালে তাঁরা পুক্‌চাং (১৪,৮১৭) যাত্রা করেন। পথে তাঁরা উত্তরদিকে চোর্তেন নিয়ামা এবং পশ্চিমদিকে জংসং ও লোনাক্ শৃঙ্গের অপরূপ দৃশ্য দর্শন করেন। শরৎচন্দ্র দাশ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁর প্রথম তিব্বতযাত্রায় জংসং গিরিবর্ত্ম (২০,০৮০) অতিক্রম করে নেপাল থেকে সিকিমের লোনাক্ উপত্যকায় আসেন এবং ১৯,০৩৭ ফুট উঁচু চোর্তেন নিয়ামা লা অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেন।

পুক্‌চাং একটি প্রশস্ত ও অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকা। দৈর্ঘ্যে ৪ কিলোমিটার ও প্রস্থে ২ কিলোমিটার। এটি চোর্তেন নিয়ামা পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে ল্যাংবো চু। শুধু তাই নয়, কয়েকটি রমণীয় জলাশয়ও রয়েছে।

ল্যাংবো চু এবং লোনাক্ চু একই নদী। এটি উত্তর-পশ্চিম সিকিমের লোনাক্ হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে জেমু চু-য়ের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আগামীকাল সকালে আমাদেরও এই লোনাক্ চু পেরোতে হবে।

কিন্তু আমাদের কথা থাক, এখন সোনাম ওয়াঙ্গিলের অভিযানের কথা ভাবা যাক। পুক্‌চাং উপত্যকায় প্রচুর থুজা (Thuza) ও অন্যান্য ঔষধী এবং রডোডেনড্রন গাছ রয়েছে। আর আছে খরগোশ (Rabbit)। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তাদের চলাফেরা। তারা সারাদিন সেই সবুজ উপত্যকার বুকে খেলা করে বেড়ায়।

ল্যাংবো চু-য়ের ওপরে কোন পুল নেই। তাই অভিযাত্রীদের পায়ে হেঁটে সেই তুষার-শীতল দুর্বার প্রবাহ পেরিয়ে দক্ষিণে এগোতে হল। কিছুদূর এগিয়ে আরেকটি গিরিবর্ত্ম—নাম থিইউ-লা (Thieu la), উচ্চতা ১৬,৭৬৪ ফুট।

গিরিবর্ত্ম থেকে নেমে এসে একই নামের উপত্যকা থিইউ-লা-চা। উপত্যকাটি

১৭,৩৮৯ ফুট উঁচু তাংচুং খাং (Tangchung Khang) পর্বতের পাদদেশে এবং লুক্কায়িত হিমবাহের (Hidden Glacier) অনতিদূরে অবস্থিত। উপত্যকাটির বুক চিরে থম্‌ফিয়াক চু (Thomphyak Chu) নামে একটি নদী বয়ে গিয়েছে। এই নদীটিও দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে গিয়ে জেমু চু-য়ে পড়েছে। আর সেখানেই আমাদের পথের সবচেয়ে রমণীয় উপত্যকা জাক্‌থাং। কিন্তু আমাদের পথের কথা এখন নয়, এখন সোনাম ওয়াঙ্গিলের পথের কথা ভাবা যাক।

থিইউ-লা-চা উপত্যকাটিও বনসম্পদে সমৃদ্ধ। সেখানে প্রচুর জুনিপার, থুজা ও রডোডেনড্রন জন্মায়। অভিযাত্রীরা সেখানে রাত্রিবাস করেন।

তাংচুং লা নামে একটি গিরিবর্ত্মও আছে। আর থাঙ্গু থেকে সিনিয়লচু-য়ের পাদদেশে পৌঁছতে হলে সেটিও পেরোতে হবে। তবে এটি শেষ বড় বাধা। হাজারখানেক ফুট লম্বা এই গিরিবর্ত্মটি বছরের অধিকাংশ সময় তুষারাবৃত থাকে। তাই কোমল তুষার পরিষ্কার করে গিরিপথটিকে ঘোড়া চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য সোনামকে থিইউ-লা-চা উপত্যকায় আরও একদিন থাকতে হয়েছিল।

অভিযাত্রীরা সেই গিরিবর্ত্মের ওপর থেকেই প্রথম সিনিয়লচুর দর্শন লাভ করলেন। সেই পরম-মুহূর্ত প্রসঙ্গে সোনাম ওয়াঙ্গিল লিখেছেন—'A fantastic sight it was and made our souls jolt with joy. It looked as if, some master sculptor had chiselled it out of rock and ice to make a gift to the wild gods of Himalayan wilderness',

সিনিয়লচুকে দেখতে দেখতে অভিযাত্রীরা তাংচুং লা পেরিয়ে নেমে এলেন নিচে, একেবারে জেমু চু-য়ের তীরে। তারপরে নদীর ডান তীর ধরে সোজা পশ্চিমে চলতে শুরু করলেন। এবং গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে জেমু হিমবাহ ও সিনিয়লচু হিমবাহের সঙ্গমে পৌঁছলেন। সেখানেই তাঁদের মূল শিবির স্থাপিত হয়েছিল।

আমাদেরও সেখানেই মূল শিবির স্থাপন করতে হবে। অতএব আর ওঁদের ভাবনা নয়, এবারে নিজেদের ভাবনা ভাবা যাক।

এতক্ষণ থাঙ্গু আর সিনিয়লচুর ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম। তাই খেয়াল হয় নি এবারে দেখতে পাই ওদের—অমূল্য হিমাদ্রি বিনীত কেশব ও অরুণ সারি বেঁধে নেমে আসছে পুলের ওপরে। কুলিদেরও দেখতে পাচ্ছি ওপরে। অতএব উঠে দাঁড়াই।

ওরা আসে। অমূল্য বলে, "চলো।"

"তোরা একটু জিরিয়ে নিবি না?"

অমূল্য একটু হাসে, বলে, "শঙ্কুদা! আমার সঙ্গে যারা এসেছে তারা সবাই 'ট্রেনড্ মাউন্টেনীয়ার'। এই পথ পেরিয়েই যদি তাদের জিরোতে হয় তাহলে আর পর্বতারোহণ করতে হবে না। তবে আমরা একটু দাঁড়াবো এখানে। কুলিরা আসুক, ওরা আগে যাবে। কেশব তিনজন হ্যাপ্‌কে নিয়ে ওদের সঙ্গী হবে। সুশান্তদা ও অসিতদা বরং ততক্ষণ ছবি তুলে নাও।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুলিরা এসে যায়। সবার শেষে আসে মেট—সদাহাস্যময় যুবক। সে সবাইকে অভিবাদন করে। তারপর বলে, "হামলোগ চলতে হ্যায় সাব্,

আপলোগ ভি আইয়ে।”

আমরা মাথা নাড়ি। ওরা সারি বেঁধে বনপথে এগিয়ে চলে। আমরা ওদের অনুসরণ করি।

বন এখানে খুব গভীর নয়, কিন্তু বনপথে বড়-বড় পাথর। পাথরের গায়ে শেওলা আর বনের ঝোপে ও ঘাসে জোঁক। কিছুক্ষণ আগেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তাই রক্তপায়ী কৃমির দল এখন সজাগ। সিকিমের জোঁক খুবই কুখ্যাত। মানুষের রক্ত যে এরা কত ভালোবাসে, গতকাল লাচেনে বসে বহুবার তার নমুনা পেয়ে গিয়েছি। সুতরাং পায়ের দিকে প্রখর নজর রেখে পথ চলতে হচ্ছে।

মাঝে মাঝে অবশ্য অন্যমনস্ক হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। পথের পাশে পাশে ফুটে আছে নানা রকমের ছোট-বড় ফুল। তারা বাতাসে দুলছে। আমি পথ চলতে চলতে চেয়ে চেয়ে তাদের দেখছি আর নদীর কলগান শুনছি।

সহসা একটা সমবেত ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। নদীর কলগান আর সেই ঘণ্টাধ্বনি মিলে মিশে এক বিচিত্র-সুন্দর ঐক্যতানের সৃষ্টি করেছে। আমি কান পেতে শুনি, শুনি আর শুনি।

তারা আসে। একপাল চমরী গাই এবং ঘোড়া কাঠ আনতে বনে গিয়েছিল। এখন গাঁয়ে ফিরছে। উঁচু-নিচু পথ চলার তালে তালে তাদের গলার ঘণ্টা বাজছে।

ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু বাদে ঘণ্টাধ্বনিও যায় হারিয়ে। জেগে থাকে শুধুই নদীর কলতান।

সকালে আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। এদিকে বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। এখন কিন্তু বেশ চড়া রোদ। রীতিমত গরম লাগছে। ফুলহাতার সোয়েটার খুলে হ্যাভারস্যাকে ভরে নিই।

পথের দু-দিকেই বড় বড় কাঁটাগাছ। সামান্য চড়াই-উৎরাই, মাটি ও পাথরের উঁচু-নিচু সংকীর্ণ পথ। পথের পাশে নদী। জেমু চু-য়ের পাশে-পাশে পথ চলে আমরা উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছি।

শুধু ফুল নয়, ফলও রয়েছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফলে আছে অসংখ্য স্ট্রবেরী—গোল গোল লাল ছোট ছোট ফল। চুষলে রস বের হয়, টক লাগে। আমরা মাঝে মাঝে চুষছি। তৃষ্ণা মিটছে।

ঘণ্টাখানেক বনপথ পেরিয়ে এখন নদীর বেলাভূমিতে নেমে এসেছি। এখানে গাছপালা নেই। শুধুই পাথর। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে নদীর তীর দিয়ে পথ চলেছি। নদী এবং পথ প্রায় সমান্তরাল। নদী নাচতে নাচতে নিচে নামছে আর পথ ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে। নদীর নাচ দেখতে দেখতে আর গান শুনতে শুনতে আমরা চড়াই ভাঙছি।

নদীর ওপারে পাহাড়ের সারি। সবুজ পাহাড়। না, শুধু সবুজ নয়, রঙীন ফুল ফুটে আছে মাঝে-মাঝে। আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় সাদা বরফ। তারা নদীতে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

শুধু বরফ নয়, ওপারে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা নেমে এসেছে—অনেক উঁচু থেকে। ওপরদিকে একটি ধারা কিন্তু নিচে নেমে বহু-ধারায় বিভক্ত হয়ে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ছে।

কাঠের পুল থেকে ঘণ্টা দেড়েক হেঁটেছি। এখন বেলা এগারোটা। তেমনি চকচকে রোদ রয়েছে চারদিকে। চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

এবারে চলা থামাতে হল। গঙ্গোত্রী হিমবাহের 'স্নাউট' গোমুখী—ভাগীরথীর উৎস। সিকিমে তেমন কোন গোমুখী আছে বলে জানা ছিল না আমার। কিন্তু এ তো দেখছি অবিকল গোমুখী। কেবল তার চেয়ে কিছু ছোট তবে দেখতে গোমুখীর মতো হলেও এটা 'স্নাউট' নয়। এর পিছনে কোন হিমবাহ নেই।

আমাদের সামনে নদীটি সম্পূর্ণ জমে গিয়েছে। নদীর ওপরে সবটা জুড়েই বরফ। সেই বরফের তলা দিয়ে তুষারগলা জলের প্রবাহ দুর্বার বেগে বেরিয়ে আসছে। তারপরেই সেই জলধারা সৃষ্টি করেছে এক অপরূপ জলপ্রপাত। এত জোরে জল পড়ছে যে নদীর বুকে ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। আমি দেখি। চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে বলি—সিকিম! তুমি সুন্দর! অপূর্ব সুন্দর! তাই তো আমরা এসেছি তোমার কাছে। আমরা সুন্দরের অভিসারে চলেছি।

সুশান্তবাবু অসিতবাবু ও শরদিন্দু ছবি নেবার পরে আবার শুরু হয় পথচলা।

আরও সোয়া ঘণ্টা পথ চলেছি। এখন বেলা সওয়া এগারটা। নদী তেমনি যাচ্ছে বয়ে—যাচ্ছে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূবে। তারই তীর বেয়ে আমরা চলেছি বিপরীত দিকে। অর্থাৎ সে যেখান থেকে এসেছে, আমরা সেখানেই চলেছি। চলেছি আমার শৈবসাথী তিস্তার উৎস জেমু হিমবাহে।

ওপারে বড়-বড় বরফের চাঁই নদীর বুক জুড়ে আর এপারে নদীর তীরে বিরাট বিরাট পাথর। পাশের পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে। এখন পড়ছে না, কিন্তু যে কোন সময় গড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ওপরের দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে।

কেবল ওপরে নয়, পায়ের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। একটু এধার-ওধার হলেই হোঁচট খাবো। হোঁচট খেলে নদীর বুকে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে। শ'দুয়েক ফুট নিচে নদী। তাই ওপরে নিচে সমান নজর রেখে সাবধানে চলতে হচ্ছে।

উঠে এলাম পাহাড়ের গায়ে। আবার বনপথ। বন গভীর নয়। গভীর বন অনেক উঁচুতে, পাহাড়ের ওপরে। সেখানে পাইনের সারি। এখানে কাঁটাগাছই বেশি, মাঝে মাঝে রডোডেনড্রন। ফুল নেই তেমন। যা আছে, সবই ছোট ছোট। তবে তা দেখেই দু-চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি নামল। সহযাত্রীরা অনেকে স্যাক্ থেকে ওয়াটারপ্রুফ নামিয়ে গায়ে দেয়। আমার ওয়াটারপ্রুফ নেই। আমি উইণ্ডপ্রুফের হুডটা খুলে মাথায় দিয়ে নিই।

বেশিক্ষণ বৃষ্টি হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রোদ উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যে স্যাঁতসেঁতে পথ আরও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। জোঁকের উৎপাত এবং আছাড় খাবার সম্ভাবনা, দুই-ই বেড়েছে। সুতরাং পায়ের দিকে তেমনি প্রখর নজর রেখে সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে।

এখন বেলা একটা। পাঁচ ঘণ্টার ওপরে রওনা হয়েছি লাচেন থেকে। পথে মাত্র একবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছি।

চলতে চলতে কেবলই ভাবছি—কবে, কখন শেষ হবে নদীর শব্দ, পৌঁছব

জেমু হিমবাহের গ্রাবরেখায়। কিন্তু নদীর শব্দ কানে আসছে তো আসছেই। শব্দটা অবশ্য ভালই লাগছে।

পা দুখানি যে দেহের ভার আর বইতে পারছে না। খিদেও পেয়েছে খুব। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। ওয়াটার-বটলের জল ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। নদী এখন অনেকটা নিচে। ঝরনাও দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্রাম করবার মতো জায়গাও চোখে পড়ছে না।

না, পড়েছে। ঐ তো সামনে একখানি বিরাট পাথর। পাশে একফালি সমতল আর পেছনে পাহাড়ের গায়ে চমৎকার একটি ঝরনা। পাথরখানি ঠিক যেন একখানি বড় ঘর। দু-দিকে পাথরের দেওয়াল আর পাথরের মেঝে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ি সেখানে। মেষপালকদের রাতের আস্তানা এটি। তাদের রান্নাবান্নার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। সঙ্গের খাবার খেলাম। প্রাণ ভরে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটালাম। তারপরে আবার শুরু করি পথচলা।

আরও ঘণ্টাখানেক পাথুরে পথ পেরিয়ে এসেছি। এখন বেলা সওয়া দুটো। নদীর বুকে বরফ দেখছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু এতক্ষণ বরফের ওপরে পদচারণা করার প্রয়োজন হয় নি। এবারে তুষারাবৃত নদীর বুকে উঠে আসতে হল। কুলিরা এই পথেই এগিয়ে গিয়েছে। বরফের ওপরে তাদের সারি সারি পায়ের ছাপ। এটাই পথরেখা। আমরা সেই পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলি।

মাঝে মাঝে শক্ত বরফ। পালা করে আছাড় খাচ্ছি প্রায় সকলেই। কোন ক্ষতি হচ্ছে না। বরং মজা লাগছে। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার মজা, উচ্চ-হিমালয়ে পদচারণার মজা। বছর দুয়েক বাদে আমি আবার বরফে হাঁটছি। সত্যি বড় মজা লাগছে।

বরফ পেরিয়ে নেমে আসি নদীর তীরে। এখানে নদী আবার নদী হয়েছে। বরফ আছে এখানে ওখানে, তবে তারই ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে জলধারা বইছে। বেলাভূমি প্রায় নেই বললেই চলে। পাহাড়ের গা বেয়ে পাথুরে পথ। ডানদিকে খাড়া পাহাড়—পাথর পড়ার জায়গা। যেমন দুর্গম, তেমনি বিপজ্জনক।

ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে সামনে তাকাচ্ছি। আমাদের দু-পাশে পাহাড়ের ঢেউ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ঐ ঢেউ যেখানে শেষ হবে সেখানেই জেমু হিমবাহ। কিন্তু সে যে বহুদূর। এখন আমি জেমুর কথা ভাবছি না, ভাবছি আজকের এই ক্লান্তিকর পদযাত্রা কখন শেষ হবে? বেলা যে তিনটে বেজে গেল।

যাক গে, পাথুরে পথ বোধহয় শেষ হয়ে গেল। উঠে এলাম ঘাস, ফার্ণ আর ছোট ছোট গাছ ও ফুলেভরা সুন্দর একফালি সমতলে। তাহলে কি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড এসে গেল! আসতে পারে। ১৩ কিলোমিটার পথ, সাতঘণ্টার ওপরে হাঁটছি।

কিন্তু একি! কোথায় ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড? এ যে দেখছি আবার তেমনি পাথুরে পথ, তেমনি পাথর পড়ার জায়গা। সেই সবুজ সমতল থেকে আবার নেমে এসেছি এই পাথুরে প্রান্তরে। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পাথর আর পাথর।

পাশেই খাড়া পাহাড়। তার গায়ে অসংখ্য ছোট-বড় পাথর ঝুলে আছে। যে কোন সময় যে-কোন পাথর গড়িয়ে পড়তে পারে আমার ওপরে। তাহলে আর

এ জীবনে সিনিয়লচুকে দেখা হবে না আমার। এ ব্যাপারে আমার কিছু করারও নেই। আমি নিরুপায়। আমি কেবল দেবতাত্মা হিমালয়ের ওপর ভরসা রেখে ক্লান্ত চরণে এগিয়ে যেতে পারি সামনে। তাই যাচ্ছি।

দূর থেকে জায়গাটা সাদা দেখাচ্ছিল। ভেবেছিলাম সাদা ছোট ছোট পাথরে বোঝাই নদীর বেলাভূমি। ভরসা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে পদচারণা করা যাবে।

কিন্তু এখানে পৌঁছে বুঝতে পারছি পাথরের নুড়ি নয়, বরফ। কঠিন বরফ এখানে আবার নদীটাকে ঢেকে রেখেছে। এবং এই তুষারাবৃত অংশটা বেশ বড়। এরই ওপর দিয়ে আবার আছাড় খেতে খেতে যেতে হবে এগিয়ে।

হিমাদ্রি বলে, "জায়গাটা ভাল নয়, Crevasse রয়েছে। আমি আগে যাচ্ছি, আপনারা একসারিতে আমার পেছনে আসুন।"

তাই করি। হিমাদ্রি আইস এক্স ঠুকে ঠুকে আগে আগে পথ চলে। তার পেছনে একে-একে আমি অরুণ ডাক্তার সুশান্তবাবু অসিতবাবু বীরেন ও অমূল্য। কেশব হ্যাপ্‌দের নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে কুলিদের সঙ্গে। শরদিন্দু আমাদের সামনে, সে একা। ওর এমন একা চলা উচিত নয়। একে দুর্গম পথ, তার ওপরে সে অনভিজ্ঞ।

আমাদের পেছনে বিনীত ও রমেনবাবু। তাদের জন্য চিন্তা করছি না। বিনীত একজন অভিজ্ঞ এবং কুশলী পর্বতারোহী।

যাই হোক, একসময় তুষারাবৃত প্রান্তরটি শেষ হয়ে গেল। বরফের নদী আবার জলের নদীতে রূপান্তরিত হল। আমরা উঠে এলাম পাথুরে পথে। এ পথের কি শেষ নেই?

সত্যি তাই। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল পাথর আর পাথর। কিন্তু একি! ডানদিকের খাড়া পাহাড়টা যে দেখছি শেষ হয়ে গেল। এখন সেখানে সুবিশাল বন—নদীর বেলাভূমি থেকে মাত্র শ'খানেক ফুট ওপরে।

আর....হ্যাঁ, তাই তো,....ওখানে যে ধোঁয়া উঠছে! কেউ বা কারা রান্না করছে। তাহলে কি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড এসে গেল? এখানে এখন আমরা ছাড়া আর কে আসবে?

তাহলে কি আজকের মতো এই ক্লান্তিকর পদযাত্রার অবসান হল? তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। এখন বিকেল চারটে।

না, আমাদের শিবির নয়, কুলিদের আস্তানা। আমাদেরই কুলি। একখানা বড় পাথরের নিচে তারা রাতের আশ্রয় নিয়েছে। সামনে আগুন জ্বালিয়েছে।

আমাদের শিবিরও তবে আর দূরে নয়। ওরা সেখানে মাল পৌঁছে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

অসিতবাবু চিৎকার করে সেই কথাই জিজ্ঞেস করে।

ওরা বলে—কেমপু নজদিক হ্যায় সাব! উপার আ যাইয়ে, রাস্তা ইধারসে হী হ্যায়।

তাদেরই নির্দেশমত নদীর খাড়া পার বেয়ে উঠে আসি ওপরে—সুগভীর ও স্যাঁতসেঁতে প্রায়-সমতল বনে। এখান থেকে একটা পায়ে-চলা পথ সামনে প্রসারিত।

পথের পাশে বড় ও ছোট গাছের সমারোহ, ফুল ও ফার্ণের প্রদর্শনী।

সেই পথ দিয়েই কুলিরা এগিয়ে যেতে বলে। আমরা এগিয়ে চলি। পা দুখানি আর চলতে চাইছে না। তবু তাদের নিষ্কৃতি দিতে পারি না।

খুবই স্যাঁতসেঁতে বন। তবে পথে পাথর নেই বললেই চলে। সত্যি বলতে কি আমি এখন মেঠো পথে বনভ্রমণ করছি। পথের পাশে পাশে ফুটে আছে নানা রঙের রডোডেনড্রন আর নানা রকমের ছোট-বড় জানা-অজানা ফুল। তাদের দেখতে-দেখতে পথ চলেছি। তবে সাবধানে চলতে হচ্ছে। কারণ ফুলের সঙ্গে হুল না থাকলেও প্রচুর বিছুটি পাতা রয়েছে। একটা ছোট ঝরনা পেরিয়ে এলাম। কিন্তু আর কতক্ষণ? কতক্ষণ চলতে হবে আমাকে? কুলিরা যখন শিবিরে মাল রেখে ওখানে আস্তানা করেছে, তখন তো শিবির বেশি দূরে হবার কথা নয়! কিন্তু শিবির যে দেখতে পাচ্ছি না! তাহলে কি পথ ভুল হল?

না, পথ ভুল হবে কেমন করে! নদীর ধার থেকে তো বনের ভেতরে এই একটাই পথ এসেছে। আমি সেই পথ দিয়েই এগিয়ে এসেছি। তা ছাড়া অমূল্য ও বীরেন পেছনে আসছে। পথ ভুল হলে ওরা নিশ্চয় আমাকে ডাক দিত?

অতএব এগিয়ে চলি ক্লান্ত চরণে। আর ভাবি—এ বনের কি শেষ নেই?

আছে, নিশ্চয়ই আছে। ঐ তো সামনে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে। তার মানে ওখানে বন নেই। কি আছে? নিশ্চয়ই ফাঁকা মাঠ—ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড, আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। কয়েক পা এগিয়েই সামনে দেখতে পাই—শুধু শিবিরেরই জায়গা নয়, শিবিরও। তাঁবু, আমাদের আশ্রয়—পরমাশ্রয়।

লাল নীল সবুজ হলুদ ও বেগুনী রঙের ছোট ছোট তাঁবু। সব মিলিয়ে আটটি। সবই টু-মেন টেন্ট্। আমরা বারোজন, হ্যাপ্ তিনজন ও মেট। আজ অসিত আসে নি বলে একটা তাঁবু কম টাঙানো হয়েছে।

বনটা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। অনেকখানি প্রায় সমতল ফাঁকা জায়গা। বেশ শুকনো। তবে খুব পরিষ্কার নয়। সর্বত্র বড়-বড় পাতার ছোট-ছোট গাছে বোঝাই। দেখতে অনেকটা পালং শাকের মতো। নাম রুমেক্স। তারই ওপরে তাঁবু খাটানো হয়েছে। এখানে-ওখানে দু-চারখানা বড়-বড় পাথর পড়ে আছে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে তাঁবু পড়েছে। এই জায়গাটির নাম তেলেম্। উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট।

প্রান্তরটির একদিকে একটা ছোট পাহাড়। সেখানে পাথরের আড়ালে কুলিরা অ্যাল্‌কাথিন শীট টাঙিয়ে নিজেদের আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে। আর প্রান্তরের একপাশে পড়ে থাকা একখানা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে মেট 'কিচেন' তৈরি করে ফেলেছে।

আমি ঢালু পথ বেয়ে জঙ্গল থেকে নেমে আসি প্রান্তরে। কেশব দেখতে পায় আমাকে। সে ছুটে আসে কাছে। আমার পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক্ খুলে নিয়ে বলে, "ওয়েল ডান শঙ্কুদা, ইউ আর সেকেণ্ড টু মাইন।"

"তুমি কখন পৌঁচেছো?"

"সাড়ে তিনটেয়।"

ঘড়ি দেখি—সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। তার মানে দশ মাইল পথ আসতে সাড়ে আট ঘণ্টা লেগে গেল। পথ ভাল নয়। তবু বলব খুব বেশি সময় লেগেছে।

কিন্তু ওরা যে এখনও পৌঁছয় নি। বিশেষ করে শরদিন্দু। সে তো আমাদের অনেক আগে ছিল! সেই কথাই জিজ্ঞেস করি কেশবকে।

কেশব বলে, "না তো! শরদিন্দু আসে নি এখনও। বললাম যে সদস্যদের মধ্যে আমার পরে আপনি এলেন।"

চিন্তার কথা। শরদিন্দু তাহলে কোথায় গেল? তার সঙ্গে যে পথে আমাদের দেখা হয় নি। পথ ভুল হয় নি তো! সে এই প্রথম এমন দুর্গম হিমালয়ে এলো।

মেট আর লাক্‌পা চা-বিস্কুট নিয়ে আসে। স্যাক্ থেকে মগ বের করে চা নিই। তারপরে মেটকে বলি, "সাব্‌রা সবাই পেছনে আসছে। কাউকে দিয়ে কিছু বিস্কুট আর এক কেটলী চা পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।"

"জী!" মেট মাথা নাড়ে, "উ লোগ থক্ গিয়া হোগা। ম্যায় যাতা হুঁ।"

সে ছুটে গিয়ে কিচেনে চলে যায়। কয়েক মিনিট বাদেই চা-বিস্কুট নিয়ে আসে। আমাকে সেলাম করে বলে, "ম্যায় যা রহা হুঁ!"

"একটু দাঁড়াও।" আমি বলি। ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলি, "সন্ধ্যে হয়ে এলো, ঘন বন। এটা নিয়ে যাও।"

"ঠিক বোলা সাব্। আভি আন্ধেরা হো যায়েগা। ঠ্যাঙ্ক্ উ।"

আমি ও কেশব ওর কথা শুনে হেসে উঠি। সে আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে হাসতে হাসতে বনের দিকে চলতে শুরু করে।

কেশব আমার তাঁবু দেখিয়ে দেয়। এসে তাঁবুর সামনে বসি। বনের দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকি। সঙ্গীরা না এসে পৌঁছলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বিশেষ করে শরদিন্দুর জন্য দুর্ভাবনাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না।

তবে বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করতে হল না। কিছুক্ষণ পরেই দুজন সহযাত্রী এলো। আর তাদেরই একজন শরদিন্দু, অপর জন অরুণ।

শরদিন্দু অবশ্য খুবই শ্রান্ত। সে ধপ করে বসে পড়ে। তাকে আবার চা-বিস্কুট দিতে বলি।

একটু সুস্থ হয়ে সে বলে, "আমার পথ ভুল হয়েছিল। আমি যে একা একা পথ চলেছি, তাই বরফের জায়গাটায় ভুল করে ওপারে চলে গিয়েছিলাম। পরে দূর থেকে আপনাদের দেখতে পেয়ে ফিরে এসেছি।"

"কাল থেকে তুমি আর এমন একা একা এগিয়ে যেও না, কারও সঙ্গে থেকো।"

সে মাথা নাড়ে। কেশব তাঁবু দেখিয়ে দেয়। অরুণ ও শরদিন্দু তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। আমি ও কেশব সহযাত্রীদের প্রতীক্ষায় বসে থাকি বাইরে।

ওরা আসে একে একে। এবং একসময় সবাই এসে পৌঁছয়। আর তখুনি শুরু হয় শোরগোল—মিলনোৎসব। সবাই নির্বিঘ্নে পৌঁছে গিয়েছি। সুন্দরের অভিসারে আমাদের পদযাত্রার প্রথম দিনটি নিরাপদে অতিবাহিত হল।

আমার তাঁবুর পার্টনার অসিত বসু। বারো বছর বাদে আজ ওর সঙ্গে এক তাঁবুতে রাত্রিবাস করব।

আটষট্টি সালে সতপন্থ অভিযানের পরে আমরা দুজন আর একসঙ্গে হিমালয়ে আসি নি।

অসিতবাবু বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু সে মাউন্টেনীয়ার। আমার চেয়ে

অনেক বেশি কর্মক্ষম এবং স্বাস্থ্যবান। আর নিজের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে সদাই সচেতন। সুতরাং এয়ার ম্যাট্রেস ফুলানো থেকে স্লীপিং ব্যাগ পাতা এবং জিনিসপত্র গোছগাছ করা পর্যন্ত সবই সে নিজহাতে করে ফেলেছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তার আহ্বানের অপেক্ষায় থাকি।

একসময় ডাক আসে। ভেতরে আসি। অসিতবাবু বলে, "রান্না হতে এখনও দেরি আছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। অযথা ঠাণ্ডা লাগিও না। স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ো।"

স্লীপিং ব্যাগে ঢুকতে আপত্তি করার কিছু নেই। আজ একদিনে আমরা আড়াই হাজার ফুটেরও বেশি ওপরে চলে এসেছি, এ যাত্রায় এই প্রথম খোলা মাঠে তাঁবুতে রাত কাটাচ্ছি।

কিন্তু স্লীপিং ব্যাগে ঢুকতে হলেই যে জুতো খুলতে হবে। এই উচ্চতায় বার বার জুতো পরা বড় পরিশ্রমের। রান্না হলে কিচেনে যেতে হবে। এ অভিযানে আমরা ভাল সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি। কিন্তু আমাদের কোন মেস-টেন্ট নেই। তাই সবাইকে কিচেনে গিয়ে খেতে হবে।

সেই কথাই বলি অসিতবাবুকে। সে বলে, "তাহলে তুমি জুতো খুলে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে যাও। আমি তোমার খাবার এনে দেব কিচেন থেকে।"

অর্থাৎ অসিতবাবু কিছুতেই আমাকে বসে থাকতে দেবে না। বাধ্য হয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করতে হয়।

স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে কিন্তু ভাবী আরাম লাগছে। এবারে যে আমরা প্রায় নতুন স্লীপিং ব্যাগ পেয়েছি। এদেশে পর্বতারোহণ যত বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে, সাজ-সরঞ্জাম তত বেশি দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে। দার্জিলিঙের জয়াল মেমোরিয়াল ফাণ্ড ও উত্তরকাশীর ডায়াস মেমোরিয়াল ফাণ্ড-এ এখন ব্যবহার করার মতো সাজ-সরঞ্জাম প্রায় কিছুই নেই। সৌভাগ্যের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর এ বছর থেকে পর্বতারোহণ সাজ-সরঞ্জামের একটি ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। তাঁরাই আমাদের অধিকাংশ সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছেন। আর কিছু দিয়েছেন দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. চৌধুরী।

কেবল স্লীপিং ব্যাগ নয়, তাঁবু থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামই অত্যন্ত ভাল। মনে মনে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বীরেন বাঁশি বাজাচ্ছে। খাবারের ডাক পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। অসিতবাবু বলে, "তোমার আর জুতো পরার দরকার নেই। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।"

কিন্তু আমি তার অনুরোধ উপেক্ষা না করে পারি না। পর্বতারোহণে পদযাত্রার সময় ডিনার শুধু খাবার নয়, সবচেয়ে বড় আড্ডাও বটে।

জুতো পরে টর্চ হাতে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। তার ওপর হাওয়া বইছে। হাওয়া তো নয়, যেন হুল ফোটাচ্ছে।

কিচেনে এসে অবশ্য শীতের হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়া গেল। এখানে কাঠের অভাব নেই। তাই রান্না হয়ে যাবার পরেও দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা তাড়াতাড়ি আগুনের ধারে বসে পড়ি।

মালবাহক কম বলে পর্বতারোহী সদস্যদের সবাইকেই অতিরিক্ত মাল বইতে হচ্ছে।

তার মধ্যে আবার বীরেনের রুক্স্যাক্টা বেশি ভারী হয়ে গিয়েছে। তাই সে পৌঁচেছে সবার শেষে, প্রায় ছ'টায়। তবু সে সব শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে কিচেনে এসে রান্নার তদারকি করেছে। আলু ও পেঁয়াজ দিয়ে নিজেই ডিমের কারী রেঁধেছে। ডাল ভাত ও ডিমের কারী। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম হয়েছে। অথচ ঠিকমত লাঞ্চ খাওয়া হয় নি। এখন বীরেনের রান্নাকে অমৃত মনে হচ্ছে।

উচ্চতাজনিত রোগ বা 'অলটিচ্যুড সিক্‌নেস'-এর একটি হল ক্ষুধামান্দ্য। এখন পর্যন্ত আমাদের সবার খিদে পাচ্ছে এবং আমরা খেতে পারছি, এটা খুবই সুখের কথা।

খেয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ বাদেই 'হট্-ড্রিঙ্কস' অর্থাৎ হরলিক্স আসে। উচ্চ-হিমালয়ে ঘুমোবার ঠিক আগে এই গরম পানীয় বড়ই প্রয়োজনীয়। এতে শীত কমে যায় ফলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।

সুন্দরের অভিসারে এসে প্রথম পদযাত্রার দিনটি নির্বিঘ্নে এবং পরমানন্দে অতিবাহিত হল। দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করি—তুমি আমাদের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো। তোমার আশীর্বাদে আমাদের আগামী দিনগুলিও যেন এমনি আনন্দময় হয়ে ওঠে।

সাত

সকালে উঠেই দুঃসংবাদটা পাওয়া গেল। আর তা নিয়ে এলো আমাদের চিরহাস্যময় মেট অর্থাৎ মালবাহকদের সর্দার শ্রীমান সাঙবা। গতকালই সে বলেছিল এখান থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই লোনাক্ চু—লোনাক্ উপত্যকার জলবিভাজিকা। নদীটা এখানে এসে জেমু চু-য়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমাদের সেই নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভিযাত্রীরা গত বছর এই নদীর ওপরে একটা কাঠের পুল তৈরি করেছিলেন। পুলটা থাকার কথা। থাকলে ভাল। কিন্তু না থাকলে নূতন করে পুল বানাতে হবে। কেমন করে পুল বানাবে বুঝতে পারি নি, তবে কাজটা যে সহজ নয়, তা বেশ অনুমান করতে পেরেছি।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মেট জানালো, তাকে সেই কঠিন কাজটাই করতে হবে। কারণ পুলটি ভেঙে গিয়েছে। সে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে পুল দেখতে চলে গিয়েছিল।

মেট গতকাল পুল বানাবার কথা বললেও, আমরা তেমন আমল দিই নি। হাতুড়ি-বাটালি, কোদাল-শাবল, দড়ি-পেরেক—কিছুই যে নেই আমাদের। মানচিত্রে দেখেছি লোনাক্ চু খুব ছোট নদী নয়। ওরা কেমন করে কি দিয়ে তার ওপর পুল তৈরি করবে?

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না। মেট যখন বলছে পুল বানাবে তখন দেখাই যাক না। জিজ্ঞেস করি, "পুল বানাতে কতক্ষণ লাগবে মেট?"

"দিন ভর লগ যায়গা সাব্!"

"সারা...দিন!"

"জী সাব্! পেড় কাটনা পড়েগা, বাঁশ কাট্‌না হোগা, রস্যি বনানা পড়ে গা, ঔর পত্থর ভী লানা হোগা।"

কি দিয়ে কেমন করে মেট পুল বানাবে জানা নেই আমাদের। জানার দরকারও নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা। পুল বানাতে সারাদিন লাগা মানে একদিনের জন্য অভিযান বন্ধ হয়ে রইল। অনেক টাকা বাড়তি খরচ হয়ে গেল। কুলি ও সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ নিয়ে আমাদের এখন দৈনিক ব্যয় কম করেও হাজার দেড়েক টাকা।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে অসিতবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে আসি। গায়ে অবশ্য উইণ্ডপ্রুফ্‌ রয়েছে। মেটকে নিয়ে লীডারের তাঁবুতে আসি। বীরেনও এখানে আছে। ওরা একই আলোচনা করছিল। মেট আগেই অমূল্যকে খবর দিয়ে গিয়েছে।

অমূল্য জিজ্ঞেস করে, "কি করা যায় বল তো! পুল না বানালে যাওয়া যাবে না। আর বানাতে হলে আজ সারাদিন এখানে বসে থাকতে হবে।"

"বীরেন কি বলছিস?" জিজ্ঞেস করি।

বীরেন বলে, "যদি অন্য কোন ভাবে নদী না পার হওয়া যায়, তাহলে পুল বানাতে হবে।"

"আগে তাহলে নদীর তীর ধরে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে দেখা যাক, পার হবার মতো কোন জায়গা আছে কিনা। না থাকলে পুল বানাতেই হবে—তোমরা কি বল?"

আমরাও মাথা নেড়ে নেতাকে সমর্থন করি। নেতা বলে, "কেশব অরুণ ও বিনীত ওয়াটারপ্রুফ্‌ নিয়ে মেটের সঙ্গে বেরিয়ে যাক। বীরেন ততক্ষণে ব্রেক-ফাস্ট-এর ব্যবস্থা করে ফেল, যদি ওরা এসে কোন সুখবর দেয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারব।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা বেরিয়ে যায়। এখনও বেশ বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু মেট কিছুতেই বর্ষাতি নিল না। ওর পায়ে গামবুট, পরনে পশমী প্যান্ট, গায়ে লেদার জ্যাকেট কিন্তু মাথায় টুপি নেই। চুলগুলো ভারী সুন্দর। সকাল থেকে সমানে ভিজছে। টপ টপ করে মাথা থেকে জল পড়ছে। দেখে মায়া হচ্ছে কিন্তু ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

নেতা আমাদের তৈরি হতে বলেছে। অতএব বৃষ্টি থামতেই তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হল। নিজ নিজ মালপত্র গুছিয়ে 'স্যাক'-এ ভরে নিই। এয়ার-ম্যাট্রেস ও স্লীপিংব্যাগ নওয়াঙকে দিয়ে দিই। ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে ওদের পথ চেয়ে বসে থাকি।

ওরা ফিরে আসে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে। বিনীত বলে, "আবার তাঁবু টাঙাতে হবে।"

"কেন, নদী পার হওয়া যাবে না?" অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

অরুণ উত্তর দেয়, "না।"

কেশব বলে, "পুল বানাতেই হবে।"

"মেট কোথায়?" অমূল্য জিজ্ঞেস্ করে।

কেশব উত্তর দেয়, "কুলিদের খবর দিতে গেছে।"

"সব কুলিরাই কি পুল বানাবে?"

"হ্যাঁ।" কেশব জানায়, "আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

"তাই যাও।" বীরেন বলে, "নিজেদের সঙ্গে থাকা দরকার। তাতে তদারকি যেমন হবে, তেমনি সহানুভূতিও দেখানো হবে। দুটোই প্রয়োজন।"

"আমিও কেশবের সঙ্গে যাচ্ছি।" অমূল্যর দিকে তাকাই।

"তুমি আবার যাচ্ছ কেন?" অমূল্য বলে, "আকাশের যা অবস্থা, যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।"

"নামুক গে।" আমি বলি, "হিমাদ্রি কিংবা অরুণের ছাতা নিয়ে যাচ্ছি। তোর ভয় নেই, আমি ভিজব না, আমার ঠাণ্ডা লাগবে না।"

নেতা আর কোন আপত্তি করে না।

কয়েক মিনিট বাদেই মেট তার দলবল নিয়ে হাজির হয়। মেয়ে কুলিরাও এসেছে দেখছি।

সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ও কেশব মেটের সঙ্গে চলতে শুরু করি। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড ছাড়িয়ে আবার বনভূমি। তারপরে পর পর দুটি নালা পেরিয়ে একটা বৃক্ষহীন প্রস্তরময় রুক্ষ প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে নদী।

বনে এসে মেট বলে, "সাব্, আপনারা নদীর তীরে চলে যান, আমরা কাঠ নিয়ে আসছি।"

কেশবের সঙ্গে এগিয়ে চলি। কিছুক্ষণ বাদে আমরা নদীর তীরে এসে পৌঁছই। পাহাড়ী নদী, উত্তাল ও উদ্দাম। দু-তীরেই পাথর। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিতা। আমরা যাবো পশ্চিমে। সুতরাং এই নদী পার হওয়া দরকার।

এই নদীর নাম লোনাক্ চু। তার মানে এটিই লোনাক্ হিমবাহ নিঃসৃত ধারা। আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এটিও লোনাক্ উপত্যকা। কিন্তু উপত্যকা নয়, আমি ভাবি গিরিনদীর কথা। এই নদী পেরিয়ে একশ' বছর আগে শরৎচন্দ দাস তিব্বত থেকে ফিরে এসেছিলেন আর এক বছর আগে সোনাম ওয়াঙ্গিল সিনিয়লচু অভিযানে গিয়েছিলেন। আমরাও তাই যাচ্ছি। কিন্তু আমরা তাঁদের মতো পারব কি? আমরা কি পারব সিনিয়লচুর শুভ্র-সুন্দর শিখরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন প্রকৃতি, যাঁর প্রসাদ ভিন্ন হিমালয়ের কোন যাত্রা সফল হতে পারে না। আমরা কেবল সেই মহাশক্তির কৃপা ভিক্ষা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।

আর তাই আমি এখন এসে দাঁড়িয়েছি এখানে, এই লোনাক্ নদীর তীরে।

লোনাক্ চু জেমু চু-য়ের উপনদী। সঙ্গম দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে অনুমান করতে পারছি সেটি খুব দূরে নয়। বড় জোর আধ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েই লোনাক্ চু জেমু চু-তে বিলীন হয়েছে।

কিন্তু লোনাক্ চু-য়ের কথা থাক, পুলের কথা ভাবা যাক। এখানে সত্যি একটা পুল ছিল। ওপারে কাঠের মঞ্চটি রয়ে গেছে এখনও। এপারে কিন্তু কিছুই নেই। বোধকরি জলের তোড়ে কিংবা তুষারপাতে ভেঙে গিয়েছে। আগের পুলের কিছু

কাঠ এখনও নদীতে ভাসছে, পাথরের ফাঁকে আটকে রয়েছে।

কেশব আমাকে বুঝিয়ে দেয়, "ওপারে যেমন প্লাটফর্ম দেখছেন, এপারে ঐ রকম একটা প্লাটফর্ম তৈরি করতে হবে। তারপরে শালবল্লী দিয়ে দু'দিকের যোগসাধন করে ওপরে তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হবে।"

কেমন করে ওরা এপারে প্লাটফর্ম বানাবে বুঝতে পারছি না! একে জলের তোড়, তার ওপর তীরভূমি পাথরে বোঝাই। পাথরের ওপর খুঁটি বসাবে কেমন করে?

ওরা আসে। নিয়ে এসেছে সরু বাঁশ, লম্বা লম্বা শালবল্লী আর মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। অস্ত্র বলতে কুকরি বা কাটারি। সেই দা দিয়েও ওরা তক্তা বানায়, বেতের মতো বাঁশ চিরে দড়ি তৈরি করে। আর পাথর জড়ো করতে থাকে।

কাঠ বাঁশ ও পাথর দিয়ে পুল তৈরি শুরু হয়। আমি ছাতা মাথায় দিয়ে তীরে বসে থাকি। বসে বসে দেখি। এদের কৌশল ও দক্ষতা সত্যই দেখবার মতো।

যত দেখছি, তত বিস্মিত হচ্ছি। এরা কেউ 'ফিজিক্স' পড়ে নি। কিন্তু 'ল অব্ গ্র্যাভিটেশান', 'সেন্টার অব গ্র্যাভিটি' এবং 'ইকুইলিব্রিয়াম্' সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ করছে। এবং এরা শুধু নল নয়, এরা বিশ্বকর্মাও বটে।

এখানে দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি নামছে। আমার ছাতা ও কেশবের বর্ষাতি রয়েছে। ওরা সমানে বৃষ্টিতে ভিজছে। কিন্তু এদের অনেকেরই বেশি জামা-কাপড় নেই। তবু অম্লান বদনে কাজ করে চলেছে। মাঝে মাঝে মেট কেবল আমাদের বলছে—সাব্, আপনারা বৃষ্টিতে ভিজছেন, ঠাণ্ডা লাগাচ্ছেন? আপনারা তাঁবুতে চলে যান।

আমরা তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি না। আমাদের উপস্থিতি ওদের কাজ করতে উৎসাহিত করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল উৎসাহ দেবার জন্যই আমরা এই শীত ও জলের মধ্যে বসে নেই। আসলে ওদের কাজ দেখতে সত্যি বড় ভাল লাগছে। কেবল দা-য়ের সাহায্যে ওরা গাছ কাটছে, তক্তা বানাচ্ছে। অতদূর থেকে সেগুলো বয়ে আনছে এখানে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খুঁটি বসিয়ে তার ওপর মাচা বেঁধে পুলের ভিত তৈরি করছে। জলের তোড়ে খুঁটি সরে যাচ্ছে না। সরু বাঁশকে বেতের মতো ছিলে নিয়ে তাই দিয়ে দড়ির কাজ করছে।

আরেকটা জিনিস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না—এদের গায়ের জোর। সবার না হলেও অন্তত কয়েকজনের। তাদের মধ্যে প্রথম মেট, তারপরে লামা, ইয়াংরুপ, নিন্দু ও সামফেল। কেবল গাছ কাটা ও বয়ে আনা নয়, নদীর তীর থেকে বড় বড় পাথর তুলে পুল তৈরি করছে। অত বড় বড় পাথর এমন অক্লেশে কেউ তুলে তুলে ছুঁড়ে মারতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মঞ্চটি তৈরি হয়ে যাবার পরে মেট মেয়েদের ছুটি দিয়ে দিল। মালবাহকরা চারটি দলে বিভক্ত। এবং প্রতি দলে অন্তত একটি করে মেয়ে আছে। তাই মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা গিয়ে দুপুরের খাবার রান্না করে রাখবে।

মেয়েরা চলে যাবার পরে মেট বলে, "সাব্, এবার আপনারাও চলে যান। না হয় আবার বিকেলে আসবেন। আমরা এখন কাঠ ও বাঁশ আনতে আবার বনে যাবো। জিনিসপত্র সব যোগাড় করে রেখে আমরাও খেতে আসব।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। ওরা এখানে না থাকলে আমরাই বা বসে থেকে কি করব? তার চাইতে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে সুশান্তবাবুকে নিয়ে এলে তিনি খানিকটা ছবি নিতে পারবেন। দিশী পদ্ধতিতে এদের এই পুল তৈরি সত্যি সবাইকে দেখাবার মতো।

অতএব ফিরে চলি শিবিরে। মেয়েরা গান গাইতে গাইতে আগে আগে চলেছে। শুনতে বড় ভাল লাগছে। নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে পথ চলেছে ওরা। বৃষ্টিতে ভিজে একটানা এতক্ষণ পরিশ্রম করেও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে নি। ওরা যে পাহাড়ী মেয়ে, পাহাড়ী ঝরনার মতই শ্রান্তি-ক্লান্তিহীনা।

হঠাৎ কেশব বলে ওঠে, "শঙ্কুদা, এই নদীটার নাম যেন কি বললেন?"

"লোনাক্ চু।"

"হ্যাঁ, লোনাক্ চু। এটা এসেছে লোনাক্ উপত্যকা থেকে?"

"হ্যাঁ। আর এর মূল উৎস লোনাক্ হিমবাহ। অবশ্য লোনাক্ হিমবাহ দুটি অংশে বিভক্ত—নর্থ লোনাক্ ও সাউথ লোনাক্। দুই হিমবাহের মাঝখানে লোনাক্ শৃঙ্গ।"

"আচ্ছা, শুনেছি থাঙ্গু থেকেও লোনাক্ উপত্যকা হয়ে আমাদের মূল শিবিরে যাবার একটি পথ আছে?"

"হ্যাঁ। গত বছরের অভিযাত্রীরা সে পথেই গিয়েছেন।"

"লাচেনের পরে তো শুনেছি, এ অঞ্চলের কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য স্থায়ী জনবসতি নেই।"

আমি মাথা নাড়ি। বলি, "জনবসতি না থাকলেও সীমান্তরক্ষার প্রয়োজনে লোনাক্ উপত্যকা অত্যন্ত মূল্যবান। এই উপত্যকা থেকে তিব্বতে যাবার দুটি গিরিপথ রয়েছে—উত্তরে নাকু-লা ও উত্তর-পশ্চিমে চোর্তেন নিয়ামা-লা।"

"আচ্ছা, সিকিম থেকে তিব্বতে যাবার ক'টি পথ আছে?"

"তুমি তো জানো যে সিকিমের সমস্ত উত্তর এবং পুবের অধিকাংশ সীমান্ত জুড়ে তিব্বত। এই দু-দিকে সিকিম থেকে তিব্বতে যাবার মতো তেরোটি গিরিবর্ত্ম রয়েছে। এর অধিকাংশই অবশ্য খুব দুর্গম। বেশির ভাগ মানুষ নাথু লা হয়েই যাওয়া আসা করতেন। কারণ এটি গ্যাংটক থেকে লাসা যাবার সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ।"

"জানি।" কেশব বলে, "আচ্ছা অন্যান্য গিরিবর্ত্মগুলোর নাম কি?"

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "পূবদিকে একেবারে ভূটান-সীমান্তের কাছে প্রথম গিরিবর্ত্ম বাতাং লা, তারপরে একে একে জেলেপ্ লা, নাথু লা, চো লা, টঙ্কার লা, গোরা লা ও খুঙ্গিয়ামী লা।"

"তার মানে পুবদিকে সাতটি গিরিবর্ত্ম রয়েছে, আর উত্তর দিকে?"

"উত্তর-পূর্ব দিক থেকেই বলছি।"

"বেশ বলুন।"

"সেসে লা, বামছো লা, ছুলুং লা, কোঙরা লা, নাকু লা এবং চোর্তেন নিয়ামা লা।" একটু থেমে আবার বলি, "সিকিমের সঙ্গে তিব্বতের তেরোটি গিরিপথ রয়েছে, অথচ সব পথই পথিকশূন্য। রাজনীতির কি অপার মহিমা!"

ফিরে আসি শিবিরে। সব শুনে সুশান্তবাবু বলেন, "নেব বৈকি, নিশ্চয়ই ছবি নেব। এমন একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট-এর ছবি না তুলে পারা যায়? আপনি বরং মেটকে বলে রাখবেন, সে যেন আমার মুভি ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন লোক রেখে যায়।"

"দরকার নেই সুশান্তদা।" শরদিন্দু সহসা বলে ওঠে, "আমি ক্যামেরা নিয়ে আপনার সঙ্গে যাবো।"

অমূল্য জিজ্ঞেস করে, "পুলটা আজকের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে তো?"

"মেট তো তাই বলছে।"

"তোমাদের কি মনে হচ্ছে?"

"কি ভাবে তৈরি করবে, তাই যে এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।" কেশব বলে।

"আজকের মধ্যে তৈরি না হলে কিন্তু খুবই বিপদে পড়ে যাবো।"

মেট সদলবলে খেতে আসে। মেট আমাদের সঙ্গে খায়। খাবার সময় অমূল্য তাকে একই কথা জিজ্ঞেস করে।

মেট যেন নেতার কথা শুনে একটু অবাক হয়। বলে, "কিউ নহী বন্ যায়েগা সাব্, জরুর বন্ যায়েগা। আজই বনেগা। পুল নহী বননেসে হামলোগ সাম্‌কো ওয়াপস নহী আয়েঙ্গে সাব্!"

সুশান্তবাবু ও শরদিন্দু যাচ্ছে বলে আমি আর কেশবের সঙ্গী হলাম না। তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়লাম। কিই বা করব? বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে।

অসিতবাবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে সুশান্তবাবু ও শরদিন্দু ফিরে আসে। তার মানে কেশব এখন একা ওখানে রয়েছে। গেলেই পারতাম ওর সঙ্গে।

সুশান্তবাবুর বোধকরি শীত লেগেছে। লাগারই কথা—প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচু সংকীর্ণ স্যাঁতসেঁতে বনভূমি, তার ওপর সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

তাঁবুতে গিয়ে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে কিন্তু সুশান্তবাবু নীরব রইলেন না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ শঙ্কুবাবু! ওদের পুল তৈরির পদ্ধতি সত্যি দেখবার মতো, ছবি নেবার মতো। যেমন craftsmanship, তেমনি enginecring skill."

"কাজ কতদূর এগলো? আজ শেষ হবে তো?" জিজ্ঞেস করি।

শরদিন্দু জানায়, "নিশ্চয়ই। প্রায় হয়ে এসেছে, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।" একবার থামে শরদিন্দু। তারপরে আবার বলে, "কেশব বলছিল, এই বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে ওদের খুবই কষ্ট হচ্ছে, আরেকবার একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।"

"বেশ তো, কিচেনে বলো। বড় এক কেটলি চা বানিয়ে চেতা নিয়ে যাক ওখানে।"

শরদিন্দু খুশি হয়ে কিচেনে চলে যায়।

একটু বাদে আমাদের চা আসে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চা-য়ের মগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। বৃষ্টি থামলেও আকাশ মেঘে ঢাকা। যে কোন সময় আবার বর্ষণ শুরু হতে পারে। মে মাসে হিমালয়ে এসে এমন বৃষ্টি

এর আগে আর কখনো দেখি নি। অথচ আমরা এই অঞ্চলের গত দশ বছরের আবহাওয়া হিসেব করে এই সময় স্থির করেছি। অবশ্য এখানে বৃষ্টি হচ্ছে বলে যে ওপরে আবহাওয়া খারাপ হবে, তার কোন মানে নেই। তাহলেও ভয় হয় বৈকি! হিমালয় অভিযানের মূল নিয়ন্ত্রা প্রকৃতি। তাই পর্বতারোহণের ভাষায় প্রকৃতিকে বলা হয় ভগবান—Weather-God.

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেট বিজয়গর্বে তার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের নিয়ে ফিরে এলো। এসেই হাসতে হাসতে বলল, "পুল বন্ গিয়া সাব্। হামলোগ কাল সুবা উপর চলেঙ্গে।"

আমরা তাকে এবং তার সঙ্গীদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। মেট কিচেনে ঢোকে। বেচারীর প্যান্ট-কোট সবই ভিজে গিয়েছে। ওর আগুনের ধারে বসা দরকার। কুলিরাও ফিরে যায় নিজ নিজ আস্তানায়। ওরাও এখন আগুন জ্বালাবে। উচ্চ-হিমালয়ের প্রিয়তম দেবতা অগ্নিদেব। সিকিমে অগ্নির উপাসনা করতে অসুবিধে নেই কোন। সিকিমে যেমন শীত আছে, তেমনি আছে কাঠ। বনসম্পদে অত্যন্ত সম্পদশালী সিকিম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা বনবিভাগ এই সম্পদের উন্নয়ন ও আহরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারেন নি। গতকাল প্রায় সারাদিন বনপথ পাড়ি দিয়েছি, আজ বনে বাসা বেঁধেছি কিন্তু বনদপ্তরের কোন অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। অথচ গ্যাংটকে একজন 'চীফ ওয়াইল্ড্ লাইফ ওয়ার্ডেন' রয়েছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া নাকি এসব বনে প্রবেশ নিষেধ। কাঠ পোড়াবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অভিযানকালে কাঠ পোড়াবার অনুমতি চেয়ে আমরা তাঁর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছিলাম আর তারই সুযোগ নিয়ে তিনি আমাদের বেশ খানিকটা ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। ভাগ্যিস আমরা তা আমল দিই নি। কারণ এখন বুঝতে পারছি, দরখাস্তের কোন প্রয়োজন ছিল না। কে এই বনে এলো আর কে কাঠ পোড়ালো, তা দেখার জন্য ওয়ার্ডেন সাহেব একটিও মানুষ মোতায়েন করেন নি সারা অঞ্চলে।

কিন্তু ওয়ার্ডেন সাহেবের প্রহসনের কথা এখন থাক, এখন নিজেদের কথা ভাবা যাক। অভিযান আরম্ভ করেই একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। তাহলেও পুলটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে রওনা হওয়া যাবে।

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। অসিত এখনও এসে পৌঁছল না। কাল তাকে একা ফেলে রেখে আমরা সবাই এগিয়ে এসেছি। অনেক মাল রয়ে গিয়েছে। কম করেও সাত-আটজন কুলির দরকার হবে। কন্ট্রাক্টর বলেছে কুলি যোগাড় করে দেবে।

কুলি যোগাড় করা ছাড়াও অসিতের জন্য আমরা অনেক কাজ ফেলে এসেছি। আমাদের ফেলে আসা ব্যক্তিগত মালপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা করে মিস্টার রায়ের গুদামে রেখে আসতে হবে।

তবে অসিত অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। সে একজন শিখরবিজয়ী ও কয়েকটি অভিযানের নেতা। তার পক্ষে এসব কাজ কিছুই নয়। তাছাড়া আজ পুল বানাবার জন্য এখানে থাকতে না হলে, তার সঙ্গে আমাদের মূল শিবিরে পৌঁছবার আগে দেখাই হত না। কিন্তু সাতটা বাজে, সে এখনও আসছে না কেন? গতকাল এ সময়ে আমরা তো সবাই পৌঁছে গিয়েছি! ওদের কি রওনা দিতে দেরি হয়েছে? দুর্গম অপরিচিত

পথ, অন্ধকার রাত। চিন্তা হচ্ছে বৈকি! খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

"অমূল্যদা!"

নীরব অন্ধকারের বুক চিরে সহসা শব্দটা ভেসে আসে। সচকিত হয়ে উঠি। উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করি, "কে?"

উত্তর আসে, "আমি অসিত। আমি এসে গেছি শঙ্কুদা!"

তাড়াতাড়ি টর্চ হাতে বেরিয়ে আসি বাইরে। শুধু আমি আর অসিতবাবু নয়, সব তাঁবু থেকে সবাই। মেট মশাল নিয়ে এসেছে।

আমরা ঘিরে ধরি ওকে। হিমাদ্রি পিঠ থেকে রুকস্যাক্ খুলে নেয়। পাশের খালি তাঁবুটা দেখিয়ে বলে, "এইটে তোমার তাঁবু। আমরা এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে দিচ্ছি।"

"না, না, তোমরা এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলাবে কি? আমি মোটেই টায়ার্ড নই। কুলিরা দেরিতে এসেছে বলে পৌঁছতে দেরি হল।"

কিন্তু হিমাদ্রি অসিতের কথায় কান দেয় না। সে তার রুক্‌স্যাক থেকে এয়ার ম্যাট্রেস বার করে নেয়। মেট মশাল নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে যায়।

চেতা ও নওয়াঙ চা-বিস্কুট নিয়ে আসে। অমূল্য কুলিদের দেখিয়ে ওদের বলে, "সব আদমী কো দেও!"

"ঠিক হ্যায় সাব্!"

অসিত চা-বিস্কুট হাতে নেয়। জিজ্ঞেস করি, "কজন কুলি এনেছিস?"

"সাতজন।" অসিত উত্তর দেয়, "এদের মধ্যে তিনজন টিবেটান—হাই অলটিচ্যুড পোর্টার।"

"তার মানে হ্যাপ্।" আমি হেসে ফেলি।

অসিত বলে, "না শঙ্কুদা, এরা তেমন নয়। আমার ধারণা এরা অনায়াসে বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাল বইতে পারবে। তাছাড়া এরা গতবছর সোনাম ওয়াঙ্গিলের সঙ্গে সিনিয়লচু অভিযানে এসেছিল। এরা ক্যাম্প্-সাইটগুলো জানে।"

"এদের রেট কত?" অসিতবাবু জিজ্ঞেস করে।

অসিত সহাস্যে উত্তর দেয়, "তুমি চিন্তা করো না অসিতদা! আমি তোমার বেশি পয়সা খরচ করি নি। বেস ক্যাম্প্ পর্যন্ত ওদের রেট সবচেয়ে কম—দৈনিক বিশ টাকা, বেস্-এর ওপরে পঁচিশ টাকা। তবে এরা আমাদের সঙ্গে থাকবে ও খাবে এবং এদের পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে।"

"তাহলে তো এদের তাঁবুর ব্যবস্থা করে দিতে হয়?" বীরেন জিজ্ঞেস করে।

অসিত উত্তর দেয়, "একটা তাঁবু দিয়ে দিলে এরা নিজেরাই টাঙিয়ে নেবে।"

"আমাদের রেলওয়ে মাউন্টেনীয়ারিং ক্লাবের তাঁবুটা ওদের দিয়ে দেওয়া যাক। সেটা থ্রি-মেন টেন্ট্।" বলে বীরেন। সে টর্চ নিয়ে মালপত্রের স্তূপের কাছে এগোয়, বিনীত তার সঙ্গী হয়।

আপাতত সকল দুশ্চিন্তার অবসান হল। পুল তৈরি হয়েছে। মালপত্র ও কুলি নিয়ে অসিত এসে গিয়েছে। রাতের খাবার প্রায় প্রস্তুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাবে। কাল সকালে আমরা আবার যাত্রা করব সিনিয়লচুর পথে—সুন্দরের অভিসারে।

ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ডাকছে আমাকে! কে? অসিতবাবু! কিন্তু সে বাইরে গিয়েছে কেন? ধড়মড় করে উঠে বসি।

আমার মনে পড়ে সব। আমরা এখন সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচু তেলেম্ শিবিরে রয়েছি। অসিত আসার পরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তখন রাত দশটা। এখন কটা বাজে? ভোর হয়ে গেছে কি? বাইরে ফর্সা মনে হচ্ছে।

ঘড়ি দেখি। সে কি! এ যে দেখছি দেড়টা বাজে! তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে ধরি। না, ঘড়ি তো ঠিকই চলছে। তাহলে এত রাতে অসিতবাবু বাইরে গিয়েছে কেন? কারও অসুখবিসুখ হল নাকি!

অসিতবাবু আবার বলে, "চটি পরেই বেরিয়ে এসো একবার।"

"কেন কি হল আবার?"

"বাইরে এসো। এলেই জানতে পারবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্লীপিং ব্যাগের জিপ খুলে উঠে বসি। উইণ্ডপ্রুফটা গায়ে দিয়ে নিই। শোবার সময়ও বৃষ্টি পড়ছিল। তাহলেও চটি পরেই বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে।

বাইরে এসে উঠে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারি অসিতবাবু কেন এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিল। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য একা ভোগ করার নয়, সবার সঙ্গে সমান ভাবে উপভোগ করবার। তাই অসিতবাবু ডাকাডাকি করছিল আমাকে।

এ আমি কোথায়? এ কি সেই তেলেম্! যেখানে আমি কাল রাত কাটিয়েছি, আজ সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজেছি!

আমার মাথার ওপরে একফালি চৌকো আকাশ। সেই আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। আকাশ আর চাঁদ যেন নেমে এসেছে পাশের পাহাড় আর গাছের মাথায়। ওখানে উঠতে পারলে তাদের হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে।

সারাদিনের সেই ঘন-কালো মেঘের দল আকাশ থেকে কোথায় যেন পালিয়ে গিয়েছে। তাদের জায়গা নিয়েছে হালকা সাদা মেঘ। তারা বলাকার মতো আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে আর চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

চারিপাশের পাহাড় আর গাছপালা আকাশের সীমারেখা, তাই আকাশটা এখানে এমন চৌকো। কিন্তু সে আকাশের রঙ লাগে নি পাহাড় আর গাছপালার গায়ে। তারা কেউ কালো, আর কেউ বা ধূসর।

আর আমাদের তেলেম্—সে সবুজ। চাঁদের আলো তাকে আরও ঘন সবুজ করে তুলেছে। সেই সবুজ মায়াময় জগতে বসে আমরা দুটি মানুষ হিমালয়ের এই অপার্থিব সৌন্দর্য অবলোকন করছি। শুধু দেখছি আর দেখছি, কেউ কোন কথা বলছি না। দেখছি আর ভাবছি ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের সেই অমর উক্তি—

"Go out alone on the hills and listen. You will hear much. The winds will hold for you something more than sound; the stream will not be merely the babbling of hurrying water. The trees and flowers are not so seperate from you as they are at other times, but very near; the same substances, the same rhythm, the same song

binds you to them. Alone amidst Nature, a man learns to be one with all and all with one."

আট

একদিন বিরতির পর আবার শুরু হল পথ চলা। না, পথ নেই, শুধু চলা। পথ নেই সিনিয়লচুর পথে। আছে পাথর বরফ বন আর জোঁক। একে পথ বলা সমীচীন নয়, তবু বলতে হবে। কারণ এখানে মানুষ এসেছেন। আজ আমরা এসেছি, ভবিষ্যতে আরও অনেকে আসবেন। মানুষ যেখানে পদচারণা করেন, তাকে যে পথ বলতেই হয়।

আজ আমরা আরও আগে বেরিয়েছি—সকাল সাড়ে সাতটায়। সাঙবা গতকাল রাতেই সাবধান করে দিয়েছিল—সাব্, কালকা পরাও খতরনক হ্যায়। কাল বহুৎ সুবা নিকালনা পড়েগা।

বীরেনও তাই বলেছে—আজকের পথ দীর্ঘতর না হলেও কঠিন।

পরশু আমরা ১৬ কিলোমিটার এসেছি কিন্তু তার মধ্যে ৬ কিলোমিটার ছিল সরকারী রাস্তা এবং উৎরাই। আর আজ এইরকম ১৬ কিলোমিটার পথহীন পথ পাড়ি দিতে হবে। তাই আজ আমরা আরও আগে পথে নেমেছি।

আগামীকাল আমাদের ১৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আর সে-পথ নাকি আরও কঠিন। কিন্তু কালকের কথা আজ থাক, আজ আজকের কথা হোক।

চা ও চিঁড়েভাজা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে, রুটি ডিম ও আলুসিদ্ধর প্যাকেট-লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আমরা পথে নেমেছি। বলা বাহুল্য অসিতবাবু কয়েকটি করে টক-লজেন্স সবাইকে দিয়েছে। তারই একটি চুষতে চুষতে চলা শুরু করেছি।

কুলিরা কয়েকজন আমাদের আগে রওনা হয়েছে। বাকিরা তাঁবু গুটিয়ে সব মালপত্র নিয়ে পেছনে আসবে। অসিত তাদের সঙ্গে থাকবে। সামনে কুলিদের সঙ্গে রয়েছে কেশব। আমরা তারই পেছনে সারি বেঁধে পথ চলেছি।

গতকাল এই পথে পুল তৈরি দেখতে নদীর তীরে গিয়েছি। অতএব পথ আমার পরিচিত। সেই বনময় চড়াই-উৎরাই পাথুরে প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। তারপরে পাশাপাশি সেই দুটি নালা আর বৃক্ষহীন প্রস্তরময় রুক্ষ প্রান্তর। বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে নদীর তীরে এসে পৌঁছই।

সত্যই বিস্ময়কর। গতকাল যা দেখে গিয়েছি, তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এ যে দেখছি রীতিমত আধুনিক একটি কাঠের পুল। সুসমতল ও সুবিন্যস্ত পন্টুন্-ব্রিজ।

আমরা একে একে পুল পার হলাম। সুশান্তবাবু ও অসিতবাবু ছবি নিল। তারপরে চললাম এগিয়ে।

চলতে গিয়েই আঁতকে উঠতে হল। আমাদের বাঁদিকে বেশ খানিকটা দূরে জেমু চু। তাকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। কেবল তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ডানদিকে বহুদূরে পাহাড়। আর সামনে কিছুদূরে বনভূমি। এই তিনের মাঝে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তর জুড়ে ঝোপঝাড় আর বিরাট-বিরাট পাথর। এই পাথুরে প্রান্তর

পেরিয়ে ঐ বনভূমিতে পৌঁছতে হবে।

কাজটা কেবল কঠিন নয়, বিপজ্জনকও বটে। আর তাই এমন আঁতকে উঠেছি। পাথরগুলোর ওপরে কম করেও আধ ইঞ্চি পুরু শেওলা জমে রয়েছে—বৃষ্টিভেজা স্যাঁতসেঁতে শেওলা। তার ওপর পা রাখলেই জুতো ফসকে যাচ্ছে। অথচ ধরার কিছু নেই। পাথরের ওপরে আইস-এক্স পোঁতা সম্ভব নয়। আগেই বলেছি পাথরগুলো প্রকাণ্ড, কম করেও ৫/৬ ফুট করে উঁচু। এখান থেকে পা ফসকে নিচে পড়ে যাওয়া মানে মাথা ফাটানো কিংবা হাতা-পা ভাঙা।

তবে ভাগ্যদেবী খুবই সুপ্রসন্না। আমরা ভাগ্যবান। প্রত্যেকের দু-চারবার পা ফসকেছে, আছাড় খেয়েছি, ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু কারও মাথা ফাটে নি কিংবা হাত-পা ভাঙে নি। অর্থাৎ আমরা অক্ষত দেহে 'ব্যালান্স টেস্ট'-এ পাস করেছি। এবং বনভূমিতে এসে পৌঁছেছি।

পাথুরে প্রান্তরটি পার হতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগল। এখন সকাল সাড়ে আটটা। অমূল্য বলে, "এখানে একটু জিরিয়ে নাও।"

বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ি। পরিশ্রম হয় নি তেমন। তবে এতক্ষণ একটা প্রচণ্ড মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলাম। একদিকে ভারসাম্যের পরীক্ষা, আরেকদিকে পড়ে যাবার লজ্জা। সত্যি বলতে কি এখনও বুক ধড়ফড় করছে। একটু জিরিয়ে নিলে ভালই হবে। আর তাই আমাদের অভিজ্ঞ নেতা বিশ্রামটুকু মঞ্জুর করল।

বিশ্রামের অবকাশ সামান্য। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে। সুতরাং কয়েক মিনিট বাদেই উঠতে হল। আমরা সারি বেঁধে বনে প্রবেশ করি।

কিন্তু এ তো বন নয়, এ যে দেখছি পঞ্চবটী। এখানে পদ্মশোভিত সরোবর নেই তবে অদূরে গোদাবরীর চেয়ে রমণীয়া নদী রয়েছে। এখানে শাল তমাল খেজুর আম অশোক চম্পক চন্দন প্রভৃতি গাছ নেই কিন্তু রয়েছে রডোডেনড্রন। এখানেও চারিদিক পঞ্চবটীর মতো পুষ্পিত তরুতে বেষ্টিত, পথের পাশে পাশে তেমনি কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণী।

এতদিন কেবল একই রকমের রডোডেনড্রন দেখেছি, সেই বড় বড় গাছ আর লাল ফুল। দেখে মনে হয়েছে বনের বুকে আগুন লেগেছে। আজ দেখছি, ছোট ও মাঝারি নানা রকমের রডোডেনড্রন। ভিন্ন তাদের রং, ভিন্ন তাদের আকার এবং গড়ন কিন্তু অভিন্ন তাদের অনুপম রূপ। এতদিন জানতাম রডোডেনড্রন হয় শুধু লাল, আজ জানলাম লাল নীল গোলাপী হলুদ বেগুনী ও সাদা এবং একাধিক রঙের মিশ্রণে রডোডেনড্রন হতে পারে।

কথাটা শুনে বীরেন একটু হাসে। বলে, "এখানে প্রচুর রডোডেনড্রন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এ কিছুই নয়।"

"মানে?" ওর কথায় একটু বিস্মিত হই।

বীরেন উত্তর দেয়, "সারা পৃথিবীতে ৯২৫ রকমের প্রজাতি বা species রয়েছে এই ফুল গাছের।"

"ন'শ' পচিশ!" বিনীতও বিস্মিত।

বীরেন বলে, "হ্যাঁ। তবে হিমালয় এই ফুলের বৃহত্তম ভাণ্ডার। উত্তর-ভারত থেকে উত্তর-ব্রহ্মদেশ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম চীন পর্যন্ত এই ফুলের মূল-মাতৃভূমি।

কেবল হিমালয় অঞ্চলেই রডোডেনড্রনের ৬৩৫টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ করলে পৃথিবীতে ৪৩টি পরিবারের রডোডেনড্রন রয়েছে।"

একটু থামে বীরেন। তারপরে আবার বলতে শুরু করে, "দু ইঞ্চি থেকে শুরু করে আশি ফুট পর্যন্ত উঁচু রডোডেনড্রন গাছ হয়ে থাকে। আল্পস অঞ্চলে প্রায় ছুঁচের মতো সরু ও ছোট রডোডেনড্রন গাছের পাতা দেখতে পাওয়া যায় আর নিম্ন-হিমালয়ে কোনটির পাতা প্রায় তিন ফুট লম্বা ও এক ফুটের মত চওড়া। আধ ইঞ্চি থেকে ছ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট রডোডেনড্রন ফুল দেখা যায়। কোন কোন জাতের ফুলে বেশ গন্ধ রয়েছে।"

"আচ্ছা শুনেছি এই গাছের পাতা ও রস নাকি বিষাক্ত?" বীরেন থামতেই বিনীত প্রশ্ন করে।

বীরেন উত্তর দেয়, "সব শ্রেণীর গাছে না হলেও কোন কোন শ্রেণীর পাতা ও রসে সত্যই বিষ রয়েছে। তবে তা মানুষের খুব একটা ক্ষতি হবার মতো নয়। কেবল ঐ সব শ্রেণীর ফুলের মধু পান করলে মানুষের জীবন সংশয় হতে পারে।"

একটু থেমে বীরেন আবার বলতে থাকে, "রডোডেনড্রন আমাদের দেশের ফুল কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই ফুল নিয়ে তেমন একটা গবেষণা হচ্ছে না। অথচ বিলেত ও আমেরিকায় রডোডেনড্রন সোসাইটি রয়েছে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডে রডোডেনড্রনের চাষ শুরু হয়েছে। রডোডেনড্রন উচ্চ-হিমালয়ের তুষার-শীতল অঞ্চলের ফুল। উদ্ভিদতাত্ত্বিকরা নানা পরীক্ষার পরে প্রমাণ করেছেন, যে কোন শীতের দেশে পাহাড়ী অঞ্চলে অল্প উচ্চতায় তৈরি করা মাটিতে এই গাছ বাঁচতে পারে। এখন ইংলণ্ডে প্রচুর রডোডেনড্রন বাগান হয়েছে। এই সব বাগানে ৬০০০ শ্রেণীর মিশ্র-প্রজাতি বা কলমের গাছ (Hybrids) রয়েছে।"

"তোকে ধন্যবাদ।" বীরেন থামতেই আমি বলি, "রডোডেনড্রন সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারলাম। কিন্তু তোর সঙ্গে কথা ছিল, পথ চলতে চলতে এই অঞ্চলের অর্কিড গাছ ও ফার্ণ সম্পর্কে কিছু বলবি। তুই সে কথা রাখিস নি।"

"বেশ, এখন রাখছি। বলুন কোনটি দিয়ে আরম্ভ করব।" বীরেন আত্মসমর্পণ করে।

"অর্কিড দিয়ে শুরু করুন।" হিমাদ্রি প্রস্তাব পেশ করে।

বীরেন শুরু করে, "অর্কিডের কথা বলতে গেলে গ্যাংটক থেকে আরম্ভ করতে হবে। গ্যাংটক থেকে গাড়ি ছাড়ার পরেই আপনারা পাহাড়ের ঢালে কিংবা গাছের ডালে ডালে প্রচুর অর্কিড দেখেছেন। কেবল অর্কিড নয়, সেই সঙ্গে অর্কিডের ফুল। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত অর্কিডের ফুল ফোটে। এই সব ফুল সহজে শুকোয় না। গ্যাংটক থেকে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার এসে আমরা সবচাইতে বেশি অর্কিড দেখেছি।"

আমরা মাথা নাড়ি। বীরেন বলতে থাকে, "ঐ পথে আপনারা প্রচুর ফার্ণ দেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা ট্রি-ফার্ণ পর্যন্ত পেয়েছেন।"

"ট্রি-ফার্ণ কি বীরেনদা?" বিনীত প্রশ্ন করে।

বীরেন উত্তর দেয়, "আট-দশ ফুট উঁচু গাছ। পাতাগুলো ফার্ণের মতো।"

"এবারে ফুলের কথা বল।" আমি বলি।

বীরেন বলে, "এ অঞ্চলের ফুলের কথা বলতে হলে, আবার রডোডেনড্রনের কথায় ফিরে আসতে হবে।"

"বেশ তো, বলুন না।" অরুণ বলে।

বীরেন আরম্ভ করে, "নিচের দিকে বিশেষ করে বাসপথে আমরা সীমিতভাবে রডোডেনড্রন আর বোরিয়াম গাছ দেখেছি। ঐ সব গাছে মার্চ মাস থেকেই ফুল ফোটে কিন্তু মে মাসের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। কারণ তারা গ্রীষ্মের তাপ সইতে পারে না।

"চুংথাং থেকে লাচেন আসার পথে রডোডেনড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলেও দেখেছেন অধিকাংশ গাছ কেমন যেন শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত। এ অঞ্চলের উচ্চতা পাঁচ থেকে ন হাজার ফুট। অথচ লাচেন থেকে রওনা হবার পরে আপনারা তাজা গাছ দেখতে পাচ্ছেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। বীরেন বলে চলে, "প্রথম দিন পদযাত্রার কথা ভাবুন—লাচেন থেকে তেলেম্। সংকীর্ণ প্রস্তরময় উপত্যকার ওপর দিয়ে নদীর তীরে তীরে পথ। গিরিশিরার বুক চিরে জেমু চু পথ তৈরি করেছে। পাশেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ও নদীর তীরে অসংখ্য বড় বড় পাথর। যে কোন সময় পাথরের ঢল নেমে আসতে পারে পথের ওপরে। আমাদের সর্বদা ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়েছে। তাই ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখতে পারি নি। তবে সুযোগ পেলেই যতটা সম্ভব দেখে নিয়েছি। মাঝে মাঝে বড় বড় স্থায়ী পাথরের আড়ালে গাছেরা ছোট ছোট কলোনী তৈরি করে নিয়েছে। সেখানে যেমন ছোট ছোট রঙীন ফুল ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে রডোডেনড্রন। অথচ সেইসব কলোনীর অনতিদূরে পাহাড়ের খানিকটা অংশ ধসে পড়ার খেলায় মেতে রয়েছে। সেই ধসের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্মগোপনকারী রডোডেনড্রনগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে আমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মতই পুলকিত হয়ে উঠেছি। তাদের হাল্কা গোলাপী ফুল আর সবুজ পাতাব মিষ্টি গন্ধ আমাদের বার বার ব্যাকুল করে তুলেছে।

"এবারে ভাবা যাক তেলেম্ উপত্যকার কথা। পরশু বিকেলে নদীব বেলাভূমি থেকে বনভূমিতে উঠে এসে যেমন বড় বড় গাছ পেযেছি, তেমনি দেখেছি নানা বিচিত্র সুন্দর ছোট ছোট গাছ ও ফুল।" বীরেন থামে।

আমরা মাথা নাড়ি। বিনীত জিজ্ঞেস কবে, "ঐ বনে আমরা কতগুলো কচু জাতীয় গাছ দেখেছি, যাদের ফুল অবিকল গোখরো সাপের ফণার মতো। এমন কি সাপের ফণায় যেমন রঙীন ডোরা থাকে, তেমনি লম্বা কিংবা চক্রাকার দাগ পর্যন্ত রয়েছে। ঐ গাছগুলোর কি নাম বীরেনদা!"

"ওগুলোকে 'অরাম কোব্রা' বলা যেতে পারে।" বীরেন উত্তর দেয়। সে বলে চলে, "তেলেম্ শিবিরে পৌঁছবার কিছু আগে বনের ভেতরে ঝরনার তীরে তোমরা কতগুলো দলছুট প্রিমুলা দেখতে পেয়েছো। তাছাড়া রডোডেনড্রন ও অন্যান্য বড় গাছ প্রচুর দেখেছো।"

আমরা মাথা নাড়ি। একটু থেমে বীরেন আবার বলতে থাকে, "এবারে আজকের কথায় আসা যাক। আজ তো আমরা সকাল থেকেই গভীর বনের ভেতর দিয়ে

পথ চলেছি। পথের পাশে পাশে নানা আকারের নানা ধরনের ছোট-বড় রডোডেনড্রন গাছ দেখছি। এদের সবাই আমার পরিচিত নয়, তবে কিছু আমার সুপরিচিত, যেমন 'রডোডেনড্রন আরবোরিয়াম', 'রডোডেনড্রন থম্‌সনি', 'রডোডেনড্রন গ্রিফিথিনাম্', 'রডোডেনড্রন এজওয়ার্থি' এবং 'ম্যাডেনি' ইত্যাদি।" থামে বীরেন। তারপরে বলে, "আজ এ পর্যন্তই থাক আবার আগামীকাল গাছ ও ফুলের কথা বলা যাবে। এবারে চলুন তাড়াতাড়ি চলা যাক, নইলে দেরি হয়ে যাবে।"

আমরা বীরেনের প্রস্তাব মেনে নিই। জোরে জোরে পা চালাই। কিন্তু পেরে উঠি না। কারণ বনভূমি কুসুমাস্তীর্ণ হলেও কুসুম-কোমল নয়। কোথাও পাথুরে রুক্ষ পথ, কোথাও স্যাঁতসেঁতে ও পিচ্ছিল আবার কোথাও বা জোঁকে বোঝাই। মাঝেমাঝেই বড় বড় গাছ কিংবা বিরাট বিরাট পাথর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। শেওলা-গজানো পিচ্ছিল পাথর, সন্তর্পণে পার হতে হচ্ছে। কোন গাছের গুঁড়ি ডিঙিয়ে অথবা কোনটির তলা দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। খুবই ক্লান্তিকর দুর্গম পথ।

এমনিতেই এসব জায়গায় রোদ আসতে পারে না, তার ওপরে বৃষ্টি লেগেই রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও হয়ে গিয়েছে এক পসলা। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু গাছের পাতা চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে অবিরত।

গতকাল প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, সূর্যের মুখ দেখি নি সারাদিন। আজ মাত্র মিনিট পনেরো রোদ দেখেছি। তারপরেই মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। সেই থেকে আকাশ মেঘের ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে। কখন তার অভিমান ভাঙবে বুঝতে পারছি না।

চলছি আর ভাবছি। ভাবছি এই অমূল্য বনসম্পদের কথা। এই সব সীমাহীন বন অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার। শাল সেগুন বাঁশ, নানা রকমের ফার্ণ, ওক বাদাম পাইন ফার (fir) সাইপ্রিস (Cypress) সীডার (Ceader) প্রভৃতি—কোন্ গাছ নেই সিকিমের বনে বনে? রয়েছে ম্যাগনোলিয়া থেকে রডোডেনড্রন পর্যন্ত নানা রকমেব পাহাড়ী ফুল আর সমস্ত প্রকার ঔষধী। আর কেবল গাছ আর ফুল নয়, এইসব বন অজস্র প্রাণীসম্পদে পরিপূর্ণ।

কিন্তু এই অনন্ত ঐশ্বর্য কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! যাওয়া-আসার পথ নেই, রক্ষণাবেক্ষণের মানুষ নেই, উন্নয়ন ও আহরণের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ সরকারী খাতায় আমাদের সবই রয়েছে। কর্তারা শুধু অর্থহীন খবরদারী করেই নিজেদের কর্তব্য শেষ করছেন। আবার মনে পড়ছে সেই টেলিগ্রামের কথা—সিকিমের চীফ্ ওয়াইলড্ লাইফ ওয়ার্ডেন-এর সেই টেলিগ্রাম। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাবার পরে আমরা তাঁকে এই অভিযানের কথা জানিয়ে আবেদন করেছিলাম—অভিযানকালে আমরা রান্নার জন্য বনের কিছু কাঠ পোড়াবো। উত্তরে তিনি লিখলেন—কাঠ পোড়ানো তো দূরের কথা, তিনি আমাদের এই বনাঞ্চলে ঢুকতেই দেবেন না।

আমরা তাঁকে আবার লিখলাম—ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সিকিম সরকারের অনুমতি ও সাহায্য নিয়ে আমরা এই অভিযানের আয়োজন করেছি। প্রতিরক্ষা দপ্তর আমাদের যাওয়া-আসার গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন, গ্যাংটক পুলিস ইনার লাইন পাসপোর্ট দেবেন। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক আমাদের সেই টেলিগ্রাম পাঠালেন।

লিখলেন—'SINIOLCHU BEING INSIDE KANCHENJUNGA NATIONAL PARK PERMISSION TO CLIMB IT NOT GRANTED.'

টেলিগ্রামটি পাঠাবার সময় ওয়ার্ডেন সাহেব নিশ্চয়ই তাঁর 'জ্যুরিস্‌ডিকশন' অর্থাৎ আধিপত্য বিস্তারের অধিকার সম্পর্কে ভেবে দেখেন নি। কারণ ভারতীয় হিমালয়ের কোন শৃঙ্গে কেউ অভিযান করবে কিনা, তা স্থির করা এবং অনুমতি দেবার একমাত্র অধিকার ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশানের। ফাউণ্ডেশান আমাদের অনুমতি দিয়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন এবং সিকিম সরকারকে ইনার-লাইন পাসপোর্ট ও ক্যামেরা পারমিট দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন, একথা জানাবার পরেও কেমন করে তিনি এই টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন, তা আজও বুঝে উঠতে পারছি না।

সবচেয়ে বড় কথা এ অঞ্চলে কে আসছে-যাচ্ছে, কে কাঠ কাটছে আর পশু মারছে, তা দেখার জন্য কোন মানুষ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা দপ্তর ছাড়া অন্য কোন বিভাগের কোন সরকারী কর্মচারীর সাক্ষাৎ হয় নি। কেউ কখনও পদার্পণ করেছেন বলেও মনে হচ্ছে না। ওয়ার্ডেন সাহেব এবং বনবিভাগের কর্তারা বোধকরি গ্যাংটকের অফিসে বসেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বনসম্পদের উন্নয়ন করে চলেছেন।

"শঙ্কুদা, সাবধান! সামনে কিচ্চর!"

বীরেনের ডাকে আমার ভাবনা থেমে যায়। সামনে তাকাই। চমৎকার একটি প্রায় সমতল তৃণাচ্ছাদিত সবুজ প্রান্তর। বর্ষণসিক্ত কিন্তু কোথাও জল দাঁড়িয়ে নেই। মেঘলা আকাশ। আলো খুবই কম। তবু ঘাসগুলো যেন চকচক করছে। কিন্তু বীরেন এমন সুন্দর ও সুসমতল প্রান্তরটি দেখে 'কিচ্চর' বলে অমন আঁতকে উঠল কেন? কিচ্চর জিনিসটা কী?

ওরা আমার মনোভাব বুঝতে পারে। অমূল্য বলে, "সামনে যে ময়দানটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা মোটেই ময়দান নয়।"

"কি তাহলে?"

"ওটা কিচ্চর। তার মানে কাদা।" বীরেন উত্তর দেয়।

অমূল্য বলে, "কিন্তু এ কাদা তোমার বরিশাল জেলার কাদা নয় যে পায়ে লাগলে চন্দনের মতো দেখাবে, এ কাদা আলকাতরার মতো কালো এবং দুর্গন্ধময়।"

হিমাদ্রি যোগ করে, "এই কিচ্চর সিকিমের নিজস্ব বস্তু। ওপর থেকে ময়দান মনে হচ্ছে কিন্তু পা দিলেই দেখবেন পা-সুদ্ধ সমস্ত জায়গাটা নিচে তলিয়ে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে পচা পাতার রসযুক্ত একরকম কালো কাদা ওপরে উঠে এসে আপনার পাখানিকে ভিজিয়ে দিয়েছে।"

"কাজেই দেখে দেখে পা ফেলে সামনের সমতলটুকু খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবেন। পায়ে গাম-বুট থাকলে অবশ্য এ সাবধানতার দরকার ছিল না কিন্তু আমরা হাণ্টার পরেছি। একটু অসাবধান হলেই জুতো-মোজা-প্যান্ট-ড্রয়ার সব কিচ্চরে ডুবে যাবে।" বীরেন সাবধান করে।

ময়দানে নেমে বুঝতে পারি ওরা মিথ্যে বলে নি। ওদের পরামর্শ মতো তাড়াতাড়ি অথচ সাবধানে এগিয়ে চলি। এখানে-ওখানে কেউ বা কারা দু-চারটি করে গাছের গুঁড়ি কিংবা ডালপালা ফেলে রেখেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য ঠিক

করে নিচ্ছি। তারপরে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। এখানে একটু শক্ত জমি পাওয়া গেছে, রয়েছে বড় বড় ঘাস। অতএব আবার একটু দাঁড়ানো গেল।

তাড়াতাড়ি হেঁটে ও সুবিধামত থেমে একসময় আমরা কিচ্চর পেরিয়ে এলাম। আবার জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এবারে অমূল্য আর বিশ্রাম মঞ্জুর করে না। সুতরাং এগিয়ে চলতে হয়।

তেলেম্ থেকে রওনা হবার পর থেকে আমরা মোটামুটি প্রায় সোজা পুবে এগিয়ে চলেছি। আজও কালকের মতো মাঝে মাঝে নদীর বেলাভূমিতে নেমে যেতে হচ্ছে। তবে পাথর পড়ার জায়গা বড় একটা পেরোতে হয় নি। কাল ছিল পাথর, আজ কিচ্চর। কোনটিই কম নয়। তবে গতকাল আজকের মতো ফুল পাই নি পথে।

কখনও নদীর বেলাভূমি, কখনও বা উঁচু বনভূমি দিয়ে পথ চলেছি কিন্তু নদী কখনই যাচ্ছে না হারিয়ে। জেমু চু আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জেমু হিমবাহে—সিনিয়লচুর পদপ্রান্তে।

নদী সর্বদা বাঁয়ে রয়েছে, কখনও পাশে কখনও বা অনেক নিচে। নদীর ওপারে তেমনি সাদা আর সবুজ মেশানো পাহাড়। শুধু সবুজই বা বলি কেন—লাল নীল হলুদ বেগুনী গোলাপী ও সাদা হরেক রকমের রডোডেনড্রন ও নানা ছোট-বড় ফুল ফুটে আছে এপারের মতই। তবে ওপারে খাড়া পাহাড়, এপারে প্রায় সমতল বনভূমি। কিন্তু এপারের চেয়ে ওপারকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তাই-ই দেখায়। সুন্দর দূর থেকে সুন্দরতর। তাহলে আমি সিনিয়লচুর কাছে চলেছি কেন?

চলেছি কারণ আমি পর্বতারোহী নই। আমি তার শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করব না। মূল শিবির থেকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা, সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে দু চোখ ভরে দেখব আর দেখব। তাই তো সুন্দরের অভিসারে আমার এই দুর্গম পদযাত্রা।

আবার বৃষ্টি নামল। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। তার মানে চার ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলেছি। হয় পাথরে প্রান্তর, না হয় স্যাঁতসেঁতে বনপথ কিংবা কিচ্চর। হয় চড়াই, না হয় উৎরাই। তার ওপর দফায় দফায় বৃষ্টি। বিশ্রামের সুযোগই পাচ্ছি না। অথচ এখন একটু বসতে পারলে ভাল হত। ভাল হত একটু গরম চা পেলে!

মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হয় না। 'কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল' বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে। কথাটা যে এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে, তা একটু আগেও বুঝতে পারি নি। বিশ্রাম ও চায়ের ভাবনা মনে আসতেই একটা বাঁক ফিরে দেখি সামনে সুসমতল প্রান্তর। তারই প্রান্তে একটা ঝরনার ধারে বসে আছে কয়েকজন কুলি-কামিন। তারা চায়ের জল চড়িয়েছে।

একজন কুলি আহ্বান করে। বলে, "আইয়ে সাব্! বৈঠিয়ে। চায় পীজিয়ে।"

আমাদের মতো দুধ-চিনি সহযোগে আসাম কিংবা দার্জিলিঙের চা এরা খায় না। এরা খায় তিব্বতী চা। পাহাড়ী চা-পাতা সিদ্ধ করে তাতে খানিকটা চমরী গাইয়ের পচা মাখন দিয়ে তৈরি করে চা। বলে নিমকিন-চা।

যে চা-ই হোক, গরম পানীয় তো বটেই। শীতে সারা শরীর হিম হয়ে গিয়েছে। তার ওপরে শুনেছি এই নিমকিন-চা নাকি শ্রান্তি দূর করে শরীরকে গরম করে

তোলে। অতএব বসে পড়ি।

বীরেন বলে, "এটাই বোধকরি জাক্থাং।"

"জী সাব্!" মেট মাথা নাড়ে।

বীরেন আবার বলে, "এটি এ পথের একটি সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। উচ্চতা বারো হাজার ফুটের মতো। আমরা তেলেম্ থেকে ৮/৯ কিলোমিটার এসেছি।"

কথাটা মিথ্যে বলে নি বীরেন। অনেকখানি প্রায় সমতল সবুজ প্রান্তর। চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট রঙীন ফুল আর বিভিন্ন ধরনের রডোডেনড্রন ফুটে রয়েছে। পাশের পাহাড় থেকে একটা ঝরনা নেমে এসে প্রান্তরের বুক বেয়ে গিয়ে নদীতে পড়ছে। পাহাড়ের গায়ে এবং উপত্যকার চারিদিকেই বড়-বড় গাছ। অতএব জল এবং জ্বালানির কোন অভাব নেই জাক্থাঙে। তাছাড়া রয়েছে একখানি বড় পাথর—ওপরের দিকটা ঘরের চালের মতো। বেশ কয়েকজন মানুষ তার তলায় রাতের আশ্রয় নিতে পারে।

উপত্যকার উত্তরে জেমু চু আর দক্ষিণে কেশং লা-য়ে যাবার পথ।

চা তৈরি হয়। মেট আমাদের স্যাক্ থেকে মগ বার করে আনে। থিচ্ন চা পরিবেশন করে। থাণ্ডুপ নিজের ঝোলা থেকে কয়েকখানি তেল মাখানো রুটি বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে। ওদের আতিথেয়তা মুগ্ধ করে আমাকে। বলি, "আমাদের খাবার সঙ্গে রয়েছে, তোমরা খেয়ে নাও।"

থাণ্ডুপ নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে সুশান্তবাবুর দিকে তাকাই। তিনি দীর্ঘকাল মানবতত্ত্ব বিভাগে কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক।

তিনি বলেন, "খান দুয়েক নিয়ে নিন। সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যাক। নইলে এরা মনে কষ্ট পাবে।"

সুশান্তবাবু সারাজীবন আদিবাসী ও পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে ঘুরেছেন। অবস্থার বিপাকে পড়ে তাঁকে সাপ থেকে হাতির মাংস পর্যন্ত খেতে হয়েছে। সুতরাং তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমি থাণ্ডুপের হাত থেকে দুখানি রুটি নিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিই।

চা খেয়ে আবার শুরু হয় পথ চলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জাক্থাং ছাড়িয়ে এলাম। তারপরেই পথটা নেমে এলো একটি ছোট পাহাড়ী নদীর তীরে, একটা কাঠের পুলের গোড়ায়।

নদীটি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিতা। দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে জেমু চু-য়ের সঙ্গে মিলিত হতে। জেমু চু-কে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু তার অবস্থিতি অনুমান করা যাচ্ছে। সে আমাদের নিয়ে যাবে জেমু হিমবাহে—সিনিয়লচুর পদতলে।

কিন্তু তার কথা থাক, বরং সামনের এই ছোট নদীটিকে দেখা যাক। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

বীরেন বলে, "এরই নাম থম্ফিয়াক্ চু। থিইউ লা চা থেকে সৃষ্টি হয়ে এখানে এসে জেমু চু-য়ে মিশেছে। থাঙ্গুর পথে মূল শিবিরে গেলে থিইউ লা চা উপত্যকায় এই নদী পেরোতে হত।"

নদী পেরিয়ে শুরু হল চড়াই। কিছুক্ষণ চড়াই ভেঙে আবার বনভূমিতে উঠে আসি। বৃষ্টি বন্ধ হয় নি, তবে বেগ কমেছে।

সত্যই কি কমেছে? এখানে যে গাছের চন্দ্রাতপ। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কেবল পাতা চুঁইয়ে জল পড়ছে। পচা পাতা পেরিয়ে আর মরে যাওয়া গাছ ডিঙিয়ে চড়াই ভাঙছি।

ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছ কোথাও কোথাও। সেখানে আর এগোবার কোন ফাঁক-ফোকর নেই। জলের নালা খুঁজে বের করে জলপথে ওপরে উঠতে হচ্ছে। তুষার-শীতল জল। জুতো ও প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই সিনিয়লচুর পথে।

জলপথ শেষ হল। উঠে এলাম প্রায় সমতল বনপথে। বনপথ না বলে ফুলবন বলাই বোধকরি সমীচীন হবে। আমার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুল আর ফুল। তারই মাঝখান দিয়ে জলধারা বয়ে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাই। বেলা একটা বাজে। একটু বসে খাবারটুকু খেয়ে নিলে হত, সেই অবসরে চারদিকটা ভাল করে দেখে নেওয়া যেত।

সহযাত্রীরা সমর্থন করে আমাকে। একটু সমতল জায়গা দেখে পাথর অথবা গাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ি সবাই। স্যাক্ থেকে খাবারের প্যাকেট বের করি—রুটি ডিমসিদ্ধ ও আলুসিদ্ধ।

খেতে খেতে চারিদিকে দেখি। কি বিচিত্র সুন্দর বনভূমি আর শান্ত সমাহিত হিমালয়। উচ্চতা নয়, হিমালয়ের অন্তরলোকের এই অনির্বচনীয় শান্তির আকর্ষণেই অনন্তকাল ধরে মানুষ ছুটে এসেছে তার কোলে। এসে দেবতাত্মা হিমলায়ের পুণ্য স্পর্শ লাভ করেছে।

আবার জোরে বৃষ্টি শুরু হল। বসে বসে ভেজার কোন মানে হয় না। তাই উঠে দাঁড়াই। শুরু করি পথ চলা।

সিকিমে এসে বৃষ্টিকে ভয় করলে পথ চলা অসম্ভব। তাই বৃষ্টিকে ভয় করছি না। ভয় পাচ্ছি সামনের দিকে তাকিয়ে। সামনে কিচ্চর। এবং এবারে তার বিস্তার দীর্ঘতর।

ভয় পেলেও কিচ্চরে নেমে আসতে হল। আমি জল-কাদার দেশের মানুষ। শৈশবের অভিজ্ঞতাকে মনে করে সহযাত্রীদের পরামর্শ মতো তাড়াতাড়ি পা চালাই। এখানেও মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। কিন্তু সেগুলো পিচ্ছিল এবং নিমজ্জমান। সুতরাং পা দেওয়া আরও বিপজ্জনক।

মাঝে মাঝেই গোড়ালি পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। পচা পাতার কালো রসে জুতো ও প্যান্ট সিক্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সারা দেহ দুলে উঠছে, আইস-এক্স-এর সাহায্যে অতিকষ্টে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

সত্যি এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যেখানে পা রাখছি, সেই জায়গাটা পাখানিকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ঠিক পুরু গালিচার মতো। তফাত কেবল একটু বেশি তলাচ্ছে আর পায়ে আলকাতরার মতো কাদা লাগছে।

এক সময় কিচ্চর শেষ হল, আবার উঠে এলাম বনভূমিতে অথবা ফুলবনে—রডোডেনড্রনের বন। এখানে ঝোপঝাড় কিছু কম। একটা ঝরনা রয়েছে এবং এখন বৃষ্টি পড়ছে না। তাই কুলিরা মাল নামিয়ে বসে পড়েছে, বিশ্রাম করছে। ওরা আমাদের বসতে বলে। ওদের পরামর্শ মেনে নিই।

থাসা এসে অমূল্যকে সেলাম করে। বলে, "সাব্, মিঠা দেও।"

মিঠা মানে লজেন্স আর থাসা আমাদের সবচেয়ে সুশ্রী কামিন। স্বাস্থ্যবতীও বটে। সুতরাং সিকিমের বিচারে তাকে সুন্দরী বলা যেতে পারে। অতএব তার অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে একটি লজেন্স দিলেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হচ্ছে না। কারণ থাসা একা এসে লজেন্স চাইলেও সে একার জন্য আসে নি। উপস্থিত কুলিকামিনদের সকলের হয়ে সে এখানে এসেছে। প্রতিদিন সকালে যাত্রা আরম্ভ করার আগে অসিতবাবু আমাদের ছ'টি করে টক লজেন্স দিয়ে দেয়। তার তিন-চারটি সবারই খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তাই অমূল্য এগিয়ে আসে অসিতবাবুর কাছে। বলে, "তোমার রুক্স্যাকে বোধহয় লজেন্সের প্যাকেটটা আছে অসিতদা?"

"কেন?" অসিতবাবু প্রশ্ন করে। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলেন, "প্যাকেট থাকলেও তুই আজ লজেন্স পাবি না। তোকে আজকের বরাদ্দ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

অমূল্য মৃদু হাসে। বলে, "আমার জন্য নয় অসিতদা, কুলিরা চাইছে।"

"কেন চাইবে? ওদের তো লজেন্স দেবার কোন কথা ছিল না।" অসিতবাবু অমূল্যর দিকে তাকায়। থাসাকে দেখতে পায়।

অমূল্য আবার হাসে। বলে, "মেয়েটা চাইছে কয়েকটা লজেন্স। ওরা এত কষ্ট করে আমাদের মাল বইছে।"

থাসা বাংলা না বুঝলেও বোধকরি ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে। সে এগিয়ে আসে অসিতবাবুর কাছে। সবিনয়ে বলে, "খাজাঞ্চিসাব্, দেও না! হাম্‌লোগকো থোরা মিঠা দে দেও।"

এ আবেদন উপেক্ষা করার শক্তি নেই অসিত বসুর। সুতরাং সে রুক্স্যাক খুলে লজেন্সের প্যাকেটটা বার করে। থাসার মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।

অসিতবাবু জিজ্ঞেস করে, "এখানে তোমরা ক'জন?"

"বিশ-বাইশ হোঙ্গে।"

"ঠিক করে গুনে বল ক'জন?"

থাসা সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তাদের গুণতে আরম্ভ করে। একটু বাদে বলে, "উনিশ হুয়া সাব্!"

"তব্ বিশ-বাইশ কিউ বোলা?"

"গলতি হো গিয়া সাব্। লেকিন মুঝ্‌কো দো মিলনা চাহিয়ে।"

"কিঁউ?"

থাসা নীরব। তবে সে কোন মতেই বিচলিত নয়। বরং মুখে মৃদু হাসি।

গুণে গুণে বিশটি লজেন্স থাসার হাতে দেয় অসিতবাবু। তার পরে বলে, "আউর কভী এইসা নহী মাঙ্গেগা। হামারা মিঠা বহুৎ কম হ্যায়।"

থাসা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে সঙ্গীদের কাছে চলে যায়। যাবার সময় শুধু সেলাম করে অসিতবাবুকে, আর মৃদু হেসে বলে যায়, "আপ বহুত আচ্ছা আদমি হ্যায় খাজাঞ্চিসাব্।"

আমরা কষ্ট করে হাসি চেপে রাখি। কিন্তু সুশান্তবাবু গম্ভীর থাকতে পারেন না। আর তাঁর হাসি আমাদের সবার গাম্ভীর্যের অবসান করে। এবং সে হাসি

থেকে অসিতবাবুও বাদ পড়তে পারে না।

হাসি থামলে অসিত গম্ভীর স্বরে বলে, "এটা কি ঠিক হল অসিতদা।"

"কি আবার বেঠিক হল?" অসিতবাবু প্রশ্ন করে।

"এই যে সুন্দর মুখ দেখে লজেন্স উজাড় করে দিলে?"

"করেছি তো বেশ করেছি, তাতে তোর কি?"

"না, আমার কিছু নয়, তবে যার ব্যাপার তাকে একটু জানিয়ে দিতে হবে, এই যা।"

"তুই কি বলতে চাচ্ছিস?"

"বৌদিকে কাল একখানা চিঠি দিতে হবে।"

অসিতবাবু কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলে, "ভাই অসিত, তোকেও একটা লজেন্স দিচ্ছি।"

"একটাতে হবে না," অসিত গম্ভীর স্বরে বলে, "কমপক্ষে দুটো লজেন্স ঘুষ দিলে ব্যাপারটা চেপে যেতে পারি।"

"এই নে।" অসিতবাবু অসিতের হাতে দুটো লজেন্স গুঁজে দিয়ে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখে।

আমরা হেসে উঠি।

আবার শুরু হয় পথ চলা। তেমনি চড়াই-উৎরাই বনময় পথ। মাঝে মাঝে একেবারে নদীর তীরে নেমে আসছি। তারপরেই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গল পেরিয়ে উঠতে হচ্ছে ওপরে। কোথাও কোথাও নদীর তীরে পাথুরে বেলাভূমি। তবে গতদিনের মতো পাথর পড়ার জায়গা বড় একটা পেরোতে হচ্ছে না। আজকের পথ খুবই কষ্টকর কিন্তু পরশুর মতো বিপজ্জনক নয়।

এইমাত্র একটা নালা বেয়ে ওপরে উঠেছি। রীতিমত হাঁফাচ্ছি। কিন্তু দাঁড়াবার অবকাশ নেই। আরেকটি নালা বেয়ে এখুনি নামতে হবে নিচে। নিরুপায় হয়ে অবরোহণ শুরু করি।

ওপারের দিকে নজর পড়ে। নদীর ওপারে তেমনি রঙীন ফুল—নানা রং। সবুজ বন আর সাদা বরফ। জেমু চু এখনও পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিতা। আমরা তার বাঁ তীর ধরে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছি। চলেছি তো চলেছিই। এ চলার বোধ করি শেষ নেই, আমরা অন্তহীন হিমালয়ে অনন্তকালের যাত্রী।

কেবল ওপারে নয়, এপারেও তেমনি ফুলের মেলা। রডোডেনড্রনই বেশি—লাল গোলাপী হলুদ বেগুনী ও সাদা রডোডেনড্রন। যেমন আলাদা রং, তেমনি আলাদা গড়ন। গাছগুলো দু-ফুট থেকে বিশ ফুট উঁচু। তবে অন্য ফুলও প্রচুর রয়েছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে নানা রকমের প্রিমূলা আর মেকানোপ্সিস (Mecanopsis)। মাঝে মাঝে হিমালয়ান পপি দেখতে পাচ্ছি—হলুদ নীল ও নেভী-ব্লু রঙের পপি। ব্লু-পপি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুলগুলির অন্যতমা। অতএব বলতেই হবে সিনিয়লচুর পথ অন্তহীন হলেও কুসুমাস্তীর্ণ।

না, পথ অন্তহীন নয়। জগতে কোন পথই অন্তহীন হতে পারে না। সব পথেরই শেষ আছে। আমাদের পথও শেষ পর্যন্ত শেষ হল। শেষ হল আজকের মতো।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি শিবিরে—সামনেই সারি সারি তাঁবু। জায়গাটার নাম পোকে, উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট।

এখন বেলা আড়াইটে। তার মানে প্রায় সাত ঘণ্টা পদচারণা করেছি। সাত ঘণ্টায় ১৬ কিলোমিটার হেঁটেছি। ভালই এসেছি বলতে হবে।

আমি ও বিনীত একসঙ্গে পৌঁচেছি। আমাদের আগে কেশব ও শরদিন্দু। কেশবের কথা আলাদা। সে ট্রেন্ড মাউন্টেনীয়ার। কিন্তু শরদিন্দু কাল কথা দিয়েও কথা রাখে নি। আজও সে একা একা হেঁটেছে। কাজটা ঠিক করে নি। তবু আজ আর অমূল্য তাকে কিছু বলে না। বোধকরি পথ ভুল হয় নি বলেই। এবং বিনীত তাকে অভিনন্দিত করে, "ওয়েল ডান ঘোষ, ভেরী ওয়েল ডান।"

গর্বে আমারও বুকখানি ফুলে ওঠে। শরদিন্দু ডায়না অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলে নয়, সে যে আমার সগোত্র। ঘোষ শব্দটি স্বভাবতই আমাকে পুলকিত করে তুলছে। মনে হচ্ছে আমি শরদিন্দুর এই কৃতিত্বের অংশীদার।

একে একে সহযাত্রীরা সবাই এসে যায়। ইতিমধ্যে চা হয়ে গিয়েছে। এবং এখন বৃষ্টি পড়ছে না। অতএব চায়ের মগ হাতে নিয়ে আমরা চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখছি।

পোকে শিবির ক্ষেত্রটি তেলেমের চেয়ে ছোট। এখানেও একদিকে নদী আরেক দিকে পাহাড়—নিচু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা। জেমু চু-কে ঠিক দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে তার প্রাণধ্বনি শুনতে পাচ্ছি অবিরত।

পোকেও তেমনি রুমেক্স গাছে বোঝাই প্রায় সমতল একফালি প্রান্তর। তারই ওপরে আমাদের তাঁবু পড়েছে। একপাশে একখানা বড় পাথরের সঙ্গে ত্রিপল বেঁধে বুনো গাছের খুঁটির সাহায্যে 'কিচেন' বানানো হয়েছে। সেখানে আগুন জ্বলছে, রান্না চড়েছে। বীরেন যথারীতি তদারকিতে লেগে যায়।

আরও একখানি বড় পাথর রয়েছে প্রান্তরের আরেক পাশে। সেখানে অ্যালকাথিন শীট বেঁধে একদল কুলি ছাউনি বানিয়েছে। থাসা রয়েছে ওদের দলে। অসিতবাবু বলে, "আমরা যে ওদের পাশের তাঁবুতে!"

"তাতে কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করি।

অসিতবাবু উত্তর দেয়, "রাতে যদি আবার মিঠা চাইতে আসে?"

সবার সঙ্গে আমিও হেসে উঠি।

নদীর ধারে একটু নিচে একটা পাথরের গুহার মতো রয়েছে, সেখানেও কয়েকজন কুলি ঠাঁই নিয়েছে। এরকম পাথর রয়েছে তেলেম্ এবং জাক্থাঙে। কাজেই পাঁচ-সাতজনের কোন পদযাত্রী দল এলে অন্তত এ পর্যন্ত তাঁবু ছাড়াই আসতে পারেন।

শুধু বৃষ্টি বন্ধ হয় নি, আকাশ প্রায় মেঘমুক্ত। তেমন হাওয়াও নেই। আমরা তাই জলখাবার খেয়ে মনের আনন্দে বাইরে ঘোরাফেরা করছি আর আকাশের রঙ বদলের পালা দেখছি। আস্তে আস্তে চারিদিকে গোধূলির ছায়া নেমে আসছে—প্রথমে দূরের সাদা পাহাড়ে, তারপরে পাশের সবুজ পাহাড়ে, অবশেষে আমাদের এই পোকে শিবিরে।

দিনের শেষ আলোয় আমি চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। একটা অপরূপ সৌন্দর্য, একটা আশ্চর্য নীরবতা, একটা স্বর্গীয় শান্তি আমার চারিদিকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ফ্রাঙ্ক স্মাইথ তাই বোধকরি বলেছেন—এই সময়টা পাহাড়ে সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর মতো চোখ কান আর কলম আমার নেই। তবু আমি সেই অমর উক্তির সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। স্মাইথ তাঁর 'The Mountain Top' বইতে এই পরমমুহূর্তটি সম্পর্কে লিখেছেন—

"If there is one hill hour more beautiful than any other it is the sunset hour. This is the hour of spiritual beauty, peace and understanding...You will see beauty, the beauty of the hills...the beauty of lights that live the night through, and as you peer over the silence...you will know a peace derived from the soul of all creation."

নয়

পথের পরিবর্তন হচ্ছে, প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু আকাশের কোন পরিবর্তন নেই। আজও আকাশ তেমনি থম্‌থমে—মেঘে ঢাকা বিষণ্ণ আকাশ। আমি শিলং আর চেরাপুঞ্জির আকাশ দেখেছি। আজ মনে হচ্ছে খাসি পাহাড়ের নাম মেঘালয় না রেখে সিকিমের নামই মেঘালয় রাখা উচিত ছিল।

আজ ২০শে মে। ছ'দিন হল গ্যাংটক থেকে বেরিয়েছি। গ্যাংটক ছাড়ার পরে সূর্যের সঙ্গে সামান্য সাক্ষাৎই হয়েছে। গত তিনদিন দিবাকরের দেখা প্রায় পাই নি বলা চলে। আজও আকাশের কোন পরিবর্তন নেই।

মালবাহকদের কথাবার্তা আর হাঁটাচলার শব্দে আজ আরও সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তবু স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে মুখ গুঁজে শুয়েছিলাম। কিন্তু মেটের জন্য তাও আর পেরে উঠি নি। চেতার সহায়তায় চা বানিয়ে মেট ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁবুতে ঢুকে বলেছে, "গুড্ মোনিং সাব্, চায়।"

বাধ্য হয়ে মুখ বের করে বলেছি, "মর্নিং।" তারপরে হাত বাড়িয়ে গরম চায়ের মগটা নিয়েছি।

মেট বলেছে, "সাব্! চায় পীনেকা বাদ তাম্বু ছোড়নে পড়েগা।"

"কিঁউ? এত্না সুবা?" অসিতবাবু প্রতিবাদ করতে চেয়েছে।

মেট মধুর স্বরে বলেছে, "জী সাব্! আজ কুলিলোগকো জল্দি ভেজনা পড়েগা। আজ বহুৎ খতরনাক আউর লম্বা পরাও।"

অতএব চা শেষ করে স্লীপিং ব্যাগের মায়া ছাড়তে হয়েছে। পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছি বাইরে। বিস্মিত হয়েছি। মালবাহকরা তখুনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আস্তানা গুটিয়ে ফেলেছে। আমাদের বাইরে বের হতে দেখেই তারা মালপত্র বাইরে এনে তাঁবু খুলতে লেগে যায়।

সহযাত্রীরা সবাই অবশ্য তখনও তাঁবু ছেড়ে বের হয় নি। কিন্তু মেট এবং সহকারীদের তাগিদে কেউ আর বেশিক্ষণ তাঁবুতে তিষ্ঠোতে পারে নি। বাধ্য হয়ে বাইরে আসতে হয়েছে। আর তারপরেই মালবাহকরা তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে।

নেতা ও সহনেতা অবশ্য আগেই তাঁবু ছেড়েছিল। সহনেতা যথারীতি কিচেনে ঢুকে রান্নায় লেগে গিয়েছে আর নেতা এক হাতে আয়না ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কাটছিল। এইটি এবারে অমূল্যর নূতন সংযোজন। এই অভিযানে এসে সে প্রতিদিন দাড়ি কামাচ্ছে। অথচ উচ্চ হিমালয়ে এসে দাড়ি কাটা নিয়ম নয়। কেউ কাটে না। কেবল গালে জল লাগাবার ভয়ে নয়, দাড়ি শীত শীতল বাতাস ও তুষারের ছোবল থেকে মুখখানিকে রক্ষা করে। সাহেবরা হিমালয়ের দাড়ি নিয়ে দেশে ফিরতেন। আমিও অনেকবার ঘরে ফিরেছি। কিন্তু এখন ফেরার পথে রেলে ওঠার আগে কেটে নিই। কারণ কয়েক বছর হল আমার অধিকাংশ দাড়ি পেকে গিয়েছে। পাকা দাড়ি নিয়ে কলকাতায় ফেরা আর নিজেকে অকালপক্কদের তালিকাভুক্ত করা একই কথা।

বীরেনের তৎপরতায় সকাল সাড়ে ছ'টায় আজ ব্রেক্ফাস্ট পেয়ে গিয়েছি। তার পরেই নেতা তাগিদ দিয়েছে, "মেট বলেছে, আজকের রাস্তা গত দু'দিনের চেয়ে বেশি—১৮ কিলোমিটার এবং অনেক দুর্গম ও বিপজ্জনক। দেখলে না, মালবাহকরা কেমন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। আমাদেরও এবারে বেরিয়ে পড়া দরকার।"

নেতার আদেশ অমান্য করি নি। লাঞ্চ-এর প্যাকেট স্যাক্-এ ভরে নিয়ে যাত্রা করেছি। এখন সবে সকাল সাতটা।

মালবাহকরা রওনা হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। সাঙ্গো আর নওয়াং ওদের সঙ্গে গিয়েছে। ওরা আগে পৌঁছে তাঁবু টাঙিয়ে রাখবে। আজ আমরা মূল শিবির প্রতিষ্ঠা করব, জেমু হিমবাহে পৌঁছব। আর সিনিয়লচুকে দর্শন করব। আমার বহু বছরের স্বপ্ন সত্য হবে।

শেরিং লাক্পা ও চেতা রয়েছে আমাদের সঙ্গে কিন্তু ওরাও আমাদের মতো এপথে এই প্রথম এলো। তার মানে আমরা কেউ পথ চিনি না। গত দু'দিন মালবাহকরা পথ দেখিয়েছে। আজ তারা এগিয়ে গিয়েছে। আজ পায়েচলা অস্পষ্ট পথরেখা কিংবা মালবাহকদের পায়ের ছাপ সম্বল করে যেতে হবে এগিয়ে।

এখনো পর্যন্ত অবশ্য পথ চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পথরেখা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে সহজে চলা যাচ্ছে না। হয় কিচ্চর না হয় চড়াই অথবা উৎরাই। কোথাও ধস অথবা পাথর পড়ার জায়গা, আবার কোথাও প্রায়-অন্ধকার গভীর বন। বনপথও সমতল নয়। বনময় পাহাড়ের গা দিয়ে সংকীর্ণ পথরেখা। কোথাও পচা পাতা, কোথাও বা মরা গাছের গুঁড়ি—তারই ওপর দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছি।

শেরং ও লাক্পার সঙ্গে শরবিন্দু এগিয়ে গিয়েছে। এখন আমি ও বিনীত চলেছি আগে আগে। আমাদের পেছনে অমূল্য ও সুশান্তবাবু। তাদের পরে অন্যান্য সহযাত্রীরা।

এখন সকাল ন'টা। তার মানে দু-ঘণ্টা হল পোকে থেকে রওনা হয়েছি। কতটা এসেছি? কত আর হবে, তিন-চার কিলোমিটার। যা পথ, তার বেশি আশা করা ভুল।

প্রায় সোজা পশ্চিমে চলেছি। না, সূর্য দেখে কথাটা বললাম না। সূর্যের সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও। হবে বলেও মনে হয় না। বরং যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

কম্পাস দেখে বুঝতে পারছি, পশ্চিমে চলেছি। আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেমু চু—তিস্তা। সে সর্বদা রয়েছে বাঁয়ে। থাকবেই তো। আমরা যে তার জন্মস্থান জেমু হিমবাহে চলেছি।

সহসা বৃষ্টি নামল। জল তো নয়, বরফের হুল। তুষারকণা তীক্ষ্ণ তীরের মতো হাতে গলায় ও মুখে বিঁধছে। তাড়াতাড়ি উইণ্ডপ্রুফের হুড্-টা মাথার ওপরে টেনে দিই। ঘাড় ও মাথা বাঁচে, কিন্তু হাত ও মুখের দুঃখ ঘোচে না।

বৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগে কখন যেন তিস্তা গা-ঢাকা দিয়েছে। জানি সে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আবার তাকে আসতে হবে আমার কাছে। কিন্তু ততক্ষণ পথ চলব কেমন করে?

অমূল্য বলে, "ভাল করে লক্ষ্য করো, কুলিদের পায়ের ছাপ দেখতে পাবে। সেই দাগ দেখে দেখে এগিয়ে চলো।"

তাই করতে হয়। কিন্তু পায়ের ছাপ খুঁজতে গিয়ে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। কারণ এখন একটা প্রায়-সমতল রুমেক্স-এর বন। এখানে পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল।

মালবাহকরা আজ গেল কোথায়? গত দু-দিন পথে বার বার দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। অথচ আজ এখনো পর্যন্ত পাত্তা পাচ্ছি না। আজ অবশ্য ওরা অনেক আগে বেরিয়েছে। তাহলেও তো এমন হওয়া উচিত নয়। আমরা ঠিক পথে চলেছি তো?

না, পথ ভুল হতে পারে না। আমরা যে পায়ের ছাপ দেখে দেখে পথ চলেছি। তাহলে ওদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আরও এক ঘণ্টা হেঁটেছি। এখন বেলা দশটা। না, কুলিদের সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও, তবে একটা ছোট নদী কাছে এসেছে। তারই তীরে তীরে পথ চলছি। আর ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। তাই বলে রোদ ওঠে নি। সূর্যের মুখ দর্শন করা বোধকরি আজও অদৃষ্টে নেই।

নদীটা কিন্তু মোটেই নদীর মতো নয়। তাকে একটি বড় পাহাড়ী ঝরনা বলা যেতে পারে। এই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনীও সুবিশাল তিস্তার অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। ভাবতেও অবাক লাগছে। কিন্তু এই তো প্রকৃতির নিয়ম। বীজ থেকে বনস্পতি, জীবকোষ থেকে জীবন।

নদীর সঙ্গে সঙ্গে গাছের আকারও ছোট হয়ে গিয়েছে। ছোট হয়েছে রডোডেনড্রন। তাদের পাশে পাশে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে জুনিপার অর্থাৎ পাহাড়ী ধূপগাছের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তার মানে আমরা তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় এসে গিয়েছি।

ওপারে অর্থাৎ নদীর ডান তীরে বেশ উঁচু গিরিশিরা, নদীর গা থেকে সোজা উঠে গিয়েছে। এপারেও অবিন্যস্ত পাথরের প্রবাহ তবে অত উঁচু নয়। আমরা তারই ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে অবশ্য নদীর তীরে একফালি করে বেলাভূমি রয়েছে। সেখান দিয়ে অক্লেশে পথ চলা যায় বলে আমরা বেলাভূমি পেলেই নেমে আসছি। এখানে মালবাহকদের পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। ওরাও এইভাবে ওঠা-নামা করে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওরা গেল কোথায়? বেলা এগারোটা

বাজে। প্রায় চার ঘণ্টা হল পোকে থেকে রওনা হয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একজন মালবাহকের সঙ্গে দেখা হল না।

এপারে পথ ফুরিয়ে গেল। ছোট-বড় গাছে-ছাওয়া গিরিশিরাটি একেবারে নদীর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবারে ওপারে যেতে হবে। অসুবিধে নেই কোন। সংকীর্ণ স্রোতাস্বিনী। ইচ্ছে করলে পাথরের ওপরে পা ফেলে ফেলে ওপরে চলে যাওয়া যেত। তবে তার দরকার হবে না। কারা যেন দুটি গাছ ফেলে রেখেছে নদীর ওপরে। তারা কারা? গত বছরের অভিযাত্রীরা? হয়তো হবে।

সাঁকো পেরিয়ে নদীর ডান তীরে এলাম। এখানে এপারের গিরিশিরাটি বেলাভূমি থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে। সামান্য উঁচু গিরিশিরা—বড়জোর শ'চারেক ফুট। আর তার ঢাল তেমন খাড়া নয়। আমরা অক্লেশে ওপরে উঠছি।

গিরিশিরা বেয়ে উঠে আসি ওপরে। বিস্ময়ে ও আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। ক্লান্তিকর পদযাত্রা থেকে সাময়িক অবসর পাওয়া গেল, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে। আমরা চমৎকার একটি সবুজ প্রান্তরে উপনীত হয়েছি। জায়গাটা যেন একটা সমতল পর্বতশিখর—তৃণাচ্ছাদিত মালভূমির মতো। সারা প্রান্তর জুড়ে ছোট-বড় নানা রকমের গাছ, নানা রঙের ফুল। আর রয়েছে একটা ঝুপড়ি—প্রয়োজনে পাঁচ-সাতজন লোক রাত্রিবাস করতে পারে।

এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত। যে যেখানে পারি, তাড়াতাড়ি বসে পড়ি। ভারী আরাম লাগছে।

একটু বাদে বীরেন বলে, "এটা জেমু উপত্যকার সব চেয়ে সুন্দর শিবিরক্ষেত্র, নাম ইয়াবুক। এর উচ্চতা ১৪ হাজার ফুটের মতো। এখানে অন্যান্য গাছের সঙ্গে নানা জাতের রডোডেনড্রন রয়েছে।"

"নাম বলুন।" বীরেন থামতেই বিনীত ফরমাশ করে।

বীরেন উত্তর দেয়, "রডোডেনড্রন লেপিডোটাম, অ্যান্‌থোপোগন ও ক্যাম্পিন্যুলাটাম ইত্যাদি।"

"এখানে আর কি কি ফুল আছে বীরেনদা?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

বীরেন জবাব দেয়, "রয়েছে মেকানপ্‌সিস নেপালেন্‌সিস ও মেকানপ্‌সিস হরিজুলা। সব ফুল অবশ্য এখনও ফুটতে শুরু করে নি। আর ঐ জলার ধারে রয়েছে প্রিমূলা ডেন্টিকুলাটা ও প্রিমুলা মাইক্রোফাইল। আরও অনেক জানা-অজানা ফুল ও গাছ রয়েছে এখানে। তবে সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।" একবার থামে বীরেন, তারপরে আবার শুরু করে, "এখান থেকে নেমে গিয়েই আমরা পৌঁছব জেমু হিমবাহের প্রাবরেখায়। খুবই কষ্টকর পথ পড়ে আছে সামনে। কম করে আরও নয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। কাজেই আর দেরি না করে এবারে চলো ওঠা যাক।"

"আরেকটু বসলে কিন্তু ভাল করতেন বীরেনদা!" অসিত মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"কেন বল তো!" বীরেন বিস্মিত।

"চা খাওয়াতে পারতাম।"

"থ্রি চিয়ার্স ফর্‌ কমরেড্‌ অসিত মৈত্র..." অসিত বসু চিৎকার করে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত স্বরে সাড়া দিই সবাই, "হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্..."

জনতার দাবীর সামনে নেতা ও সহনেতাকে নতি স্বীকার করতে হয়। তারা অসিতের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

অসিত চেতাকে বলে, "কিচেন কিট্ খোলো।"

সে পাথর দিয়ে উনান বানায়। অসিতবাবু আইস-এক্স দিয়ে জুনিপার কাটতে শুরু করে।

আমি নীরবে চারিদিক দেখতে থাকি। আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি জেমু হিমবাহে—আমার শৈশবসাথী তিস্তার জন্মভূমিতে।

"এটাও তো জেমু হিমবাহের গ্রাবরেখা?" সুশান্তবাবু বীরেনকে জিজ্ঞেস করেন।

বীরেন উত্তর দেয়, "তা বলতে পারেন, তবে এটা মৃত অংশ।"

"মৃত অংশ!"

"হ্যাঁ, দেখছেন না কি রকম গাছপালা গজিয়ে গিয়েছে! জেমু হিমবাহ বছরে প্রায় শ'খানেক ফুট করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর তারই ফলে এই চমৎকার শিবিরক্ষেত্রটি সৃষ্টি হয়েছে।" বীরেন বলে চলে।

কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। আমরা জেমু হিমবাহে উপনীত হয়েছি। যুগে যুগে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহীরা পদচারণা করেছেন এখানে। এই হিমবাহের কোলে বসে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনিয়লচু....। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?

দেখব কেমন করে? আকাশে মেঘ আর মাটিতে গিরিশিরা। তারা যে সিনিয়লচুকে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু কেন?

কেন প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আচরণ? আমি যে তাকে দেখার জন্যে এতদূর থেকে ছুটে এসেছি, এ খবর তো তাঁর অজানা নয়! তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করবেন। আমার আঠারো বছরের স্বপ্ন আজ সত্য হবে, সুন্দরের অভিসার সার্থক হবে।

হিমবাহের হিমেল হাওয়া—যেমন আগুন জ্বালাতে সময় লেগেছে, তেমনি বসে থাকতে কষ্ট হয়েছে। তবু অসিত চা বানিয়ে ফেলেছে। এবং গরম চা সকল কষ্টের উপশম করল। চা ও খাবার খেয়ে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করি পথ চলা।

ঘড়ি দেখি। সবে সাড়ে এগারোটা। বীরেন বলেছে—আর ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো মূল শিবিরে। তখনও দিনের আলো থাকবে। বৈকালী রোদের সোনালী আলোয় আমি সিনিয়লচুকে দেখব। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

সবুজ-সমতল শেষ হয়ে গেল। আমরা ইয়াবুক থেকে নেমে চলেছি। খাড়া উৎরাই। সাবধানে নামতে হচ্ছে।

প্রায় পাঁচ-ছ শ' ফুট একটানা উৎরাই ভেঙে উপস্থিত হলাম পাথুরে প্রান্তরে। কিন্তু এ পাথর সে-পাথর নয়। বিরাট বিরাট পাথর—স্তূপাকারে পড়ে আছে সর্বত্র। তারই ওপর দিয়ে অতি সাবধানে চলতে হচ্ছে।

চলা সত্যি কষ্টকর। কখনো বড় পাথরের পাশ দিয়ে, কখনো তলা দিয়ে, আবার কখনও বা সেই স্তূপ অতিক্রম করে।

এবারে কোন্‌দিকে যাবো? থমকে দাঁড়াই। কেবল আমি নই, বিনীতও বিভ্রান্ত। একে আমরা নদীর তীর থেকে বহুদূর সরে এসেছি, তার ওপরে পাথর বলে

পায়ের ছাপ নেই।

খোঁজাখুঁজি করতে বিনীতের বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। তার পরে দুখানি বড় পাথরের মাঝে কয়েকটি জুতোর ছাপ পাওয়া গেল। ভাগ্যিস এখানে একটু ছাই রঙের মাটি রয়েছে। বিনীত বলে, "এখন থেকে এই ভাবেই দেখে দেখে এগোতে হবে। পথ ভুল হলেই হিমবাহের ভেতরে চলে যাবার সম্ভাবনা। তাহলে আর শিবিরে পৌঁছতে পারবেন না।"

অমূল্য ও সুশান্তবাবু আমাদের অনুসরণ করছে। বাকি সদস্যরা রয়েছে তাদের পেছনে। তারা দূর থেকে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলছে।

কেবল শরদিন্দু নেই সঙ্গে। সে শেরিং ও লাক্‌পার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছে। বেচারী চা-ও খেতে পারে নি। কিন্তু আমরা কি করব? সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পথ চলবে না। কেন? সে-ই জানে।

একটা কথা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আজ মালবাহকরা কোথায় গেল? ওরা আমাদের আগে বেরিয়েছে, কিন্তু ওরা মাল বইছে, ওদের সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে! একজনও কি পেছিয়ে পড়ে নি!

"বাঁদিকে দেখুন, জেমু হিমবাহের গোমুখী—গ্লেসিয়ার স্নাউট।"

বিনীতের কথা শুনে সেদিকে তাকাই। ঠিকই বলেছে সে। হিমবাহের ভেতরে, অনেকটা দূরে, বোধহয় মাইলখানেক হবে, প্রকাণ্ড বড় গুহামুখ—গ্লেসিয়ার-স্নাউট।

থমকে দাঁড়াই। এ যে আমার শৈশবসাথী তিস্তার জন্মস্থান। ওখান থেকে জন্ম নিয়ে হিমবাহের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে পুবে। ঐ জলধারার স্থানীয় নাম জেমু চু, আমার কাছে তিস্তা—শুধুই তিস্তা।

গ্রাবরেখার শেষে অর্থাৎ আমাদের ডানদিকে আরেকটি জলধারা দেখা যাচ্ছে। ঐ ধারাটি এসেছে গ্রীনলেক থেকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদোদক নিয়ে আসছে তিস্তার বুকে। স্থানীয়রা ঐ ধারাটিকেও জেমু চু বলেন। কারণ কিছুদূরে গিয়ে দুটি ধারা এক হয়ে গিয়েছে।

ঐ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের মূল শিবির। সেখান থেকে ওর উৎস গ্রীনলেক মাত্র ৮/১০ কিলোমিটার—একবেলার পথ। ঐ হিমবাহ-হ্রদের তীরে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের মূল-শিবির স্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা শুধু সিনিয়লচুর পাদদেশে নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছেও যাচ্ছি বৈকি।

কাছে যাচ্ছি কিন্তু তার পাদদেশে পৌঁছতে পারব না। আমি যে পর্বতাভিযানে এসেছি। অভিযানের স্বার্থে দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দেখা হবে না গ্রীনলেক।

না হোক, আজ তো সিনিয়লচুকে দেখতে পাবো। আমার সুন্দরের অভিসার সার্থক হবে, আঠারো বছরের স্বপ্ন সত্য হবে।

তুষারপাত কিছু কমেছে কিন্তু বাতাসের বেগ পড়ে নি। আমরাও চলা থামাই নি। সমস্ত দৈহিক কষ্টকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছি। আজ যে সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হবে আমার!

পাথরে পায়ের ছাপ পড়ে না। ভাগ্যিস পাথরের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু মাটি রয়েছে। সেই মাটির ওপরে জুতোর ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছি।

আবার একটি প্রায়-সমতল প্রান্তর। এটি ইয়াবুকের চাইতে ছোট। কিছু বড় গাছ, থুজা ও জুনিপার রয়েছে। আর রয়েছে ঝরনা। প্রান্তরে পড়ে আছে কয়েকখানি বড় বড় পাথর। তারই একখানিতে লাল রং দিয়ে লেখা—

'Sugarloaf Expedition, 1979.
Base Camp
Himalayan Association, Calcutta.'

মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম বে-সরকারী পর্বতারোহণ সংস্থার অভিযাত্রীরা এখানে এসেছে। তারা ২১,১২৮ ফুট উঁচু সুগারলোফ শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেছে।

সুগারলোফ জেমু হিমবাহ অঞ্চলের আরেকটি অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গে মানুষ প্রথম আরোহণ করে ১৯৩১ সালে। সে বছর এক জার্মান অভিযাত্রীদল কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেষ্টা করেন। পল বওর ছিলেন অভিযানের নেতা। সেই অভিযানকালে অলওয়েইন (Allwein) এবং ব্রেনার (Brenner) সুগারলোফ শিখরে আরোহণ করেছেন।

সেটি ছিল বওর-য়ের দ্বিতীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান।* সে অভিযানও বিফল হয়। এবং দুর্ভাগ্যের কথা অভিযানকালে ৯ই অগাস্ট অভিযাত্রী হর্ম্যান শ্যালার (Herman Schaller) ও পাসাং নামে একজন মালবাহক মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা সেই দুর্ঘটনার পরেও বওর অভিযান চালিয়ে যান। ২৪,১৫০ ফুট উঁচুতে এগারো নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হ্যান্স হার্টমান (Hans Hartmann) ও কার্ল উইয়েন ২৫,২৬৩ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। কিন্তু তারপরে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই প্রান্তরটি পর্বতাভিযানের আদর্শ শিবিরক্ষেত্র। বেশ সুসমতল এবং জল ও জ্বালানী রয়েছে। তাই কলকাতার সুগারলোফ অভিযাত্রীরা এখানেই তাঁদের মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আগুন জ্বালাতে পারলে ভাল হত, হাত-পা সেঁকে নেওয়া যেত। কিন্তু তার সময় নেই। অতএব পেট পুরে জল খেয়ে নিয়ে শুরু করি পথ চলা।

আবার আরম্ভ হয় পাথর—শিবিরক্ষেত্রটি ছাড়িয়েই। প্রান্তরটি যেন পাথরের মরুভূমিতে মরূদ্যান। সত্যই অভিনব অবস্থান। প্রকৃতির কি বিচিত্র সৃষ্টি!

---

* প্রথম অভিযান ১৯২৯ সালে। দু-বারই বওর জেমু হিমবাহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেষ্টা করেছেন। মানুষ এই পর্বতে আরোহণ করেছেন অনেক পরে, ১৯৫৫ সালে।

তিনটি প্রধান শিখর নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত—মূল শিখর (২৮,২০৮´), দক্ষিণ শিখর (২৭,৮০৩´) এবং পশ্চিমশিখর (২৭,৬২৫´)। চার্লস ইভান্স-এর নেতৃত্বে এক বৃটিশ নিউজিল্যাণ্ড অভিযাত্রীদল ১৯৫৫ সালে মূল ও দক্ষিণশিখরে প্রথম আরোহণ করেন। দক্ষিণশিখরে আরোহণ করেছেন চার্লস ইভান্স নিজে, ১৬ই মে আর মূল শিখরে আরোহণ করেন জর্জ ব্যাণ্ড, জো ব্রাউন, নর্ম্যান হার্ডি এবং এইচ. আর. এ. স্ট্রীথার—২৫শে মে (১৯৫৫)।

কিন্তু কেবল ঐ শিবিরক্ষেত্রটি তো নয়, এই সীমাহীন পাথুরে প্রান্তরও যে তাঁরই সৃষ্ট। কেন এই বৈচিত্র্য?

এই বৈচিত্র্যের জন্যই সাগর মাটি আর পাহাড় হয়েছে। হয়েছে সিনিয়লচু। আর সে হয়েছে বলেই আমি আজ এসেছি এখানে, এই জেমু হিমবাহে। আমি প্রকৃতির অপরূপ রূপবৈচিত্র্য দেখতে এসেছি। এসেছি সুন্দরের অভিসারে।

এসেছি একটি নদীর তীরে। আমি তার কাছে এসেছি, না সে আমার কাছে এসেছে বলতে পারব না। তবে আমি তার পাশে পাশে পথ চলছি।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন বেলা একটা। বীরেনের হিসেবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মূল-শিবিরে পৌঁছে যাবো। ভাবতেও ভাল লাগছে। সেখানে গিয়ে তাঁবু পাবো, গরম খাবার পাবো আর সিনিয়লচুকে দেখব।

বাতাস বাড়ছে। বাতাস তো নয়, তুষারপ্রবাহ। একেবারে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আবহাওয়া আরও খারাপ হচ্ছে। আবার বৃষ্টি নামবে নাকি?

না, বৃষ্টি নয়। এখানে বৃষ্টি হয় না। বরফ পড়ে। তাই পড়া শুরু হল—তুষারপাত। বাতাসের সঙ্গে ছুটে আসছে তুষারকণা। নাকে-মুখে ছুঁচের মতো বিধছে। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

বিনীত ধমক লাগায়, "একদম তাড়াহুড়ো করবেন না, একে পাথর তার ওপর ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না, সব ঝাপসা হয়ে উঠেছে।"

ঠিকই বলেছে বিনীত। আস্তে আস্তে এগোতে থাকি। জেমু চু-য়ের তীর ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি।

সুগারলোফ অভিযানের শিবির থেকে দেড় ঘণ্টা হেঁটেছি। এখন বেলা দুটো। আর বোধকরি বেশিক্ষণ হাঁটতে হবে না। ক্লান্তিকর পদযাত্রার যতি আসন্ন। সামনে একটি উপত্যকার মতো দেখা যাচ্ছে। ওখানে বড় পাথর নেই। নুড়ি বিছানো জুনিপারে বোঝাই নাতিপ্রশস্ত প্রায়-সমতল সুদীর্ঘ প্রান্তর, দিগন্তের দিকে প্রসারিত। প্রান্তরের বাঁয়ে উঁচু গিরিশিরা আর ডাইনে নদী। তাড়াতাড়ি পা চালাই। এবারে আর বিনীত বাধা দেয় না।

না, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। ঐ তো মানুষ দেখা যাচ্ছে। একজন....দু'জন....। হ্যাঁ, দুজন মানুষ। গিরিশিরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে!

মানুষ যখন, তখন আমাদেরই লোক। কিন্তু মাত্র দুজন কেন? বাকি সবাই কোথায়? আর তাঁবুই বা দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বোধহয় আড়ালে পড়ে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ওখানে গেলে দেখা যাবে। ওরা তাহলে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

বেলা আড়াইটে। এত আগে মূল শিবিরে পৌঁছব ভাবতে পারি নি। আমি ও বিনীত ওদের কাছে আসি। হ্যাঁ, আমাদেরই লোক—শেরিং ও লাক্পা। ওরা কি করছে এখানে? কোথায় শিবির?

শেরিং কাছে আসে। হতাশ স্বরে বলে, "সাব্! রাস্তা ভুল হো গিয়া।"

কি বলছে লোকটা! রাস্তা ভুল হয়েছে! এই তো গ্রীনলেকের জেমু চু, আমাদের পাশে!

বিনীত ধমক লাগায় তাকে, "কৌন বোলা তুমকো?"
"কোই বোলা নহী সাব! লেকিন জরুর ভুল হুয়া হ্যায়।"
"কেইসে সমঝা তুমনে?" প্রশ্ন করি।
শেরিং আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একই কথা বলে, "রাস্তা জরুর ভুল হুয়া হ্যায় সাব্! ইয়ে রাস্তা নহী হ্যায়।"
বিনীতকে বলি, "ও বলছে বটে কিন্তু রাস্তা ভুল হবে কেমন করে, আমরা তো কুলিদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে পথ চলেছি।"
শেরিং নেপালী হলেও দার্জিলিঙে থাকে। সে বাংলা বুঝতে পারে। তাই বিনীত কিছু বলার আগেই বলে ওঠে, "ও কুলিকে পায়েরকে ছাপ নহী হ্যায়।"
"কাদের তাহলে? সিকিমের ভূতরা বুঝি আজকাল গামবুট পায়ে দিতে শুরু করেছে?" বিনীত তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে।
"নহী সাব্। ভূত কেইসা জুতিকে ছাপ ছোড় যায়েঙ্গে? ওহ্ ছাপ হাম তিনো লোগকে হী হ্যায়।"
কথাটা তো নেহাত মিথ্যে বলে নি শেরিং। ওরা আগাগোড়া আমাদের আগে আগে চলেছে। আমরা হয়তো ওদের পায়ের ছাপ দেখে দেখেই সারাদিন পথ চলেছি।
কিন্তু নদী? এই যে গ্রীনলেকের জেমু চু আমার পাশে রয়েছে! তাহলে পথ ভুল হবে কেমন করে?
শেরিং ঘোষণা করে, "ইয়ে জেমু নালা নহী হ্যায়।"
"এটা কি তাহলে?"
"কোই দুসরা নালা হোগী। গেলেসিয়ারমে এইসী বহুৎ নালা নিকালতী।"
বিনীতের দিকে তাকাই। বিনীত বলে, "এখানে একটু বসা যাক। লীডার আসুক, তারপরে যা হোক করা যাবে।"
কিন্তু এখানে বসে থাকা খুবই কঠিন। তুষারপাত বন্ধ হয় নি, তেমনি হাওয়া দিচ্ছে। জায়গাটার উচ্চতা বোধকরি হাজার পনেরো ফুট। চলার ওপরে থাকলে তবু একরকম। বসে থাকা মানেই জমে যাওয়া। আমি হ্যাভারস্যাক্ নামিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করতে থাকি। অমূল্যরা প্রায় এসে গিয়েছে।
হঠাৎ নজর পড়ে ওদিকে—তিনটি রুক্স্যাক্। কিন্তু ওরা তো দুজন, শেরিং ও লাক্পা। তাহলে তিনটে রুক্স্যাক্ কেন?
তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "আর কে আছে তোমাদের সঙ্গে?"
"আভি নহী হ্যায় সাব্, লেকিন থা।"
চমকে উঠি—কি বলছে শেরিং! ছিল, এখন নেই! তাহলে কোথায় গেল? চিৎকার করে উঠি।
"কৌন থা?"
"জী শরদিন্দুসাব্।"
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। শরদিন্দু আজ সকাল থেকেই ওদের সঙ্গে পথ চলেছে। কিন্তু সে কোথায় গেল?
লাক্পা উত্তর দেয়, "পথ খুঁজতে।"

"কোথায় গেছে?"

"এই গিরিশিরার ওপরে উঠে গেছে।"

"কতক্ষণ আগে?"

"তা আধঘণ্টা হয়েছে।"

হে ঠাকুর, এ তুমি কি করলে? শরদিন্দু যে এই প্রথম পর্বতাভিযানে এলো। হিমবাহ অঞ্চলে এসব গিরিশিরা একেবারে গোলকধাঁধা। একবার পথ হারিয়ে গেলে....

আর ভাবতে পাচ্ছি না। চিৎকার করে অমূল্যকে বলি, "তাড়াতাড়ি আয়, এদিকে বোধহয় সর্বনাশ হয়ে গেল।"

অমূল্য আসে, তার সঙ্গে সুশান্তবাবু।

শেরিং তাকে একই ভাবে পথ হারাবার কথা বলে।

কিন্তু অমূল্য তার মত মেনে নেয় না। বলে, "এটাই জেমু চু। এখানে না থেমে এগিয়ে যাওয়াই উচিত হবে।"

"তাহলেও এখন এগনো যাবে না।" বিনীত বলে।

"কেন?" অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

আমি উত্তর দিই, "শরদিন্দু missing!"

"Missing!" সুশান্তবাবু চিৎকার করে ওঠেন।

"হ্যাঁ, সে পথ খুঁজতে গেছে!"

সব শুনে অমূল্য বলে, "শরদিন্দু কাজটা ঠিক করে নি। তাহলেও missing বলছ কেন? এখনও দিনের আলো রয়েছে, ঠিক এসে যাবে।"

নেতার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। সকল আশঙ্কা মিথ্যে করে শরদিন্দু ফিরে আসুক। কিন্তু আমি পর্বতারোহী নই, আমি অমূল্যর মতো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার বার বার মনে পড়ছে গৌরাঙ্গের কথা—চুঁচড়ার গৌরাঙ্গ চৌধুরী। খুব ভাল পর্বতারোহী ছিল সে। ১৯৬৫ সালে গিয়েছিল গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী-১ (২১,৮৯০) অভিযানে। ২১শে সেপ্টেম্বর সকালে পথ খুঁজতে গিয়ে আর শিবিরে ফিরে আসে নি। হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো।*

"কিন্তু এখানে যা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে যে জমে যাবো!" সুশান্তবাবু বলেন, "তাছাড়া পথ যদি সত্যই ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আজ আর শিবির খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁবু, খাবার ও স্লীপিং ব্যাগ কিছুই যে সঙ্গে নেই।"

"না, না। পথ ভুল হয় নি।" অমূল্য ভরসা দেয়, "শিবির নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু শরদিন্দু ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে, এই যা।"

"বড্ড শীত করছে যে!" সুশান্তবাবু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন।

আমার অবস্থাও মোটেই ভাল নয়। সত্যি এভাবে এখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে শিবিরে যাবার শক্তি থাকবে না।

অমূল্য বলে, "লাক্‌পা, তুমি ওপরে চলে যাও! দেখ দেখি শরদিন্দুকে দেখা

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' (হিমালয়—১) অথবা 'সোনা সুরা ও সাকী' দ্রষ্টব্য।

যায় কিনা। শেরিং, তুমি পেছনে চলে যাও, সাব্‌দের ওখানে দাঁড়াতে বলো। আর বিনীত এসো দেখি, আগুন জ্বালানো যায় কিনা।”

লাক্‌পা গিরিশিরা বেয়ে ওপরে উঠে যায়, শেরিং চলে যায় পেছনে অসিতবাবুদের থামিয়ে রাখতে। আর অমূল্য ও বিনীত জুনিপার জড়ো করে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। আমিও ওদের সঙ্গে হাত মেলাই।

পারি না। বহুক্ষণ চেষ্টা করেও আমরা আগুন জ্বালাতে পারি না। পারব কেমন করে? একে বরফ পড়ছে, তার ওপরে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। এখানে একদিকে গিরিশিরা আর তিন দিকই খোলা, একটুও আড়াল নেই। নেই কোন বড় পাথর। নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করার চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আগুন জ্বালানো গেল না।

লাক্‌পা ফিরে আসে। সে কাউকে দেখতে পায় নি।

এখন কি করব? শরদিন্দু ফিরে না এলে এখান থেকে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। শীতে সারা শরীর হিম হয়ে গিয়েছে। থর থর করে কাঁপছি।

“বুঝতে পারছি তোমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আর একটু কষ্ট করো, সাড়ে তিনটে বাজে, আমরা চারটে পর্যন্ত এখানে শরদিন্দুর জন্য অপেক্ষা করব।” অমূল্য বলে।

জিজ্ঞেস করি, “তারপরে কি করবি? পেছিয়ে যাবি?”

“না, পেছিয়ে গিয়ে কোন লাভ হবে না। ইয়াবুকের সেই ঝুপড়িটার আগে কোন আশ্রয় নেই। জায়গাটা এখান থেকে ছ কিলোমিটারের কম নয়। সেখানে পৌঁছবার অনেক আগেই রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারে অত পাথর পেরিয়ে সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা এগিয়ে যাবো।”

“এগিয়ে যাবি?”

“হ্যাঁ। তাতে শরদিন্দুকে খুঁজে পাবার ও কুলিদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস, পথ ভুল হয় নি।”

আর ভাবতে পারছি না। চুপ করে থাকি। তুষারপাত ও বাতাস বাড়ছে, আলো কমছে। চারটে বাজে নি কিন্তু মনে হচ্ছে গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে এই মৃত্যুশীতল জেমু হিমবাহের বুকে। জীবনের এক কঠিনতম প্রতীক্ষায় রত রয়েছি। কিসের প্রতীক্ষা? শরদিন্দুর প্রত্যাবর্তনের না নিজের মৃত্যুলগ্নের?

নিজের চেয়ে এখন শরদিন্দুর কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে। সে শেরিঙের কথা বিশ্বাস করে আমাদের মঙ্গলের জন্যই পথ খুঁজতে গিয়েছে। কিন্তু তাকে একা এগিয়ে যেতে বার বার নিষেধ করেছি। আমাদের জন্য তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। শেরিং ও লাক্‌পা দুজন যখন তার সঙ্গে ছিল, তাদের একজনকে সে নিয়ে যেতে পারত। তার মতো অনভিজ্ঞ অভিযাত্রীর পক্ষে এই আবহাওয়ায় এই দুর্গম হিমবাহে একা পথ খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা। পথ খুঁজে পেলেও সে আর এ জায়গাটা খুঁজে পাবে কি?

“ঐ যে কে আসছে!” বিনীত সহসা চিৎকার করে ওঠে।

সেদিকে তাকাই, সামনের দিকে। সত্যি তাই। তুষারপাতের মধ্যে ছায়ামূর্তির

মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন মানুষ টলতে টলতে এদিকে আসছে।

"কে?" একসঙ্গে সবাই চিৎকার করে উঠি।

কোন সাড়া নেই।

তাহলে কি আমরা ভুল দেখছি?

না, ভুল নয়। ছায়ামূর্তিটা নড়ছে। এদিকে আসছে।

নিজের অলক্ষ্যে ছুটতে শুরু করি। বিনীত আর লাক্‌পাও আমার সঙ্গে ছুটছে। চেঁচিয়ে উঠি—"কে?"

"আ....ম....ই..."

সাড়া দিয়েছে। ছায়ামূর্তি সাড়া দিয়েছে। মানুষ। মানুষের সাড়া পাওয়া গেছে এই মনুষ্যহীন মৃত্যুশীতল প্রান্তরে।

আবার ছুটে চলি। ছায়ামূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

ছায়া কায়ায় পরিণত হল। আমাদের মতোই মাথায় টুপি, চোখে চশমা, গায়ে উইণ্ডপ্রুফ। কে?

"শরদিন্দু!" বিনীত চিৎকার করে ওঠে। ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

পাওয়া গেছে। শরদিন্দুকে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া শরদিন্দু ফিরে এসেছে। হিমালয়, তুমি করুণাময়। সিনিয়লচু, তুমি সুন্দর—অনন্ত সুন্দর।

ক্লান্ত ও অবসন্ন শরদিন্দু কোনমতে বলে ওঠে, "পেয়েছি।"

"কী?"

"শিবির। শিবির দেখতে পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"এই দিকে।" সে হাত দিয়ে সামনের দিকটাই দেখায়।

"কতদূর এখান থেকে?"

"তা দু-তিন কিলোমিটার হবে।"

"তাহলে আমাদের পথ ভুল হয় নি?"

"না।"

অপদার্থ শেরিং। অযথা আমাদের থামিয়ে দিয়ে প্রায় দু-ঘণ্টা দুঃসহ কষ্ট সইতে বাধ্য করেছে। শেরিং শেরপা নয়, মালবাহক। কিন্তু সে শেরপাদের দেশের মানুষ, বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে। ভেবেছিলাম তাব অনুমান একেবারে মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, লোকটা কিছুই বোঝে না। ভাগ্য ভাল, তার ভুলের জন্য আরও বেশি খেসারত দিতে হল না। শরদিন্দুকে ধন্যবাদ, সে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে তার এমন একা যাওয়া উচিত হয় নি। যাক্ গে, সে ফিরে এসেছে।

আমরা অমূল্যদের কাছে আসি। শরদিন্দু হারিয়ে গেছে শুনে সে যেমন বিচলিত হয় নি, তেমনি সে ফিরে এসেছে দেখেও অবিচলিত রইল। সব শুনে শুধু শরদিন্দুকে বলল, "শেরিঙের কথা শুনে একা একা এগিয়ে যাওয়া উচিত হয় নি তোমার, আমাদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অযথা সবাইকে কষ্ট দিলে।"

"আমি দুঃখিত অমূল্যদা।" শরদিন্দু নতমস্তকে নেতাকে বলে।

অমূল্য তার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলে, "Never mind, Mountaineering-এ

এমন একটু-আধটু হয়। But I must congratulate your courage." একবার থামে সে। তারপরে লাক্‌পাকে বলে, "তাড়াতাড়ি পেছনে চলে যাও। শেরিংকে বল, পথ ভুল হয় নি। সবাইকে নিয়ে আসুক। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।"

স্যাক্ কাঁধে নিই। শেরিঙের রুক্‌স্যাক্ পড়ে থাকে। সে এসে নিয়ে নেবে। এখানে চোর নেই।

অমূল্য বলে, "শরদিন্দু আগে চলো, তুমি আমাদের 'লীড্' করবে।"

"অ্যাজ্ ইওর লীডারশিপ প্লীজেস!"

বহুক্ষণ বাদে আবার হেসে উঠি। আমাদের হাসিতে জেমু হিমবাহ পুলকিত হয়ে উঠছে। বহুদিন বাদে আবার মানুষ এসেছে তার বুকে।

শরদিন্দুর পেছনে এগিয়ে চলি। প্রথমে বিনীত, তার পরে আমি সুশান্তবাবু ও অমূল্য। এখন আমরা একসারিতে চলেছি।

পথে পাথর নেই সুতরাং পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে না। সবচেয়ে মজার কথা বরফ পড়ছে, তবু তেমন শীত লাগছে না। শরদিন্দু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বোধকরি হৃদয়ের উত্তাপ দেহকে উত্তপ্ত করে তুলেছে।

বরফ পড়ছে, আলো কমছে, তবু বেশ দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি আমাদের দৃষ্টিশক্তি বেড়ে গিয়েছে! বাড়তে পারে। হিমালয়ের পথে পথিককে পরিচালিত করে মন, শরদিন্দু ফিরে আসায় সেই মন সকল ইন্দ্রিয়কে সতেজ করে তুলেছে।

আরেকজন মানুষ!

আবার থমকে দাঁড়াই।

এদিকেই আসছে। হাতে ফ্লাস্ক। কি নিয়ে এসেছে? লোকটি কে?

"সাঙ্গে।" শরদিন্দু বলে ওঠে, "চা নিয়ে এসেছে।"

চা! প্রাণদায়িনী পরম-পানীয় গরম চা।

সাঙ্গে কাছে আসে। বলে "নমস্তে সাব্! চায়!"

মাত্র এক ফ্লাস্ক চা। পনেরোজন মানুষ। সবার হবে না। আমরা তো অনেকটা এগিয়ে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবিরে পৌঁছে যাবো। ওরা রয়েছে পেছনে, অনেক পেছনে। ওদের বেশি দরকার।

শরদিন্দু ও বিনীত সমর্থন করে আমাকে।

সাঙ্গেকে বলি, "ক্যামেরা সাহেবকে একটু দিয়ে তাড়াতাড়ি পেছনে চলে যাও। সাহেবদের সবাইকে চা দাও।"

"আপলোগ নহী পীয়েঙ্গা সাব্?" সাঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

"নহী। তুম পিছে চলা যাও।"

"ঠিক হ্যায় সাব্। আপলোগ জল্‌দি চলিয়ে। ক্যাম্প আউর জাদা দূর নহী হ্যায়।"

"কিত্‌নী দূর?"

"তিন কিলোমিটার হোগা।"

সাঙ্গে চলে যায়। আমরাও এগিয়ে চলি। চলতে চলতে শরদিন্দুকে বলি, "সাঙ্গেকে তো ছেড়ে দিলাম, রাস্তা চিনতে পারবি তো?"

"আশা করছি। ওপর থেকে শিবিরের অবস্থানটা দেখে নিয়েছি—সোজা পশ্চিমে।"

বাঁদিকে সেই গিরিশিরা আর ডান-দিকে নদী। দুয়ের মাঝে মাটি আর কাঁকড়ের প্রায় মসৃণ ভূখণ্ড। আস্তে আস্তে সামনে উঁচু হয়ে গিয়েছে। আমরা তারই ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি।

গিরিশিরার গা বেয়ে একটা ঝরনা নেমে এসেছে, নদীতে গিয়ে মিশেছে। ঝরনাটা পার হতে হবে। আলো বড় কম। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। প্যান্ট ভিজে গেলে মুশকিলে পড়ব।

গিরিশিরাটি ঢালু হয়ে সামনের উঁচু জমিতে মিশেছে। আমরা সেখানে উঠে এলাম। জায়গাটা অনেকটা মালভূমির মতো। সামনে আবার ঢালু হয়েছে। নদীটা ডানদিক থেকে মালভূমিকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে।

মালভূমির ওপরে পথরেখা বেশ স্পষ্ট। আমরা সেই পথরেখা ধরে এগিয়ে চলেছি। চারিদিকে ঝোপঝাড়। সবই আবছা দেখাচ্ছে। গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে।

নেমে এলাম মালভূমি থেকে। হঠাৎ তুষারপাত থেমে গেল। কিন্তু নেমে এলো আঁধার, সিনিয়লচুর আপন দেশে সন্ধ্যা হল। আজ আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি?

স্যাক্ থেকে টর্চ বের করি। পথটা মালভূমি থেকে নেমে নদীর ধারে এসেছে, জুতোর ছাপও রয়েছে। কিন্তু এর পরে? না, আর পথ নেই। এবারে কোন্‌দিকে যাবো?

নদীটা একটু বাঁয়ে গিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের এপারে একটু বাদেই একটা পাথরের টিলা। এপারে নদীর তীর দিয়ে এগোবার উপায় নেই।

টর্চের আলোয় শরদিন্দু চারিদিকটা দেখে নেয় ভাল করে। তারপরে হতাশ স্বরে বলে, "বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। তখন তো এমন আড়াআড়ি ভাবে কোনো নদী দেখি নি। তবে নদীর পাশেই আমাদের শিবির হয়েছে।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "আপনারা বরং এখানে একটু দাঁড়ান, আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি।"

ওরা কথা শুনে হাসি পায় আমার। আবার সে একা যেতে চাইছে। বলি, "দেখে আয়, তবে একা নয়, বিনীত সঙ্গে যাক। দুজনেই এখানে রুক্‌স্যাক্ রেখে যা!"

"আপনি একা থাকবেন?" বিনীত বলে ওঠে।

"হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে?" পাল্টা প্রশ্ন করি। বলি, "তোরা নিশ্চিন্তে যা, আমাকে ভূত ধরবে না।"

"বেশ থাকুন।" বিনীত বলে, "তবে টর্চটা জ্বেলে রাখুন।"

"কেন, ভূত আসবে না।?"

"না।" বিনীত উত্তর দেয়, "লীডার পেছনে আসছে, সে দেখতে পাবে। আমরাও সহজে ফিরে আসতে পারব।"

অতএব আমি টর্চ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ওরাও টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলে।

আমি একা। এখানে ঝিঁঝিপোকা কিংবা জোনাকী পর্যন্ত নেই। কেবল আছে নদীর কুলুকুলু শব্দ—আমার শৈশবসাথী তিস্তার কল-কাকলি। আমি নিঃশব্দে সেই শব্দ শুনতে থাকি।

কতক্ষণ কেটেছে বুঝতে পারছি না। ওপরে মালভূমির একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। তাহলে বোধহয় অমূল্য এসে গেল। কেন যেন মনে হচ্ছে সে এলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমরা পথ খুঁজে পাবো।

তাড়াতাড়ি আলো দেখাই। ওরা আসে।

না, অমূল্য নয়। শেরিং ও লাক্‌পা। ওরা পেছনে ছিল। খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছে বলতে হবে। জিজ্ঞেস করি, "লীডার সাব্ কোথায়?"

"পিছে আতা হ্যায়, সাব্।" লাক্‌পা উত্তর দেয়।

শেরিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খুবই স্বাভাবিক। ওর আর কথা বলার মুখ নেই। ওরই জন্য আমাদের এই কষ্ট। তখন ওভাবে না থামিয়ে দিলে আমরা দিনের আলো থাকতেই মূল শিবিরে পৌঁছে যেতাম।

বিনীত ও শরদিন্দু ফিরে আসে। বিনীত বলে, "না ওদিকে পথ নেই।"

"পথটা তাহলে গেল কোথায়?"

"বুঝতে পারছি না।" শরদিন্দু বলে।

এবারে কি সত্যই পথ ভুল হল? না, এ পর্যন্ত তো জুতোর ছাপ রয়েছে। এবং সে ছাপ সিকিমের ভূত কিংবা শেরিঙের নয়, মালবাহকদের। অতএব অমূল্যর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আর যে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। বরফ পড়ছে না বটে তবে বড্ড হাওয়া দিচ্ছে। হিমবাহের ওপবে এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? শীতে হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে। অথচ দাঁড়িয়ে না থেকেই বা উপায় কী?

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটু বাদেই সুশান্তবাবুকে নিয়ে অমূল্য এসে পৌঁছয়।

সব শুনে অমূল্য একবার চারিদিক দেখে নেয় ভাল করে। তারপরে শেরিং ও লাক্‌পাকে জুতোর ছাপগুলো দেখিয়ে বলে, "ঠিক এখান থেকে নদীর ওপারে চলে যাও তো! আমার মনে হচ্ছে ওপারেও পায়ের ছাপ পাবে।"

নেতার আদেশ, সুতরাং শেরিং আপত্তি করতে পারে না। ওপারে যেতে অবশ্য তেমন অসুবিধে নেই। নদীটা এখানে একটি সংকীর্ণ ঝরনার মতো আর বড় বড় পাথরে পরিপূর্ণ। টর্চের আলোয় দেখে দেখে পাথরে পা দিয়ে ওবা অক্লেশে ওপারে চলে যায়। আর গিয়েই লাক্‌পা চেঁচিয়ে ওঠে, "মিল গিয়া সাব্! এহি রাস্তা হ্যায়!"

সাবাস অমূল্য! আমরা পথ হারিয়ে আধঘণ্টা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি আর সে এসে পাঁচ মিনিটে পথ খুঁজে বের করল। এই না হলে নেতা!

নদী পেরিয়ে আসি। লাক্‌পাদের পেছনে এগিয়ে চলি। কুয়াশার জন্য দেখতে পাচ্ছি না বেশিদূর। কেবল বুঝতে পারছি নদীর তীর থেকে খানিকটা ওপরে ওঠে এলাম। পৌঁছলাম উঁচু জমিতে। এখানেও পাথর কম। বড় গাছ নেই। রয়েছে জুনিপার ও অন্যান্য ঝোপঝাড়। তাই ভেঙে এগিয়ে চলি। জানি না কোথায় চলেছি।

ঘড়ি দেখি। সাতটা বাজে। বারো ঘণ্টা হল পদচারণা করছি। জানি না আর কতক্ষণ করতে হবে?

কাদের কথাবার্তা! থমকে দাঁড়াই। হ্যাঁ, ঐ তো টর্চ জ্বেলে কয়েকজন মানুষ আসছে।

ওরা আসে। আমাদের পাঁচজন মালবাহক—ইয়াংরুপ, সোনাম, সামফেল, চেতন ও লামা।

ওরা আমাদের দেখে খুশী হয়। বলে—আপনারা এসে গেছেন সাব্! আমরা আপনাদের নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম।

"ক্যাম্প আর কতদূর?" সুশান্তবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"থোরা সাব্! বহুৎ নজদীগ্।"

"তোমরা কখন এসেছো?"

"তিন বাজে।"

"এতক্ষণে আমাদের কথা মনে পড়ল!" সুশান্তবাবুর স্বরে বিরক্তি।

অমূল্য বলে, "একজন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আর বাকি চারজন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাও। পেছনে অন্য সাহেবরা আসছে। তারা সবাই শ্রান্ত। তাদের রুকস্যাক নিয়ে এসো। আমি ক্যাম্পে গিয়ে আরও লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আমার টর্চটাও দিয়ে দিই ওদের। ওরা তাড়াতাড়ি নেমে যায়। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

"এসে গেছি। ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে।" বিনীত বলে ওঠে।

সত্যি তাই। সামনে আলো দেখা যাচ্ছে। আর বেশি দূর নয়, বরং বেশ কাছে বলা যেতে পারে। আমাদের সুবিধার জন্য ওরা বাইরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই পৌঁছে যাবো ১৫,৮১০ ফুট উঁচু মূল শিবিরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পর্বতশৃঙ্গ সিনিয়লচুর পাদদেশে।

কিন্তু কোথায় সিনিয়লচু? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

দেখব কেমন করে? সে যে মেঘের ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে রেখেছে। আজও দেখা হল না! অথচ বড় আশা ছিল দেখা হবে তার সঙ্গে। আজ আমার আঠারো বছরের স্বপ্ন সত্য হবে!

নাই বা দেখা হল আজ। কাল নিশ্চয়ই সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হবে আমার। আমি যে পৌঁছে গিয়েছি তার কাছে। চোখে দেখতে না পেলেও আমি তার উপস্থিতি অনুভব করছি। সে আছে। রয়েছে আমার কাছে, খুব কাছে।

আমি প্রতীক্ষা করব। তাঁবুর শুয়ে শুয়ে সারারাত প্রভাতের প্রতীক্ষা করব।

সিনিয়লচু, আমি এসেছি তোমার পদতলে। আগামীকাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার। প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।

দশ

ব্রাহ্মমুহূর্তে শুভদৃষ্টি হল। সুন্দরের অভিসার সার্থক হল। আমার আঠারো বছরের স্বপ্ন সত্য হল।

সত্যি বলতে কি এমন অতর্কিতে অদর্শনের যন্ত্রণার উপশম হবে, তা একটু আগেও আশা করি নি। কেমন করে করব? এখনও যে আমাদের এই মূল শিবিরে

প্রভাতের পরশ লাগে নি। রীতিমত রাত রয়েছে। সবে সকাল সাড়ে চারটে। প্রচণ্ড শীত। তবু প্রাকৃতিক প্রয়োজনে স্লীপিং ব্যাগের মায়া কাটিয়ে তাঁবুতে বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে বিস্ময়ে ও পুলকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন বিস্মৃত হয়েছি। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি সিনিয়লচুর দিকে, সুন্দরের পানে। নিজের অলক্ষ্যেই কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।....
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর।"

জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকলে এমন সুন্দরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয় না।

তবে শুধু সিনিয়লচুর সৌন্দর্য নয়। পরিবেশ তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে সুন্দরতর করে তুলেছে। আগেই বলেছি এখনও শিবিরে সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় নি। মাটিতে তাই কালো আঁধার কিন্তু আকাশ আলো হয়ে গিয়েছে। সেখানে নীলের ছড়াছড়ি। আর অদৃশ্য অংশুমানের সোনালী কিরণ এসে সিনিয়লচুর সারা গায়ে সোনা দিয়েছে ছড়িয়ে। মাটির জগতে সোনার জন্য এত হানাহানি আর এখানে কত সোনা!

শুধু সিনিয়লচু নয়। লিট্‌ল-সিনিয়লচু, টেন্ট-পিক্, পিরামিড-পিক্, নেপাল-পিক্ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক ও দুই নম্বর শিখর—এক কথায় সিনিয়লচুর প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই সোনার পাহাড়ে পরিণত। কিন্তু প্রতিবেশীদের কথা থাক, সোনার কথাও আর নয়। হিমবন্ত-হিমালয়ের বুকে সোনা-রূপার এমন ছড়াছড়ি আমি এর আগেও দেখেছি। কিন্তু যা কখনও দেখি নি, তা হল সিনিয়লচু। যেমন শিখর, তেমনি গিরিশিরা আর গড়ন! শিখরটি যেন মানুষের হাতে তৈরি মেট্রো ডিজাইনের চূড়া। একটা দিক ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে, আরেকটা দিক ধনুকের মতো বেঁকে নিচে নেমে এসেছে। শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে অভিনব বটে।

গিরিশিরাটি সত্যি যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার। তারপরে তুষার-সঞ্চয় আর গড়ন? মনে হচ্ছে হাজার হাজার স্থপতি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিমুক্তা দিয়ে শত শত বছর ধরে সৃষ্টি করেছে এই অনিন্দ্যসুন্দরকে।

এ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। আমি তাই তার দিকে তাকিয়ে আবার গেয়ে উঠি—

'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত॥
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে॥
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত॥"

কবি সিনিয়লচুকে দেখেন নি। কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, আমি তারই সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি ভাগ্যবান, ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সেই দুরধিগম্য দেবালয়ের দ্বারে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আমি এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সামনে বিহ্বল ও ভাষাহীন হয়ে রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়েছি। তিনি তো শুধু মহাকবি নন, তিনি যে আমার ভাষার মালাকর।

"বাইরে কে গান গাইছেন?" পাশের তাঁবু থেকে সুশান্তবাবু বলে ওঠেন।

"তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে আসুন।" আমি বলি, "সিনিয়লচুকে দেখুন, ছবি নিন।"

শুধু সুশান্তবাবু নয়, একে একে সবাই বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। আর এসেই নিশ্চল ও নীরব হয়ে যায়। আমার মতোই অপলক নয়নে শুধু সিনিয়লচুকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

আমাদের শীত করছে না, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিচলিত হচ্ছি না, কেবল সিনিয়লচুকে দেখছি। তাকে দেখা ছাড়া আমাদের এখন আর কোনো কাজ নেই। আমরা দেখছি সিনিয়লচুকে। দেখছি তার স্বর্ণসিংহাসনসম শিখর আর বাঁকা তলোয়ারের মতো মূল-গিরিশিরা। দেখছি তার তুষারপ্রপাত আর হিমবাহ। দেখছি আর দেখছি। এ দেখার শেষ নেই।

আমরা কলকাতার কয়েকজন শীতকাতুরে মানুষ কতক্ষণ এই ষোলো হাজার ফুট উঁচু হিমবাহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল, তখন প্রভাতের পরশে জেমু হিমবাহ আলোময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে সিনিয়লচুর তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং তার গায়ে রামধনুর রং লেগেছে। তাকে আরও সুন্দর লাগছে।

কিন্তু সুন্দর তো চিরস্থায়ী নয়। বরং যৌবনের মতো সুন্দর সর্বদা ক্ষণস্থায়ী। কথা নেই বার্তা নেই কারণ নেই, কোথা থেকে যেন পুঞ্জীভূত মেঘের দল সারি বেঁধে ছুটে আসছে। তারা সিনিয়লচু আর তার প্রতিবেশীদের সারা গায়ে সাদা ওড়না দিচ্ছে জড়িয়ে।

ধীরে ধীরে ওদের দেহের এক-একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতির এই বিচিত্রলীলা দর্শন করছি।

নেই, কেউ নেই কিছু নেই! সবার সঙ্গে আমার চোখের সামনে সিনিয়লচু অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন কোথাও সোনা নেই, রূপা নেই, রামধনু নেই—শুধুই সাদা। সীমাহীন সাদার সমুদ্রে সিনিয়লচু ডুব দিয়েছে।

এ অবগাহন অনন্তকালের জন্য নয়। যে কোন মুহূর্তে মেঘ কেটে যেতে পারে, তখুনি সিনিয়লচু আবার আমার সামনে আবির্ভূত হবে। তবু মনটা ভারী হয়ে ওঠে। যাকে দেখার জন্য কত কষ্ট করে এতদূর থেকে ছুটে এসেছি, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

চমক ভাঙল। এই প্রথম অনুভব করছি এখানে প্রবল বাতাস বইছে, এখনও রোদ ওঠে নি, ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘড়ি দেখি, ছটা বাজে।

"চা আসছে।" সহসা অসিতবাবু বলে ওঠে।

সে ঠিকই বলেছে। চেতাকে নিয়ে মেট বেরিয়ে এসেছে কিচেন থেকে। তাদের হাতে চায়ের কেটলি ও মগ।

"সাবাস, মেট!" অমূল্য তাকে অভিনন্দিত করে।

"গুড মোর্নিং সাব্।" মেট ও চেতা উত্তর দেয়।

গরম চায়ের মগে ঠোঁট ঠেকিয়ে চারিদিকে তাকাই। গতকাল রাতের আধারে শিবিরের অবস্থানটা দেখতে পাই নি। আর আজ এতক্ষণ সিনিয়লচুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। এবারে অবসর পাওয়া গেছে। অতএব আমাদের মূল শিবিরটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি এ জায়গাটি জেমু গ্রাবরেখার মৃত অংশ। গতকাল সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদী পেরিয়ে যে উঁচু প্রায়-সমতল মালভূমির সদৃশ ভূখণ্ডে উঠে এসেছিলাম, এটি তারই পশ্চিমাংশ। শিবির ক্ষেত্রটি বেশ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। জুনিপার ও নানা ছোট ছোট গাছ রয়েছে প্রায় সর্বত্র। কিন্তু কোনো বড় গাছ নেই। আছে শেওলা গজানো বড় বড় পাথর। তা থাকগে, গ্রাবরেখায় পাথর থাকবেই। কিন্তু তাতে আমাদের তাঁবু টাঙাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। পাশাপাশি সাতটি 'টু-মেন টেন্ট্' টাঙানো হয়েছে। একটায় অমূল্য একা, বাকী ছটায় আমরা বারোজন। যথারীতি অসিতবাবু আমার 'টেন্ট-মেট্'।

শিবিরক্ষেত্রটির উত্তরে সামান্য দূরে একটা বেশ উঁচু গিরিশিরা আর দক্ষিণ দিকটা নেমে গিয়েছে গ্রীনলেক থেকে আসা নদীর তীরে। নদী এখানে একটি নিতান্তই নাতিপ্রশস্ত নালা। এটি জেমু চু-য়ের উপনদী। তাই নাম জেমু নালা। পারাপার কোনো সমস্যাই নয়। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে জুতো না ভিজিয়ে পার হওয়া যায়। নদীর এপারে তাঁবু ও পলিথিন খাটিয়ে মালবাহকরা বাসা বেঁধেছে আর ত্রিপলের ছাউনিতে কিচেন-কাম-স্টোর বানানো হয়েছে।

জেমুনালা পেরিয়ে দক্ষিণে খানিকটা এগিয়ে গেলেই জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ। তারপরেই সিনিয়লচু থেকে সিনিয়লচু হিমবাহ নেমে এসে জেমু হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই সঙ্গম ছাড়িয়ে আমাদের পথ।

কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যই জমা থাকুক। এখন বর্তমানের কথা ভাবা যাক। এখনও এখানে রোদের দেখা নেই। আজ দেখা পাওয়া যাবে কিনা, তাও বুঝতে পারছি না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সিনিয়লচু আর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে শিখরে আমরা অবাক বিস্ময়ে রামধনুর খেলা দেখেছি। হিমালয়ের সূর্য বড়ই অস্থির ও চপলমতি। তার খেয়াল বোঝা ভার।

অথচ উচ্চ-হিমালয়ে সূর্যের আরেক নাম জীবন। তাঁর কৃপা ছাড়া কোনো পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না। দেব দিবাকর আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করবেন কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। তাহলেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। আশায় বুক বেঁধে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং রোদের প্রতীক্ষায় না থেকে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। বহু কাজ পড়ে রয়েছে।

মেট এসে সেলাম করে, "ম্যানেজার সাব্, আজ ক'জন কুলি ছেড়ে দেবেন?"

"লীডার সাব্ কি বললেন?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

মেট জবাব দেয়, "এখনও কোনো কথা হয় নি তাঁর সঙ্গে, তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন।"

তাকিয়ে দেখি, নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এক হাতে আয়না ধরে আরেক হাতে দাড়ি কাটছে অমূল্য। বীরেনও ওখানে রয়েছে। মেটকে নিয়ে নেতার কাছে আসি।

পরামর্শের পরে ঠিক হল মেট ও চেতাকে বাদ দিয়ে আমরা বিশজন পোর্টার স্থায়িভাবে মূল শিবিরে রাখব। তাদের মধ্যে চারজন দার্জিলিঙের হ্যাপ্ ও তিনজন টিবেটান হ্যাপ্। তার মানে আজ তেরজন পোর্টার এখানে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কাকে কাকে রাখা হবে, তা ঠিক করবে মেট।

এই অভিযান শুরু হবার পর থেকে বার বার '১৩' সংখ্যাটি কেন ফিরে ফিরে আসছে, বুঝতে পারছি না। ১৩ জন সদস্য কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে, ১৩ই মে আমরা সিকিমের মাটিতে পদার্পণ করেছি, আজ আবার ১৩ জন মালবাহক মূল-শিবিরে রেখে বাকি মালবাহকদের ফিরে যেতে বলছি।

তারা ফিরে যাবে লাচেন। অভিযান শেষে খবর পাঠাবার পরে তাদের কয়েকজন আসবে এখানে। মালপত্রসহ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এই যাওয়া ও আসার জন্য তাদের দেড়দিন করে তিনদিনের বাড়তি মজুরী দিতে হবে। তাতেও প্রায় দিন সাতেকের মজুরী ও খাবার বেঁচে যাবে। কারণ এখানে এখন আমাদের এত মালবাহকের প্রয়োজন নেই।

আমি আর অসিতবাবু মেটকে নিয়ে আমাদের তাঁবুতে এলাম। যে সব কুলি-কামিনদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম টুকে নিলাম। ওদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অগ্রিম দিয়ে দিতে হল। হিসেব করব লাচেন ফিরে গিয়ে, সেখানেই সব বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

অগ্রিম নিয়ে হাসিমুখেই বিদায় নেয় ওরা। হয়তো ঘরের টানে টাকার মায়া কাটিয়েছে। কিন্তু আমরা হাসিমুখে বিদায় দিতে পারি না। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। গত চারদিন এরা সবাই সঙ্গে ছিল। আমাদের মাল বয়েছে, চা খাইয়েছে, পথ দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার আসবে এখানে, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু অধিকাংশই হয়তো আর কোনদিন আমার পথের সাথী হবে না।

তাই আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। ওরা চলে যাচ্ছে সারি বেঁধে। কাছের থেকে দূরে, বহুদূরে। গতকাল আমরা যে পথ দিয়ে এখানে এসেছি, সেই পথ দিয়েই ওরা আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তাই নিয়ম, আসা আর যাওয়ার একই পথ।

একসময় ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি কিচেনে এসে ঢুকি। ব্রেকফাস্ট রেডি। রুটি অমলেট ও আলুর তরকারী।

খাবার দিতে দিতে মেট জিজ্ঞেস করে, "সাব্, যে তেরোজন পোর্টার এখানে রাখলেন, তারা কি করবে?"

বীরেন ও অসিতের সঙ্গে পরামর্শ করে অমূল্য বলে, "দুজন চলে যাক তেলেম্। দু বোঝা বাঁশ নিয়ে আসুক।"

"বাঁশ দিয়ে কি করবেন!"

"তুষারপাতে পথরেখা নিশ্চিহ্ন হলেও যাতে পথ ভুল না হয়, সেই জন্য মার্কিং ফ্ল্যাগের বদলে বাঁশ ব্যবহার করব।"

"নিশান বানাবো।" বীরেন যোগ করে, "ভুলে ডিমার্কেশন ফ্ল্যাগগুলো নিয়ে আসা হয় নি।"

"কিন্তু তেলেম্ গেলে তো ওরা আজ ফিরে আসতে পারবে না, কাল ফিরবে।" মেট বলে।

"তাই আসবে।" অমূল্য মঞ্জুর করে, "তবে ওদের বলে দাও যেন যত্ তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসে।"

মেট মাথা নাড়ে। তারপরে বলে, "বাকি এগারোজন পোর্টার আজ কি করবে সাব্?"

একটু ভেবে নিয়ে বলি, "তিনজনকে কাঠ আনতে নিচে পাঠাও, সারাদিনে অন্তত দু-বোঝা করে জ্বালানী আনতে হবে। আর বাকি আটজন অসিতের সঙ্গে মাল নিয়ে ওপরে যাবে।"

"ঠিক হ্যায় সাব্।" মেট সেলাম করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য কুলিদের কাছে চলে যায়।

বিনীত নেতাকে জিজ্ঞেস করে, "আজ তাহলে ক'টা 'লোড্' ওপরে যাবে?"

"পনেরো।"

"তার মানে সাতজন হ্যাপ্ ওপরে যাচ্ছে?"

"না।" অমূল্য বলে, "শেরিং-এর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে, তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। লাক্‌পা এখানে না থাকলে বীরেনের পক্ষে কিচেন ম্যানেজ করা মুশকিল।"

"তাহলে তো তেরোজন পোর্টার ওপরে যাচ্ছে। তেরোটা 'লোড্' ওপরে যাবে?"

"হ্যাঁ, তেরোজন পোর্টার তেরোটা লোড্ বইবে আর কেশব ও অসিত রুক্‌স্যাকে দু-লোড্ মাল নিয়ে যাবে।"

অসিত ও কেশব কোন মন্তব্য করে না, কেবল মৃদু হাসে।

সুশান্তবাবু বলেন, "তার মানে ওরাও দু-জন পোর্টার?"

"হ্যাঁ।" অমূল্য উত্তর দেয়, "আপনি শঙ্কুদা ডাক্তার ও সাংবাদিক ছাড়া আমরা সবাই অভিযানের মালবাহক, কেবল দিনমজুরী পাবো না এই যা।"

বীরেন বলে, "আমি কিচেনে আছি। অসিত ও কেশব তোমরা তৈরি হয়ে নাও, সময় নষ্ট করো না। আধঘণ্টার মধ্যে প্যাক্-লাঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি। বিনীত ও হিমাদ্রি ওদের মালপত্র সব গুছিয়ে দাও। অরুণ ও শরদিন্দু তোমাদের সাহায্য করবে।"

অমূল্য বলে, "অসিত, তোমরা এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে সেখানে মাল রেখে আজ ফিরে আসবে। আগামীকাল আবার পনেরোটা 'লোড্' নিয়ে ওপরে যাবে এবং এক নম্বর প্রতিষ্ঠা করবে। পাঁচজন হ্যাপ্ ওপরে রেখে দেবে। তাদের নিয়ে পরশু তোমরা দু-নম্বর শিবিরের পথ তৈরি করবে আর পরশু বিনীত দশজন পোর্টার নিয়ে এক নম্বরে যাবে।"

আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। কুলিদের সাহায্যে এবং অরুণ ও শরদিন্দুর সহযোগিতায় বিনীত ও হিমাদ্রি 'প্যাকিং লিস্ট' দেখে দেখে ওপরে পাঠাবার মাল বাছাই করতে লেগে গেল।

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞেস করে, "লীডার, প্রত্যেক ক্যাম্পের জন্য একটা করে মেডিকেল কিট্ লাগবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাছাড়া থাকবে 'ফার্স্ট-এড' বক্স।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"সেটা ঠিক করাই আছে।" ডাক্তার বলে, "আমি মেডিক্যাল কিট্‌গুলো ঠিক

করে ফেলেছি।" ডাক্তার তার কাজে লেগে যায়। অসিতবাবু সাহায্য করছে তাকে।

সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না। আমি শুধু ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখছি আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। না, রোদ ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। সিনিয়লচু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত সবাই তেমনি মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

সিনিয়লচুর প্রায় সোজাসুজি পশ্চিমে অর্থাৎ আমাদের শিবিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিছুক্ষণ আগে আমি বিশ্বের এই তৃতীয় উচ্চতম শিখরের বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ দেখেছি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সিনিয়লচুর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার উচ্চতা সিনিয়লচুর চেয়ে সামান্যই বেশি। দু-য়ের মাঝে উচ্চতার ব্যবধান যে প্রায় ছ'হাজার ফুট, তা মনেই হয় না। আরও কাছে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার বড্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমরা যে পর্বতাভিযানে এসেছি। কর্তব্যের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই আমাদের।

বীরেনের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। কিচেন থেকে বীরেন ডাকছে। তার মানে প্যাক্-লাঞ্চ তৈরি।

কুলিরাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে। তারা নিজেরাই রান্না করেছে, আমরা রেশন দিয়েছি। দুজন কুলি বাঁশ আনতে নিচে চলে গিয়েছে। এখন তিনজন কাঠ আনতে যাচ্ছে। এরা তিনজনই মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী। মেট অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও ছোটদের ছেড়ে দিয়েছে, দশজন স্বাস্থ্যবান যুবক ও এই তিনটি যুবতীকে এখানে রেখেছে। ওদের নাম থাসা, নাজে ও আথি।

কাঁধে দড়ি নিয়ে নাচতে নাচতে নিচে যাচ্ছে ওরা। যেন তিনটি বনহরিণী ছুটে চলেছে।

অসিতবাবু সহসা বলে ওঠে, "না, সাঙবার সিলেক্শান ভাল বলতে হবে। কাজের মানুষগুলোকে রেখে দিয়েছে।"

"অসিতদা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না।" অসিত গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে।

"কি বলতে চাচ্ছিস তুই?" অসিতবাবুর কণ্ঠে কৃত্রিম ক্রোধ।

অসিত আবার বলে, "যে মেয়েটাকে অসিতদা সারা পথে লজেন্স খাইয়েছে, সেটাকে রাখা হয়েছে—তাই না?"

"আমি রেখেছি?"

"কি জানি? মেটকে কি বলেছো তা তুমিই জানো।"

"অসিত ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

অসিত মোটেই ভয় পায় না। সে আবার বলে, "সুশান্তদা, আমি আজ সারাদিন এখানে থাকব না আর কাল তো ওপরেই চলে যাচ্ছি, আপনারা একটু অসিতদার দিকে নজর রাখবেন।"

"তবে রে!" অসিতবাবু অসিতের দিকে এগিয়ে যায়, অসিত ছুটে কিচেনের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে নিল ওরা—অসিত, কেশব, সাঙ্গে ও নওয়াঙ এবং তিনজন

টিবেটান হ্যাপ্। ওদের নাম থামডং, নোরগে ও থাণ্ডুপ। তিনজনই কষ্টসহিষ্ণু যুবক। গত বছরের সিনিয়লচু অভিযানে মালবাহকের কাজ করেছে। দু-নম্বর শিবির পর্যন্ত পথ ওদের জানা আছে। শেরপা পাই নি, ওরাই এখন আমাদের প্রধান ভরসা।

এবারে ওদের বিদায় দেবার পালা। জানি এ বিদায় নিতান্তই সাময়িক। ওরা আজই ফিরে আসবে। তাহলেও উৎকণ্ঠার কবল থেকে মুক্তি পাই না। যেখানে প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুর হাতছানি, ওরা সেই জগতে চলেছে। তার ওপর আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। উঠতে পারে তুষারঝড়।

তবু দিতে হবে বিদায়। দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে ওদের যেতে হবে এগিয়ে। এই এগিয়ে যাবার নামই পর্বতারোহণ। আমরা পর্বতাভিযানে এসেছি।

অসিত প্রণাম করে আমাকে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি। একে একে সবাইকে আলিঙ্গন করি। ওরা এগিয়ে চলে। সুশান্তবাবু ছবি তোলেন।

অভিযানের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। প্রথম পর্যায়ে গাড়িতে করে লাচেন এসেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পায়ে হেঁটে মূল শিবিরে পৌঁচেছি। আর এই তৃতীয় পর্যায়ে পর্বতারোহীরা সিনিয়লচুর গায়ে এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

আমরা ওদের এগিয়ে দিই। অসিত আর কেশবের পেছনে পেরিয়ে আসি জেমু নালা। তারপরে জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ—পাথর আর বরফের ঢেউ, একটির পরে একটি ঢেউ। আস্তে আস্তে নিচু হয়ে অনেক নিচে সিনিয়লচু হিমবাহে মিশেছে। যেমন বিপজ্জনক, তেমনি কষ্টকর পথ। সেই পথ পেরিয়ে ওদের পথ—সিনিয়লচু শিখরের ভয়ঙ্কর-সুন্দর পথ।

অসিতবাবু ছবি নেয়। আবার করমর্দন আর আলিঙ্গন। তারপরে ওরা যায় এগিয়ে, আমরা থাকি দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। একসময় হিমবাহের ঢেউয়ের মাঝে ওরা যায় হারিয়ে। আমরা ফিরে চলি শিবিরে।

ন'টা বেজে গিয়েছে। বেলা বাড়ছে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। দেখব কেমন করে? আকাশ যে তেমনি মেঘে ঢাকা। সিনিয়লচু সেই যে সকালে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে, আর তাকে দেখতে পাই নি।

এ অদর্শনের জন্য অবশ্য আপসোস করার কিছু নেই। সকালে তার যে অনিন্দ্যসুন্দর অপার্থিব রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমৃত্যু আমার মনের মুকুরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাছাড়া সকালের সেই দেখা তো শেষ দেখা নয়। আমি যে বেশ কয়েকদিন সিনিয়লচুর পদতলে প্রতীক্ষা করব। তার সঙ্গে আরও বহুবার দেখা হবে আমার। তাকে দেখার জন্যই তো আমার এই অভিযানে আসা। আমি তাকে দেখব দুপুরের উজ্জ্বল আলোয়, বিকেলে আর গোধূলি বেলায়। দেখব রাতের আঁধারে আর চাঁদের আলোয়।

বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। একে রোদ নেই, তার ওপরে হিমেল হাওয়া। তাঁবুতে আসি। আমি একা। অসিতবাবু ডাক্তারের তাঁবুতে—মেডিক্যাল কিট্ প্যাক্ করছে। এখন আমার কোন কাজ নেই। অযথা কষ্ট করি কেন? তার চেয়ে বরং একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক। আমি স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ি।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি—সিনিয়লচুর ভাবনা। তার কথা ছাড়া এখন যে আর কারও কথা মনে আসছে না আমার। আমি ভেবে চলি—

প্রথমেই মনে পড়ছে ক্লড হোয়াইট-এর কথা, আজকের নয়, নব্বুই বছর আগের কথা। ১৮৯০ সালে সিনিয়লচুর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হোয়াইট সাহেব যে কথা বলেছিলেন, আজও তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হোয়াইট বলেছেন—"Siniolchu was flooded with the rosy light from the rising sun and no mere photograph can give any idea of the beauty of the scene.'*

সেই বর্ণনাতীত বিস্ময়কর সৌন্দর্য আজ আমিও দর্শন করেছি। এবং একথা শুনেই পর্বতারোহীরা এই সুন্দরের অভিসারে আসা আরম্ভ করেছেন। তাঁরা সিনিয়লচুকে দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন কিন্তু তার শিখরে আরোহণ করার কথা কল্পনাও করেন নি। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের মতো পর্বতারোহী পর্যন্ত সিনিয়লচু শিখরকে বলেছেন—'Inaccessible' আর শিখরশিরাকে বলেছেন—'Scimitar' বা বাঁকা তলোয়ার।

কিন্তু মানুষ জগতের সবচেয়ে সাহসী, শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান প্রাণী। পূর্বগামীদের সতর্কবাণী কোনকালে পরবর্তীদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। সকল উপদেশ উপেক্ষা করে দুঃসাহসীরা এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা ভয়কে জয় করে, কষ্টকে উপেক্ষা করে, অসাধ্য সাধন করেছেন।

সেই দুঃসাহসীদের দলনায়ক প্রখ্যাত জার্মান পর্বতারোহী পল বওর। আগেই বলেছি বওর ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে এসে ব্যর্থ হন। পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের অগাস্ট মাসে তিনি আবার এই জেমু হিমবাহে আসেন।

সেবারে তিনি ঠিক কোন পর্বতারোহণের পরিকল্পনা করে আসেন নি। এসেছিলেন তিনজন জার্মান যুবককে পর্বতারোহণ শিক্ষা দিতে। তাঁদের নাম—কার্ল উইয়েন (Karl Wien), এডলফ্ গুট্নার (Adolf Gottner) এবং জি. হেপ্ (G. Hepp)। তাঁদের মধ্যে তুলনায় উইয়েন ছিলেন অভিজ্ঞ। কারণ তিনি একত্রিশ সালের কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের সদস্য ছিলেন।

তাঁরা সেবারে ৬ই আগস্ট (১৯৩৬) কলকাতায় পৌঁছন এবং ১০ই আগস্ট গ্যাংটক রওনা হন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অভিযাত্রীরা গ্যাংটক থেকে লাচেন আসেন। লাচেন তখন প্রায় জনশূন্য। গ্রামবাসীরা যথারীতি গ্রীষ্মকালীন চাষাবাদের জন্য থাঙ্গু চলে গিয়েছেন। তাই কুলি যোগাড়ের জন্য অভিযাত্রীদের দিনদুয়েক লাচেনে কাটাতে হল।

লাচেন থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয় দিনে তাঁরা মূল শিবিরে পৌঁছলেন। আমাদেরই মতো কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁদের দেখা আর আমাদের দেখা এক নয়। দুবার অভিযান করেও বওর কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বপ্ন-শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি, কিন্তু অভিযানকালে তাঁর প্রিয় সহযাত্রীরা শহীদ হয়েছেন। সুতরাং এই শিবির থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার পরে তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল, তা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। হিমালয় আমাদের, কিন্তু ওঁদের মতো করে মনে-প্রাণে আমরা হিমালয়কে আজও ভালোবাসতে পারি নি।

---

* ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—সেদিন মূল শিবির থেকে বএর ও তাঁর সহযাত্রীরা শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেন নি, দেখেছেন সিনিয়লচু। সেই দেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে উইয়েন লিখেছেন—

"We know no mountain that can equal Siniolchu in beauty and boldness of feature. Its ridges are as sharp as a knife-edge, its flanks, though incredibly steep, are mostly covered with ice and snow, furrowed with ice-flutings so typical of the Himalaya. The crest of the cornice-crowned summit stands up like a throan,' **

এবারে ওঁদের অভিযানের কথায় আসা যাক। মূল শিবির প্রতিষ্ঠার পরে পর্বতারোহীরা সিনিয়লচুর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জেমু হিমবাহের বিস্তৃত অংশ সমীক্ষা করেন। এই সময় তাঁরা এ অঞ্চলের যে মানচিত্র (Toposheet) অঙ্কন করেছেন, তা আজও মূল্যবান রূপে সমাদৃত।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অভিযাত্রীরা ২৩,৩৬০ ফুট উঁচু টুইন্‌স শৃঙ্গের পূর্ব শিখর (Eastern of the Twins) আরোহণের চেষ্ট করে ব্যর্থ হলেন। তারপরে তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরা ধরে ২৪,০৮৯ ফুট উঁচু টেন্ট্ পিক্ আরোহণের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের ২৩,৫৬০ ফুট উঁচু নেপাল পিক্-এর শিখর অতিক্রম করতে হয়। তাঁরা নেপাল শৃঙ্গে আরোহণ করেন কিন্তু তুষার গহ্বরের জন্য টেন্ট্ শৃঙ্গে আরোহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই অভিযানে জার্মান অভিযাত্রীদের সবচেয়ে বড় সাফল্য সিম্‌বু নর্থ (২১,৪৭৩) ও সিনিয়লচু আরোহণ। দুটিই প্রথম আরোহণ। কিন্তু সিম্‌বুর কথা থাক। সিনিয়লচুর কথায় ফিরে আসা যাক।

হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হবার জন্য অভিযাত্রীদের কয়েকদিন মূল শিবিরে বন্দী হয়ে থাকতে হল। আবহাওয়া একটু ভাল হবার পরে বএর তাঁর তিন তরুণ সহযাত্রী এবং মালবাহক মিঙমা ও নিমাকে নিয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর সিনিয়লচু আরোহণের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁরা উত্তর পশ্চিম গিরিশিরা ধরে শিখরারোহণের পরিকল্পনা করেছিলেন।

লিট্‌ল-সিনিয়লচু শিখরের পাদদেশে প্রায় ১৮,৭০০ ফুট উঁচুতে ২১শে সেপ্টেম্বর অগ্রবর্তী মূল শিবির স্থাপিত হল। মালবাহকদের সেখানে রেখে চার পর্বতারোহী পরদিন লিট্‌ল-সিনিয়লচু এবং সিনিয়লচু শিখরদ্বয়ের মধ্যবর্তী গিরিশিরায় ২০,৩৪০ ফুট উচ্চতায় উপস্থিত হলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং শিবিরে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না, আর সে ইচ্ছাও তাঁদের ছিল না।

বএর সেই গিরিশিরার ওপরে চারজন লোকের বসার মতো তুষারাবৃত সমতল দেখতে পেলেন। সুতরাং সেখানেই তাঁরা আকাশের নিচে রাত কাটানো স্থির করলেন।

তাঁদের সঙ্গে খাবার গরম করবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। খাবার যা ছিল তাও উল্লেখ করবার মতো নয়। তাই খেয়ে নিয়েই তাঁরা সেখানে বসলেন। বসলেন তাঁদের টেন্ট্-ব্যাগের ওপরে। তারপরে সঙ্গে সামান্য যা কিছু ছিল, তাই দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিয়ে রুক্‌স্যাকের ভেতরে পা ঢুকিয়ে বেঁধে নিলেন। বলা বাহুল্য তুষারক্ষত এড়িয়ে যাবার পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। তবু তাঁরা বিশ হাজার

ফুট উঁচুতে তুষারপাতের মধ্যে এইভাবে বসে রইলেন। এবং এক সময় সেই কালরাত্রির অবসান হল।

পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর। সকালেই অভিযাত্রীরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। আগের দিনের সমস্ত ক্লান্তি ও সারারাতের অসহ্য কষ্টকে ঝেড়ে ফেলে তারা বিশ্বের সুন্দরতম শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা ২১,২৩০ ফুটে উঠে এলেন। বএর বুঝতে পারলেন এই শারীরিক অবস্থায় মলপত্র সহ চারজনের পক্ষে শিখরে আরোহণ সম্ভব নয়। তাই নেতা ঠিক করলেন—তিনি এবং হেপ্ সাহায্য করবেন আর উইয়েন এবং গুট্নার শিখরে উঠবেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ওঁদের সঙ্গে দিয়ে বাকি মালপত্র নিয়ে নিলেন নিজেদের রুক্স্যাকে।

হালকা হয়ে উইয়েন ও গুট্নার নূতন উদ্যমে শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন। নেতা এবং হেপ্ সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের উৎসাহিত করতে থাকলেন। একসময় শিখর অভিযাত্রীরা তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তাঁরা ফিরে চললেন গতরাতের সেই সমতলে।

অবশেষে উইয়েন এবং গুট্নার সেই অসাধ্যসাধন করলেন। বেলা দুটো নাগাদ তাঁদের স্বপ্ন সফল হল। তাঁরা উপস্থিত হলেন সিনিয়লচু শিখরে—বিশ্বের সুন্দরতম পর্বতশীর্ষে। সেই পরম মুহূর্তটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে উইয়েন লিখেছেন—

"It was a fantastic scene which met our gaze. From the peak the sharp south ridge branches off, furrowed on both sides with thousands of ice-flutings; the north and the south faces fell with appalling steepness, and yet there were relatively, few rocks sticking out of the ice. We shouted joyfully to our friends in the saddle."*

বিশ্ব-পর্বতারোহণের ইতিহাসে ১৯৩৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হল। সেই সঙ্গে লেখা হল চারটি নাম—পল্ বএর, কার্ল উইয়েন, এ গুট্নার এবং জি. হেপ্।

শিখর শিবির ছাড়াই শিখরারোহণ। তাছাড়া বেলাও পড়ে এসেছে। সুতরাং অভিযাত্রীরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা নেমে চললেন। সুদীর্ঘ অবরোহণের পরে ফিরে এলেন সেই ২০,৩৪০ ফুট উঁচু গিরিশিরার ওপরে, মিলিত হলেন সঙ্গীদের সঙ্গে।

উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ওঁরা বিজয়োৎসব পালন করলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে উত্তেজনা কিছু প্রশমিত হবার পরে ওঁদের খেয়াল হল দেব দিবাকর অস্তমিত, সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসছে শ্বেতশুভ্র সিনিয়লচুর সারা গায়ে। সুতরাং সেদিন রাতেও তাঁদের শিবিরে ফেরা হল না। বিশ হাজার তিন শ' ফুট উঁচুতে উন্মুক্ত আকাশতলে একইভাবে তাঁরা দ্বিতীয় রাত অতিবাহিত করলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর বিকেলে অভিযাত্রীরা নিরাপদে মূল শিবিরে ফিরে এলেন। সামান্য সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে মাত্র একটি শিবির স্থাপন করে ছ'দিনে তাঁরা সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করেছেন।

---

* Himalayan Journal. Vol. IX 1937

পৃথিবীর পর্বতারোহণ-ইতিহাসে এমন দুঃসাহসী নজীর খুব বেশি নেই। আর তাই বোধকরি সোনাম ওয়াঙ্গিল তাঁর গত বছর সিনিয়লচু আরোহণের রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন—

'Siniolchu has been claimed to have been climbed twice before.....From our own experience on the mountain, we, however, found it rather surprising that these two quickie climbs could be made alpine style, without pitching camps and fixing ropes and with little logistic support! Because, siniolchu was no easy peak....''**

এভারেস্ট বিজয়ী সোনাম ওয়াঙ্গিল একজন বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী। তিনি ভারতীয় পর্বতারোহণের গৌরব। তবু বোধকরি তাঁর পক্ষে এ মন্তব্যটি করা ভাল হয় নি। কারণ সেকালের সঙ্গে একালের পর্বতারোহণের পার্থক্য অনেক। অজানাকে জানা ও দুর্গমকে সুগম করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সেকালের অভিযাত্রীরা হিমালয়ে আসতেন। হিমালয়কে ভালোবেসেই তাঁরা দলে দলে হিমালয়ের পথে পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। প্রচারের লোভ কিংবা কোনো সার্থসিদ্ধির মোহ তাঁদের ছিল না। সুতরাং কোনো শৃঙ্গে আরোহণ না করে, মিথ্যে সাফল্যের কথা প্রচার করার মতো মানসিকতা তাঁদের না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই জার্মান অভিযাত্রীদের—যাঁরা সেই অভিযানের মাত্র ন'মাস বাদে পর্বতারোহণের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সোনাম ওয়াঙ্গিলের নেতৃত্বে সিনিয়লচু শিখরে প্রথম ভারতীয় আরোহণ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। এবং এ যুগে আমরা যেভাবে পর্বতারোহণ করে থাকি, তাতে জার্মানদের সেই অভূতপূর্ব আরোহণকে বিস্ময়কর বলে মনে হতেই পারে। তাহলেও সেকালের আরোহণ সম্পর্কে একালে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ তাহলে তো আরেক জার্মান অভিযাত্রী হার্মন বুহ্‌ল-য়ের (Herman Buhl) একাকী নাঙ্গাপর্বত আরোহণকেও অবাস্তব বলতে হয়।

আজ তাই চুয়াল্লিশ বছর পরে সিনিয়লচুর সামনে দাঁড়িয়ে আমি সেকালের সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের উদ্দেশে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

আর সেই সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের অন্তিম অভিযানের অবিস্মরণীয় কাহিনী—

উইয়েন, গুট্‌নার এবং হেপ্‌ দেশে ফিরে মাত্র মাস সাতেক ঘরে ছিলেন। তারপরেই তাঁরা হিমালয়ের হাতছানিতে আবার ঘর ছেড়েছেন। অনিবার্য কারণে সেবারে বএর সঙ্গী হতে পারেন নি। কিন্তু আরও ছ'জন জার্মান অভিযাত্রী তাঁদের সঙ্গে এলেন। তাঁরা হলেন—হ্যান্‌স হার্টমান, পি. ফ্রাঙ্কহাউসার, এম্‌. ফেফার, উল্‌রিচ্‌ লুফ্‌ত, মুল্‌রিটার এবং ট্রল্‌। গিলগিট স্কাউটস-এর ডি. এম. বি. স্মার্ট পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সেবার তাঁরা আর সিকিমে আসেন নি, এসেছিলেন কাশ্মীরে—বিশ্বের অন্যতম

** 'Indian Mountaineer. No. 5. 1980

১৯৩৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর আরেক জার্মান-সুইস অভিযাত্রীদল সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করেন।

নিষ্ঠুর পর্বতশৃঙ্গ নাঙ্গাপর্বতে। ২৬,৬২০ ফুট উঁচু এই শিখরটি বহু তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের ৩রা জুলাই আরেক জার্মান পর্বতারোহী হার্মান বুহ্‌লের কাছে প্রথম পরাজয় বরণ করেছে।

কিন্তু ১৯৫৩ সালের রূপকথা নয়, আমি স্মরণ করছি ১৯৩৭ সালের সেই অমর কাহিনী। কার্ল উইয়েন এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি তাঁর দল নিয়ে নাঙ্গাপর্বতে এলেন।

৭ই জুন (১৯৩৭) তাঁরা ২০,২৪০ ফুট উঁচুতে চার নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করলেন। বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরফ খুঁড়ে একটা খাদের ভেতরে তাঁবু টাঙ্গানো হল। ১১ই জুন থেকে শিখরাভিযাত্রীরা সেখানে বাস করতে শুরু করলেন।

তারপরে তিন দিন ধরে প্রবল তুষারপাত হল। সুতরাং তাঁরা স্থান নির্বাচন করেও পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করতে পারলেন না। তুষারপাতের মধ্যেই ১৪ই জুন সকালে স্মার্ট কুলিদের নিয়ে মূল শিবিরে নেমে এলেন। চার নম্বর শিবিরে রয়ে গেলেন—উইয়েন, হেপ্, গুট্‌নার, হার্টমান, ফ্রাঙ্কহাউসার, ফেফার ও মূল্‌রিটার এবং নজন শেরপা। তাঁরা রয়ে গেলেন চিরকালের মতো। কিন্তু সেদিন স্মার্ট সেকথা ভাবতেও পারেন নি। তাঁর আশা ছিল শিখরাভিযাত্রীরা দিন তিনেকের মধ্যে পাঁচ ও ছ নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

কিন্তু মানুষ আশা করে, ভগবান বাদ সাধেন। না, ভগবান নয়, নিষ্ঠুর নাঙ্গাপর্বত। ১৮ই জুন লুফ্‌ত শিখরাভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ নিয়ে কয়েকজন কুলিসহ চার নম্বর শিবিরে উপস্থিত হলেন। এসেই আঁতকে উঠলেন। সেখানে যে কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু রয়ে গিয়েছে অতিকায় তুষারধস নেমে আসার চিহ্ন। তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁর বন্ধুরা, সহযাত্রীরা! লুফ্‌ত পাগলের মতো চিৎকার করে তাঁদের নাম ধরে ডাকতে থাকলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। শুধু লুফ্‌তের আকুল আহ্বান নাঙ্গাপর্বতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

একটু প্রকৃতিস্থ হবার পরে লুফ্‌ত মালবাহকদের নিয়ে সেই তুষারধসের ভেতরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। বহু চেষ্টার পরে তিনটি রুক্‌স্যাক্ পেলেন। বুঝতে পারলেন তিন-চারদিন আগে নাঙ্গা থেকে নেমে আসা তুষারধস তাঁর সাত সঙ্গী ও নয় শেরপার তুষার-সমাধি রচনা করেছে।

লুফ্‌ত বুঝতে পারলেন, যন্ত্রপাতি ছাড়া সেই বিরাট ধসের তলা থেকে সহ-যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মালবাহকদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মূল শিবিরে।

চারিদিকে দুঃসংবাদ দেওয়া হল। খবর পৌঁছল জার্মানীতে। পল বএর দুজন পর্বতারোহীকে নিয়ে বিমানযোগে এসে পৌঁছলেন কাশ্মীরে। গিলগিট স্কাউটরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের সাহায্যে।

১৫ই জুলাই অর্থাৎ একমাস বাদে তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন তখনও সেখানে সেই অভিশপ্ত তুষারধসের চিহ্ন বর্তমান। ধসটা যে জায়গা অধিকার করে রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য ১৩০০ ফুট ও প্রস্থ ৫০০ ফুট।

তখন বর্ষাকাল, আবহাওয়া খুবই খারাপ। তারই মধ্যে বএর অনুসন্ধান আরম্ভ

করে দিলেন। চারদিন বরফ খোঁড়ার পরে শিবিরের প্রথম নিদর্শন পেলেন—একখানি আইস এক্স। তারপরে আরও দুদিন প্রাণপাত পরিশ্রমের পরে তাঁবু খুঁজে পেলেন। প্রথম তাঁবুতেই ন'জন শেরপার মৃতদেহ পাওয়া গেল। শেরপা সর্দার নুরসাঙ তাঁদের শেষকৃত্য সম্পাদন করে সেখানেই আবার সমাধিস্থ করলেন।

সদস্যদের তিনটি তাঁবুর মধ্যে দুটি খুঁজে পাওয়া গেল। প্রথম তাঁবুতে হার্টম্যান, ফেফার ও হেপ্ আর দ্বিতীয় তাঁবুতে ফ্রাঙ্কহাউসার ও কার্ল উইয়েন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন।

আবার অনুসন্ধান চলল, কিন্তু সবই বৃথা হল। চারিদিকে দশ ফুট গভীর পরিখা খনন করেও তৃতীয় তাঁবুর হদিস মিলল না। পাওয়া গেল না মুল্‌রিটার এবং সিনিয়লচু বিজয়ী এড্‌ল্‌ফ গুট্নারকে।

পাওয়া গেল ডায়েরী ও ঘড়িসহ অভিযাত্রীদের কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। দেখা গেল তাঁরা ১৪ই জুন বিকেল পর্যন্ত ডায়েরী লিখেছেন এবং ঘড়িগুলো বারোটা বেজে কয়েক মিনিট বাদে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মানে স্মার্ট যেদিন চার নম্বর শিবির থেকে নিচে নেমে যান, সেদিনই (১৪ই জুন) রাত বারোটার পরে নাঙ্গাপর্বত থেকে সেই মরণধস নেমে এসেছে, মরণজয়ী অভিযাত্রীদের সঙ্গে হিমালয়ের চিরমিলন ঘটেছে।

নিষ্ঠুর নাঙ্গাপর্বত আমার সিনিয়লচু বিজয়ী প্রিয় পর্বতারোহীদের প্রাণ হরণ করেছে। আজ সিনিয়লচুর পাদদেশে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীরদের অমর প্রাণের উদ্দেশে জানাই আমার শতসহস্র প্রণাম।

এগারো

পরদিন। আজ সকালেও সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হল আমার। আমি তাকে দেখি, দু'চোখ ভরে দেখি আর দেখি। এ দেখার যে শেষ বলে কিছু নেই। হিমালয় সুন্দর, সিনিয়লচু আরো সুন্দর। সুন্দর কি কখনো পুরনো হয়? আর তাই বোধহয় সুন্দরের অভিসার সার্থক হলেও হৃদয় অপূর্ণ থেকে যায়।

আজ কিন্তু নিজের থেকে ঘুম ভাঙে নি। ঘুম ভাঙিয়েছে সাঙবা। সে বেড-টি নিয়ে এসে বলেছে—গুড্ মোর্নিং সাব্!

স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসেছি। উঠে বসেছে অসিতবাবু। আমরা গরম চা-য়ের মগ হাতে নিয়েছি। ঘড়ি দেখেছি—তখন সকাল ছ'টা। জিজ্ঞেস করেছি—বরফ পড়ছে নাকি?

—না সাব্! মেট বলেছে—আকাশ সাফ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদেই রোদ আসবে এখানে।

—সত্যি! আমরা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছি।

—হ্যাঁ সাব্। বাইরে আসুন না, এসে দেখুন না, পাহাড়গুলো কেমন বড়িয়া দেখাচ্ছে।

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি উইণ্ড-প্রুফটা গায়ে দিয়ে পা-দু'খানা জুতোর মধ্যে কোনো রকমে গলিয়ে বেরিয়ে এসেছি বাইরে। আর এসেই দেখা হয়েছে

সিনিয়লচুর সঙ্গে। দেখা হয়েছে তার সহযোগী লিট্‌ল-সিনিয়লচু, প্রতিবেশী পিরামিড ও টেন্ট্‌ পিক্‌-এর সঙ্গে। দেখা হয়েছে সিকিমের ইষ্টদেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে। টেন্ট্‌ (২৪,০৮৯) ও পিরামিড (২৩,৪০৫) আমাদের উত্তর-পশ্চিমে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা সোজা পশ্চিমে। তাদের সবার শিরে সোনালী সূর্যের সম্পাত—তারা তেমনি সোনার খনিতে পরিণত।

শুধু আমি আর অসিতবাবু নই, আমরা সবাই বেরিয়ে এসেছি বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর দেখছি। এ দেখার শেষ নেই।

কেবল কাঞ্চনজঙ্ঘা ·কিংবা সিনিয়লচু নয়, চারিদিকেই দেখি। আমাদের শিবির, এই হিমবাহ আর ঐ সোনালী পর্বতমালা। গতকাল রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে গিয়েছিল। তাই তাঁবুর কোণে কোণে আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তোর মতো বরফ জমে আছে। ভারী ভাল লাগছে দেখতে।

মনে পড়ছে পঞ্চাশ বছর আগে লেখা কয়েকটি কথা। এমনি এক মে মাসের সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের মূল শিবির থেকে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ দেখেছিলেন সিনিয়লচুকে। এই স্বর্গীয় শৃঙ্গকে তাঁর মনে হয়েছিল অশরীরী পরী বলে। স্মাইথের ভাষায়—'fairy like ethereal.'

সিনিয়লচু শৃঙ্গে আরোহণ সম্পর্কে স্মাইথের তখন মনে হয়েছে—'mountain has been called the "Embodiment of Inaccessibility", yet who would think of Siniolchu in terms of accessibility or inaccessibility? It is too beautiful to be defined by man."*

স্মাইথ যা পারেন নি, আমি তা পাবব কেমন করে? আমি শুধু বলতে পারি—সিনিয়লচুর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

ফ্রাঙ্ক স্মাইথ বিশ্ববিখ্যাত পর্বতাবোহী। কিন্তু সিনিয়লচুকে দেখে তাঁর মনে পর্বতারোহণের বাসনা হয় নি। তিনি এই গিরিশৃঙ্গের অপরূপ রূপ দর্শন করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

আমি পর্বতারোহী নই, কেবল পবর্তারোহীদের সঙ্গে এখানে এসেছি। তারা এসেছে সিনিয়লচুর শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে। সিনিয়লচু অতিশয় দুর্গম শিখর। স্মাইথের ভাষায়—'Embodiment of Inaccessibility', তার ওপবে আমরা শেরপা পাই নি এবং আবহাওয়াও সুবিধের নয়। অতএব আমার পর্বতারোহী বন্ধুদের স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা কেবল সিনিয়লচু জানে। আমি শুধু বলতে পারি—আমার আঠার বছরের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আমি সিনিয়লচুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি আর দেখছি। স্মাইথের মতো আমিও আমার সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করছি সিনিয়লচু সুন্দর, তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

তাই অসিতবাবু ও সুশান্তবাবুকে বলি—ছবি নিন। যাঁরা আজ আমার পাশে নেই, তাঁদের জন্য আমি এই অনিন্দ্যসুন্দরকে নিয়ে যেতে চাই, আমি তার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে মর্ত্যলোকে অক্ষয় করে রাখতে চাই। স্মাইথও তাই চেয়েছেন। তিনি তাঁর 'The mountain Scene' বইতে লিখেছেন, 'Years afterwards when memories are failing, a photograph will recapture much that has long been forgotten. And it will do more than this; it will extend

* 'The Kanchenjunga Adventure'—London, 1930

the scope of memory far beyond one particular scene and set in motion a whole train of thoughts, just as a smell may resurrect some childhood scene.'.....

ওঁরা ছবি নিচ্ছেন। কয়েকদিন পরে অভিযান শেষ হবে। আমরা এই অভিযানের অভিজ্ঞতায় মন ভরে নিয়ে ঘরে ফিরব। আস্তে আস্তে এই দৃশ্য আমাদের মনের ক্যানভাসে ফিকে হয়ে যাবে। তখন এর এক-একখানি ছবি আজকের এই দিনটিকে, এই অভিযানের সুখস্মৃতিকে আমার মনের পর্দায় নূতন করে জীবন্ত করে তুলবে।

কিন্তু আজকের কথা বলার আগে গতকালের না-বলা কথাগুলো বলে নেওয়া যাক। সিনিয়লচুকে দেখতে দেখতে আমি ভেবে চলি—

গতকাল অসিতরা রওনা হবার পরে মাত্র ঘণ্টা চারেক আবহাওয়া ভাল ছিল। তারপরেই তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেল। আর ক্রমেই তা বেড়ে চলল। বিকেলের দিকে যেমন জোরে বরফ পড়তে শুরু করল, তেমনি বাতাসের বেগ বেড়ে উঠল। চারিদিকের সব কিছু সাদা ধোঁয়ার মতো মনে হতে থাকল। আমরা সবাই কিচেনে জড়ো হয়ে অসিতদের ফিরে আসার পথ চেয়ে রইলাম। ওদের জন্য বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। দুর্গম পথ, তুষারঝড়ের মধ্যে ওরা ফিরে আসবে কেমন করে?

আমাদের তখন একবার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। অসিত বলে গেছে—ফিরে এসে মুড়ি ও পকোড়া খাবে। তাই পকোড়া ভাজা হচ্ছিল। কিন্তু ওদের দেখা নেই।

ওদের জন্য দুশ্চিন্তা, সেই সঙ্গে পকোড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ভয়। অতএব সময়টা খুব খারাপ কাটছিল।

তবে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ওরা এসে গেল। সবাই সুস্থদেহে ফিরে এলো। খুবই কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেউ তা নিযে কোন দুঃখ প্রকাশ করল না। ওয়াটার প্রুফ খুলে, গা-মাথা ঝেড়ে সবাই এসে আগুনের ধারে বসল।

মুড়ি মুখে পুবে অসিত বলল—১৭,২০০ ফুটে এক নম্বব শিবিরের স্থান নির্বাচন কবেছি। সেখানে তাঁবু টাঙিয়ে মালপত্র সব বেখে এসেছি।

—এবাবে পথেব কথা বলো। অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

অসিত উত্তর দেয়—আমরা গ্রাবরেখার গিরিশিরা অতিক্রম করে জেমু হিমবাহে পৌঁছলাম। কঠিন ও ভয়ঙ্কর পথ। তারপর জেমু হিমবাহ থেকে সিনিয়লচু হিমবাহ পৌঁছন গেল। আপনারা তো সবাই জানেন, সিনিয়লচু হিমবাহ জেমু হিমবাহের একটি প্রধান উপ-হিমবাহ।

—জেমুর অন্যান্য হিমবাহগুলো কি? অসিত থামতেই ডাক্তার প্রশ্ন করে।

বীরেন উত্তর দেয়—সিম্বু, নেপাল গ্যাপ্ ও টেন্ট্ পিক্ হিমবাহ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণী থেকে নেমে আসা বিভিন্ন হিমবাহ। সিনিয়লচু হিমবাহের বরফ সরবরাহ হচ্ছে সিনিয়লচু, লিট্‌ল-সিনিয়লচু ও টেন্ট্ পিক থেকে।

—সে যাই হোক, বীরেন থামতেই আবার অসিত শুরু করে—গ্রাবরেখা থেকে হিমবাহে পৌঁছতে আমাদের খাড়া উৎরাই ভাঙতে হয়েছে। আগেই বলেছি বেশ বিপজ্জনক রাস্তা আড়াআড়ি ভাবে জেমু হিমবাহের সঙ্গমে পৌঁচেছি। সেখান থেকে আবার শুরু হল চড়াই। প্রায় শ'পাঁচেক ফুট চড়াই ভেঙে আমরা একটি ছোট্ট

শিবিরক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। এই সমতল জায়গাটুকু সিনিয়লচু গ্রাবরেখার গিরিশিরায়। তোমরা শুনে অবাক হবে, ওখানে ঝোপঝাড় রয়েছে। আমরা সেটি ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছি। কয়েক শ' ফুট উঠে আরেকটি শিবিরক্ষেত্র পেয়েছি, এটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং নিরাপদ। সেখানেই তাঁবু টাঙিয়ে মালপত্র রেখে এসেছি। আগামীকাল আমরা সে তাঁবুতে বাস করব, প্রতিষ্ঠিত হবে অভিযানের এক-নম্বর শিবির।

সিনিয়লচু অভিযানের ভাবনায় আমাকে বিভোর রেখে সিনিয়লচু কখন যে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে টের পাইনি। খেয়াল হতে দেখি সিনিয়লচু নেই।

না, আছে। সিনিয়লচু আছে কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেবল সিনিয়লচু নয়, সেই সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘাও অদৃশ্য হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার কখন দেখা হবে, কে জানে?

কিচেন থেকে বীরেনের চিৎকার কানে আসে, "সবাই চলে এসো। ব্রেক-ফাস্ট রেডি।"

অমূল্য আগেই বলেছে—আজ সবাই একসঙ্গে ব্রেক্-ফাস্ট করবে। অসিতবা চলে যাচ্ছে।

এ যাওয়া কয়েকদিনের জন্য। সুতরাং এ ব্রেক্-ফাস্ট 'লাস্ট্ সাপার' নয়। তাহলেও নেতার নির্দেশ মতো সবাই কিচেনে আসি। একসঙ্গে খেতে বসি।

বীরেন ও অমূল্য অসিতের পাশে বসে খেতে খেতে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। ওরা মাঝে মাঝে ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করছে।

খাবার পরে অসিতরা প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে নেয়। ওরা তৈরি হয়।

এবারে বিদায়েব পালা। অসিত আবার প্রণাম করে আমাকে, আমি আবার ওকে বুকে জুড়িয়ে ধরি। বলি, "তুই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। তোকে উপদেশ দেওয়া বাতুলতা। তবু একটা কথা বলি—আমরা থাকলেই হিমালয় থাকবে। হিমালয়ে এসে হারিয়ে গেলে কিন্তু সেই সঙ্গে হিমালয়ও হারিয়ে যাবে আমাদের জীবন থেকে। হিমালয় ধৈর্যহীনদের জন্য নয়।"

"আপনার কথা মনে থাকবে শঙ্কুদা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা কখনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করব না। আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন সফল হয়ে নিরাপদে আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পরি।"

ওরা সারি বেঁধে চলা শুরু করে—অসিত, কেশব, নওয়াঙ ও সাঙ্গে। তারপরে মালবাহকরা—সবার শেষে তিন তিব্বতী—থাম্‌ডিং, নোরগে ও থাণ্ডপ। অসিতের নির্বাচন সত্যি প্রশংসনীয়। ছেলে তিনটে যেমন কাজের, তেমনি পরিশ্রমী।

আজও ওদের খানিকটা এগিয়ে দিই। তারপরে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, ওরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ বাদে ওরা হিমবাহের ঢেউয়ের মাঝে যায় হারিয়ে। আমরা ফিরে আসি শিবিরে।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। বীরেন আবার কিচেনে ঢোকে। অসিতবাবু অরুণ ও শরদিন্দু আগামীকালের মালপত্র গোছাতে লেগে যায়। বিনীত ও হিমাদ্রি অমূল্যর সঙ্গে ম্যাপ নিয়ে বসেছে। কাল বিনীত আর পরশু অমূল্য ও হিমাদ্রি ওপরে যাবে। সুশান্তবাবু ও রমেনবাবু সংবাদ লিখতে বসেছেন। আর ডাক্তারকে নিয়ে আমি বসেছি চিঠিপত্র নিয়ে। আগামীকাল ডাক যাবে। লাচেন থেকে মিস্টার সিং

আমাদের সংবাদ ওয়ারলেস যোগে গ্যাংটক পাঠিয়ে দেবেন। সেনদা এই সংবাদ ফোনে শিলিগুড়ি ও কলকাতায় জানিয়ে দেবেন আর দিল্লীতে টেলিগ্রাম করে দেবেন।

কিন্তু সংবাদ নয়, চিঠি। চিঠির ভাবনাই ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। প্রায় শ'তিনেক চিঠিতে ঠিকানা লিখতে হবে। আমাদের মূল শিবির প্রতিষ্ঠার খবর দিয়ে শুভেচ্ছা কামনার চিঠি। সিনিয়লচুর ছবি সহ মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ আমরা কার্ডে ছাপিয়ে এনেছি। সদস্যরা সবাই তাতে সই করেছে। এখন তারিখ ও ঠিকানা লিখে টিকেট লাগাতে হবে। যাঁরা আমাদের টাকা দিয়ে, জিনিস দিয়ে এবং গায়ে খেটে কিংবা উৎসাহ যুগিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে চিঠি পাঠাবো—সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা কামনা করব।

কাজ শেষ হল না কিন্তু খাবারের ডাক এল। এ ডাক উপেক্ষা করা যায় না। উচ্চ হিমালয়ে খিদে কম পায়, কিন্তু খাবার ডাক শুনে বসে থাকতে পারি না। গরম থাকতে থাকতে তবু যাহোক কিছু খাওয়া যায়, জুড়িয়ে গেলে মুখে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ভাত ডাল ডিমের ডালনা ও আচার। বীরেন রেঁধেছে। ভালই হয়েছে। নেতার মতলব জানি না। হয়তো কাল সকালেই বীরেনকে বিনীতের সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দেবে। খুব মুশকিলে পড়ে যাবো। কে রান্না করবে?

কথায় কথায় সে-কথাই বলি সাঙবাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে বসে, "কেন ঘাবড়াচ্ছেন সাব্? ডিপটিসাব্ ওপরে চলে গেলে আমি খানা পাকাবো, বড়িয়া খানা।"

ওর কথায় খুশি হই। ছেলেটা সত্যি বড় ভাল। এই ক'দিনে আমাদের একেবারে আপনজন হয়ে উঠেছে। নিজের কাজ মনে করে সর্বদা সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করছে। যেমন সুন্দর চেহারাটি, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন ফিটকাট ছেলে হিমালয়ে খুব বেশি দেখা যায় না।

খাবার পরে ফিরে চলি তাঁবুতে। অসিতবাবু বলে, "এবারে তুমি আর ডাক্তার বিশ্রাম করো। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। আমি অরুণ ও শরদিন্দু চিঠিতে ঠিকানা লিখছি।"

ডাক্তার গিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। হয়তো একটু ঘুমিয়ে নিতে। কাজটা ঠিক করছে না। উচ্চ হিমালয়ে এমনিতেই মানুষের ঘুম কমে যায়। তার ওপরে এখানে রাত বড়ই দীর্ঘ। সন্ধ্যার পরেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ি। অথচ চোখে ঘুম নেই। ফলে রাত আর ফুরোতে চায় না। অতএব দিবানিদ্রা আরও বেশি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবু ডাক্তারকে বাধা দিই না। কিন্তু আমি আর তাঁবুতে ঢুকি না। একা একা হাঁটতে থাকি। দক্ষিণে অর্থাৎ যেদিক থেকে মূল-শিবিরে এসেছি, সেদিকেই হাঁটছি আপন মনে। উদ্দেশ্যহীন পদচারণা।

সেদিন রাতে কিছুই দেখতে পাই নি। তারপরে এদিকে আর আসা হয় নি। আজ তাই দেখতে দেখতে চলেছি। বাঁয়ে একটু দূরে একটা বেশ উঁচু গিরিশিরা আর ডাইনে সীমাহীন জেমু হিমবাহ। মাঝখানে প্রায় সমতল পাথুরে প্রান্তর—জুনিপার আর কিছু ছোট ছোট ফুল।

আমরা এখন জেমু হিমবাহে বসবাস করছি। মনে পড়ছে এই হিমবাহে প্রথম বেসরকারী ভারতীয় অভিযাত্রীদের কথা। ১৯৭৫ সালের মে মাসে 'মাউন্টেনীয়ার্স ইয়ুথ রিং' নামে কলকাতার এক পর্বতারোহণ সংস্থা সেই অভিযানের আয়োজন করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশান এই অভিযানকে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। তাহলেও প্রকৃত অর্থে সে আয়োজনকে পর্বতাভিযান না বলে সমীক্ষা বলাই উচিত হবে। কারণ অভিযাত্রীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জেমু হিমবাহের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে হিমবাহের দক্ষিণ-পূর্ব বাঁকের ঢালে প্রথম শিবির স্থাপন করবেন। তারপরে আরও অগ্রসর হয়ে সিকিম ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত নেপাল (গ্যাপ্) শিখরের ঠিক নিচে দ্বিতীয় শিবির প্রতিষ্ঠা করে সমীক্ষা সম্পূর্ণ করবেন। কিন্তু মালবাহক, সাজ-সরঞ্জাম ও রসদের অভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। কেবল দলের তিনজন সদস্য হিমবাহের পূর্ব-ঢাল অতিক্রম করে গ্রীণ-লেক উপত্যকায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। শ্রীদেবব্রত সাহা এই অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন। প্রখ্যাত ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক ডঃ মনতোষ ব্যানার্জী এবং আরও ছ'জন অভিযাত্রী ছিলেন সেই দলে। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী কল্যাণ ভট্টাচার্য, এইচ. পাল, এম. কে. দে, এ. দাসগুপ্ত, অনাথনাথ অধিকারী এবং অধ্যাপক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ডায়মণ্ডহারবার কলেজের অধ্যাপক অর্ধেন্দু আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু। তার কাছে আমি এই জেমু হিমবাহের অনেক কথা শুনেছি। এখন তাই পদচারণা করতে করতে বার বার তার কথা মনে পড়ছে।

কিন্তু থাক, আর ওদের কথা নয়, এবারে আবার জেমু হিমবাহকে দেখা যাক। শ'খানেক গজ এসে একটুকরো সমতলে পৌঁছই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানুষের হাত পড়েছে। চারিদিকে ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে সমতলটুকু আলাদা করা হয়েছে। ভেতরে একটাও বড় পাথর নেই। এবং মাটি ফেলে নিচু জায়গাগুলো সমতল করা হয়েছে। তার মানে মানুষের নির্মিত, প্রকৃতির অবদান নয়।

এটাই তাহলে সেই হ্যালিপ্যাড্। সোনাম ওয়াঙ্গিলের সহযাত্রীরা গত বছর ৯ই মে এই হ্যালিপ্যাড নির্মাণ করেছে। তারপরে এক বছর কেটে গেছে। কিন্তু অবতরণ ক্ষেত্রটি অক্ষতই রয়ে গিয়েছে। গত বছর এখানে হ্যালিকপ্টার অবতরণ করেছে। নিমা দোরজি নামে জনৈক অভিযাত্রী তুষারগহ্বরে পড়ে গিয়ে আহত হন। দুর্ঘটনার চারদিন পরে ১৯শে মে এখানে হ্যালিকপ্টার নামে, দোরজি ও অপর একজন অসুস্থ অভিযাত্রীকে নিয়ে গ্যাংটক ফিরে যায়।

হ্যালিপ্যাড ছাড়িয়ে ভূখণ্ডটি আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেছে। আমি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। এসে পৌঁছই সেই নদীতীরে—সেদিন রাতে যেখানে আমরা শেষ বারের মতো পথ হারিয়েছিলাম।

নদীর তীরে একখানি পাথরের ওপরে বসে পড়ি। বসে বসে ভাবতে থাকি গত বছরের (১৯৭৯) সফলকাম অভিযানের কথা—

সোনাম ওয়াঙ্গিল তাঁর অভিযাত্রীদের নিয়ে গত বছর ৮ই মে এখানে আসেন। পরদিন সোনাম আঠারজন সদস্যকে নিয়ে এক নম্বর শিবিরের পথ তৈরি শুরু করেন। তাঁরা জেমু হিমবাহের গ্রাবরেখা অতিক্রম করে সিনিয়লচু হিমবাহ পর্যন্ত পথ চিহ্নিত করলেন। সিনিয়লচু হিমবাহের ডানদিকে রয়েছে কঠিন পাথরের খাড়া

দেওয়াল। আর তার উপরিভাগ অসংখ্য তুষার-ফাটলে ক্ষত-বিক্ষত। সৌভাগ্যক্রমে অভিযাত্রীরা নিরাপদে পেরিয়ে এলেন। তারপরে তাঁরা ডানদিকে মোড় ফিরে হিমপ্রপাতের দিকে অগ্রসর হলেন। এই সময় তাঁদের তিন-চার ফুট উঁচু নরম তুষার ভেঙে এগোতে হয়েছিল। হিমপ্রপাতের পাশে পৌঁছে তাঁরা ৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত একফালি সমতল দেখতে পেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রায় শ'ছয়েক ফুট ওপরে আরেকটা পাথরের দেওয়াল দেখা যাচ্ছিল।

প্রথম দর্শনে সমতলটিকে তাঁদের এক নম্বর শিবির স্থাপনের উপযোগী বলে মনে হল। অল্‌টিমিটারে দেখলেন জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৫৬৬ ফুট। সেখানেই তাঁরা তাঁবু টাঙিয়ে মালপত্র রাখলেন। কিন্তু তারপরে দেখতে পেলেন জায়গাটায় প্রচুর চোরা-ফাটল রয়েছে, সেখানে শিবির স্থাপন করা নিরাপদ নয়। অথচ তখন আর তাঁবু সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না। কারণ তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। তাই তাঁরা তাড়াতাড়ি মূল শিবিরে ফিরে এলেন।

পরদিন সহনেতা ফুরবু শেরিং ও সাতজন অভিযাত্রী মালপত্র নিয়ে সেই সমতলে উপস্থিত হলেন। প্রথমেই তাঁরা তাঁবুগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরে দুজন সদস্য কোমরে দড়ি বেঁধে পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ডানদিক অর্থাৎ খাড়া পর্বতগাত্রের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁরা হিমপ্রপাত অতিক্রম করতে চাইলেন। কয়েকটি ফাটল ও বরফের সেতু পেরিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। হিমপ্রপাত অতিক্রম করে তাঁরা একটা তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে তাঁরা মূল শিবিরে ফিরে এলেন।

পরদিন ১২ই মে। সেদিন অভিযাত্রীরা ধাপ কেটে কেটে এবং 'ফিক্‌স্‌ড রোপ' লাগিয়ে একটা খাড়া বরফের দেওয়াল পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে আগের দিনের সেই তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। আর তখুনি হাস্যমুখর সিনিয়লচুর বিস্ময়কর ও সুন্দর সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। অভিযাত্রীরা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই স্বতঃস্ফূর্ত দৃশ্যের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁদের হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠল। তাঁরা শাশ্বত সুন্দরের কাছে করুণা প্রার্থনা করলেন।

তারপরে অভিযাত্রীরা তুষারক্ষেত্রটির দিকে তাকালেন। পরম সুন্দরের পাশে দেখতে পেলেন এক চরম কুৎসিত দৃশ্য। তুষারক্ষেত্রটির এক-চতুর্থাংশ জুড়ে প্রকাণ্ড ফাটল—মরণফাঁদ। তাঁরা খুব সাবধানে সেই ফাটলের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে শিবির স্থাপনের উপযোগী একখণ্ড সমতল দেখতে পেলেন। খুব ভাল করে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলেন—সেখানে চোরা ফাটল নেই, তুষারধস নামবে না কিংবা পাথর পড়বে না।

সেখানেই তাঁরা দু'নম্বর শিবির স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁবু টাঙিয়ে মালপত্র রাখলেন। জায়গাটার উচ্চতা ১৭,৩৫৮ ফুট। অভিযাত্রীরা মালপত্র রেখে বিকেল চারটের সময় মূল-শিবিরে ফিরে এলেন।

১৩ই মে অভিযাত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ওপরের শিবিরে রওনা হলেন। একদল মালপত্র নিয়ে চললেন, আরেকদল তিন ও চার নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এগিয়ে গেলেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন 'কল্‌'-য়ের (Col.) ঠিক

নিচে ১৯,৩০৫ ফুটে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হল।

১৫ই মে নিমা দোরজি দুর্ঘটনায় পতিত হলেন। তখন তিনি এক নম্বর শিবিরের কাছে ফিক্সড-রোপ লাগাচ্ছিলেন। কাঠের খিল (Peg) পোঁতার সময় তিনি একটা তুষার-ফাটলে পড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে তাঁকে উদ্ধার করা গেল। দেখা গেল তাঁর ডানদিকের পাঁজর ভেঙে গিয়েছে। ১৯শে মে আরেকজন অসুস্থ অভিযাত্রীর সঙ্গে তাঁকে হ্যালিকপ্টারে গ্যাংটক পাঠিয়ে দেওয়া হল।

গুরমে থিন্‌লে, নিমা ওয়াংচু, জি. টি. ভোটিয়া, ফু দোরজি, ফেণ্ডো ভোটিয়া এবং সেওয়াং থাণ্ডুপকে নিয়ে প্রথম শিখরাভিযাত্রীদল গঠিত হল। তাঁরা ১৬ই মে চার নম্বর শিবির স্থাপনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিন নম্বর শিবিরের ওপরে পাহাড়ের দিকে তাঁদের একটা খাড়া বরফের গলি পার হতে হল। গলিটা প্রায় ১২০০ ফুট লম্বা। সেটি পার হবার সময় তাঁরা সোজাসুজি বহু নিচে পাসানরাম উপত্যকা দেখতে পেলেন। অবশেষে তাঁরা সিনিয়লচু গিরিশিরায় উপস্থিত হলেন।

ফ্রাঙ্ক স্মাইথ এই গিরিশিরাকেই বাঁকা তলোয়ার বলে অভিহিত করেছেন। এটি শুধু সরু এবং খাড়া নয়, তুষারের কার্নিশে (cornice) বোঝাই। ঢাল প্রায় পঁচাত্তর ডিগ্রি। একটু অসাবধান হলেই দুদিকেই সোজা কয়েক হাজার ফুট নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

এখানে অভিযাত্রীদের দড়ি ফুরিয়ে গেল। তাই তাঁরা তিন নম্বর শিবিরে ফিরে এলেন।

পরদিন অভিযাত্রীরা খানিকটা এগিয়ে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল পেলেন। সেখানে ফিক্সড-রোপ করতে তাঁদের অনেকটা সময় কেটে গেল। কিন্তু সেদিনই ২০,৬২৫ ফুট উঁচুতে তাঁরা চার নম্বর বা শিখর-শিবির প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন।

চার নম্বর শিবিরের পরে পথ আরও বিপজ্জনক। তাই অভিযাত্রীরা ১৮ই মে ভোর পাঁচটায় চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। প্রথমেই তাঁরা দুটো বিরাট তুষার ফাটল পার হলেন। তারপরে তাঁদের ঝুলন্ত কার্নিশের ওপরে পা ফেলে ফেলে আরোহণ করতে হল। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ যে কোন সময় সেই নরম কার্নিশ ধসে পড়তে পারত। আর তাহলে তাঁরা সোজা কয়েক হাজার ফুট নিচে পাসানরাম হিমবাহে পড়ে যেতেন। কিন্তু সেই কার্নিশ ছাড়া সিনিয়লচু শিখরের আর কোন পথ নেই। সুতরাং তাঁদের সে ঝুঁকি নিতেই হল।

সিনিয়লচুর কৃপায় অভিযাত্রীরা নির্বিঘ্নে সেই কার্নিশ পেরিয়ে আবার শিখর-শিরায় পৌঁছে গেলেন। এটি সিনিয়লচু শিখরের দক্ষিণ গিরিশিরা, মূল গিরিশিরা থেকে সরু এবং খাড়া।

প্রথমে তাঁদের লাফিয়ে একটা তুষার-ফাটল পার হতে হল। তারপরেই নিরেট পাথরের আরেকটা খাড়া দেওয়াল। ফিক্সড-রোপ না লাগিয়ে সেটিতে আরোহণ করা সম্ভব নয়। অথচ তখন দড়ি ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই আগের দেওয়াল থেকে দড়ি খুলে এনে লাগাতে হল এখানে।

অভিযাত্রীরা দেওয়াল পেরিয়ে একটা গলি পেলেন। সেটি পার হয়ে তাঁরা আবার শিখর-শিরায় উপস্থিত হলেন। একই দড়িতে কোমর বেঁধে অভিযাত্রীরা এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছিল তাঁদের। কারণ সেই খাড়া শিখর-শিরায় কঠিন বরফের

ওপর নরম তুষারের একটা পাতলা আস্তরণ পড়েছিল। যে কোন সময় তাঁরা পা ফসকে পড়ে যেতে পারতেন।

হিমালয়ের করুণায় তেমন কোন অঘটন ঘটল না। ছ'জন ভারতীয় অভিযাত্রী বিশ্বের সুন্দরতম পর্বতের স্বপ্ন-শিখরের উপস্থিত হলেন। ঘড়িতে তখন বেলা একটা।

সিনিয়লচুর শিখরদেশ সংকীর্ণ। আয়তন মাত্র দু-তিন ফুট। শিখরের চারিদিকে বরফের কার্নিশ—অবিকল মুকুটের মতো। অভিযাত্রীরা স্বপ্নকিরীটকে প্রণাম করলেন। তাঁরা সাফল্যের আনন্দে বিহ্বল ও দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

বিহ্বলতা কেটে যাবার পরে অভিযাত্রীরা চারিদিকের ছবি নিলেন। তারপরে শিখরপূজা সেরে জাতীয় পতাকা এবং সোনাম গিয়াৎসো মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউটের পতাকা প্রোথিত করলেন। (সোনাম ওয়াঙ্গিল এখন এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ)

অভিযাত্রীদের অল্‌টিমিটারে সিনিয়লচু শিখরের উচ্চতা উঠল ২২,৭০৪ ফুট। এটি সিনিয়লচু সম্পর্কে নূতন তথ্য। এতদিন সিনিয়লচু ২২,৬২০ ফুট উঁচু বলে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

যাই হোক অভিযাত্রীরা আধ ঘণ্টা শিখরে অবস্থান করে অবতরণ আরম্ভ করলেন। সেদিন রাতে চার নম্বর শিবিরে কাটিয়ে পরদিন তাঁরা মূল শিবিরে ফিরে এলেন।

তারপরে এই অভিযাত্রীদল আরও তিনবার শিখরে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় দলে ছ'জন অভিযাত্রী ২০শে মে, তৃতীয় দলে তিনজন অভিযাত্রী ২১শে মে এবং চতুর্থ দলে ছ'জন অভিযাত্রী ২৩শে মে শিখরে আরোহণ করেন। শেষ দলটির নেতৃত্ব করেন স্বয়ং নেতা—সোনাম ওয়াঙ্গিল। তাঁরা সেদিন ভোর তিনটেয় তিন নম্বর শিবির থেকে বেরিয়ে দুপুর সাড়ে বারোটায় শিখরে পৌঁছন। তাঁরাও সেই স্বপ্ন-শিখরে আধঘণ্টা অতিবাহিত করেন।

দুপুরের পর থেকেই তুষারপাত শুরু হয়েছিল। এখন আবার বাতাস উঠল। না, তুষার-ঝড় বলব না। তবে আবহাওয়া খুবই খারাপ। এখানে যেমন-তেমন, ওপরে ওদের কি অবস্থা, কে জানে। অসিতরা নির্বিঘ্নে এক নম্বর শিবিরে পৌঁছতে পেরেছে কি? পারলেও এই আবহাওয়ায় ওরা যে সেখানে সুখে নেই, তা বেশ অনুমান করতে পারছি।

অবশ্য জানি সুখের জন্য আমরা এখানে আসি নি, সুখের জন্য ওরা ওপরে যায় নি। সুখের সঙ্গে সম্পর্ক নেই পর্বতারোহণের। তাহলেও ভাবনা হয় বৈকি। তাই বার বার মনে হচ্ছে—অসিতরা ওপরে কেমন আছে?

কিন্তু কে এখন আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? যারা দিতে পারে, আমরা যে কিচেন-এ বসে তাদেরই প্রতীক্ষা করছি। মালবাহকদের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে রয়েছি।

চারিদিকে শুধুই সাদা—আলোর সাদা নয়, আঁধারের সাদা। বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। তবু তাকিয়ে রয়েছি জেমু হিমবাহের দিকে, দেখছি কেউ আসছে কিনা।

নিচের থেকে যাদের আসার কথা ছিল, তারা এসে গিয়েছে। যে দু'জন কুলি কাল বাঁশ আনতে তেলেম্ গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। মেয়েরাও

দু-বোঝা করে কাঠ এনে এখন সমবেত সঙ্গীত শুরু করেছে। মাঝে মাঝে সেই সুর ভেসে আসছে এখানে।

কিন্তু গান নয়, আমি ভাবছি কাঠের কথা। ছ'বোঝা কাঠ আনতে ওদের মজুরী আর খাওয়া নিয়ে দৈনিক প্রায় একশ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তবু কাঠে কুলোচ্ছে না, কেরোসিন জ্বালাতে হচ্ছে।

পর্বতাভিযানে মূল শিবির প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত সেখানে জল ও জ্বালানী থাকতে হবে। কারণ যে-কোন অভিযানে অধিকাংশ সদস্য থাকে মূল-শিবিরে। তাই মূল শিবিরে বরফ গলিয়ে জল করা কিংবা স্টোভে রান্না করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

এখানে জলের কোন অসুবিধে নেই। জ্বালানীও আছে, কিন্তু একটু দূরে। তাই দৈনিক দু-বোঝার বেশি কাঠ আনা সম্ভব হচ্ছে না মেয়ে কুলিদের। অথচ ছ'বোঝা কাঠে আমাদের কুলোচ্ছে না।

কেমন করে কুলোবে? কুলিরাও যে এই কাঠ জ্বালাচ্ছে। কেবল রান্না নয়, সেই সঙ্গে আগুন পোহানো। ওদের বিছানাপত্র কম, তাই ওরা সারারাত ছাউনির সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। তাও একটা আগুনে হচ্ছে না। সঙ্গে মেয়েরা থাকায় নাকি ওরা এক ছাউনির তলায় রাত্রিবাস করতে পারছে না। ওরা এক গ্রামের বাসিন্দা হলেও আলাদা পরিবারের মেয়ে। তাই তেরোজন মানুষের জন্য তিনটি ছাউনি টাঙানো হয়েছে। তিনটি যুবতী আছে যে! একজনের সঙ্গে স্বামী, একজনের সঙ্গে ভাই ও একজনের সঙ্গে 'বয়-ফ্রেণ্ড' রয়েছে। 'গার্ল-ফ্রেণ্ড' 'বয়-ফ্রেণ্ড'-য়ের সঙ্গে এখানে আসতে পেরেছে, কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গে এক ছাউনিতে থাকতে রাজী হয় নি। সুতরাং সারারাত তিনটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখে ওরা আমাদের জ্বালানী শেষ করে দিচ্ছে।

কিন্তু কাঠ আনার জন্য তিনজনের বেশি নিযুক্ত করা এখন সম্ভব নয়। আজ যারা বাঁশ নিয়ে এসেছে, কাল তাদের আবার নিচে পাঠাতে হবে। তারা ডাক নিয়ে লাচেন যাবে। জঙ্গলের পথ বলে একজন ডাক-রাণারে কাজ হচ্ছে না।

ভাবনায় ছেদ পড়ে। বিনীত বলে ওঠে, "কুলিরা এসে গেছে।"

একটু বাদেই ওরা একে একে ভেতরে ঢোকে। বর্ষাতি খুলে আগুনের ধারে এসে বসে।

অমূল্য বলে, "লাক্‌পা, এই ওস্তাদদের চা খাওয়াও!"

পর্বতাভিযানে শেরপাদের ওস্তাদ বলা হয়। এরা কেউ শেরপা নয়, তবু অমূল্য এদের ওস্তাদ বলে সম্মানিত করল।

লাক্‌পা নেতার আদেশ পালন করে। ওরা চায়ে চুমুক দেয়।

এবারে অমূল্য জিজ্ঞেস করে, "ওপরের খবর কি?"

"ভাল সাব্!" থিচন বলে।

"তোমরা কখন এক নম্বরে পৌঁচেছো?"

"এগারোটার সময়।"

"তখন বরফ পড়ছিল?"

"না সাব্।" নাম্বার উত্তর দেয়, "বরফ পড়া শুরু হয়েছে ফেরার পথে।"

"এখন তাহলে খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো।" একবার থামে অমূল্য। তারপরে আবার বলে, "কাল ওপরে যাবে তো?"

"কেন যাবো না, নিশ্চয়ই যাবো।" ওরা সমস্বরে বলে ওঠে। তারপরে উঠে দাঁড়ায়। আমাদের নমস্কার করে নিজেদের আস্তানায় চলে যায়।

একটু বাদে মেট বলে, "সাব্, কুলিদের রেশন দিতে হবে।"

এটাই আমাদের কিচেন-কাম-স্টোর। খাবার সহ প্রায় সব জিনিসপত্র এখানেই রাখা হয়েছে। কাজেই আমাদের পক্ষে এখন রেশন দেওয়া কোন হাঙ্গামা নয়। কিন্তু বাইবে ববফ পড়ছে। ওদের পক্ষে এখন রেশন নিতে আসা মুশকিল।

আমার কথা শুনে মেট মৃদু হাসে। বলে, "সাব্, পেটে খিদে থাকলে কি মানুষ বরফের ভয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে? ডাক দিলেই দেখবেন ওরা ছুটে আসবে।"

"বেশ তো, ওদের ডেকে রেশন দিয়ে দাও।"

মেট চেঁচিয়ে ওদের ডাকতে শুরু করে। ওরা সাড়া দেয়। মেট বলে—"এসে রেশন নিয়ে যা!"

কয়েক মিনিটের মধ্যে চারজন মালবাহক এসে হাজির হয়, তাদের দুজন মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে থাসা রয়েছে।

হিমাদ্রি বলে, "অসিতদা, পকেটে লজেন্স আছে নাকি?"

অসিতবাবু কটমট করে তার দিকে তাকায়। বলে, "হিমু, ভাল হবে না কিন্তু।"

আমবা হেসে উঠি। কুলিরাও হাসে। কেন তা তারাই বলতে পাবে। তবে কোন কারণ নেই। আমরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলছি।

শরদিন্দু ও অরুণ ওদের হিসেব করে রেশন দিতে শুরু করে—চাল আটা ডাল তেল নুন আলু আচার মশলা চা চিনি ও দুধ ইত্যাদি।

বেশন পাবার পরেও কুলিরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন বুঝতে পারছি না। তাই মেটের দিকে তাকাই। মেট বলে, "সাব্, আবার চা হচ্ছে দেখে ওরা চা খেতে চাইছে।"

খুবই স্বাভাবিক। একে শীত, তার ওপর বরফ পড়ছে। সামনে গরম চা দেখলে কার না খেতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু আমবা তো আর চা খাবো না। এখন জল গরম হচ্ছে বোর্ণভিটার জন্যে। তারই একটু একটু করে দেওয়া যাবে ওদের। সেই কথা বলি চেতাকে। আর ওদের বসতে বলি।

একটু বাদে চেতা বোর্ণভিটা পরিবেশন করে। ওরা চারজনও ভাগে পায়।

ওরা ভারী খুশি। উষ্ণ পানীয় ঠোঁটে ঠেকিয়ে ওরা হাসাহাসি শুরু করে। ভাষা বুঝছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি ওরা কিছু বলতে চাইছে।

আমি আবার মেটের দিকে তাকাই। কিন্তু মেট কিছু বলতে পারার আগেই থাসা অসিতবাবুর দিকে ফিরে বলে, "সাব্, মিঠা মিলেগী?"

আবার হাস্যরোল। হাসি থামলে হিমাদ্রি যোগ করে, "তখুনি তোমাকে বলেছিলাম অসিতদা!"

"তুই থাম্!" অসিতবাবু হিমাদ্রিকে ধমক লাগায়। তারপরে শান্তস্বরে থাসাকে

বলে, "এখন সঙ্গে নেই। কাল সকালে তাঁবু থেকে নিয়ে নিও।"

ওরা খুশি মনে রেশন নিয়ে ছাউনিতে চলে যায়। আমরা হেসে উঠি, অসিতবাবু গম্ভীর।

একটু বাদে বিনীত বলে, "অসিতদা, তুমি কাল মেম্বারদের লজেন্সের 'কোটা' সবাইকে দিয়ে দিও, নইলে যা অবস্থা দেখছি শেষ পর্যন্ত আর ভাগে পাওয়া যাবে না।"

"তুই কাল ওপরে যাচ্ছিস, তোর 'কোটা' পেয়ে যাবি। আর কারও 'কোটা' নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।"

আবার হাসারোল।

হাসি থামলে সাঙবা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে, "সাব্, কাল কুলিরা কি করবে?"

একটু ভেবে নিয়ে অমূল্য বলে, "দুজন ডাক নিয়ে লাচেন যাবে, মেয়েরা কাঠ আনবে আর বাকিরা বিনীতের সঙ্গে ওপরে যাবে। তারা এক নম্বরে মাল রেখে ফিরে আসবে।"

"কাল কিন্তু একটু বেশি 'লোড' ওপরে পাঠাতে পারলে ভাল হয়।" হিমাদ্রি বলে।"

"বেশ তো, চারজন মেম্বার তাহলে কাল 'ফেরী' করুক।" অমূল্য প্রস্তাব করে।

বীরেন বলে, "চারজনের দরকার নেই, চেতা ও লাক্পা কাল মাল নিয়ে ওপরে যাবে, কিচেন আমি ম্যানেজ করব। বিনীতের সঙ্গে দুজন মেম্বার মাল নিয়ে গেলেই চলবে, তারা ফিরে আসবে।"

বীরেনের পরামর্শ সবাই মেনে নেয়। সুতরাং নেতা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। বিনীতকে বলে, "তোমরা পরশু দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত করে তরশু তিনজন হ্যাপ্ সহ সেখানে চলে যাবে। আমরা পরশু এক নম্বরে যাবো ও পরেব দিন থেকে তোমাদের সাহায্য করব।"

"শুধু কি মালবাহকরাই মূল শিবির থেকে মাল ফেরী করবে?"

"না, মেম্বাররাও তাদের সঙ্গে থাকবে।" অমূল্য বলে।

"মেম্বার বলতে কে কে?" শরদিন্দু জিজ্ঞেস করে।

অমূল্য বলে, "আমি তো আগেই বলেছি, শঙ্কুদা, সুশান্তদা, রমেনদা ও ডাক্তার ছাড়া সবাই অভিযানের মালবাহক।"

"তার মানে আমি মাল ফেরী করতে পারব?"

"নিশ্চয়ই।"

শরদিন্দু খুশি হয়।

"কিন্তু বীরেন মাল ফেরী করতে গেলে যে মূল শিবিরে অরন্ধন।" সুশান্তবাবু বোধকরি চিন্তিত।

আমরা যদিও বাংলায় কথাবার্তা বলছি, তাহলেও মেট আমাদের সমস্যাটা অনুধাবন করতে পারে। সে সবিনয়ে বলে ওঠে, "সাব্, আমি তো আগেই বলেছি, ডিপ্‌টিসাব্ ওপরে গেলে আমি রান্না করব।"

"আর আমি ওকে সাহায্য করব।" রমেন বাবু বলে ওঠেন।

"ডক্টর রমেনের কি রান্না আসে নাকি?" অমূল্য প্রশ্ন করে। সে মাঝে মাঝেই

সাংবাদিককে ডক্টর রমেন বলে ডাকে।

রমেনবাবু উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই। আমি বেশ ভাল রান্না করতে পারি।"

"কে শিখিয়েছে, বৌদি?" অমূল্য আবার প্রশ্ন করে।

রমেনবাবু এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই একটু থতমত খেয়ে বলে ফেলেন, "তা বলতে পারো।"

তুমুল হাস্যরোল।

হাসি থামলে সুশান্তবাবু বলেন, "ঠিক আছে। বীরেন ওপরে না গেলেও আপনি একদিন রান্না করুন। বৌমা কেমন ট্রেনিং দিয়েছে, পরীক্ষা করা যাক।"

রমেনবাবু মাথা নাড়েন।

বীরেন বলে, "বাঁচা গেল। অন্তত একটা দিনের জন্য হেঁসেল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।"

"না, একদিন নয়।" রমেনবাবু প্রতিবাদ করেন, "এক বেলা।"

"তাই হোক।" বীরেন যেন এতেই খুশি।

অমূল্য বলে, "দুঃখ করছিস কেন? আজ পর্যন্ত কোন পর্বতাভিযানে সহনেতা পাচক হতে পারে নি। সেদিক থেকে তুই একটা নূতন রেকর্ড স্থাপন করলি—'ডেপুটি লীডার-কাম-কুক' কথাটা পর্বতারোহণের অভিধানে নূতন সংযোজন।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হল। রাতের কালো ছায়া নেমে এলো সিনিয়লচুর সাদা জগতে। সুন্দরের অভিসারে এসে দ্বিতীয় দিনটি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হল। কিছুক্ষণের মধ্যে রান্না শেষ হবে। আমরা খেয়ে নিয়ে তাঁবুতে চলে যাবো, স্লীপিং ব্যাগের উষ্ণ-কোমল জঠরে আশ্রয় নেবো। তারপরে মেট 'হট্-ড্রিঙ্কস' নিয়ে আসবে—হর্বলিক্স কিংবা বোর্ণভিটা। আমি সেই গরম মগ ঠোঁটে ঠেকিয়ে অসিতবাবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকব। একসময় সহসা অসিতবাবুর নাসিকা গর্জন কানে আসবে। মনে মনে একটু হেসে নিয়ে আমি নীরব হব। তারপরে আঁধারের দিকে তাকিয়ে আলোময় সিনিয়লচুব কথা ভাবতে থাকব। ভাবব এই অভিযানের কথা। ভাবব আর ভাবব। এক সময় আমার চোখ দুটিও বুজে আসবে। নিজের অজান্তেই আমি ঘুমের দেশে হারিয়ে যাবো। হারিযে গিযে স্বপ্ন দেখব—আমার সতীর্থরা সিনিয়লচুর স্বপ্ন-শিখরে জাগ্রত-যৌবনের পতাকা প্রোথিত কবেছে।

আমার সে স্বপ্ন সত্য হবে কি?

না হলেও দুঃখ করব না। কারণ আমিও ফ্রাঙ্ক স্মাইথের মতো বিশ্বাস করি যে—

'It will be better for mountaineering when the restless ghost of altitude is laid and men settle down to enjoy the most marvellous mountain region of the world. Kanchenjunga and Everest have taught me that there is little pleasure to be gained in high altitude mountaineering or the fierce glare of publicity centred upon the major peaks of the Himalayas. The spiritual essence of mountaineering and mountain exploration is to travel where the spirit moves.'......

আমি সেই পরমাত্মার ব্রহ্মলোকে বিচরণ করছি। এর বেশি আমার আর কোনো কামনা নেই। আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, আমি সিনিয়লচুকে দর্শন করেছি।

বারো

আজ আর দেখা হল না সিনিয়লচুর সঙ্গে। সকাল থেকেই মেঘ আর কুয়াশার যবনিকায় চারিদিক ঢেকে রয়েছে। আজ ২৪শে মে, ১৯৮০।

সিনিয়লচুকে দেখতে না পেলেও অমূল্য তার কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। হিমাদ্রিকে নিয়ে সে আজ এক নম্বর শিবিরে যাবে। দশজন মালবাহক ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। পাঁচজনকে ওরা রেখে দেবে ওপরে, বাকি পাঁচজন বিকেলে ফিরে আসবে। বিনীত গতকাল এক নম্বরে চলে গিয়েছে। আজ অসিত ও কেশবের সঙ্গে তার দু নম্বব শিবির নির্বাচনের কথা।

কথা তো বুঝলাম কিন্তু করবে কেমন করে? এখানেই এমন মেঘের মাতামাতি, ওপরে না জানি কি হচ্ছে? আবহাওয়া কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। আজ পাঁচদিন আমরা মূল শিবিরে এসেছি। এর মধ্যে মাত্র তিনদিন কিছুক্ষণের জন্য ভালভাবে সিনিয়লচুকে দর্শন করতে পেরেছি।

তাই বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। পর্বতাভিযানে শিখরারোহণ বড় কথা নয়, সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগিয়ে যাবার নামই পর্বতারোহণ। আমরা তাই যাচ্ছি। সাফল্যের কথা ভাবছি না। প্রকৃতি কৃপা করলে নিশ্চয়ই সফলকাম হব। অতএব অমূল্যরা তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু আজকের কথা বলার আগে গতকালের কথা ভেবে নেওয়া যাক। বিনীত কুলিদের নিয়ে গতকাল সকাল দশটা নাগাদ ওপরে রওনা হয়েছে। তখন আবহাওয়া বেশ ভাল। নিচের দিকে মেঘ থাকলেও, সিনিয়লচু এবং লিটল সিনিয়লচু সূর্যকিরণে স্নান করে বিনীতকে তাদের কাছে ডাকছিল।

বিনীত ও তার সঙ্গীরা গ্রাবরেখার গিরিশিরা বেয়ে নিচে নেমে গেল। বেলা বারোটা নাগাদ তারা আড়াআড়ি ভাবে জেমু হিমবাহে পৌঁছল। ওরা একটি বেশ বড় হিমবাহ-হ্রদ দেখতে পেলো। বেলা একটায় ওরা সিনিয়লচু হিমবাহের গ্রাবরেখায় উপস্থিত হল। গ্রাবরেখার গিরিশিরা বেয়ে শ'তিনেক ফুট আরোহণ করল। তারপরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে একফালি সমতল পেলো। সেখানে কিছু ঘাস ও ঝোপঝাড় ছিল। একটু জিরিয়ে নিয়ে ওরা আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই আরোহণ করতে থাকল। এবং বেলা দুটোর সময় এক নম্বর শিবিরে পৌঁছে অসিত ও কেশবের সঙ্গে মিলিত হল।

ততক্ষণে নিচের উপত্যকা থেকে মেঘের দল সেখানে পৌঁছে গিয়েছে, শুরু হয়েছে তুষারপাত। ওরা তাই তাড়াতাড়ি চা-বিস্কুট খাইয়ে কুলিদের রওনা করে দিয়েছে। অবিরাম তুষারপাত ও প্রবল বাতাসকে উপেক্ষা করে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কুলিরা মূল-শিবিরে ফিরে এসেছে।

"সাব্ চলিয়ে। বেক্-ফাস্ রেডি।"

সাঙবার ডাকে আমার ভাবনা থেমে যায়। ব্রেক্-ফাস্ট্ তৈরি হয়ে গেছে, বীরেন ডাকছে।

অমূল্যদের নিয়ে কিচেনে এলাম। ওরা আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে সিনিয়লচুর কাছে। যাচ্ছে দূরে—দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে।

জানি ওরা আসবে ফিরে, আবার আমরা এমনি একসঙ্গে খেতে বসব। তবু মনটা ভারী হয়ে ওঠে। আজ দুপুরে খাবার সময় ওরা থাকবে অনেক দূরে। বেশ কিছুদিন এমন আর একসঙ্গে বসে খেতে পারব না। অসহায়ের মতো আমি শুধু ওদের ফিরে আসার দিন গুনতে থাকব।

পর্বতাভিযানে সাফল্য আসে সমবেত প্রচেষ্টায়। একজন বা দুজন শিখরে আরোহণ করে, অন্যরা সর্বস্ব পণ করে তাদের এগিয়ে দেয়। আমরাও তাই করছি, তা-ই করব। যারা ওপরে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করছে, মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত পাঞ্জা লড়ছে, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি করছে। কিন্তু এই মূল-শিবিরে বসে অভিযানের যোগান দিয়ে যাওয়াও কম কথা নয়। কাজের কথা না হয় বাদ দিলাম। এখানে বসে শুধু ওদের প্রতীক্ষ করাটাই তো চরম যন্ত্রণাদায়ক। অসহায়ের মতো ওপরের দিকে তাকিয়ে আশা ও নিরাশায় অস্থির হওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি বোধকরি পর্বতাভিযানে আর নেই।

কিন্তু আমি যে পর্বতারোহী না হয়েও পর্বতাভিযানে আসি। আমাকে তো এ শাস্তি পেতেই হবে। সুতরাং আমার কথা থাক। এবারে ওদের বিদায় দেওয়া যাক।

নেতা শেষবারের মতো নির্দেশ দেয় আমাদের। একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করে, আলিঙ্গন করে। তারপরে বিদায় নেয়। এখন সকাল সাড়ে আটটা।

ওরা চলা শুরু করে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে ওরা গ্রাবরেখার গিরিশিরায় হারিয়ে যায়। আমরা ফিরে আসি শিবিরে।

দুপুরের খাওয়া মিটল দুপুরের আগেই। কি আর হবে বসে থেকে? আকাশের অবস্থা অপরিবর্তিত। বরফ পড়ছে না কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জ্বালানীর অভাব। খাবার গরম রাখা মুশকিল। তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম—ভাত ডাল আলুসেদ্ধ ও আচার।

খাবার পরে বীরেন সাঙবাকে বলে, "একটা চাল ও একটা আটার বস্তা বের করে রেখো।"

"এখুনি বার করে আনছি সাব্।"

"এখন বার করবে কি, বরফ পড়া শুরু হল যে!"

"এ বরফে কি হবে, আমি নিয়ে আসছি।"

সে আমাদের আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিচেনের সঙ্গেই ত্রিপল চাপা দিয়ে স্টোর বানানো হয়েছে।

সাঙবা চলে গেল কিন্তু শেরিং বসে রইল আগুনের ধারে। অথচ তারই এসব করা উচিত। কিন্তু ওকে সেকথা মনে করিয়ে দেওয়া বৃথা। অতএব চুপ করে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেট ফিরে আসে। হতাশ স্বরে বলে, "ওখানে চাল-আটা কিছু নেই!"

সে কি! চাল-আটা কোথায় গেল?

ওখানেই তো থাকার কথা!

বীরেন বলে, "শরদিন্দু, আমার রুক্স্যাক্ থেকে প্যাকিং লিস্টটা নিয়ে এসো তো।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। লাচেন থেকে হিসেব করে রেশন আনা হয়েছে, হিসেব করে ওপরে পাঠানো হয়েছে। তাহলে এখানে চাল-আটা থাকবে না কেন? আমরা আটজন সদস্য, মেটকে নিয়ে দশজন মালবাহক ও দুজন ডাক-রাণার, এই কুড়িজন মানুষকে এখন এখানে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। চাল-আটা না থাকলে চলবে কেমন করে?

শরদিন্দু প্যাকিং লিস্ট নিয়ে আসে। অরুণ ও অসিতবাবুকে নিয়ে বীরেন হিসেব করতে বসে। কতগুলো চাল-আটার বস্তা লাচেন থেকে এখানে এসেছে, ক'টা খরচ হয়েছে, ক'টা ওপরে গিয়েছে—সবই লেখা আছে।

হিসেব শেষ হয়। বীরেন বলে, "না, চাল-আটা না থেকেই পারে না। দু বস্তা করে চাল ও আটা থাকতেই হবে।"

"কিন্তু মেট বলছে—নেই!" ডাক্তার বলে।

বীরেন উত্তর দেয়, "মেট ভুল করছে। চলো ভাল করে খুঁজে দেখা যাক।"

অতএব তুষারপাতের মধ্যেই বাইরে আসি। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিই। ত্রিপল সরিয়ে একটা একটা করে বস্তা পরীক্ষা করি।

না, নেই। চাল ও আটার কোনো বস্তা নেই। শুধু তাই নয়, আলুব থলেটাও পাওয়া গেল না।

গেল কোথায়? ওপরে চলে গিয়েছে? কিন্তু গত কয়েকদিন ওপরে যে-সব মাল গিযেছে তাব প্রত্যেকটির বিববণ লেখা রযেছে। ভুলে কুলিরা বস্তা বদল করে নিয়ে গিয়েছে? তাই বা সম্ভব কেমন করে? প্রতিদিন সকালে কুলিরা রওনা হবার আগে হিমাদ্রি প্রত্যেকটা মাল পরীক্ষা কবেছে।

কিন্তু ভুল না হলে চাল-আটা ও আলু কোথায় কেল? একথা ঠিকই যে মালপত্রগুলো এখানেই পড়ে থাকে এবং কিচেনে কেউ রাতে শোয় না। কিন্তু এখানে কে মাল চুরি করবে? কুলিরা এখানে আমাদের পরিজন। এই চাল-আটা শুধু আমাদের নয়, তাদেরও খাদ্য। খাবার না থাকলে আমাদের সঙ্গে ওদেরও উপোস করতে হবে। ওরা কেন চুরি করবে? আমরা তো এমনিতেই ওদের রেশন দিচ্ছি। তাছাড়া ওরা উচ্চ হিমালয়ের সৎ ও সরল মানুষ। সমতলের পাপ ওদের এখনও স্পর্শ করে নি। ওরা কেন চুরি করবে? ছিঃ ছিঃ!

মালপত্র ঠিক করে রেখে, বরফ ঝেড়ে আবার ভেতরে আসি।

মেট বেচারী আমাদের চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গিয়েছে। কেবলই বলছে, "এ কেমন করে হল সাব্, এখন কি হবে?"

ওকে সান্ত্বনা দিই। বলি, "নিশ্চয়ই ভুলে ওপরে চলে গিয়েছে। কাল হিমাদ্রিকে চিঠি দিচ্ছি, সে বস্তাগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেবে।"

"কিন্তু সে মাল আসতে তো কাল সন্ধ্যে হয়ে যাবে, এখানে যে ভাঁড়ার শূন্য। কুলিদের রেশন দিতে হবে।" বীরেন বলে।

"সাব্, কুলিরা আসুক, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, কি করা যায়। তবে আপনাদের আমি ভুখা থাকতে দেব না। আজ রাতটা কোনমতে চালিয়ে নিন, কাল দুপুরে আমি আপনাদের পাহাড়ী খানা খাওয়াবো।" মেট তার মনোবল ফিরে পেয়েছে।

আমাদের পক্ষে অবশ্য এখনও না খেয়ে থাকার কথা উঠছে না। কারণ বিস্কুট, চানাচুর, কয়েকটা ডিম, গোটাচারেক মাংসের কৌটো, সুজি, পাঁপর—ইত্যাদি খাবার রয়েছে। অবশ্য এগুলো দিয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করলে দু-দিনেই ফুরিয়ে যাবে। তবে আজ রাতখানা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

অতএব আর খাবারের চিন্তায় না থেকে এবারে চায়ের আয়োজন করা যাক। বাইরে বরফ পড়ছে। মেয়েদের কাঠ নিয়ে আসার সময় হয়ে এলো, ওপরের কুলিরাও এসে যাবে। সবাইকে চা দিতে হবে।

কথাটা বলতে দেরি আছে কিন্তু সাঙবার তালিম করতে দেরি নেই। সেই উনোন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ায়। আর আমাদের হাই অল্‌টিচ্যুড্ পোর্টার-কাম-কুক্ শ্রীযুক্ত শেরিং? সে খেয়ে-দেয়ে সেই যে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে, গরম চায়ের মগ সামনে না নিয়ে গেলে আর বাবুর ঘুম ভাঙবে না।

এদের এক-একজনের মজুরী, সাজ-সরঞ্জাম ও গাড়িভাড়া এবং খাওয়া খরচ বাবদ আমাদের প্রায় হাজার টাকা খরচ পড়বে। বাকি তিনজন তবু যা-হোক কিছু করছে কিন্তু এ লোকটা একেবারেই কোন কাজের নয়। তাহলেও বলার কিছু নেই কারণ স্বয়ং শেরপা ক্লাইম্বার্স এসোসিয়েশন এদের দিয়েছেন। এবং তাঁরা বোধকরি এদের যোগ্যতার কথা বিবেচনা করেই আর শেরপা পাঠাবার প্রয়োজন মনে করে নি।

পরদিন। আজ আবার দেখা হল সিনিয়লচুর সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সকালের আকাশ আমাদের রীতিমত পুলকিত করে তুলেছে। আমরা খাবার চাই না, ভাল আবহাওয়া চাই। যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ আমরা শুধু সিনিয়লচুর এই অবিস্মরণীয় অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করতে চাই।

চাল-আটা না থাকলেও আমরা না-খেয়ে নেই। গতকাল রাতে জেলী মাখিয়ে বিস্কুট ও বোর্ণভিটা পেয়েছি। আজ সুজি দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট্ হবে। কুলিদের জন্যও চিন্তার কিছুই নেই। ওদের সঙ্গে নাকি খাবার আছে। এখানে আমরা ওদের যে ক'দিন রেশন দিতে পারব না, তা লাচেন গিয়ে দিয়ে দিলেই চলবে।

কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমরা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ওদের তো না খাইয়ে রাখা যায় না! যাক্ গে, ওদের সঙ্গে খাবার রয়েছে আর লাচেন গিয়ে খাবার দেওয়ায় আমাদের কোন অসুবিধে নেই। সেখানে প্রচুর চাল-আটা আছে।

আজ ঘুম থেকে উঠে সাঙবাকে দেখি নি। শেরিং বলল সে নাকি সবজি আনতে নিচে গিয়েছে। ফিরে এসে দুপুরের খাবার রান্না করবে।

কি রান্না করবে জানি না। কিন্তু সে যা রান্না করে দেবে, তা-ই অমৃত জ্ঞান করে খেয়ে নেবো। এমন আন্তরিকতা, এমন ভালোবাসা যে কেবল হিমালয়েই

পাওয়া সম্ভব।

নেতার নির্দেশ মতো আজ পাঁচজন কুলি ওপরে পাঠাচ্ছি। হিমাদ্রি কাল তাদের মাল ঠিক করে রেখে গিয়েছে।

বীরেন চাল-আটার কথা জানিয়ে হিমাদ্রিকে চিঠি দিল। আর আমি অমূল্যকে লিখলাম—

"যদি সত্যই চাল-আটা ও আলুর থলে ওপরে না গিয়ে থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছে, আমরা অকাজের সদস্যরা অর্থাৎ আমি সুশান্তবাবু রমেনবাবু ও শরদিন্দু, আগামীকাল সকালে লাচেন রওনা হবো। এখানে পাঁচজন কুলি রেখে বাকি কুলিদের দিয়ে অপ্রয়োজনীয় মালপত্র নিচে নিয়ে যাবো। এতে যেমন খাবারের সাশ্রয় হবে, তেমনি কুলিদের বসিয়ে রাখার দরকার হবে না। উপরন্তু আমরা লাচেন গেলে তোদের ফিরে যাবার জন্য যথাসময়ে এখানে কুলি পাঠাতে পারব এবং ওখানে গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারব।

আমাদের এখন এখানে বসে থাকা মানে অন্ন ধ্বংস করা। অন্ন নেই, সুতরাং চলে যেতে চাইছি। তোর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।

আমরা সবাই ভালো। আমাদের মন সর্বদা তোদের সঙ্গে রয়েছে। আমরা তোদের সাফল্য ও নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে রয়েছি।"

আজ সারা সকাল সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হল। এতক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হয় নি আমার। ওপরের আবহাওয়াও নিশ্চয়ই ভালো। এতদিনে প্রকৃতি বোধ করি কৃপা করলেন আমাদের। ভালই হল—আজ ওদের দু-নম্বর শিবির নির্বাচনের কথা।

কিন্তু ওপর থেকে রেশন না এলে যে আবহাওয়া ভাল থাকলেও আমাদের কাল বিদায় নিতে হবে সিনিয়লচুর কাছ থেকে। উপায় কি? অভিযানের প্রয়োজনে এ আত্মত্যাগ অতি তুচ্ছ। অথচ সিনিয়লচুকে এত তাড়াতাড়ি এভাবে ছেড়ে যেতে হবে ভাবতেই পারছি না।

"ঐ তো মেট আসছে।" ডাক্তার বলে ওঠে।

আমরা সামনে তাকাই। ডাক্তার ঠিকই বলেছে। কেনই বা বলবে না, একে অল্প বয়স তার ওপরে মেডিক্যাল অফিসার।

সাঙবা হ্যালিপ্যাড ছাড়িয়ে এসে গিয়েছে। তার পিঠে একটা বিরাট সবুজ বোঝা। আমাদের জন্য সবজি নিয়ে এসেছে। আমাদের চাল-আটা নেই, তাই শেষ রাতে খাবার যোগাড় করতে চলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

কাছে পৌঁছতেই পিঠের বোঝা দেখিয়ে সে সহাস্যে বলে, "সাব্, সবজি নিয়ে এসেছি। বহুৎ 'বড়িয়া' সবজি। এই দিয়ে খানা বানাবো, রুটি আর ভাতের কোন জরুরত পড়বে না।"

সে বোঝাটা নামায়। দেখি দু-তিন রকম ফার্ণের কচি কচি পাতা ও প্রচুর ব্যাঙের ছাতা।

বীরেন বলে, "ও ঠিকই বলছে। এগুলোর 'ফুড্ ভ্যালু' বেশ বেশি।"

অসিতবাবু ও অরুণ তাকে সমর্থন করে।

ডাক্তার মেটকে বলে, "কিন্তু খানা বানাবার আগে তুমি ব্রেক্‌ফাস্ট করে নাও। কিচেনে বীরেনদা তোমার সুজি রেখে দিয়েছেন।"

"আবার আমার জন্য রেখে দিয়েছেন কেন?"

"সে কি, তুমি সকাল থেকে কিছু খাও নি!"

"তাতে কি হয়েছে সাব্, দুপুরে সবাই পেট ভরে খানা খাবো।" একবার থামে সে। তারপরে বীরেনকে বলে, "সাব্, আমাকে কিন্তু একটু ঘি দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তেল ঘি গরম মশলা চিনি—সবই পাবে। আগে তুমি গিয়ে খেয়ে নাও।"

"ঠিক হ্যায় সাব্!"

বোঝাটা আবার পিঠে তুলে নিয়ে মেট কিচেনের দিকে চলতে শুরু করে। বীরেন ও ডাক্তার তার সঙ্গী হয়।

কুলিরা কাল রেশন নেয় নি। বলেছে, ওদের সঙ্গে খাবার আছে। তখন ভেবেছি ওরা যে 'সাম্পা' বা স্থানীয় ছাতু সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করে, তা বোধহয় বেশি এনেছে, চা সহযোগে তা-ই খেয়ে দিন কাটাবে। কিন্তু এখন মেয়েরা চাল ধুচ্ছে, আটা মাখছে, আলু কাটছে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আমাদের থেকে খাবার নিয়ে ওরা খাচ্ছে, আর আমাদের খাবার নেই।

আমাদের খাওয়াও কিন্তু খারাপ হল না। খাবার ডাক পড়তেই কিচেনে এসেছি। দেখেছি—বড় সসপ্যানে সবুজ সজল শাকের তরকারী ও ছোট সসপ্যানে ব্যাঙের ছাতার শুকনো তরকারী ফুটছে।

আমরা বসতেই থালায় থালায় বেড়ে দিল সাঙবা। বীরেন বলে, "খেয়ে দেখুন, খারাপ লাগবে না। তেল ঘি গরম-মশলা নুন চিনি—সবই পড়েছে। তা ছাড়া 'হাই অল্‌টিচ্যুড্ গ্রীণ ভেজিটেবলস্'-এর 'ফুড্ ভ্যালু' খুবই বেশি।"

হেসে বলি, "ভ্যালু যাই হয়ে থাক, এই খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে।"

"না, না।" সুশান্তবাবু প্রতিবাদ করেন, "বীরেন ঠিকই বলেছে, "তবে কেবল হাই অল্‌টিচ্যুড্ গ্রীণ ভেজিটেবলস্-এর নয়, লো অল্‌টিট্যুড্ গ্রীণ্ গ্র্যাস-এর ফুড ভ্যালুও কম নয়। নইলে রাণা প্রতাপ ঘাসের রুটি খেয়ে মুগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কেমন করে?"

তুমুল হাস্যরোল।

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে 'হিমালয়ান-লাঞ্চ' শেষ হল। খাবার পরে বীরেন ঘোষণা করে, "আপনারা তাঁবুতে চলে যান। একটু বাদে চা ও পাঁপরভাজা যাচ্ছে।"

আমরা সমস্বরে বীরেন ও সাঙবার জয়ধ্বনি দিই।

সভা শান্ত হলে অসিতবাবু বলে, "তোমরা তাঁবুতে চলে যাও, আমি বরং এখানেই বিশ্রাম করি।"

"আমিও তাহলে এখানেই থাকব।" ডাক্তার বলে ওঠে।

"বেশ, থাকো।" অসিতবাবু বলে, "গায়ে যখন গরম তেল ছিটে যাবে, তখন বুঝবে মজা।"

"গরম তেল!" ডাক্তার অসিতবাবুর বক্তব্য বুঝতে পারে না।

অসিতবাবু বলে, "হ্যাঁ। এটা হাই অল্‌টিচ্যুড্, এখানে পাঁপর ভাজার সময় ভীষণ

গরম তেল ছোটে।"

আমরা হেসে উঠি।

হাসি থামলে ডাক্তার বলে, "তা ছিটুক গে। আপনাকে একা রেখে গেলে আমাদের পাঁপর আর তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছবে না। আপনাকে ম্যানেজ করা বীরেনদার একার সাধ্য নয়।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "আর আমি মেডিক্যাল অফিসার। গরম তেল ছিটে কারও পুড়ে-টুড়ে গেলে যে আমাকেই চিকিৎসা করতে হবে।"

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি এবং ডাক্তারও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অসিতবাবু কিন্তু গম্ভীর। একটু বাদে সে গম্ভীর স্বরে বলে "ডাক্তার, তুই বিচ্ছু দেখেছিস?"

"বিচ্ছু মানে বিছা! হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি!"

"তোর না দেখলেও চলত।"

"মানে?"

"তুই নিজেই একটা কাঁকড়া-বিচ্ছু!"

আবার হাস্যরোল। এবং এবারে অসিতবাবু ও যোগ দেয়। কে বলবে আমরা ষোলো হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছি, কে বলবে আমরা গতকাল দুপুরের পরে ভাত পাই নি, কে বলবে শাকের 'সুপ' খেয়ে আজ আমরা জঠর-জ্বালা নিবারণ করেছি?

মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন যে কত কম, তা কেবল হিমালয়ের অন্তরলোকে এলে উপলব্ধি করা যায়। আর তাই হিমালয় দেবালয়। এখানে এসে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে।

দিনের দ্বিতীয় দফায় কাঠ নিয়ে মেয়েরা নিচের থেকে ফিরে এলো। ওরা চা-বিস্কুট খেয়ে ছাউনিতে গিয়ে ঢুকল।

সহসা সারাদিনের ঝলমলে রোদ কোথায় যেন গেল মিলিয়ে। চারিদিকে ঘনিয়ে এলো ঘন কুয়াশা। মেঘের ঘোমটা মাথায় দিল সিনিয়লচু, সে হারিয়ে গেল। শুরু হল তুষারপাত।

আমরা কিচেনে বসে ওপরের কুলিদের প্রতীক্ষা করছি। ওরা দু-নম্বর শিবির নির্বাচনের খবর নিয়ে আসবে। নিয়ে আসবে অভিযাত্রীদের কুশলবার্তা আর চাল-আটা সংবাদ। ওরা আমাদের খাবার নিয়ে আসবে।

ওরা এলো। একে-একে রান্নাঘরে ঢুকল। বরফ ঝেড়ে টুপি আর বর্ষাতি খুলল। তারপরে এসে আগুনের ধারে বসল।

নিয়ে এসেছে! ওরা চাল-আটা আর আলু নিয়ে এসেছে! তবে বস্তা নয়, ছোট-ছোট তিনটি থলি। আজ বোধহয় কোনো কারণে বস্তা বয়ে আনতে পারে নি। অল্প কিছু নিয়ে এসেছে। তা আনুক গে, চাল-আটার বস্তা ওপরে চলে গিয়েছে। আমাদের আর উপোস করতে হবে না।

লামা উঠে দাঁড়ায়। সে পকেট থেকে তিনখানি চিঠি বের করে।

প্রথমখানি বিনীতের। ডাক্তার পড়তে শুরু করে—

'বিকেল চারটে,
২৪শে মে, ১৯৮০
এক নম্বর শিবির

তোমরা শুনে সুখী হবে, আমরা আজ প্রায় উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে তিন নম্বর শিবিরের পথ দেখে এসেছি। কাল এই চিঠি যখন তোমাদের হাতে পৌঁছবে, তখন আমরা দু-নম্বরে বাসা বেঁধেছি। পরশু আমরা আবার পথ তৈরি করব যাতে তরশু তিন নম্বর শিবির স্থাপন করা যায়। পল্ বএর ও তাঁর সঙ্গীরা ২০,৩৪০ ফুট উঁচু যে 'স্যাড্‌ল' বা গিরিশিরার ক্ষুদ্র ঢালু অংশে বসে দু রাত কাটিয়েছেন, তার কাছাকাছি কোথাও তিন নম্বর শিবির স্থাপন করব। কারণ আমরা পরদিনই শিখরে আরোহণ করতে চাই। তবে সমস্ত পরিকল্পনা যে প্রকৃতিদেবীর করুণার ওপরে নির্ভরশীল, প্রতি পদক্ষেপে তার প্রমাণ পাচ্ছি।

যাক্ গে, এবারে আজকের পর্বতারোহণ প্রসঙ্গে আসছি। গতকাল বিকেল থেকে মাঝরাত অবধি এখানে তুষারপাত চলেছে। রাতে তারই মধ্যে বাইরে বেরিয়ে বেশ কয়েকবার তাঁবুর ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে। তবু সকালে উঠে দেখি তাঁবুর ওপরে তুষারের চাদর আর পাশে রেখে দেওয়া জিনিসপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সবই বরফে চাপা পড়েছে।

সেগুলো উদ্ধার করে আমরা যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করি। জানতাম গত রাতের তুষারপাত পথের ফাটলগুলোর ওপরে হালকা তুষারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। সেখানে পা পড়লেই অতল সমাধি। কিন্তু দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিবিরে বসে থাকলে পর্বতাভিযান হবে কেমন করে?

আমি কেশব ও তিনজন হ্যাপ্ তাই ব্রেক-ফাস্ট করে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। ক্লাইম্বিং ও ফিক্সড রোপ, রক্ ও আইস পিটন, ক্যারাবিনার, হাতুড়ি ও দুটি তাঁবু সঙ্গে নিলাম।

আমরা ধীরে ধীরে হাঁটু-ভাঙা বরফের মধ্যে এগুতে থাকি। ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে পুরোপুরি দক্ষিণ দিকের নিকষ কালো রঙের গ্রাবরেখা-গিরিশিরার ঢালে এসে দাঁড়াই। দৃষ্টি প্রসারিত করতেই ডান পাশে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ভয়ঙ্কর হিমপ্রপাতের অংশ দেখতে পাই।

হিমপ্রপাতের ওপর উঠতে গেলে প্রথমেই একটা খাড়া প্রাচীর (৭০-৮০) বেয়ে উঠতে হবে। প্রাচীরটি পশ্চিম থেকে পূবে এগিয়ে উত্তরের ঢালে বাঁক নিয়েছে।

আমরা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলি। এক সময় খাড়া প্রাচীরের তলদেশে পৌঁছে যাই। প্রাচীরের নিচে সুন্দর একটি বরফের সমতল প্রান্তর। দু-পাশে খাড়া গিরিশিরা তাকে বেষ্টন করে আছে। জায়গাটি আমাকে ছবিতে দেখা চীনের প্রাচীরের কথা মনে করিয়ে দিল।

ওখানেই দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করলাম। তাঁবু দুটো টাঙিয়ে সব মালপত্র ভেতরে রেখে দিলাম। দুটি বাঁশ পুঁতে মাথায় লাল কাপড় লাগালাম। যাতে দূর থেকে শিবির দেখা যায়।

তারপরে আমরা সবাই কোমরে দড়ি বেঁধে সেই খাড়া প্রাচীরের গা বেয়ে ওপরে

উঠতে শুরু করলাম। প্রায় হাঁটু সমান বরফ ভেঙে উঠতে হচ্ছিল। প্রতি পদক্ষেপে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্রাম করে আবার এগিয়ে চলেছি। ঘন্টাখানেক প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর সেই প্রচীরের ওপরে আরোহণ করতে সমর্থ হলাম। তখন সময় সকাল সাড়ে দশটা। অবশ্য বুঝতে পারলাম 'হ্যাপ্রা' মালপত্র নিয়ে এভাবে উঠতে পারবে না। তাদের জন্য ফিক্সড রোপ লাগাতেই হবে।

ইতিমধ্যে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু হাওয়ার প্রকোপ না থাকায় আমরা এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। যদিও জানি দু-নম্বর থেকেই তিন নম্বর শিবিরের পথ তৈরি করতে হবে। তবু যতটা পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া যায়।

পশ্চিম থেকে পুবে আসা হিমপ্রপাতের মাঝখানে উত্তর দিকের গিরিশিরার খানিকটা অংশ দক্ষিণ দিকে ঢুকে গেছে। ফলে ভেতরের অংশ দৃষ্টির বাইরে। বাঁকের মুখে বিরাট এক ঝুলন্ত হিমপ্রপাত—অসংখ্য ফাটল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফাটলগুলো হালকা বরফের আস্তরণে ঢাকা।

বাঁক নেওয়া হিমপ্রপাতে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। তার ওপরে চারিদিকে অসংখ্য ফাটল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ অনিবার্য।

হঠাৎ বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। তুষারপাত আরও ঘন হল। দৃষ্টিক্ষমতা কমে এলো। বাধ্য হয়ে আমরা শিবিরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ওঠা যেমন কষ্টসাধ্য, নামা তেমনি দুঃসাধ্য। প্রবল তুষারপাত ও বাতাসকে সাথী করে কিছুক্ষণ আগে মানে আড়াইটে নাগাদ আমার ফিরে এসেছি এখানে। মিলিত হয়েছি নেতা ও হিমুদার সঙ্গে। জানি এ মিলন ক্ষণস্থায়ী। আগামীকাল সকালেই আবার ছাড়াছাড়ি হবে, আমরা চলে যাবো দু-নম্বর শিবিরে। কিন্তু সে বিচ্ছেদ তো মধুবতর মিলনের আকাঙ্ক্ষায়।

আমরা সবাই ভাল। তোমাদের কুশল কামনা করি।

— বিনীত'

দ্বিতীয় চিঠিখানি হিমাদ্রির। শরদিন্দুকে লিখেছে। সে পড়া শুরু করে—

'বীরেনদার চিঠি পেয়ে চিন্তিত হলাম। আমি নিজে দু-বস্তা করে চাল-আটা ও এক থলে আলু স্টোরস্-এ রেখে এসেছি। সে মাল বের করা হয় নি। কাজেই এখানে আসবে কেমন করে?

ভাল করে খুঁজে দেখো। যদি না পাও, তাহলে বুঝতে হবে চুরি হয়েছে। কুলিদের ছাউনি 'সার্চ' করলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

আমার ধারণা পাছে রেশন কম পড়ে, তাই ওরা আগের থেকেই বস্তা সরিয়ে মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এবং এখন ওদের রেশন না পেলেও চলে যাচ্ছে।

তোমাদের অভুক্ত রেখে ওরা রোজ পেট পুরে ভাত ও রুটি খেয়ে চলেছে, এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?

ওপরে রেশন বেশি নেই। তবু তোমাদের জন্য পাঁচ কেজি করে চাল ও আটা

এবং দু কেজি আলু পাঠালাম। ওজন করে দেখো, পথে কমে গিয়েছে কিনা?
শুভেচ্ছা নিও। —হিমাদ্রি'

এক নম্বর শিবির
২৫.৫.৮০

তৃতীয় চিঠিখানি নেতার। সে আমাকে লিখেছে। আমিও জোরে জোরে পড়ে যাই—

'তোমাদের চিঠি পেয়ে বড়ই অসহায় বোধ করছি। খাবার চুরি গেছে, তোমরা না-খেয়ে আছো! আজ প্রায় বিশ বছর পর্বতারোহণ করছি কিন্তু এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হিমালয়ের মানুষ এমন অসৎ হতে পারে, কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছে।

কুলিদের ছাউনি 'সার্চ' করা নিরাপদ নয়। ধরা পড়ে গিয়ে গোলমাল করবে। রাগ দেখিয়ে লাচেন চলে যাবে। সেখানে গিয়ে মিথ্যে দুর্নাম রটাবে এবং ফেরার পথে হামলা করবে। সুতরাং অভিযানের প্রয়োজনে এ অন্যায় সইতে হবে।

তার চেয়ে সুশান্তদা, রমেনদা ও শরদিন্দুকে নিয়ে তুমি কালই লাচেন নেমে যাও। এখন মূল শিবিরে পাঁচজন পুরুষ পোর্টার থাকলেই চলে যাবে। যতটা পারো অপ্রয়োজনীয় মাল সঙ্গে নিয়ে যেও। অরুণও চলে যাক্। দুর্গম পথ। তোমাদের সঙ্গে একজন ট্রেন্ড মাউন্টেনীয়ার থাকা উচিত হবে।

তোমরা লাচেন পৌঁছে তিনজন কুলিকে দিয়ে যতটা সম্ভব চাল-আটা ও আলু মূল শিবিরে পাঠিয়ে দেবে। সেদিন অন্য কুলিদের ছুটি দিয়ে দিও, একদিনের মজুরী বেঁচে যাবে।

পরদিন বারোজন পোর্টার খালি হাতে মূল শিবিরে পাঠিয়ে দেবে। কোন মেয়ে পোর্টার না পাঠালেই ভাল। কারণ অসিতদার লজেন্স নিশ্চয়ই এতদিনে ফুরিয়ে এসেছে।

আমরা ২রা জুনের মধ্যে লাচেন ফিরে যাবো। গ্যাংটকে সেনদাকে ওয়ারলেশ পাঠিয়ে তিন তারিখে লাচেনে গাড়ি আসার ব্যবস্থা করো। তিনি যেন শিলিগুড়িতে ফোন করে অমলকে আট তারিখের রেলওয়ে রিজার্ভেশান করতে বলেন। কারণ ফিল্ম উদ্ধারের জন্য গ্যাংটকে দু-একদিন বেশি থাকতে হতে পারে।

আমাদের জন্য চিন্তা করো না, সীমিত শক্তির মধ্যে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কোনরকম বাড়তি ঝুঁকি নিচ্ছি না। তবু বলছি—প্রকৃতি অকরুণ না হলে, তোমাদের আত্মত্যাগ বিফল হবে না।

তোমরা সকলে আমাদের শুভেচ্ছা নিও। সর্বদা সাবধানে থেকো। আবার লাচেনে দেখা হবে।

—অমূল্য সেন
২৫.৫.৮০'

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাই। বাইরে ফর্সা হয়ে গেছে। আজ আমি বিদায় নেব সিনিয়লচুর কাছ থেকে। জানি না তার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না?

কটা বাজে! স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। টর্চ জ্বালি।

সে কি! এ যে দেখছি সবে সাড়ে এগারোটা! কাল বোধ হয় আর চাবি দেওয়া হয়নি, ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে।

না! ঘড়ি তো ঠিকই চলছে। তাহলে বাইরে এত আলো কেন? তাঁবুর ভেতরটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মনে পড়ে সব কথা। হিমাদ্রি ওপর থেকে চাল-আটা ও আলু পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাত-ডাল আলু সেদ্ধ ও ডিম ভাজা দিয়ে 'ডিনার' সেবেছি। প্রায় দেড় দিন পরে ভাত খেয়ে রাত আটটায় তাঁবুতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে হরলিক্স এসেছে। তার পরে অসিতবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি, ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে তখন বাইরে বেশ বরফ পড়ছিল।

এখন এত আলো কেন? তাহলে কি তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে? আকাশে চাঁদ উঠেছে? বাইরে বেরুলে দেখা হবে সিনিয়লচুর সঙ্গে?

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। উইণ্ড-প্রুফটা গায়ে দিই। কোন রকমে জুতোয় পা গলিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

এ আমি কোথায়! এ কি আমার সেই পরিচিত পৃথিবী! না, না—এই তো স্বর্গ।

মাথার ওপরে চন্দ্রাতপের মতো নীলাকাশ। আকাশে কৃষ্ণা-চতুর্থীর চাঁদ আর ভাসমান মেঘের দল। আকাশটা নেমে এসেছে পাশের গিরিশিরার মাথায়। আর সিনিয়লচু?

না, সে সোনা নয়, রুপো নয়, তামা নয়। সিনিয়লচু মুক্তোর পাহাড়ে পরিণত। তার সারা শরীরে আলোর ঝালর। আলো তার গা বেয়ে গলে-গলে পড়ছে। সেই প্রতিফলিত আলোকশিখায় সমস্ত জেমু হিমবাহ উদ্ভাসিত, আমার চারিদিকের জগৎ মোহময়।

এই অপার্থিব অপরূপ রূপ একা উপভোগ করাব নয়। তবু আমি কাউকে ডাকতে পারি না। আমি যে নিজের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার সব কথা গিয়েছে ফুরিয়ে। আমি শুধু সিনিয়লচুর দিকে রয়েছি তাকিয়ে। তাকে দেখছি আর দেখছি। এই দেখা ছাড়া এখন যে আমার আর কিছু করার নেই।

শুধু সিনিয়লচু নয়, লিটল সিনিয়লচু, টেন্ট, পিরামিড, নেপাল আর কাঞ্চনজঙ্ঘা—সবাই সুন্দর, সবাই মণিময়-হিমালয়। কিন্তু সিনিয়লচু? তার সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না।

আজই এমন, পূর্ণিমায় না জানি কেমন? গত পূর্ণিমায় আমি এখানেই ছিলাম, কিন্তু সেদিন রাতে দেখা হয় নি চাঁদের সঙ্গে, সিনিয়লচুর সঙ্গে। চাঁদ কিংবা সূর্যকে দেখতে না পেলেই যে সিনিলয়লচু মেঘের ঘোমটা মাথায় টেনে নেয়।

পূর্ণিমার রাতে সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হয় নি বলে আমার আর কোন দুঃখ রইল না। আজ এই কৃষ্ণ-চতুর্থীতে যা দেখলাম, তারও তুলনা নেই।

কিছুক্ষণ আগে এই শিবিরকে আমার স্বর্গ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল ভেবেছি। কারণ স্বর্গ কোথায়, স্বর্গ কেমন, কিছুই যে জানি না আমি। স্বর্গে ঠাঁই পাবো কিনা, তাও জানা নেই আমার।

না পেলেও আর কোনো দুঃখ রইল না। স্বর্গ যতো সুন্দরই হোক, এর চেয়ে সুন্দর নয়। মর্ত্যের মাটিতে দাঁড়িয়েই আজ আমার স্বর্গ-দর্শন হয়ে গেল।

মানুষ সুন্দর, মাটি সুন্দর, সাগর সুন্দর। আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর আর পাহাড় সুন্দর। কিন্তু সবার সেরা সুন্দর কে?

না, সিনিয়লচু নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মাটিকে সৃষ্টি করেছেন আর যিনি আমার সিনিয়লচুকে সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে সুন্দর যে আর কেউ নেই, কিছু নেই।

অনিন্দ্যসুন্দর সিনিয়লচুর দিকে তাকিয়ে আমি সেই অনন্ত সুন্দরের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করছি। আমি আমার সর্বসত্তায় তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করছি।

আজ আমার সুন্দরের অভিসার পূর্ণ হল।

তেরো

গতকাল দুপুরে আমরা লাচেন ফিরেছি। তিনদিন পরে পেট ভরে ডাল-ভাত খেয়েছি আর বারোদিন বাদে ঘরে ঘুমিয়েছি। কিন্তু এ আরামকে 'হারাম' বলে মনে হচ্ছে। সতীর্থরা যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে, আমরা তখন ডাকবাংলোয় ডান্‌লোপিলোর বিছানায় ঘুমোচ্ছি।

কিন্তু আমরা তো আরামের জন্য লাচেন ফিরে আসি নি, অভিযানের প্রয়োজনেই অভিযান শেষ হবার আগে আমাদের মূল শিবির ছেড়ে আসতে হয়েছে। সেদিন সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ আমরা পাঁচজন বিদায় নিয়েছি অসিতবাবু বীরেন ও ডাক্তারের কাছ থেকে, বিদায় নিয়েছি শেরিং আর সাঙবার কাছ থেকে। ওরা আমাদের এগিয়ে দিয়েছে হ্যালিপ্যাড পর্যন্ত। ওরা কেঁদেছে, আমরা কেঁদেছি। ওরা কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দেখেছে। আমরা কাঁদতে কাঁদতে একবার ওদের দেখেছি, একবাব সিনিয়লচুকে দেখেছি। এক সময় ওদের মতো সেও হারিয়ে গিয়েছে আমার চোখের সামনে। ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। কিন্তু সিনিয়লচু!

তাকে যে আর কোনো দিন দেখতে পাবো না!

না, না। সিনিয়লচুকে দেখতে পাবো, তাকে যে দেখতে পাচ্ছি আমি। দেখতে পাচ্ছি প্রতিক্ষণে—চোখ বুজলেই আমি তাকে দেখতে পাই। শুধু আজ নয়, কাল নয়, চিরকাল—যতদিন আমি এই সুন্দর ভুবনে থাকব, ততদিন অনিন্দ্যসুন্দর সিনিয়লচু বেঁচে থাকবে আমার মানসচোখে, আমার বুকের মাঝে।

সেদিন মাত্র ছ'ঘন্টা হেঁটে পোকে পৌঁছেছি। যাবার সময় এই পথটুকু যেতে দ্বিগুণ সময় লেগেছিল।

পরদিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে লোনাক চু-য়ের পুল পেরিয়ে তিনটের সময় তেলেম্‌ এসেছি। পুলটা ঠিকই আছে। আমরা তেলেমে থামি নি। আরও একঘন্টা পাথর পেরিয়ে জেম্‌ চু-য়ের তীরে ছোট্ট একটি ভারী সুন্দর শিবিরক্ষেত্র পেয়েছি। আর এই এগিয়ে আসার জন্য গতকাল দুপুরবেলাতেই পৌঁছে গিয়েছি এখানে। কুলিরা মালপত্র রেখে বিদায় নিয়েছে। তিনজন মেয়ে সহ সাতজন কুলি মাল

নিয়ে এসেছে আর লামা ছিল সুশান্তবাবুর সাহায্যকারী। সে মুভি ক্যামেরা বয়ে এনেছে ও প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে পথচলায় সাহায্য করেছে।

আটজন কুলিকেই কাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আজ তাদেরই তিনজন চাল-আটা ও আলু নিয়ে ওপরে যাবে। গতকাল বিকেলে তারা মিস্টার সিং-এর গুদাম থেকে মালপত্র বাংলোয় নিয়ে এসেছে। ওপরের মাল ওজন করে বেঁধে রেখে গিয়েছে। ওরা আজ সকালেই রওনা হবে। কারণ বকশিশের লোভ দেখিয়েছি। বলেছি—তিনদিনের পথ দু-দিনে পৌঁছতে পারলে চারদিনের মজুরী পাবে। মূল-শিবিরে যে খাবার নেই!

ছ'টা বেজে গেছে, আর শুয়ে থাকা উচিত হবে না। বেড-টি না পেলে কেউ বিছানা ছাড়বে না। কুলিরাও এসে যাবে, তাদের চা খাওয়াতে হবে। বীরেন আসে নি, অতএব আমাকেই উদ্যোগী হতে হবে।

কাল আর স্লীপিং ব্যাগ খুলি নি, ডাকবাংলোর কম্বল গায়ে দিয়েছি। তাতেই গরম লেগেছে, একে ষোল হাজার ফুট থেকে ন'হাজারে নেমে এসেছি, তার ওপরে ঘরে ঘুমিয়েছি।

জামা গায়ে দিয়ে বাইরে আসি। কালুকে ডাকি। তাকে চা বানাতে বলি। কালুই এখানে আমাদের সব কাজ করে দিচ্ছে।

চা নিয়ে আসতেই ওরা একে একে উঠে বসে—সুশান্তবাবু রমেনবাবু শরদিন্দু এবং অরুণ। চায়ের মগ হাতে দিয়ে শরদিন্দুকে মনে করিয়ে দিই, "ওপরে মাল পাঠাবার পরে গ্যাংটকে সেনদাকে ওয়ারলেশ পাঠাতে হবে। মিস্টার সিং-এর ট্রান্সমিটার নাকি ভাল নেই, ছাতেন যেতে হবে।"

সাতটার আগেই কুলিরা এসে গেল। কথা ছিল থিচন নাম্বার ও নিন্দু যাবে।

তারাই কাল মালপত্র সব ঠিক করে রেখে গেছে। কিন্তু আজ ওদের সঙ্গে আবার পূর্ণিমা এসে হাজির হল কেন?

পূর্ণিমা মানে সিকিমের কোনো সুন্দরী যুবতী নয়, জনৈক মধ্যবয়সী পুরুষ। মূল শিবিরে মাল পৌঁছে দিয়ে সে লাচেন ফিরে এসেছিল।

পূর্ণিমা বলে, "সাব্, নাম্বার ও নিন্দুর সঙ্গে আমি মাল নিয়ে ওপরে যাবো, মেট তাই বলে দিয়েছে।"

সে কি! বেচারী থিচন কাল দু-মণ আটার বস্তাটা গুদাম থেকে একা বয়ে আনল বাংলোয়। মালপত্র ওজন করে বস্তায় ভরে সেলাই করে রেখে গেল। আর সে-ই যাবে না!

পূর্ণিমাকে বুঝিয়ে বলি। কিন্তু তার সেই একই কথা—মেট বলে দিয়েছে।

থিচন বা পূর্ণিমা যে-কেউ মাল নিয়ে যাক, আমাদের কাছে একই কথা। তাহলেও ন্যায়-অন্যায় আছে তো! গতকাল থিচন অনেক খেটেছে। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত ওরাই সমাধান করে। তর্ক করতে করতে হঠাৎ দুজনের কি যেন একটা রফা হয়। থিচন বলে, "সাব্, আমাকে একটুকরো সাদা কাগজ আর কলম দেবেন!"

ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মাল নিয়ে যাবে, এর মধ্যে আবার লেখা-পড়ার কি আছে!

তবু ওকে কাগজ কলম এনে দিই। থিচন কাগজখানিকে কয়েকটা সমান ভাগ

করে ছিঁড়ে নেয়। নিজেদের ভাষায় সেগুলিতে কি যেন লিখে-লিখে দলা পাকায়। কতগুলো টুকরো সাদাই থাকে। তারপরে কাগজের দলাগুলোকে দু হাতের মধ্যে কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিয়ে মেঝের ওপর ছড়িয়ে দেয়।

দুজনে পালা করে এক-একখানি কাগজ তোলে আর খোলে। দু-তিনবার তোলার পরে পূর্ণিমা নিজেদের ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে। থিচন কাগজখানি দেখে। সে কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়। করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একবার একটু ম্লান হাসে। তারপরে শান্তস্বরে বলে, "সাব্, আমরা লটারী করেছি, পূর্ণিমাচাচা জিতেছেন। তিনিই মাল নিয়ে যাবেন।"

আমার কিছু বলার নেই। এই ওদের আইন এবং ওরা সে আইন মেনে চলে। আমি ওকে শুধু সান্ত্বনা দিই, "তুমি তাহলে কাল সকালেই যেও, আজ একটু বিশ্রাম করে নাও।"

"জী সাব্!" পরাজিত থিচন নমস্কার করে বেরিয়ে যায় বাংলো থেকে।

কয়েক মিনিট বাদে নাম্বার নিন্দু ও পূর্ণিমা রওনা হয়। ওরা আমার অভুক্ত সহযাত্রীদের খাবার নিয়ে যাচ্ছে। যাতে পথে না খেয়ে ফেলে, তাই চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমি ওদের পথের খাবার দিয়ে দিয়েছি, একদিনের বেশি মজুরী দিতে চেয়েছি। এখন ওদের ধর্ম। ওরা হিমালয়ের মানুষ। তাই হিমালয়কে বলি—তুমি দেখো, আমার বন্ধুরা যেন তাদের খাবার পায়। হিমালয়! তুমি এই মালবাহকদের মনে শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাও।

ব্রেক-ফাস্ট্ করে বর্ষাতি গায়ে দিয়ে শরদিন্দুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি পথে। এখন বৃষ্টি পড়ছে না কিন্তু যে কোন মুহূর্তে নামতে পারে। মেঘলা আকাশ। গত তিনদিনও পথে আমাদের প্রচুর বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। আমি তাই রমেনবাবুর বর্ষাতিটা নিয়েছি।

আমরা লাচেন থেকে ছাতেন চলেছি। পরিচিত পথ, পরিচিত গ্রাম। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। লাচেনে বাড়ি-ঘর বেশি, চাষের জমি কম। এরা চাষের ব্যাপারে প্রধানত থাঙ্গুর ওপরে নির্ভরশীল। থাঙ্গুতে প্রচুর আলু হয়। শীতের আগে তারা সেই আলু নিয়ে লাচেনে ফিরবে। এখানেও অবশ্য কিছু কিছু আলু পেঁয়াজ বিন্‌স মুলো এবং শাক-সবজি হয়। এ গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের দু-চারটি করে গৃহপালিত পশু আছে। গৃহপালিত পশু বলতে গরু ও চমরী গাই এবং দু-এর সংমিশ্রণে চরু। তবে ঘোড়া খচ্চর আর ভেড়াও রয়েছে।

লাচেনবাসীরা সবাই বৌদ্ধ। তাই গুম্ফাটি গ্রামের সব চেয়ে সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। এখন সরকারী অনুদানে গুম্ফাটিকে নবরূপ দান করা হচ্ছে। গ্যাংটক থেকে বৌদ্ধ শিল্পীরা এসে গুম্ফার অঙ্গসজ্জায় রত রয়েছেন। ষাটজন লামা আছেন এই গুম্ফায়। তাদেরই একজন আমাদের মালবাহক হয়েছিল। সে আমাদের গাইড হয়ে গতকাল ফিরে এসেছে।

লোকটি সাধারণ কুলির কাজ করেছে, কিন্তু কুলিরা সবাই তাকে সমীহ করে চলত। লামারা সিকিমের সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সে যে অভাবের জন্য আমাদের মাল বয়েছে, তা ঠিক নয়। কারণ গ্রামবাসীরাই লামাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। লোকটি পরিশ্রমী, কাজ পেয়ে সঙ্গী হয়েছিল।

আর শুধু লামার কথাই বা বলি কেন? আমাদের কুলি-কামিনদের অনেকেই

নাকি অবস্থাপন্ন। ঘরে হাজার হাজার নগদ টাকা ও প্রচুর সোনা-রূপা মজুত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা কেউ বড় একটা ভোগ করে না। ঘরে রেখে দিয়েই শান্তি পায়।

পয়সার প্রসঙ্গ থাক, লামাদের কথা ভাবা যাক। লামারা সিকিমী সমাজের অভিভাবক। তাঁদের নির্দেশ আইনের মতো অলঙ্ঘনীয়। রোগশোক, উৎসব ও আনন্দে লামার নির্দেশ ছাড়া এরা কোনো কাজ করে না। অথচ আমাদের লামা মালবাহক রূপে সর্বদা সাঙবার কথামত কাজ করেছে। হিমালয়-সমাজের শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা সমতলের সমাজে উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম। লামারা সিকিমী-সমাজের আধ্যাত্মিক নেতাও বটেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'Lands of the Thunderbolts' গ্রন্থে আর্ল অব্ রোণাল্ডশে লাচেন গুম্ফার প্রধান লামার প্রভূত প্রশংসা করেছেন। বলেছেন—লামা একজন মহাপুরুষ। তিনি মাঝে মাঝেই লাচেন থেকে চলে যেতেন। থাম্বু ছাড়িয়ে এক নিভৃত গুহায় গিয়ে তপস্যায় বসতেন। একবার তিনি নাকি একনাগাড়ে পাঁচ বছর তপস্যা করেছেন। ঐ সময় তিনি সামান্য খাবার খেতেন এবং কোনো মানুষের মুখ দেখতেন না। লেখক তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

'From conversation with him it appeared that he had reached the stage of arahatship and was, therefore, beyond good and evil.'

লাচেনের মানুষরা শুনেছি সাত হাজার ফুটের নিচে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারে না, গরমে কষ্ট পায়। এরা কোনো কাজে গ্যাংটকে গেলে, দু-চারদিনের মধ্যে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে।

লাচেনবাসীরা প্রায় সকলেই ভোট, এদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত থেকে এসেছে। এখনও আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে প্রচুর তিব্বতী প্রভাব রয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা তিব্বতী শরণার্থীদের প্রতি এরা বড়ই উদাসীন।

ছাতেন এসে মেজরসাহেবকে পাওয়া গেল না, পেলাম সুবেদারজীকে। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, মিজোরামের মানুষ। অত্যন্ত অতিথিবৎসল ও মধুর স্বভাব। তিনি চা খাওয়ালেন। আমাদের সামনেই গ্যাংটকে সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। অভিযানের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানালেন।

সুবেদারজীর শুভেচ্ছা সার্থক হয়েছে কি? গতকালই অসিতদের সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করার কথা। প্রকৃতি কি কৃপা করেছেন তাদের? স্বপ্ন কি সফল হয়েছে?

পরদিন। সকালেই কন্ট্র্যাক্টর কুলিদের নিয়ে এসে হাজির হল। সে চারজন মেয়ে নিয়ে এসেছে। নেতা মেয়েদের পাঠাতে নিষেধ করেছে। তাই কন্ট্র্যাক্টরকে বলি, "মাত্র তো বারোজন লোক ওপরে পাঠাবে।"

"মেট তো পনেরোজন পাঠাতে বলেছে।" সে বলে।

"হ্যাঁ।" আমি বলি, "তার মধ্যে তিনজন কাল চলে গিয়েছে।"

সে মাথা নাড়ে।

এবারে আমি বলি, "মাত্র বারোজনের মধ্যে আবার মেয়েদের পাঠাচ্ছ কেন?"

"দোষ কি? ওরাও তো সমান মাল বয়।"

"তা বয়, কিন্তু লোকের যখন অভাব নেই, তখন আর মেয়েদের পাঠিও না। বারোজন জওয়ান ছেলে পাঠিয়ে দাও।"

আমার প্রস্তাব কন্‌ট্র্যাক্টর শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়, তবে বেশ বুঝতে পারছি খুশি মনে নয়। জানি না ওকে মেয়েরা কোনো বিশেষ কমিশন দেয় কিনা!

ছেলেরাও কিন্তু কন্ট্রাক্টরকে কিছু কম কমিশন দেয় না। কথায় কথায় শুনেছি—কন্‌ট্র্যাক্টর আমাদের কাছ থেকে দৈনিক জনপ্রতি একুশ, তেইশ ও পঁচিশ টাকা পেলেও, সে এদের দিচ্ছে মাত্র সতেরো টাকা করে। অর্থাৎ এই লোকটা গড়ে প্রত্যেক মালবাহকের কাছ থেকে দৈনিক ছ'টাকা করে কমিশন নিচ্ছে। স্থানীয় মালবাহকদের জন্য আমাদের ন'হাজার টাকার মতো মজুরী দিতে হবে, তার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার কন্‌ট্র্যাক্টর একাই নিয়ে নেবে। পুঁজিপতিদের শোষণ নিয়ে আমরা অবিরত মাথা ঘামিয়ে চলেছি, কিন্তু এই সব শোষণের সংবাদ বড় একটা রাখছি না। ফলে সমাজে অবিচার বেড়েই চলেছে।

কিন্তু আমরা সবাজসেবী নই, পর্বতাভিযাত্রী। অতএব অভিযানের কথায় ফিরে আসা যাক। কন্‌ট্র্যাক্টর শেষ পর্যন্ত আমার কথা শুনতে বাধ্য হল। বারোজন পুরুষ-পোর্টার পাঠিয়ে দিল মূল শিবিরে। তারপরে মেয়েদের নিয়ে চলে গেল বাংলো থেকে।

ব্রেক্-ফাস্ট্ করে আমার সহযাত্রীরা তাস খেলতে বসে গেল। সাংবাদিক তাস খেলা জানতেন না। কিন্তু কাল শরদিন্দু তাঁকে তাস চিনিয়ে খেলা শিখিয়ে দিয়েছে। আজ তাঁরই গরজে সকাল থেকে তাসের আড্ডা বসে গেল।

কিই বা করবে? কাজ যা ছিল, কালই হয়ে গেছে। এখন তো শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা—সংবাদের প্রতীক্ষা, সহযাত্রীদের জন্য প্রতীক্ষা। আর এই কর্মহীন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষাই পর্বতাভিযানের সবচেয়ে বড় শাস্তি।

ওরা তবু তাস নিয়ে মেতে উঠেছে, আমি কি করি? আমি তাস খেলা জানি না। তাই রান্নাঘরে এসে ঢুকি। কিছুক্ষণ কালুর কাজের তদারকি করি। তারপরে কালু বলে, "তিন সাব্ কাল স্নান করেছেন। আজ আপনি আর শরদিন্দুসাব্ স্নান সেরে নিন, আমি গরম জল করে দিচ্ছি।"

কথাটা কালু ঠিকই বলেছে। স্নান করা একান্ত প্রয়োজন। গ্যাংটক ছাড়ার পরে আর স্নান করা হয় নি। তার মানে আজ সতেরো দিন স্নান করি না। নিজেই নিজের গায়ের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। গরম জল ছাড়া স্নান করা মুশকিল। কিন্তু এটি এখানে বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারণ একমণ কাঠের দাম সাত টাকা। এমনিতেই দৈনিক দেড় মণ করে কাঠ লাগছে। আমাদের আর্থিক অবস্থাটি সুবিধের নয়। তাহলেও একটা দিন অন্তত গরম জল দিয়ে ভালভাবে স্নান করে নিতে হবে। কালুকে জল গরম করতে বলি।

কেবল স্নান নয়, নিজের আরও কিছু পরিচর্যার প্রয়োজন। গেঞ্জি ও রুমাল ইত্যাদি কাচা আর দাড়ি কামানো দরকার।

আজও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আশ্চর্য, একটা দিনও বৃষ্টির বিরতি নেই! আমরা এখানে ঘরে বসে কাচের দরজা-জানলার ভেতর দিয়ে বর্ষার দৃশ্য উপভোগ করছি। শরদিন্দু মাঝে মাঝে গেয়ে উঠছে, 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো

নাচে রে...'

কিন্তু ওপরে? আজ ওদের এক নম্বর শিবির গুটিয়ে মূল-শিবিরে ফিরে আসার কথা।

আচ্ছা ওখানে তো আবহাওয়া ভাল হতেও পারে! এখানে বৃষ্টি হলেই যে ওখানে আবহাওয়া খারাপ হবে, তার কোনো মানে নেই! এই তো সেদিন মূল শিবিরে সকাল থেকে তুষারপাত চলছিল, আর সেদিনই বিনীতরা দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে তিন নম্বরের পথ পর্যবেক্ষণ করে এলো। হে ঠাকুর! তাই যেন হয়—এখানে যত খুশি বৃষ্টি হোক, ওপরে যেন আবহাওয়া ভাল থাকে। তাহলেই আমার পর্বতারোহী বন্ধুদের সকল শ্রম সার্থক হবে।

কিন্তু ওরা যদি সত্যিই সফল হয়ে থাকে, তাহলেও যে সে সংবাদ আমরা পরশুর আগে পাবো বলে মনে হয় না। তার মানে আরও অন্তত দুটি দিন প্রতীক্ষা করতে হবে। তাই করব। আমরা সুসংবাদের প্রতীক্ষা করব, সঙ্গীদের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকব।

সেই প্রতীক্ষা আর পথ চেয়ে থাকার মধ্য দিয়ে আরও একটি দিন কেটে গিয়েছে। গতকাল মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের মুখ দেখেছি। কিন্তু আজ সকাল থেকেই সোনালী রোদ। লাচেন ঝলমল করছে। আজ ১লা জুন, ১৯৮০।

এমন মেঘশূন্য আকাশ গ্যাংটক ছাড়ার পরে আর চোখে পড়ে নি। তাই লাচেনে লেগেছে উৎসবরে আনন্দ। ছোট-বড় সবাই পথে বেরিয়ে পড়েছে, সব বাড়ির সামনে জামা-কাপড় ও নানারকমের শয্যাদ্রব্য শুকোতে দিয়েছে।

ডাকবাংলোর সামনে একটা বাড়িতে বোধকরি কোনো পুজো হচ্ছে। বিরাট পতাকা টাঙানো হয়েছে। ঐ পতাকা সৌভাগ্যের প্রতীক। বাড়িটার সামনে অনেক মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। বড় বড় পেতলের হাঁড়িতে রান্না চড়েছে। কালু জানায়—ভগবানের পুজো হবে।

পুজোবাড়ির পাশের বাড়িটি প্রাক্তন চৌকিদারেব। বহু বছর হল সে অবসর নিয়েছে। ভারি অমায়িক মানুষটি। একদিন আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করে গেছে। ষোল বছর আগে সুশান্তবাবু যখন এখানে ছবি তুলতে এসেছিলেন, তখন সে এই ডাকবাংলোর চৌকিদার ছিল। কথাটা বলতেই সে সুশান্তবাবুকে আলিঙ্গন করেছে।

এখন সে চাষ-বাস নিয়ে আছে। কিছু জমি করেছে। ছেলে-মেয়েরাই সব দেখাশোনা করে, বিশেষ করে কিশোরী কন্যাটি। সারাদিন সে ক্ষেত কিংবা গোয়ালে কাজ করছে। গরু ঘোড়া চমরীগাই ভেড়া—সবই আছে তার।

শুধু সামনের বাড়িতে নয়, গুম্ফাতেও আজ নাকি পুজো হবে। লামা এসে নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। সুশান্তবাবু ও রমেনবাবু সেই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে চলেছেন। আমি আর শরদিন্দু আজ আবার ছাতেন যাচ্ছি—গাড়ির খবর নিতে। অরুণ বাংলোতেই থাকবে। নইলে একা কালুর পক্ষে সবদিক সামলানো সম্ভব নয়।

সুবেদারজী আজও তেমনি আদর-যত্ন করলেন। চা খাওয়ালেন এবং সুসংবাদ দিলেন। না, অভিযানের সংবাদ নয়, গাড়ির খবর—পরশু দুপুরে চারখানি ওয়ান-টনার পাওয়া যাবে। পরশু আমাদের চুংথাঙে রাত কাটাতে হবে। পরদিন সেখানে দুখানি

থ্রি-টনার পাবো। তারা আমাদের গ্যাংটক নিয়ে যাবে। গ্যাংটক থেকে অন্য গাড়ি শিলিগুড়ি পৌঁছে দেবে। সেনদাও ফোন করে সুবেদারজীকে এই একই খবর দিয়েছেন।

সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এলাম লাচেন। না, পথে বৃষ্টি নামে নি। বরং এখনও ঝকঝকে রোদ রয়েছে। পথ ও প্রান্তর সব শুকিয়ে গিয়েছে। পথে-পথে দোকানে-দোকানে ডাকবাংলোর সামনে সর্বত্র দলে-দলে মানুষ। আমাদের কুলি-কামিনরাও রয়েছে। ব্যাপার কী? এরা কি সবাই পুজোবাড়িতে নিমন্ত্রিত নাকি?

কালু সহাস্যে বলে, "না সাব্! আজ আমাদের 'মিটিং'।"

মিটিং? মানে সভা? কিসের সভা?

কলু বলে, "থাঙ্গু যাবার মিটিং। কবে যাওয়া হবে? কে কোন্ জমি চাষ করবে? পঞ্চায়েতকে কত টাকা দিতে হবে? সব ঠিক হচ্ছে আজ।"

"কিন্তু এরা তো বেশির ভাগ এখানে-ওখানে আড্ডা দিচ্ছে, জুয়া খেলছে আর থুম্বা খাচ্ছে। পঞ্চায়েত-প্রধানকেও তো দেখছি না!"

"তিনি পঞ্চায়েত কোঠিতে রয়েছেন—ঐ যে ওখানে গুম্ফায় ওঠার মুখে বড় ঘরখানি, ওখানেই আসল সভা হচ্ছে—কর্ম সমিতির। আমরা সব সাধারণ সভ্য। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজ নিজ সদস্যদের মতামত জানিয়ে দিচ্ছি। কেউ কেউ অবসর মতো একটু জুয়া খেলে কিংবা থুম্বা খেয়ে নিচ্ছে।'"

দুপুরের খাবার খেয়ে সহযাত্রীরা তাস নিয়ে বসল। আমি বেরিয়ে আসি বাইরে, এখনও রোদে রয়েছে যে! একখানি চেয়ার নিয়ে রোদে বসি।

এখানে অনেক লোক। তারা দু-তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে জটলা করছে। তার মানে সাব্-কমিটির মিটিং চলেছে আর কি! বোধ করি সারাদিন ধরেই চলবে।

হঠাৎ ওদের মধ্য থেকে একটি যুবক উঠে আসে আমার কাছে। বলে, "আপনার কলমটা একটু দেবেন?"

কলম মানে ডটপেন। দুটি নিয়ে এসেছিলাম, একটা পথে পড়ে গেছে। এখন এটাই আমার একমাত্র সম্বল। এবং জীবনে বহুবার বহুজনকে কলম দিয়ে আর ফেরত পাই নি। তবু কলমটা তাকে দিয়ে দিই। কারণ কলম ছাড়া মিটিং হবে কেমন করে?

"গুড আফ্টারনুন স্যার!"

তাকিয়ে দেখি ফেণ্ডো ভোটিয়া ও তার এক তিব্বতী বন্ধু। প্রতিনমস্কার করে বসতে বলি। ওরা সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ে।

ফেণ্ডো একজন সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান তিব্বতী যুবক। সে বাস্তুত্যাগী। ১৯৫৯ সালে পালিয়ে এসেছে তিব্বত থেকে। ঘর ছেড়েছিল দাদার সঙ্গে। কিন্তু দাদা আর এদেশে এসে পৌঁছয় নি, পথেই মারা যায়। আধমরা হয়ে ফেণ্ডো এই গ্রামে পৌঁছয়, তখন তার বয়স বারো বছর।

সেই থেকে ফেণ্ডো এ অঞ্চলে আছে। বহু কষ্ট করে সে আজ বড় হয়েছে। কিছু লেখাপড়া শিখেছে, দার্জিলিং থেকে 'বেসিক মাউন্টেনীয়ারিং ট্রেনিং' নিয়েছে। এখন সে একটা সরকারী চাকরি করে। এই গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছাতেনে ঘর বানিয়ে বসবাস করছে। সবচেয়ে বড় কথা সে গত বছরের সিনিয়লচু অভিযানে অংশ নিয়েছে এবং সহ-নেতার সঙ্গে প্রথম দলে শিখরে আরোহণ করেছে।

ফেণ্ডো আমাদের অভিযানের খবর নেয়। তারপরে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কি গ্রাম পঞ্চাযেতের সভায় এসেছো নাকি?"

"না স্যার। আমরা তো তিব্বতী, এখনও পঞ্চায়েতের সদস্য নই।" বন্ধুটি উত্তর দেয়।

"কিন্তু তোমরা তো এখন ভারতীয়।"

"সরকার স্বীকার করলেও সমাজের চোখে আমরা বিদেশী।"

কথাটা ভাল লাগে না আমার। আমিও বাস্তুত্যাগী কিন্তু এরা দেখছি আমাদের চেয়ে বেশি দুর্ভাগা। অথচ লাচেনবাসীদের পূর্বপুরুষগণ প্রায় প্রত্যেকেই ভোটিয়া এবং একদিন তিব্বত থেকে এসেছিলেন। তারপর যুগ যুগ ধরে যাওয়া-আসা চলেছে। ফলে সীমান্তের দু-দিকেই গড়ে উঠেছে একটা মিশ্র সমাজ। আর এ অবস্থা শুধু সিকিমে নয়—সিকিম থেকে লাদাখ পর্যন্ত প্রত্যেক সীমান্তরাজ্যে সমান সত্য।

এ কথা সত্যি যে বৃটিশ-পূর্ব যুগে ভারত ও তিব্বতের সীমান্তরাজ্যগুলিতে রাজায় রাজায় প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে নি। উভয় দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে এসেছে। ভারতীয় হিন্দু গিয়েছে কৈলাস-মানস সরোবরে, তিব্বতী বৌদ্ধ এসেছে বুদ্ধগয়া ও সারনাথে। কারণ ভিন্ন রাষ্ট্র হলেও অভিন্ন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন বিরাজ করেছে তিব্বত ও ভারতের মাঝে। পরিতাপের কথা সেই তিব্বতের বাস্তুত্যাগীদের আজও আমরা আপন করে নিতে পারছি না।

ফেণ্ডোর বন্ধু আবার কথা বলে, "স্যাব, আমি আপনাদের যে তিনজন তিব্বতী হ্যাপ্ দিয়েছি, তাদের একটু সাহায্য করতে হবে।"

"বেশ করব। বলো কি সাহায্য?"

"আপনারা ওদের মূল শিবির পর্যন্ত দৈনিক বিশ টাকা ও তার ওপরে পঁচিশ টাকা করে মজুরী দিচ্ছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

সে আবার বলে, "ওটা কন্ট্র্যাক্টরের কাছে পনেরো এবং বিশ টাকা বলতে হবে।"

"কেন বল তো?" আমি বিস্মিত।

সে উত্তর দেয়, "কন্ট্র্যাক্টরকে ওদের এক-তৃতীয়াংশ কমিশন দিতে হয়।"

"কিন্তু ওরা তো এ গ্রামের বাসিন্দা নয়।"

"তাহলেও দিতে হবে।"

"আমি কম বললে কন্ট্র্যাক্টর বিশ্বাস করবে তো?"

"আপনি বলবেন, খাবার দিচ্ছেন বলে মজুরী কম দিয়েছেন।"

"বেশ বলব।"

"আরেকটা কথা স্যার।" এবারে ফেণ্ডো কথা বলে।

"বেশ বলো।"

সে একটুকরো কাগজ আমার হাতে দেয়। তাতে গোটা গোটা কাঁচা হরফে ইংরেজীতে লেখা—

'Tharchung Tibetan.

Vill. Gomba Lhou.

Dist. Khamba Zong, Tibet.'

"ইনি কে?" জিজ্ঞেস করি।

ফেণ্ডো উত্তর দেয়, "আমার বাবা।" ফেণ্ডোর চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। সে ভারী স্বরে বলতে থাকে, "গোলমালের সময় বাবা আমাদেব দু-ভাইকে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমবা একটা আস্তানা ঠিক করব। তারপরে দাদা গিয়ে তাদের নিয়ে আসবে। কিন্তু দাদা পথেই মাবা গেল। আমি তখন খুবই ছোট। আমি মা-বাবা আর বোনদের জন্য কিছুই কবে উঠতে পারি নি। যখন সে সাধ্য হল, তখন অনেক দেরি হযে গিয়েছে।" সে আর কিছু বলতে পারে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আমিও কথা বলতে পারছি না। কি বলব? ওকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথাই যে জানা নেই আমার। তবু একসময় কথা বলতে হয়। বলি, "মা-বাবা ছাড়া দেশে তোমার আব কে আছে?"

মুখ তোলে ফেণ্ডো। চোখ মোছে। বলে, "চাব বোন। দুজন আমার বড়, দুজন ছোট।" সে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আর আমি ভাবি দেশে দেশে যুগে যুগে এমন কত লক্ষ-কোটি নিরাপরাধ রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে! ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তব দিতে পারে কিন্তু মানুষের সমাজ ইতিহাসেব কথায় কান দেয় না।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপবে সে আবাব মুখ তোলে। এবাবে অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে বলে, "স্যাব! ঠিকানাটা আপনাব ডাযেরীতে লিখে বাখুন। আপনি কলকাতায় থাকেন। যদি কোনোভাবে আমাব মা-বাবা ও বোনদের একটা খবর যোগাড় করতে পারেন, দয়া কবে আমাকে জানাবেন। জানি না এ জীবনে তাদেব সঙ্গে আমার আব দেখা হবে কিনা। কিন্তু যদি জানতে পারি তারা ভাল আছে, তাহলেই আমি শান্তি পাবো। তারাও যদি জানে, আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি—আমারই মতো শান্তি পাবে।"

জানি না ফেণ্ডোর মা-বাবা আজ বেঁচে আছেন কিনা? জানি না তার বোনেরা আজ কোথায় কি ভাবে আছে? জানি না আমি তাদের কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব কিনা? তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। অতএব ঠিকানাটা ডায়েরীতে লিখে রাখা দরকার নইলে হারিয়ে যাবে।

কিন্তু কলম, আমার কলমটা কোথায় গেল?

মনে পড়ে আমার। কিছুক্ষণ আগে জনৈক যুবক চেয়ে নিয়ে গেছে। তারা ওখানে মিটিং করছিল। এখন তো কেউ নেই! কোথায় গেল? কখন গেল?

আমি যখন ফেণ্ডোর কাছে তার অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী শুনছিলাম, তখন বোধকরি তাদের মিটিং শেষ হয়ে গেছে। তারা বাংলো থেকে বিদায় নিয়েছে। বিদায়বেলায় আমাকে কলমটি ফেরত দিয়ে যেতে যথারীতি ভুলে গিয়েছে।

চৌদ্দ

গতকাল কোনো খবর আসে নি। তাহলে কি....

না, না, তার কি মানে আছে? আমরা ওয়্যারলেস অর্থাৎ 'ওয়াকিটকি সেট্' আনি নি। পায়ে হেঁটে খবর আসবে। গতকাল পৌঁছতে পারে নি, আজ আসবে।

সুতরাং সেই প্রতীক্ষা। আজ শুধু সংবাদ আসার কথা নয়, আজ ওদের ফিরে আসার দিন। আজ ২রা জুন।

গত পাঁচ দিন ধরে আমরা এখানে আজকের দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছি। গত পাঁচ মাস ধরে আমরা যে শুভ সংবাদের প্রত্যাশা করেছি, আজ তা আসতে পারে। আসবে কি?

নিশ্চয়ই আসবে। আমার মন বলছে, অমূল্যরা আজ ফিরে আসবে। তাই কালুকে ওদের জন্য চাল নিতে বলেছি।

রমেনবাবু বলেন, "আমি আজ ডাল ও তরকারী রাঁধব।"

অরুণ বলে, "আমি কয়েকটা ভাল বিস্কুট রেখে দিয়েছি। ওরা এসে চা দিয়ে খাবে।"

শরদিন্দু বলে, "আমি তাহলে ব্রেক-ফাস্ট করে এগিয়ে যাই খানিকটা, অন্তত পুল পর্যন্ত।"

সুশান্তবাবু নিঃশব্দে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরছেন। ওদের প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটিকে ক্যামেরায় ধরে রাখবার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন।

আজও আবহাওয়া ভাল। সকাল থেকে রোদ উঠেছে। ভালই হয়েছে। ওরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

ব্রেক-ফাস্ট-এর সময় কন্ট্রাক্টর এসে হাজির হল। তাকেও চা-খাবার দিতে হয়। খাওয়া হলে কন্ট্রাক্টর জিজ্ঞেস করে, "সাব্, কুলিদের পাওনা কখন দেবেন? ওরা টাকার জন্য খুব জ্বালাতন করছে।"

কথাটা সত্য নয়। কারণ যে সব কুলিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের দু-চারজনের সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়, কেউ টাকা চায় না। তবু ওকে বলি, "তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়েছে, সব মাল নিয়ে কুলিরা ফিরে আসার পরে মেটের সামনে বসে হিসেব হবে, তারপরে টাকা দেব।"

"এরা অশিক্ষিত মানুষ, এরা ওসব লেখা-পড়া বোঝে না।"

"আমাদের সঙ্গে তো কুলিদের কোনো সম্পর্ক নেই! তোমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, তুমি লোক দিয়েছো। আমরা চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে টাকা দেব, তুমি ওদের পাওনা মিটিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।" লোকটা মাথা চুলকায়।

লোকটা ধূর্ত। নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "এরা অশিক্ষিত মানুষ, এরা চুক্তি মানতে চাইছে না।"

"মানে!"

"এরা বলছে খালি-হাতে মূল শিবিরে যাতায়াতের জন্য সবাইকে দুদিনের মজুরী দিতে হবে।"

এতক্ষণে লোকটা আসল কথা বলল। চুক্তি হয়েছে খালি হাতে যাতায়াতের জন্য দেড় দিনের মজুরী পাবে, এখন বলছে দু-দিনের টাকা দিতে হবে। তার মানে বেশ কয়েক শ' টাকা বেশি চাইছে।

লোকটা খুবই অন্যায় কথা বলছে। প্রথমতঃ চুক্তি, দ্বিতীয়তঃ হিমালয়ের সর্বত্র খালি হাতে যাওয়া-আসার জন্য অর্ধেক মজুরী দেবার নিয়ম। তবু রেগে যাওয়া চলবে না। আমরা ওদের হাতের মুঠোয়। শান্ত স্বরে বলি, "আমি তো বলেছি কন্‌ট্র্যাক্টর, কুলিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তোমার কাছ থেকে লোক নিয়েছি, চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে টাকা দিয়ে দেব, আজই দেব।"

"এরা শুনতে চাইছে না সাব্!"

"ওদের শোনাবার দায়িত্ব তোমার।"

লোকটা আবার কি যেন বলতে চাইছিল। আমি বাধা দিয়ে বলি, "মেট ফিরে এলে তুমি প্রধানজীকে নিয়ে এসো, তোমার টাকা নিয়ে যাবে।"

সে আর কিছু বলতে পারে না। একটুকাল বসে থাকে, কি যেন ভাবে, তারপরে নিঃশব্দে চলে যায়।

সুশান্তবাবু বলেন, "ঝামেলা করবে মনে হচ্ছে! ভাগ্যিস সেদিন লিখিয়ে নিয়েছিলেন!"

"তাই তো প্রধানকে নিয়ে আসতে বললাম, তিনি সেই চুক্তির সাক্ষী।"

একটু বাদে লামা এসে হাজির হয়। গত কয়েকদিন সে গুম্ফার পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আসতে পারে নি। মানুষটি বড় ভাল। যেমন কাজের, তেমনি পরিশ্রমী। সুশান্তবাবুকে বড়ই যত্ন করে নিয়ে এসেছে। সে আমাদের কাছে খানিকটা দড়ি চেয়েছে—ফিক্‌সড রোপ-এর ম্যানিলা দড়ি। আব বলেছে—আপনাদের চাল-আটা বেশি হলে আমি কিছু কিনতে চাই।

চাল-আটার খদ্দের সে একা নয়। চেয়েছে কালু, চেয়েছেন মিঃ সিং। কালু খানিকটা দড়িও চেয়েছে।

দেওয়া যাবে যথাসময়ে। আগে অমূল্যবা ফিবে আসুক। সেই কথা বলেই বিদায় করি লামাকে। বিকেলে আবার আসবে বলে সে চলে যায়।

আমি ভাবি—ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! চাল-আটার অভাবে আমরা অসময়ে মূল শিবির থেকে পালিয়ে এসেছি আর এখানে চাল-আটা বেচতে হচ্ছে! কি করব এগুলো গ্যাংটক ফিরিয়ে নিয়ে? সেখানে তো কিনতে পাওয়া যাবে!

একটু বাদে শরদিন্দু রওনা হয়ে যায়। আইস এক্‌স্ হাতে নিয়ে সে এগিয়ে চলে পুলের দিকে। যে পথ দিয়ে আমরা সিনিয়লচুর কাছে গিয়েছি, যে পথ দিয়ে অমূল্যরা ফিরে আসবে আমাদের কাছে, সেই পথ ধরে শরদিন্দু চলেছে এগিয়ে—সে চলেছে সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে।

আর আমরা? আমরা ডাকবাংলোর পেছনে রয়েছি দাঁড়িয়ে। এখান থেকে পথের অনেকটা দূর অবধি দেখা যায়। সেদিন এখানে দাঁড়িয়ে আমি লাচেনকে দেখেছি। দেখেছি ঐ তুষারাবৃত শিখরটিকে। আজও তাকে দেখছি। সেদিন সে ছিল এ যাত্রার প্রথম হিমবন্ত-হিমালয় দর্শন। আর আজ? আজ হয়তো হিমবন্ত-হিমালয়কে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছি।

"আ গিয়া সাব্, সাব্ লোক আ গিয়া হোগা!" কালু চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ঠিকই দেখেছে। ঐ তো গায়ে হলুদ জামা, মাথায় টুপি, পিঠে লাল রুকস্যাক, হাতে আইস এক্স্....।

এসেছে! অমূল্যবা ফিবে আসছে, আমাব সঙ্গীবা ফিবে এসেছে।

বেবিয়ে আসি বাংলো থেকে, ছুটে চলি পথে—ওবা ফিবে আসছে এই পথে।

হ্যাঁ, এবাবে চেনা যাচ্ছে ওদেব। প্রথমে শবদিন্দুব সঙ্গে অমূল্য আব অসিত। তাবপবে বীবেন, বিনীত, কেশব ও ডাক্তাব। তাদেব পবে কুলিবা।....হিমাদ্রি আব অসিতবাবু কোথায়? তাদেব দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নিশ্চযই পবে আসছে। পেছিযে পড়েছে আব কি!

অমূল্য কাঁদছে? কেন? কোনো দুর্ঘটনা? হিমাদ্রি আব অসিতবাবুকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না?

ছুটে আসি অমূল্যব কাছে। সে দু হাতে আমাকে জড়িযে ধবে। আমাব কাঁধে মুখ লুকিযে ছোট ছেলেব মতো কেঁদে ওঠে।

অমূল্য কাঁদছে! কেন? অসিতেব চোখেও জল! কি হযেছে?

"পাবলাম না শঙ্কুদা, পাবলাম না।" অমূল্য বলে ওঠে, "পাবলাম না তোমাদেব স্বপ্ন সফল কবতে।...."

"প্রকৃতি আমাদেব কিছুতেই এগুতে দিল না সুশান্তদা!" অসিত সুশান্তবাবুকে জড়িযে ধবে কেঁদে ওঠে।

"তোবা সবাই ভাল আছিস তো?"

"হ্যাঁ।" অমূল্য মাথা নাড়ে।

"হিমাদ্রি আব অসিতবাবু কোথায?"

"পেছনে আসছে।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এবাবে অমূল্যকে সান্ত্বনা দিই, "কাঁদছিস কেন? তুই তো জানিস, পর্বতাভিযানে সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রকৃতিব হাতে। অভিযাত্রীবা শুধু চেষ্টা কবতে পাবে। আমবা চেষ্টা কবেছি, এই আমাদেব পবম গৌবব। এই গৌবব নিযেই মাথা উঁচু কবে ফিবে যাবো সবাব কাছে।"

ওদেব নিযে ফিবে চলি ডাকবাংলোয। খবব বটে গিয়েছে লাচেনেব ঘবে ঘবে। ঘবেব মানুষ বেবিযে এসেছে পথে। পথেব পাশে দাঁড়িয়ে তাবা আমাদেব অভিনন্দিত কবছে।

ফিবে আসি ডাকবাংলোয। সবাইকে নিয়ে ড্রযিংরুমে বসি। কালু চা-বিস্কুট দেয। আমবাও এক মগ কবে চা পেয়ে যাই। কালু অতুলনীয।

একটু বাদে কুলিবা আসে, মেট আসে, হ্যাপ্‌বা আসে। অবশেষে হিমাদ্রি আব অসিতবাবু আসে। তাদেব বুকে জড়িযে ধবি। জিজ্ঞেস কবি, "ভাল আছো?"

ওবা মাথা নাড়ে। আলিঙ্গনমুক্ত হয। নিঃশব্দে একপাশে গিয়ে বসে। কালু তাদেব চা দেয়।

ব্যর্থতাব গ্লানিতে অভিযাত্রীবা বিপর্যস্ত। ব্যর্থতাব কাহিনী শুনতে খুবই ইচ্ছে কবছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা এখন না তোলাই ভাল। আর তাব অবকাশও নেই। কাল দুপুরে গাড়ি আসবে। মালপত্র বেঁধে-ছেদে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। দিতে হবে মালবাহকদেব মজুরী। কনট্র্যাক্টব প্রধানকে নিযে এসে গিযেছে। কুলি-কামিনরাও

হাজির দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং সমস্যাটার সমাধান করা দরকার।

অভিযাত্রীদের বলি, "যারা স্নান করতে চাও করে নাও, গরম জল ফুটছে, স্নান করে খেতে বসে যাও।"

"তোমরা খেয়েছো?" অসিতবাবু জিজ্ঞেস করে।

"না। আমি আর শরদিন্দু একটু পরে খাবো।"

"কেন?"

"মালবাহকদের মজুরী মেটাতে হবে।"

"শরদিন্দু খেতে বসুক, আমি তোমার সঙ্গে থাকছি।"

অসিতবাবু সঙ্গে থাকলে খুবই সুবিধে হবে। কিন্তু সে এইমাত্র এলো।

অসিতবাবু উঠে দাঁড়ায়। বলে, "কোথায় বসবে?"

"আমার ঘরে, সেখানেই কাগজপত্র রয়েছে।"

"বেশ চলো।"

প্রধানকে বলি, "চলুন।"

প্রধানজী উঠে দাঁড়ান। মেট ও কন্‌ট্র্যাক্টর তাঁর সঙ্গী হয়। শুধু তারা নয়, কয়েকজন কুলিও তাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ে।

সবাইকে বসতে বলি। কাগজপত্র বের করি।

অসিতবাবু মেটকে দেখিয়ে প্রধানজীকে বলে, "ভারী চমৎকার আপনার ছেলে। যেমন সুন্দর স্বভাব, তেমনি কাজের মানুষ।"

"সবই আপনাদের আশীর্বাদ।" বৃদ্ধ হাতজোড় করেন। সাঙবা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে।

হঠাৎ ঘরের অপর প্রান্ত থেকে একজন মালবাহক চেঁচিয়ে ওঠে, "আপনারা নাকি খালি হাতে যাওয়া-আসার জন্য আমাদের মাত্র দেড়দিনের মজুরী দিচ্ছেন?"

লোকটার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গী ভাল নয়। তবু যথাসম্ভব শান্তস্বরে উত্তর দিই, "হ্যাঁ। কন্‌ট্র্যাক্টরের সঙ্গে তাই চুক্তি হয়েছে, আর এটাই হিমালয়ের নিয়ম।"

"আমরা মানি না।"

"আমাদের রক্ত নিঙড়ে কাজ করিয়ে নিয়ে এখন মজুরী দিতে চাইছ না!"

"আমরা দু-দিনের মাইনে চাই।"

"দু-দিন করে দিতেই হবে।" ওরা সমস্বরে বলতে থাকে।

এ আমরা কোথায়? এ কি সিকিমের লাচেন গাঁও, না পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শিল্পাঞ্চল? ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, সবই ধূর্ত কন্‌ট্র্যাক্টরের কারসাজি।

কিন্তু আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। তাই গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, "তোমাদের বলা শেষ হয়েছে?"

ওরা চুপ করে। তবে ওদের চোখে-মুখে তীব্র অসন্তোষ, যে কোন সময় তা তীব্রতর রূপ নিতে পারে। সুতরাং সাবধানে এগোতে হবে।

শান্তস্বরে বলি, "আমি তোমাদের কথা শুনেছি, এবারে আমার কথা বলছি। এখানে প্রধানজী রয়েছেন। দু-দলের কথা শুনে তিনি যা বিচার করবেন, আমি তা মেনে নেবো। তোমরা মানতে রাজী আছো?"

"জী।"

"ভাই সব, বহু কষ্ট করে টাকা-পয়সা রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে আমরা তোমাদের দেশে আসি কারণ আমরা হিমালয়কে ভালোবাসি। তোমরা হিমালয়ের মানুষ, আমরা তোমাদেরও ভালোবাসি। আমরা তোমাদের ঠকাতে আসি না। তোমাদের থেকে কিছু নিতে আসি না, কিছু দিয়ে যাবার জন্য আসি। তোমরা মুখে রক্ত তুলে আমাদের জন্য মাল বয়েছো। আর আমরা তোমাদের ঠকাবো! একথা তোমরা ভাবলে কেমন করে? তোমরা কি জানো আমরা কত করে তোমাদের দিনমজুরী দিচ্ছি?...."

"এটা বলা ঠিক হচ্ছে না সাব্!" কন্ট্র্যাক্টর আমার কানে কানে বলে। সে আমার একখানি হাত ধরে ফেলে।

একটু হেসে আমি আবার কুলিদের বলি, "তোমরা জানো না আমরা তোমাদের কত করে দিচ্ছি। কন্ট্র্যাক্টর সেকথা তোমাদের বলে নি। অথচ তার কথা শুনে তোমরা আমাদের ওপর হামলা করতে এসেছো, বলছ—আমরা তোমাদের রক্ত শোষণ করছি!"

"হ্যাঁ হুজুর, ও তো তাই বলল!" সবচেয়ে উৎসাহী লোকটি বলে ওঠে।

তার মানে ফল হয়েছে।

আমি কন্ট্র্যাক্টরের দিকে তাকাই। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করি, "তুমি একথা বলেছো?"

সে চুপ করে থাকে।

অসিতবাবু তাকে জিজ্ঞেস করে, "আমরা মজুরী দিয়ে ওদের রক্ত শোষণ করছি আর তুমি কমিশন খেয়ে ওদের আয়ু বাড়িয়ে দিচ্ছ!" একবার থামে সে। তারপরে আমাকে বলে, "সবাইকে 'রেট'-টা বলে দাও।"

"সাব্।" কন্ট্র্যাক্টর আবার আমার হাত ধরে। বলে, "আমি দেড় দিনের মজুরীতেই ওদের রাজী করাচ্ছি, আপনি চুপ করুন।"

"না।" অসিতবাবু বলে, "দৈনিক রেট না বললেও, খালিহাতে যাতায়াতের জন্য জনপ্রতি আমরা মোট কত করে দিচ্ছি, সেটা অন্তত বলে দাও এদের।"

ঠিকই বলেছে সে। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা দরকার। তাই আবার বলি, "তোমরা আমাদের কাজ করেছো কিন্তু আমরা তোমাদের কাজে লাগাই নি। কন্ট্র্যাক্টর তোমাদের কাজে লাগিয়েছে, তোমরা তার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে নেবে। আমরা তাকে চুক্তিমত টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

একবার থেমে ওদের দেখে নিই সবাইকে। না, ফল হয়েছে। ওরা কন্ট্র্যাক্টরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এবারে বলা যাক কথাটা। বলি, "আমি শুধু তোমাদের একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি, খালি হাতে মূল শিবিরে যাওয়া কিংবা আসার জন্য আমরা প্রত্যেককে বত্রিশ টাকা করে দেব।"

"বত্রিশ রূপেয়া!"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক হ্যায় সাব্! হামলোগ বহার চলা যাতা। কসুর মাফ কিজীয়েগা।"

প্রচুর মিল্ক-পাউডার ছিল। কালু চিনি যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। বীরেন মিষ্টান্ন

রাঁধছে। ডাল-রুটি-তরকারী আর মিষ্টান্ন। অনেকদিন এমন উপাদেয় খাদ্য জোটে নি।

আজ লাচেনে শেষ রাত। চৌকিদারকে দিয়ে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়েছি। আগামীকাল এ সময় চুংথাঙে থাকব। আজ তাই মিস্টার সিং ও তার সহকর্মীদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নাকি ন'টার আগে আসতে পারবেন না।

আমরা ড্রয়িংরুমে বসে ভবিষ্যতের অলোচনা করছি। আলোচনা-শেষে সাব্যস্ত হল—চুংথাং চেক্পোস্টে 'এক্সপোজড্ ফিল্ম' জমা দেওয়া হবে না। কারণ আমাদের অধিকাংশ রঙীন ফিল্ম, সরকারী লেবরেটারী 'ডেভেলপ্' করতে পারবেন না। আমরা তাই সব ফিল্ম নিয়ে গ্যাংটক চলে যাবো। আই. জি. মিস্টার গ্যাডগিলের হাতে ফিল্মগুলো তুলে দিয়ে আমাদের বক্তব্য রাখব।

সবে সাড়ে সাতটা। অতিথিদের আসতে এখনও দেড়ঘন্টা দেরি। এবারে একটু অতীতের কথা শোনা যাক, অভিযানের ব্যর্থতার কাহিনী।

অমূল্য শুরু করে, "তোমরা সেদিন মূল শিবিরে বসে বিনীতের চিঠিতে জানতে পেরেছিলে, প্রায় উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে দু-নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত হয়েছে।"

"হ্যাঁ," আমি বলি, "পরদিন গিয়ে ওদের দু-নম্বর দখল করার কথা।"

"পারি নি।" বিনীত বলে ওঠে, "কারণ সেদিন সারারাত প্রবল তুষারপাত হয়েছে। সকালে তুষারপাত থেমে গেল বটে কিন্তু আকাশ এবং পথের অবস্থা বিবেচনা করে সেদিন আর বেরুতে সাহস পাই নি। কথাটা জানাই নি তোমাদের।"

"ছাব্বিশ তারিখ সকালে উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার।" এবারে কেশব কথা বলে, "আমরা পাঁচজন হ্যাপ্‌কে নিয়ে সকালেই বেরিয়ে পড়লাম দু-নম্বরের দিকে। হাঁটু-সমান নরম তুষারের স্তূপ পেরিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল। অবস্থা ফিক্সড রোপ লাগাবার অনুকূলে ছিল না, তাই আমরা আগের দিনের মতই এগিয়ে চললাম।

"কিছুক্ষণ পরে আবার তুষারপাত আরম্ভ হল। বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। তবু আমরা চললাম এগিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত এক সময় গিয়ে পৌঁছলাম দু-নম্বর শিবিরে।

"দেখলাম দু-দিনের তুষারপাতে তাঁবু দুটির অর্ধেকের বেশি বরফের নিচে। বুঝতে পারলাম শিক্ষিত শেরপা ছাড়া ঐ আবহাওয়ায় ওখানে বাস করা অর্থহীন। তাই আমরা তাঁবুর চারিদিকে বরফ সরিয়ে মালপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ফিরে এলাম এক নম্বরে।" কেশব চুপ করে।

হিমাদ্রি বলে, "সাতাশ তারিখেও আবহাওয়ার কোন উন্নতি হল না। তুষারপাতের জন্য প্রায় সারাদিন আমাদের তাঁবুর ভেতরে বন্দী হয়ে থাকতে হল। রাতে আবহাওয়া আরও খারাপ হল। এদিকে ওপরের মালপত্র দু-নম্বরে রেখে আসায় এবং এক নম্বরে বেশি লোক থাকায়, কেরোসিন ফুরিয়ে গেল। দরিদ্র অভিযান। সামান্য কিছু মাংস ও ফলের রস ছাড়া আমরা কোনো টিনফুড নিতে পারি নি। তার ওপরে ঐ উচ্চতায় বরফ গলিয়ে জল করতে প্রচুর জ্বালানির দরকার। ফলে এক নম্বর শিবিরে খাদ্যাভাব ও জলাভাব দেখা দিল। হ্যাপ্‌রাও আর ওপরে থাকতে চাইছিল না।" হিমাদ্রি থামে। সে নেতার দিকে তাকায়।

নেতা বলে চলে, "পরদিন সকালেও মনে হল নিষ্ঠুরা প্রকৃতি আমাদের কৃপা

করতে প্রস্তুত নন। স্বাভাবিক ভাবেই আমি অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অতগুলো মানুষ এক নম্বর শিবিরে বসে থাকলে খিদেয় আর তেষ্টায় মারা যেতে হবে। তাই আঠাশ তারিখে তুষারপাতের মধ্যেই কেশব অসিত ও হিমাদ্রি হ্যাপ্‌দের নিয়ে দু-নম্বর শিবির থেকে সব মালপত্র নিয়ে আসতে চলে গেল। আর বীরেনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বিনীতকে নিয়ে আমি মূল শিবিরে রওনা হলাম। বলে এলাম—পরদিনও আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে সবাই সাধ্যমত মালপত্র নিয়ে মূল শিবিরে নেমে আসবে এবং অভিযান পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে।" একবার থামে অমূল্য। তারপরে ভারী গলায় আবার বলে ওঠে, "তাই হয়েছে। কারণ সেদিন মূল শিবিরে এসেও দেখলাম আবহাওয়া খুবই খারাপ। সারা উপত্যকা জুড়ে অবিশ্রান্ত তুষারপাত চলেছে। তবে তোমাদের ধন্যবাদ। কারণ কুলিরা ঠিক সময়ে মূল শিবিরে পৌঁচেছিল। আমরা খেতে পেয়েছি, আজ সব নিয়ে, সবাইকে নিয়ে নিরাপদে এখানে ফিরে আসতে পেরেছি। তোমাদের সবার সব চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল। আমি আর কখনও এমন খালি হাতে হিমালয় থেকে ফিরে যাই নি।" অমূল্য আর কিছু বলতে পারে না। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সংসারে কান্না বস্তুটি সংক্রামক। একজনের কান্না বহুজনকে কাঁদায়। আমারও চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। তবু জোর করে কণ্ঠস্বরকে অবিকৃত রেখে বলে উঠি, "ভুল, অমূল্য, তুই ভুল করছিস। হিমালয় থেকে কেউ খালিহাতে ফেরে না। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সেই কথাগুলো ভুলে গেলি?"

"কোন কথা?" অমূল্য চোখে মোছে।

"স্মাইথ বলেছেন," আমি বলি '....look upon the mountains not as national emblems and potential "records" but as mountains each affording some new and delightful experience, some new problems to appeal to that curious inexplicable desire inherent in man since he first trod this planet—the urge to tread the untrodden ground...'

পনের

সুন্দরী সিকিমের কাছ থেকে আজ আমাদের বিদায় নেবার কথা। কিন্তু কথা থাকলেই তো কাজ হয় না। কথা ছিল সিনিয়লচুর শুভ্র-শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করা হবে, হয় নি। আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি গ্যাংটক। আজ গ্যাংটক থেকে বিদায় নেবার কথা। সেকথাও বুঝি বা মিথ্যে হয়ে যায়। অথচ কাল বিকেলে নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেন ধরতে হবে।

শিলিগুড়ি গিয়ে অমলকে বলে টাকার যোগাড় করে দার্জিলিঙের হ্যাপ্‌দের মজুরি মেটাতে হবে। কম করেও হাজার আড়াই টাকা। আজই শিলিগুড়ি পৌঁছনো দরকার।

কিন্তু কি করব বুঝতে পারছি না। শেষ রাত থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি—প্রবল বর্ষণ। প্রকৃতি প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি বিরূপা। বর্ষার জন্য পথে কষ্ট পেয়েছি, অভিযান বিফল হয়েছে। এখনও বোধ করি তাঁর বাসনা পূর্ণ হয় নি। তাই সিকিম

থেকে বিদায় নেবার সময়েও তিনি শান্ত হচ্ছেন না।

আজ ৬ই জুন (১৯৮০)। এক রাত চুংথাঙে কাটিয়ে পরশু বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় আমরা গ্যাংটকে পৌঁচেছি। সেনদা সেই ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সেদিন রাতে ফোনে কলকাতা ও শিলিগুড়ির সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের সব খবর দিয়েছি আর জেনেছি—আট তারিখের 'দার্জিলিং মেলে' রির্জাভেশান পাওয়া যায় নি, সাত তারিখের 'সামার স্পেশালে' যেতে হবে। সুতরাং আজই শিলিগুড়ি পৌঁছনো দরকার। কথা ছিল সকাল সাতটার সময় গাড়ি আসবে। কিন্তু আসবে কেমন করে? এলেও এত বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ী পথে গাড়ি চালানো উচিত হবে কী?

গতকাল গ্যাংটকে আমরা ঘরে বসে কাজ করেছি, আর অমূল্য অসিতবাবু ও সুশান্তবাবু সারাদিন ছুটোছুটি করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম বিফলে যায় নি। আজ সকালে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে আর ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিস গ্যাডগিল সাহেব অমূল্যর কথার ওপরে বিশ্বাস করে 'এক্‌সপোজ্‌ড ফিল্ম রিলিজ' করে দিয়েছেন। তাঁর এই সাহায্যের কথা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে।

ফিল্ম-সমস্যা মিটে যাবার পরে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। কারণ আমাদের ধারণা ছিল সেটাই শেষ সমস্যা। কিন্তু গতকাল বিকেলে আরেকটা নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

পর্বতাভিযানে কাজের শেষ নেই। অমূল্যরা যখন ফিল্ম ছাড়াবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করছিল, আমি তখন হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আর হিমাদ্রি ও কেশব হ্যাপ্‌দের নিয়ে সাজ-সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ যুবকল্যাণ দপ্তর, কলকাতার ভ্রমণ সংস্থা 'ইনট্যুর', এবং দার্জিলিং মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমরা এই অভিযানের এসেছি। হিমাদ্রি ও কেশব ইনস্টিটিউটের সাজ-সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে আগামীকাল শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং চলে যাবে। তাই ওরা কাল সকাল থেকেই নওয়াংকে নিয়ে সাজ-সরঞ্জাম গোছাতে লেগে গিয়েছিল। হিমাদ্রি অভিযানের 'ইকুইপ্‌মেন্ট অফিসার' এবং নওয়াং তার প্রধান সহকারী। প্রথম থেকেই হিমাদ্রি সব তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এবং নওয়াং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করেছে।

লাচেনে মালবাহকদের হিসাব মিটিয়ে দেবার আগে মালপত্র সব গুণে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং সাজ-সরঞ্জাম সবই থাকার কথা। কিন্তু গতকাল দেখা গেল সংখ্যায় ঠিক থাকলেও দার্জিলিং থেকে আনা সবচেয়ে ভাল স্লীপিং ব্যাগটি উধাও হয়ে গিয়েছে। আরও মজার কথা সেটির বদলে যে পুরনো ও ছেঁড়া ব্যাগটি রয়েছে, তার ওপরেও লেখা—'H. M. I.'

একে ম্যাজিক ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে? নওয়াং অবশ্য বলছে—সব ঠিকই আছে। কিন্তু হিমাদ্রি সেকথা মানতে নারাজ। এবং সে ঠিকই বলছে কারণ সুশান্তবাবু যে স্লীপিং ব্যাগটি ব্যবহার করেছেন, সেটি নেই।

সেই স্লীপিং ব্যাগটার সরকারী দাম দেড় হাজার টাকা। কিন্তু ইনস্টিটিউটে আমাদের মুচলেকা দেওয়া আছে কোনো জিনিস হারালে চারগুণ দাম দিতে হবে। সুতরাং ছ'হাজার টাকার ধাক্কায় পড়া গেল।

এমনিতেই অর্থাভাব। শিলিগুড়ি গিয়ে অমলের কাছ থেকে টাকা ধার করে

নওয়াঙদের মজুরী দিতে হবে। তার ওপরে এই বাড়তি দণ্ড এবং পরিমাণটা খুবই বেশি। অধ্যক্ষকে অনুরোধ করে হিমাদ্রি হয়তো জরিমানা মাফ করাতে পারবে। তাহলেও পনেরো শ' টাকা! খুবই বিপদে পড়া গেল। জানি না কি ভাবে এই খেসারতের টাকা যোগাড় করব?*

কিন্তু মানসিক অবস্থা যাই হোক, মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। কারণ অভিযান ব্যর্থ হলেও সিকিম বঙ্গ সংস্কৃতি সংস্থা গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সেখানে দেখা হয়েছে দীপালী ও কমলের সঙ্গে। আলাপ হয়েছে মিস্টার বিশ্বাস ও মিস্টার রক্ষিতের সঙ্গে। পরিচয় হয়েছে সর্বশ্রী সখেস শিকদার, গৌতম রায়, দুলাল কর্মকার ও শ্রীমতী শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার মানে সুন্দরের অভিসারে এসে গ্যাংটকের শেষ সন্ধ্যাটির স্মৃতি সুন্দর হয়ে রইল।

কিন্তু আর গতকালের কথা নয়। আজকের কথায় ফিরে আস যাক। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। এবারে গাড়ির খোঁজ নেওয়া দরকার।

ফোনে মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল। তাঁরা জানালেন—বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ গাড়ি পাঠাতে পারেন নি। বৃষ্টি কমে গেছে, এখুনি এসে যাবে। আমরা যেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই।

মালপত্র নিচে নামাবার মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। ভেবেছিলাম হোটেল থেকে খেয়ে নেবো। কিন্তু সে সময় আর পাওয়া গেল না। পাশের রেস্তোরাঁ থেকে চা-বিস্কুট খেয়ে এসে গাড়িতে উঠতে হল। ড্রাইভার ভরসা দেয়, "রংপোতে ভাল বাঙালী হোটেল আছে, সেখানে বাঙালী খানা খাওয়াবো।"

বেলা সাড়ে এগারোটায় গাড়ি ছাড়ল। রংপো গ্যাংটক থেকে ৩৯ কিলোমিটার। পাহাড়ী রাস্তা, বড় গাড়ি। দুটোর আগে বোধকরি পৌঁছতে পারব না। ততক্ষণে খুবই খিদে পেয়ে যাবে। সকাল থেকে দুবার শুধু চা-বিস্কুট খেয়েছি। কিন্তু কি আর করব? শেষবারের মতো কষ্টটুকু সয়ে নেওয়া যাক!

কর্তৃপক্ষ আমাদের ঠিক তেমনি দু-খানি থ্রি-টনার শক্তিমান ট্রাক্ দিয়েছেন। সামনের

---

* শেষ পর্যন্ত খেসারতের টাকাটা আর যোগাড় করতে হয় নি। কারণ হিমাদ্রি ও কেশব দার্জিলিং গিয়ে স্লীপিং ব্যাগটা উদ্ধার করতে পেরেছে। আর তা উদ্ধার হয়েছে আমাদের পরম বিশ্বাসভাজন স্বল্পবাক হাই অলটিচ্যুড পোর্টার নওয়াং শেরপার বাড়ি থেকে। নিজের স্লীপিং ব্যাগ পালটে সে ঐ ভাল স্লীপিং ব্যাগটি কিট্-এ ভরে নিয়েছিল। সে ছিল হিমাদ্রির সহকারী এবং সাজ-সরঞ্জামের রক্ষক। সুতরাং কাজটি করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি এবং আমরা তাকে কখনই সন্দেহ করি নি।

নওয়াং *'শেরপা ক্লাইম্বার্স এসোসিয়েশন'*-এর মনোনীত *হ্যাপ্*। সুতরাং এই অসাধুতা অমার্জনীয় অপরাধ। তবু আমরা তাকে মার্জনা করেছি। কারণ স্লীপিং ব্যাগটি উদ্ধার করা গেছে তার অপর দুই সহকর্মী লাক্পা নরবু এবং সাঙ্গে শেরপার সততায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই আমাদের দেড় হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে শেরপা ক্লাইম্বার্স এসোসিয়েশনের সম্মান রক্ষা করেছে।

গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন সুশান্তবাবু আর পেছনের গাড়িতে আমি। সামনের গাড়ির পেছনে দু-জন হ্যাপ্ ও ছ'জন সদস্য—হিমাদ্রি, বিনীত, অরুণ, শরদিন্দু, কেশব ও ডাক্তার। আর আমার গাড়ির পেছনে—দু-জন হ্যাপ্ এবং পাঁচজন সদস্য—অমূল্য, বীরেন, অসিত, রমেনবাবু ও অসিতবাবু।

পঁচিশদিন পরে ফিরে চলেছি গ্যাংটক থেকে। সেদিন যখন গ্যাংটক এসেছিলাম, তখন কত আশা আর আকাঙ্ক্ষা! আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে নি। আমি সিকিমকে দেখেছি, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছি, সিনিয়লচুকে দেখেছি—দু-চোখ ভরে দেখেছি। কিন্তু আশা বিফল হয়েছে—আমরা সিনিয়লচু শিখরে আরোহণ করতে পারি নি।

গাড়ি থেমে গেল। শুধু আমাদের নয়, সুশান্তবাবুদের গাড়িও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার!

ড্রাইভার বলে, "বাঁদিকে আমাদের ক্যান্টিন। এখন লাঞ্চ টাইম। আমি খেয়ে আসি। দশ মিনিট দেরি হবে।"

"তা হোক্ গে, তুমি খেয়ে এসো।"

ড্রাইভার চলে যায়। পেছন থেকে রমেনবাবু আমাকে বলেন, "মহারাজ! ড্রাইভার যখন খেতে গেল, তখন দেখুন না রাস্তার ধারে কোনো হোটেল আছে কি না? আমরাও খেয়ে নিতাম।"

গাড়ি থেকে নেমে আসি। না, এটা মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট, এখানে হোটেল থাকবে কেন?

রমেনবাবুকে বলি, "ড্রাইভার বলেছে রংপোতে বাঙালী খানা খাওয়াবে।"

"অগত্যা বাঙালী খানার জন্য আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করা যাক।"

দুই ড্রাইভার ফিরে এলো। তাদের সঙ্গে দশ-বারোজন জওয়ান এবং একজন হাবিলদার। সবার কাঁধে বাক্স বিছানা কিংবা অন্যান্য মালপত্র।

হাবিলদার এসে সেলাম করেন। বলেন, "আমি একটু লীডারসাবের সঙ্গে কথা বলব।"

ভদ্রলোককে নিয়ে আসি গাড়ির পেছনে। হাবিলদার বলেন, "স্যার, বৃষ্টির জন্য আজ গ্যাংটক থেকে বাস আসে নি। আমরা ছুটিতে ঘরে ফিরছি। কালকের ট্রেন ধরতে হবে। আপনাদের গাড়িতে যদি শিলিগুড়ি নিয়ে যেতেন!"

অমূল্য বলে, "আপনারা গাড়ি দিয়েছেন বলে আমরা অভিযানে আসতে পেরেছি, আর সেই গাড়িতে আপনাদের জায়গা হবে না? তবে দুটো গাড়িতে ভাগাভাগি করে চলুন।"

হাবিলদার হিসেব করে দুই গাড়িতে মানুষ এবং মালপত্র ওঠালেন। নিজে এলেন আমাদের গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

রমেনবাবু একা খাবার কথা বললেও সবারই খিদে পেয়েছে। শুকনো খাবার প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে। কিছু ভাঙা বিস্কুট, চিঁড়ে আর খানিকটা চানাচুর আছে। আর রয়েছে চা চিনি দুধ ইত্যাদি। কিন্তু সবই সামনের গাড়িতে। ওরা হয়তো খেয়ে নেবে। নিক্ গে। ওদের কিন্তু রংপোতে আমাদের জন্য দেরি করতে হবে। টাকা-পয়সা যা আছে সবই অসিতবাবু ও আমার কাছে। আমরা না পৌঁছলে ওরা রংপোতে হোটেল-বিল মেটাতে পারবে না।

বড় গাড়ি হলেও উৎরাই পথ। বেশ জোরে চলেছে। রানীপুল এসে গেল—গ্যাংটক

থেকে .১২ কিলোমিটার। সবে সাড়ে বারোটা। এরকম চললে আর ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই রংপো পৌঁছে যাবো আশা করছি, বড্ড খিদে পেয়েছে।

আরও ১১ কিলোমিটার এসে গেছি। তার মানে গ্যাংটক থেকে ২৩ কিলোমিটার এলাম। সামনে সিংটাম—৬ কিলোমিটার। আমরা থামব না। এগিয়ে যাব। সিংটাম থেকে রংপো মাত্র ১০ কিলোমিটার। এখন বেলা সোয়া একটা।

একি! আমি পড়ে যাচ্ছি কেন? মাথাটা গাড়ির দরজার সঙ্গে ঠুকে গেল। তাড়াতাড়ি সামনের রডটাকে আঁকড়ে ধরি। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি.....।

কয়েকটা মুহূর্ত কিভাবে কেটে গেছে বুঝতে পারছি না। অমূল্যদের কথাবার্তা কানে এলো। যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখি গাড়িটা বাঁদিকে কাত হয়ে থেমে আছে। সামনের চাকা পথের ধারে নর্দমায় পড়ে গেছে। গাড়িটা পাহাড়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। আমি এ দিকেই বসেছি কিন্তু কোনো চোট লাগে নি।

কেবল আমার নয় কারও কিছুই হয় নি। হতে পারত, কিন্তু হয় নি। তবে এটা পাহাড়ের দিক না হয়ে খাদের দিক হলে এ যাত্রায় হয়তো আর ঘরে ফেরা হত না।

মনে পড়ে সব। সবে গ্যাংটক থেকে ২৩ কিলোমিটারের পোস্টটা ছাড়িয়ে এসেছি। তারপরেই ঢালেব মুখে একটা বাঁক, ইংরেজীতে যাকে বলে 'Hair-pin bend', ড্রাইভার যথারীতি হর্ন দেয় নি। বাঁকের মুখে পৌঁছে হঠাৎ দেখতে পায়, উল্টোদিক থেকে আরেকটা মিলিটারী ট্রাক একেবারে সামনে এসে গিয়েছে, সে গাড়ি বাঁদিকে গভীর খাদ। বাধ্য হয়ে আমাদের ড্রাইভার খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি বাঁয়ে নিয়ে এসেছে। আর তারই ফলে বাঁদিকের সামনের চাকাটা পাহাড়ের পাশে পথের নর্দমায় পড়ে গিয়েছে। নর্দমা বাঁধানো এবং গভীর নয়, বড়জোর ফুট দুয়েক। কিন্তু ভারী গাড়ি, চাকাটা তোলা মোটেই সহজ কাজ হবে না।

যাকে বাঁচাবার জন্য আমাদের এই পাতাল-প্রবেশ সে গাড়িটার কিন্তু কিছুই হয় নি। এবং সে আমাদের দুর্দশায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আপনপথে চলে গেল। অথচ ওটাও একটা মিলিটারী ট্রাক।

গাড়ি থেকে নেমে আসি সবাই। আমাকে ড্রাইভারের দিক থেকে নামতে হল। বাঁদিকের দরজাটা পাহাড়ের গায়ে ঠেকে আছে।

অমূল্যদের সঙ্গে হাবিলদারও নেমে এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। তাঁরা ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়িটাকে পরীক্ষা করেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে হাবিলদার আমাদের ভরসা দেন, "আপনারা ভাববেন না স্যার! গাড়ি উঠে যাবে, আমরা ব্যবস্থা করছি।"

ওরা মিলিটারী মানুষ। এসব ওদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ভারী গাড়ি, দু-ফুটের মতো গভীর নর্দমা। গাড়ির 'এ্যাক্সল্'টা (axle) প্রায় পথের সঙ্গে লেগে গেছে।

আরও নিরাশ হলাম যখন ড্রাইভার জানালো তার গাড়িতে 'জ্যাক্' (Jack) নেই। জ্যাক্ ছাড়া এই ভারী গাড়ি তুলবে কেমন করে?

হাবিলদার কিন্তু নির্বিকার। তিনি সঙ্গীদের ধমক লাগান, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও পাথর নিয়ে এসো, গাড়ি তুলতে হবে।"

আমরাও এগিয়ে আসি। হাবিলদার বলেন, "আপনারা আমাদের মেহমান, আপনারা তক্‌লীফ করবেন না। ঐ গাছের ছায়ায় গিয়ে বসুন, যা করবার আমরাই করছি।"

ওরা চেষ্টা শুরু করে। পাথরের পর পাথর এনে চাকাটার পাশে সাজায়। তারপরে শাবল দিয়ে পড়ে যাওয়া চাকাটা উঁচু করার চেষ্টা করতে থাকে।

পারে না। কিন্তু হাবিলদার হাল ছাড়েন না। গাড়ি এলেই থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন—ভাই, তোমার কাছে জ্যাক্ আছে?

সময় বয়ে চলে। দুটো বেজে গেছে, আড়াইটে বাজে। সুশান্তবাবুরা এতক্ষণে রংপো পৌঁছে গেছেন। তাঁরা আমাদের দুর্ঘটনার কথা কিছুই জানেন না। হয়তো খাওয়া শেষ করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁদের কাছে টাকা নেই। ওঁরা খেয়ে টাকা দিতে পারছেন না আর আমরা পকেটে টাকা নিয়ে উপোস করছি!

অবশেষ পাওয়া গেল, খাবার নয়, জ্যাক্। সরকারী গাড়ি, গ্যাংটক যাচ্ছে। ড্রাইভার জ্যাক্‌টা আমাদের দিলেন। আবার গাড়ি তোলার চেষ্টা শুরু হয়।

সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। একে ভারী গাড়ি, তার ওপরে জায়গাটা খুবই অসুবিধের।

এবারে হাবিলদার হার মানেন। জ্যাক্‌টা ফিরিয়ে দিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে বলেন, "আপনি গ্যাংটক পৌঁছে আমাদের দপ্তরে একটু খবরটা দিয়ে যাবেন। বলবেন, তাড়াতাড়ি যেন একটা ব্রেকডাউন ভ্যান পাঠিয়ে দেন।"

শুধু তাই নয়, নিচের দিকের একটা গাড়িতে তিনি দুজন জওয়ানকে সিংটাম পাঠিয়ে দিলেন। তারাও ব্রেকডাউন ভ্যান যোগাড়ের চেষ্টায় চলল।

সবই তো বুঝলাম। ব্রেকডাউন ভ্যান আসবে, নর্দমার চাকা রাস্তায় উঠবে, গাড়ি চলবে। কিন্তু কখন? তিনটে বাজে। পেট যে আর মানতে চাইছে না। সঙ্গে কোনো খাবার নেই, কাছাকাছি কোনো দোকান আছে কী?

কথাটা জিজ্ঞেস কবি হাবিলদারকে। তিনি বলেন, "না স্যার! সিংটামের আগে কোনো দোকান পাবেন না। আপনাদের খুবই খিদে পেয়েছে, পাবারই কথা।"

"তা পাক গে।" আমি লজ্জা পাই, "আপনি গাড়ি তোলার ব্যবস্থা করুন।"

"ব্যবস্থা যা করার সবই করেছি কিন্তু দেরি হবে। আপনারা ততক্ষণ না খেয়ে থাকবেন কি কবে? তার চেয়ে এক কাজ করুন।"

"কী?"

"রাতে খাবার জন্য আমরা ক্যান্টিন থেকে আলুর পরোটা নিয়ে এসেছি। রাতের কথা পরে ভাবা যাবে, আপনারা পরোটা ক'খানা খেয়ে নিন। আমাদের সঙ্গে চা চিনি দুধ কেটলি মগ সবই আছে, এখুনি চা বানিয়ে দিচ্ছি।"

হাবিলদারের নির্দেশে একজন জওয়ান আমাদের পরোটা দেয় আর দুজন শুকনো পাতা জড়ো করে চা বানাতে বসে যায়।

ওদের রাতের খাবার ও চা খেয়ে আমরা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলাম। ভাগ্যিস এই মানুষগুলো সঙ্গী হয়েছিল! ওরা না থাকলে আজ আমাদের যে কি হাল হত, ভাবতেই পারছি না।

চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে অসিত যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। ফিরে এলো তিনজন স্থানীয় যুবককে সঙ্গে করে। তারা শাবল ও কোদাল নিয়ে এসেছে।

অসিত বলে, "এরা নাকি গাড়ি তুলে দিতে পারবে। পারলে পঁচিশ টাকা দিতে হবে।"

"বেশ, দেব।" অমূল্য বলে।

ওরা কাজ শুরু করে। ছেলেগুলো কাজ জানে মনে হচ্ছে। কারণ ওরা পড়ে যাওয়া চাকাটা উঁচু করার চেষ্টা না করে, রাস্তা কাটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চাকাটা সোজাসুজি নর্দমা থেকে ধাপে ধাপে উঁচু করে একটা সিঁড়ির মতো ঢাল বানিয়ে ফেলল। উদ্দেশ্য গাড়ি চালিয়ে সেই ঢালের ওপর দিয়ে চাকাটাকে পথের ওপরে নিয়ে আসা।

কিন্তু এলো না। কারণ চালাতে গিয়ে দেখা গেল গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। বহু চেষ্টা করেও শক্তিমানের অভিমান ভাঙানো গেল না। তাহলে কি গাড়ি বিগড়ে গিয়েছে?

কে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? যে দিতে পারে, সে যেন কেমন নীরব হয়ে গিয়েছে। গাড়ি পড়ে যাবার পরেই ড্রাইভার ঘাবড়ে গিয়েছিল, এখন সে একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, খুবই 'নার্ভাস'। কেবলই বলছে—আমার 'কোর্ট-মার্শাল' হয়ে যাবে।

এতক্ষণ হাবিলদার তাকে কোনমতে চাঙ্গা রেখেছিলেন কিন্তু এবারে সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

সুতরাং অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সমর্পণ করা ছাড়া আমাদের এখন অন্য কিছু করার নেই। গ্যাংটকগামী একটা মিলিটারী ট্রাক ধরে জওয়ান দুজন নিচের থেকে ফিরে এলো। তারা জানালো—নিচে কোন ব্রেকডাউন ভ্যান নেই, ওপরে গিয়েছে। ওঁরা খবর দিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে।

তাই এলো, তবে অনেক দেরিতে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ব্রেকডাউন ভ্যান এসে পৌঁছল। আমরা স্বর্গ হাতে পেলাম।

সত্যি স্বর্গ হাতে পাবার মতো। আমরা এতগুলো মানুষ গত সোয়া চার ঘণ্টা ধরে এত বুদ্ধি ও পরিশ্রমের বিনিময়ে যা করতে পারি নি, তা করতে যন্ত্রদানবের মাত্র মিনিট পনের সময় লাগল। পনের মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িকে নর্দমা থেকে রাজপথে তুলে দিয়ে বেক্‌ডাউন ভ্যান চলে গেল।

কিন্তু এবারেও গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অবশেষে ড্রাইভার জানালো, "তেল নেই।"

"কেন? তুমি গ্যাংটক থেকে তেল নিয়ে আসো নি?"

"না সাব্! ভুলে গেছি।"

এর কোর্ট-মার্শাল হওয়াই উচিত। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি? আমাদের যে আজই শিলিগুড়ি পৌঁছতে হবে। হিমাদ্রিরা হোটেল বিল কিভাবে মিটিয়েছে জানি না কিন্তু ওদের গাড়ি এতক্ষণে অন্তত তিস্তাবাজার ছাড়িয়ে চলে গেছে। তারা আমাদের জন্য খুবই চিন্তা করছে। তাছাড়া হাবিলদারজীর পরোটা হজম হয়ে গিয়েছে। খিদে নামে সেই দৈত্যটা আবার জেগে উঠেছে।

হাবিলদারজী আরেকবার তেলের ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করেন। তারপরে বলেন, "এত বড় ট্যাঙ্ক, তলায় যা তেল আছে, তাতেও তোমার গাড়ি সিংটাম পর্যন্ত চলে যাবে।"

"কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছে না যে?" ড্রাইভার কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে।

হাবিলদার উত্তর দেন, "এক কাজ করো। সামনে উৎরাই, আমরা ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে গড়িয়ে দিচ্ছি, স্টার্ট হয়ে যাবে। যেটুকু তেল আছে তাতে সিংটাম চলে যাবো, মাত্র ছ' কিলোমিটার। সেখানে তেল নিয়ে নেবে।"

"কেমন করে? পয়সা কোথায় পাবো?" ড্রাইভার প্রশ্ন করে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "আমি কিনে দেব। আর কেউ জানতে পারবে না সেকথা।"

ড্রাইভার আশ্বস্ত হয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে এবং আমাদের ধাক্কায় শক্তিমানের মানভঞ্জন হয়। প্রায় ছ'টার সময় গাড়ি আবার সচল হল, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সিংটামের পথে।

সিংটামে পৌঁছনো গেল কিন্তু তেল পাওয়া গেল না। এখানে ডিজেল নেই, পেট্রোল আছে। আমাদের ডিজেল দরকার।

তবে সিংটামে জঠরাগ্নির জ্বালা কিঞ্চিৎ নির্বাপিত করা গেল। অবশ্য দোকান-পাট প্রচুর থাকলেও ঠাণ্ডা নিমকি লাড্ডু ও গরম চা ছাড়া আর কিছুই জোটানো গেল না। আর অমূল্য অনেক চেষ্টা করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে কালিঝোরা চেক্‌পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল। তাঁরা বললেন—সুশান্তবাবুদের গাড়ি এখনও সেখানে পৌঁছয় নি। পৌঁছলেই তাঁদের সব খবর দিয়ে দেবেন। যাক্ গে, একটা দিকে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সিংটামে তেলের দোকানে তেল পাওয়া গেল না, কিন্তু মদের দোকানে মদের অভাব নেই। সুতরাং আমাদের সেবাপরায়ণ জওয়ানগণ কিঞ্চিৎ শ্রান্তি বিনোদনের জন্য তারই একটা দোকানে ঢুকেছে। এবং তারা ফিরে আসছে না। অবশেষে হাবিলদারজী অনেক কষ্টে ধরে আনলেন তাদের। ঠেলে-ঠুলে গাড়িতে তুললেন। তারপরে ড্রাইভারকে বললেন, "গাড়ি ছোড়!"

"তেল!" আমি বলে উঠি।

হাবিলদারজী ভরসা দেন, "এখনও ট্যাঙ্কের তলায় যা তেল আছে, তা দিয়ে আমরা রংপো পৌঁছে যাবো। মাত্র তো দশ কিলোমিটার পথ। সেখানে ডিজেল পাওয়া যাবেই।"

হাসি পায় আমার। ড্রাইভার বলেছিল—রংপোতে বাঙালী খানা খাওয়াবে, এখন হাবিলদারজী বলছেন রংপোতে ডিজেল পাওয়া যাবে। আশায় থাকা যাক। কিন্তু বেলা দুটোয় রংপো পৌঁছবার কথা, আর এখন রাত আটটা। এখনও দশ কিলোমিটার। আমরা কি যেতে পারব সেখানে?

তাহলেও আপত্তি করি না। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। এবং এবারে বিনা ধাক্কাতেই স্টার্ট নেয়। স্বভাবতই পুলকিত হয়ে উঠি। ভাগ্যদেবী বোধকরি এতক্ষণে সুপ্রসন্না হলেন।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে। মন্থরতার কারণ বুঝতে পারছি না। তেলের অভাব, না ড্রাইভারের মানসিক অস্থিরতা! তবে সে আগের চেয়ে আরও বেশি নার্ভাস। মনে হচ্ছে সিংটামে তেল না পেয়ে মনে মনে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

তাছাড়া দুর্ঘটনাস্থল থেকে সিংটাম পর্যন্ত রাস্তা ছিল একটানা উৎরাই। এখন মাঝে মাঝে চড়াই আর তীক্ষ্ণ বাঁক। একাধিকবার কসরৎ করে 'গীয়ার' বদলের পর গাড়ি আস্তে আস্তে চড়াইতে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝিবা থেমে গেল, পেছন দিকে গড়িয়ে পড়ল।

অমূল্যরা পেছনে বসেছে। ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমাকে কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকতে হচ্ছে।

হঠাৎ ড্রাইভার বলে ওঠে, "স্টিয়ারিংটা কেবলই ডানদিকে ঘুরে যেতে চাইছে।"

সর্বনাশ! ডানদিকে খাদ, অন্ধকার পথ।

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "বাঁয়ে রাখো, পাহাড়ের গা ঘেঁষে চালাও।"

সে সাধ্যমত চেষ্টা করছে। আর আমি বেগতিক দেখলেই বলে উঠছি—বাঁয়ে রাখো। সাবধানে চালাও।

শক্তিহীন শক্তিমান অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে। জানি না আজ আমাদের অদৃষ্টে কি আছে? আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই অন্ধকার পথ, গাড়িতে তেল নেই, ড্রাইভার 'নার্ভাস'—একটু এদিক ওদিক হলেই....ভাবতে পারছি না।

বেশিক্ষণ অবশ্য দুর্ভাবনা করতে হল না। গাড়ি থেমে গেল।

অসিতবাবু জিজ্ঞেস করে, "কি হল?"

উত্তর দিই, "বুঝতে পারছি না।"

বুঝতে পারলাম একটু বাদেই।

আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গেল। আমিও পথে নামি।

ড্রাইভার ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে। তারপরে ক্ষীণকণ্ঠে জানায়, "ডিজেল খতম হোগিয়া।"

তার মানে আমরাও খতম হলাম।

হাবিলদারজী নেমে এলেন। অমূল্যরাও নিচে নামে। টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে হাবিলদারজী বলেন, "আমরা সিংটাম থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মতো এসেছি। রংপো আরও পাঁচ কিলোমিটার হবে।"

ঘড়ি দেখি, ন'টা বেজেছে। তার মানে পাঁচ কিলোমিটার আসতে এক ঘন্টা লেগেছে।

তবু এতক্ষণ এগিয়েছি। এবারে? আঁধার রাত, অচেন-অজানা পথ, অভুক্ত দেহ।

কোথাও কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে না কাছাকাছি কোনো বসতি আছে। ডাকাত কিংবা ভূতের ভয় করছি না। কিন্তু বীরেন বলে, "বাঘ-ভালুক আছে কিনা বলতে পারছি না, তবে সাপ থাকাই স্বাভাবিক।"

বাঘ-ভালুকের বদলে সাপ থাকা নিরাপদ কিনা জানা নেই আমার। তবে 'ব্যাটারী ডাউন' হয়ে যাবে বলে ড্রাইভার গাড়ির 'হেড লাইট' নিবিয়ে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে মাত্র দুটি টর্চ, তার একটির ব্যাটারী কমে এসেছে। গাড়িতে গরম লাগছে, পথে পায়চারি করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অন্ধকার পথ নিরাপদ নয়। বীরেন বলেছে—সাপ থাকাই স্বাভাবিক।

একটু বাদে আরও একটা সমস্যা দেখা দিল। একে ন্যাশনাল হাইওয়ে, তার ওপরে সামনে চড়াই এবং বাঁক। ওদিক থেকে গাড়িগুলো বড্ড জোরে নেমে আসছে। অন্ধকারে পথের মাঝে এত বড় গাড়ি ফেলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। সুতরাং শক্তিমানকে বাঁদিকে পথের পাশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কে নেবে? যারা ভরসা, সেই জওয়ানরা যে নেশায় বুম্ হয়ে গাড়িতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তবে হাবিলদারজীও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। টেনেটুনে সবগুলোকে নিচে নামালেন। তারা টলতে টলতে গাড়ি ঠেলে পথের পাশে নিয়ে এলো। তারপরে নিজেরাও পথের ওপর শুয়ে পড়ল। ওরা ১৪,৩০০ ফুট উঁচু নাথুলা থেকে আসছে,

রংপোর উচ্চতা মাত্র ১৪০০ ফুট। গাড়িতে ওদের গরম লাগছিল। এবারে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় আর কেউ গাড়িতে উঠতে চাইছে না।

অথচ এভাবে পথের ওপরে শুয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সাপের কামড়ে না মারা গেলেও গাড়ির তলায় পিষ্ট হবে। তাই ওদেরও ধরাধরি করে পথের পাশে টেনে এনে শুইয়ে দিই।

হাবিলদারজী বলেন, "এখান থেকে রংপো মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। একটুখানি তেল পেলেই আমরা রংপো চলো যেতে পারতাম। দেখি কোনো গাড়িকে ধরে একটু তেল যোগাড় করা যায় কিনা!"

শুরু হল তেলভিক্ষা। গাড়ি আসছে দেখলেই আমাদের গাড়ির ওপরে টর্চ মেরে রাখছি, কাছে এলে থামবার জন্য হাত দেখাচ্ছি। সব গাড়ি থামছে না, তবে অনেকেই থামছে। আমাদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে হাবিলদারজী তেলভিক্ষা করছেন। কেউ বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে, কেউ বলছে—চড়াই পথ, তেল দেব কেমন করে? আর কেউবা বলছে—আমারই তেল কম, রংপোতে নিতে হবে।

সাপের ভয় উপেক্ষা করে তবু এতক্ষণ পথে পায়চারি করে গায়ে একটু বাতাস লাগাচ্ছিলাম। এবারে তাও বন্ধ হল। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠি।

বীরেন আমার পাশে এসে বসে। বলে, "মদের গন্ধে গাড়ির ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে না।"

অসিতদের সেই গন্ধ সহ্য করেই পেছনে বসে থাকতে হচ্ছে। কি করবে, সামনে যে সবার জায়গা হবে না।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে বৃষ্টি থামল। আবার নেমে আসি পথে। রাত এগারোটা। গাড়ির সংখ্যা কমে এসেছে। যা যাচ্ছে, তার অধিকাংশই ছোট গাড়ি—পেট্রোল-চালিত। তাদের থামিয়ে কোনো লাভ নেই।

মনে হচ্ছে একটা ট্রাক আসছে। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালাই, হাত দেখাই। গাড়িটা থামে—একটা পাবলিক ক্যারিয়ার।

যথারীতি হাবিলদার তেলভিক্ষা করেন। সব শুনে ড্রাইভার বলেন, "ডিজেল আমিও দিতে পারব না। গ্যাংটক যাচ্ছি, পথে কোথাও ডিজেল পাবো না। কিন্তু আপনাদের তো মিলিটারী ট্রাক!"

আমরা মাথা নাড়ি। তিনি বলেন, "এখান থেকে মাত্র দু-তিন কিলোমিটার দূরে গ্যাংটকের দিকে মিলিটারী অয়েল-ডিপো রয়েছে। আপনারা তো সেখানে গেলেই তেল পেয়ে যাবেন।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "তেলের জায়গা নিয়ে আপনারা দু-জন আমার সঙ্গে চলুন, আমি ডিপোর সামনে নামিয়ে দিয়ে যাবো।"

আশ্চর্য! এই পথে গাড়ি চালায় আর আমাদের ড্রাইভার এই খবরটা জানে না। কিংবা হয়তো জানে, কেবল কোর্ট-মার্শালের ভয়ে সে সেখান থেকে তেল নেয়নি।

হাবিলদারজীও বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। তিনি ড্রাইভারকে আশ্বাস দেন, "তোমার ভয় নেই, কোর্ট-মার্শাল হবে না। আমার সঙ্গে চলো।"

ড্রাইভার কি যেন একটু ভাবে। তারপরে গাড়ি থেকে দুটো তেলের টিন আর একটা বোতল বের করে। হাবিলদারজীর সঙ্গে সেই পাবলিক ক্যারিয়ারে গিয়ে ওঠে।

আবার শুরু হল অন্ধকার পথে পায়চারি। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছি কাছাকাছি কোনো সাপ এসে গেল কিনা? বেশিক্ষণ জ্বালানো যাচ্ছে না। একটা টর্চ, তারও ব্যাটারী কমে এসেছে। ভাল টর্চটা হাবিলদারজী নিয়ে গিয়েছেন।

একটা কথা ভেবে কিন্তু বড়ই অবাক হচ্ছি—সকাল থেকে যেমন শারীরিক ধকল চলেছে, তেমনি মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। অথচ ঘুম পাচ্ছে না। সারাদিন বলতে গেলে খাওয়া হয়নি কিন্তু এখন একেবারেই খিদে নেই।

ভালই হয়েছে। এ অবস্থায় ঘুম কিংবা খিদে পেলে বিপদ আরও বাড়বে।

আচ্ছা, ওরা তেল পাবে কি? পেলেই বা তেল নিয়ে আসবে কেমন করে? ওদিক থেকে যে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। এত রাতে হেঁটে আসতে পারবে কি?

তবে সেসব ভাবনা ড্রাইভার ও হাবিলদারজীর। এখন শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

জানি না কখন এই প্রতীক্ষার শেষ হবে? জানি না সহযাত্রীরা এখন শিলিগুড়িতে কি করছে? জানি না আগামীকাল ট্রেন ছাড়ার আগে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছতে পারব কিনা?

রাত সাড়ে বারোটা। তার মানে তেরো ঘন্টায় ঊনচল্লিশ কিলোমিটার পথ পোরোতে পারলাম না। রংপো এখনও 'দূর অস্ত্'।

রংপোতে আমাদের লাঞ্চ করার কথা ছিল। ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ। আগামীকাল ব্রেক্‌ফাস্টের আগে পৌঁছানো যাবে কী?

গ্যাংটকের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। সচকিত হয়ে উঠি। ওদিক থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে বহুক্ষণ। রাত একটা বাজে।

গাড়িটা এসে আমাদের গাড়ির পেছনে থেমে গেল। তাহলে কি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন! তেল এসে গিয়েছে! ছুটে আসি গাড়িটার কাছে।

হ্যাঁ, মিলিটারী জীপ। হাবিলদারজী নেমে এলেন গাড়ি থেকে। তাঁর সঙ্গে মিলিটারী পোশাক পরা দুজন ভদ্রলোক।

আমাদের ড্রাইভারও ফিরে এসেছে। সে নেমে আসে গাড়ির পেছন থেকে। এবং সে একা নয়, তার হাতে মস্ত একটা জেরিক্যান।

তেল! তেল পাওয়া গেছে, তেল এসে গেছে...। আনন্দে আমার হৃদয় নেচে ওঠে। অনেক কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

আমাদের ড্রাইভার গাড়িতে তেল ভরে, মবিল ঢালে। তারপরে গিয়ে তার জায়গায় বসে। চাবি ঘুরিয়ে সেল্‌ফ-এ চাপ দিতেই গাড়ি গর্জে ওঠে। এ তো গাড়ির গর্জন নয়, প্রাণের স্পন্দন। গাড়ির ইঞ্জিনের মতো আমার হৃদয়যন্ত্রটাও যেন বহুক্ষণ বাদে আবার চলতে শুরু করল।

যিনি জীপ চালিয়ে তেল নিয়ে এসেছেন, তিনি একজন মিলিটারী মোটর-মেকানিক। ভদ্রলোক 'বনেট' খুলে আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনটাকে পরীক্ষা করলেন কয়েক মিনিট ধরে। তারপরে ড্রাইভারকে বললেন, "তোমার গাড়ি ঠিক আছে।"

ড্রাইভার বলে, "একটু স্টীয়ারিংটা দেখুন, কেবল ডানদিকে ঘুরে যেতে চাইছে।"

ভদ্রলোক গাড়িতে উঠলেন। সামনে-পেছনে গাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপরে বললেন, "আরে ভাই, এর নাম শক্তিমান। অতটুকু আছাড়ে এর কিছু হয় না। তেল ছিল না বলেই ওসব গোলমাল হয়েছে।"

মেকানিক নেমে আসেন গাড়ি থেকে। আবার ড্রাইভারকে বলেন, "তুমি গাড়ি ছাড়ো, আমি খানিকটা দূর অবধি তোমার পেছন পেছন যাচ্ছি। কোনো গোলমাল মনে হলে গাড়ি থামিয়ে দিও।"

তারপর তিনি করমর্দন করে বিদায় নেন আমাদের কাছ থেকে। অমূল্যকে বলেন, "স্যার, আপনাদের খুবই কষ্ট হল। আশা করি আর কোনো অসুবিধা হবে না। রংপোতে গিয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিন। কাল খুব ভোরে রওনা হলে দশটার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাবেন।"

এবারে মন বলছে তা যাওয়া যাবে।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। আর সেই মন্থর গতি নয়। শক্তিমান শক্তিমানের মতই চলছে। মেকানিক ঠিকই বলেছেন, তেল কম থাকার জন্যই তখন ওভাবে গাড়ি চলেছে। আর ড্রাইভার অমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। রথের সঙ্গে সারথিও এখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগে তেল বস্তুটি যে কতখানি অপরিহার্য, তা এর আগে আর কখনও এমন তিলে তিলে উপলব্ধি করি নি।

পথে একবার গাড়ি থামাতে হয়। না, গাড়ির গোলমালের জন্য নয়, মেকানিকের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে। তিনি বিদায় নিয়ে ডিপোতে ফিরে যান, আমরা এগিয়ে চলি রংপোর পথে। এবং এখন মনে হচ্ছে রংপো আর দূরে নয়।

রাত দুটোয় রংপো পৌঁছলাম। আর আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘুমিয়ে থাকা খিদেটা জেগে উঠল। শুধু আমার নয়, সবার। সবচেয়ে বেশি বোধকরি হাবিলদারজীর।

কিন্তু এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরে এত রাতে কে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকবে? সারা শহর গভীর নিদ্রায় অচেতন। অচেনা জায়গা, কোথায় খাবার পাওয়া যেতে পারে, তাও জানি না।

হাবিলদারজী মিলিটারী মানুষ। তিনি পরাজয়কে বরণ করে নিতে অভ্যস্ত নন। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে একজন পাহারারত বন্দুকধারী সেপাইকে পাওয়া গেল। সে ইশারা করে রাস্তা দেখিয়ে বলে, "সামনে দুটো হোটেল আছে। চেষ্টা করে দেখুন, কিছু পান কিনা।"

আমরা প্রথম হোটেলটির সামনে এসে ডাকাডাকি শুরু করি। কয়েক মিনিট বাদে দোতলার বারান্দা থেকে কেউ একজন সাড়া দেন।

সব শুনে তিনি বলেন, "আমার কাছে তো কোনো তৈরি খাবার নেই। এত রাতে রান্না করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে আপনারা ঐ অন্নপূর্ণা হোটেলে দেখুন। পাঁউরুটি দই রসগোল্লা সন্দেশ লাড্ডু এবং চা পেয়ে যাবেন।"

শব্দগুলো শুনে জিভে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটে চলি অন্নপূর্ণার দিকে। মা-অন্নপূর্ণা নিশ্চয়ই আমাদের অভুক্ত রাখবেন না।

কয়েক মিনিট ধাক্কাধাক্কি করার পরে ভেতরে আলো জ্বলে উঠল। জয় মা অন্নপূর্ণা! হাবিলদারজী সবিনয়ে খাবার ভিক্ষে করলেন। ভেতর থেকে কিশোরকণ্ঠ ভেসে

আসে, "খাবার আছে কিন্তু এত রাতে দরজা খুলতে পারব না, আমার মালিক নিষেধ করেছেন।"

"আপনার মালিক কোথায়?"

"ক্যালিম্পং গিয়েছেন।"

তার মানে ক্যালিম্পং গিয়ে মালিকের অনুমতি নিয়ে এলে কর্মচারী হোটেল খুলবে।

চুপ করে যাই। কিন্তু হাবিলদারজী মিলিটারী মানুষ। তিনি রসিকতাটা বরদাস্ত করতে পারলেন না। দেহাতী খিস্তি সহযোগে দরজায় লাথি মারতে আরম্ভ করলেন।

রংপো মদের জন্য সুপরিচিত। বিখ্যাত সিকিম ডিস্টিলারী এখানে অবস্থিত। তাই মাতালের ভয়ে এখানেও দোকান-পাট সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এবারে সবাই সত্যি সত্যি আমাদেরও মাতাল ভাববে।

কিন্তু হাবিলদারকে থামাবার মতো কোনো উপায় জানা নেই আমার। তাঁর অবস্থা এখন প্রায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো।

না থামিয়ে অবশ্য ভালই হল। তাঁর পদাঘাতের শব্দে পাশের দোকানে জনৈক যুবক জেগে উঠল। সে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে আসে বাইরে। সব শুনে বলে, "আপনারা দুজন আমার সঙ্গে আসুন।"

"কোথায়?"

"এই হোটেলের দোতলায়, মালিকের কাছে।"

"মালিক নাকি ক্যালিম্পং গেছেন!"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার ভাগনে আছে। সে-ই এখন সব দেখাশোনা করে। সে এসে বললেই ছেলেটা দরজা খুলে দেবে। এখানে মাতালের বড্ড অত্যাচার কিনা, ছেলেটা আপনাদের তা-ই ভেবেছে।"

ছেলেটা কিন্তু মানুষ মন্দ নয়। মালিকের ভাগনে এসে বলতেই সে দরজা খুলে দিল। যত্ন করে আমাদের খাবার দিল। তারপরে সবিনয়ে বলল, "দুধ ছাড়া চা খেলে বানিয়ে দিতে পারি।"

হাবিলদারজী চা খেয়ে তাকে বকশিশ দিলেন।

মিলিটারী ট্রাক। যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যাবে না। তাই খাবার পরে ভাগনে ও তার সহকারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চলল মিলিটারী চেক-পোস্টে, রংপো বাজার থেকে দু' কিলোমিটার। বাকি রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে ভোর হতেই রওনা হব শিলিগুড়ি।

চেক-পোস্টে আসা গেল। জওয়ানদের নিয়ে হাবিলদারজী চলে গেলেন ব্যারাকে। আর আমরা গাড়িতেই শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণই বা ঘুমোতে পারব? রাত তিনটে বাজে।

ঘুম ভেঙেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে। বোধহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছি। ঘুমবো কেমন করে? ওরা কাল কপর্দকহীন অবস্থায় শিলিগুড়ি পৌঁচেছে। আমাদের খবরও পেয়েছে কিনা কে জানে! অবশ্য হিমাদ্রি আছে। সে অমলের সুপরিচিত, তার বাড়ি চেনে। খুব একটা অসুবিধে হবে না। হ্যাপ্‌দের মজুরীর টাকাও অমল যোগাড় করে দিতে

পারবে। তা হলেও ঘন্টাখানেকের বেশি ঘুমোতে পারি নি। কেবলই ভয় হয়েছে, যদি ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়!

পাঁচটা বেজেছে, সুতরাং উঠে পড়া গেল। কম করেও ঘন্টাচারেক সময় লাগবে শিলিগুড়ি পৌঁছতে। রংপো থেকে শিলিগুড়ি ৭৫ কিলোমিটার। পথে কয়েকটি চেক্-পোস্টে থামতে হবে। তাছাড়া চা খেতে তিস্তাবাজারেও নামতে হবে একবার। অতএব আর দেরি নয়।

ড্রাইভারকে ডেকে তুলি। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নিই। হাবিলদারজীও সঙ্গীদের নিয়ে এসে যান। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে।

চেক্-পোস্ট একটু উঁচুতে। গাড়ি উৎরাই বেয়ে নেমে আসে বড় রাস্তায়। এগিয়ে চলে।

চারিদিক ফর্সা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রোদ ওঠে নি।

সে কি! আবার বৃষ্টি নামবে নাকি? সূর্যের অভাবে অভিযান বিফল হয়েছে। বৃষ্টির জন্য গতকাল সকালে রওনা হতে পারি নি। আর তাই সিকিমের শেষ রাতটিতে দুঃসহ দুঃখ সইতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি আকাশের দিকে তাকাই।

না, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। এখুনি সূর্য উঠবে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। তিস্তার তীরে তীরে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ—কখনো পাইন বনের বুক চিরে, কখনও খাড়া পাহাড়ের পায়ে-পায়ে, আবার কখনও বা বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে।

এই পথ ধরে আমি দেবতাত্মা হিমালয়ের আনন্দময় অন্তরলোকে গিয়েছি, গিয়েছি আমার শৈশবসাথী তিস্তার জন্মভূমি জেমু হিমবাহে, গিয়েছি বিশ্বের সুন্দরতম শৃঙ্গ সিনিয়লচুর পদপ্রান্তে। আমি তাকে দেখেছি, প্রাণভরে দর্শন করেছি। আমার আঠার বছরের স্বপ্ন সত্য হয়েছে। আজ এই পথ ধবে আমি ফিরে যাচ্ছি ঘরে।

সূর্য উঠছে। সিকিমের আকাশে সূর্য উঠছে। নূতন দিনের সূর্যকে সাক্ষী রেখে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি সুন্দরী সিকিমের কাছ থেকে।

বিদায়বেলায় বলে যাই—সিকিম, তুমি সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য দিয়ে মন-প্রাণ পূর্ণ করে নিয়ে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। তোমার করুণায় আমার সুন্দরের অভিসার পূর্ণ হল। তোমার কোলে বসে আমি অনন্ত-সুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করে গেলাম।

সিকিম! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো—তোমার সুন্দর স্মৃতি যেন আমার মনের মণিকোঠায় চিরসুন্দর হয়ে থাকে।

সিকিম-হিমালয় পর্বতারোহণপঞ্জী (২০,০০০′ শৃঙ্গ পর্যন্ত)

প্রথম আরোহণ এবং প্রথম ভারতীয় আরোহণ।

উচ্চতানুযায়ী শৃঙ্গের স্থান	শৃঙ্গের নাম	উচ্চতা (ফুট)	নেতা	সংগঠক	আরোহণের তারিখ/বছর	শিখরারোহণকারী
১	কাঞ্চনজঙ্ঘা	২৮,১৪৬	চার্লস ইভান্স	বৃটিশ-নিউজিল্যাণ্ড	২৫.৫.১৯৫৫	জর্জ ব্যাণ্ড, জো ব্রাউন, নর্মান হার্ডি এবং এইচ্ আর. এ. স্ট্রীথার
			এন. কুমার	ভারতীয়	৩১.৫.১৯৭৭	প্রেম চাঁদ ও এন. ডি. শেরপা
২	কাঞ্চনজঙ্ঘা-দক্ষিণ	২৭,৮০৩	চার্লস ইভান্স	বৃটিশ-নিউজিল্যাণ্ড	১৬.৫.১৯৫৫	নেতা
৩	জং সং	২৪,৩৪৪	জি. ও. ডাইরেনফুর্ত	আন্তর্জাতিক	৩রা জুন ১৯৩০, প্রথম আরোহণ	ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, জনসন, হোয়েলিনন, শেচইণ্ডার, কুর্জ, লেওয়া, শেরিং নরবু ও নেতা (ভিন্ন ভিন্ন দলে ছয় দিনে ছ'বার আরোহণ করেন)
৪	কাব্রু	২৪,১২৪				
৫	টেণ্ট্	২৪,০৮৯	এল. শেচমাডেরার	সুইস-জার্মান	১৯৩৯	ই. গ্রোব, এইচ. পাইদার ও নেতা
৬	কাব্রু—৩	২৪,০৮৪				
৭	কাব্রু—উত্তর	২৪,০৭৫				
৮	কাব্রু—দক্ষিণ	২৪,০০২	সি. আর. কুক	বৃটিশ	১৮.১১.১৯৩৫	নেতা (শীতকালীন আরোহণ)

উচ্চতানুযায়ী শৃঙ্গের স্থান	শৃঙ্গের নাম	উচ্চতা (ফুট)	নেতা	সংগঠক	আরোহণের তারিখ/বছর	শিখরারোহণকারী
৯	ডোমখাণ্ড	২৩,৮২০				
১০	দোদাঙ নিয়ামা	২৩,৬২৩	জি. ও. ডাইবেনফুর্ত	আন্তর্জাতিক	জুন, ১৯৩০	হোয়েলিন ও শেচইণ্ডার
১১	নেপাল-দঃ পশ্চিম	২৩,৫৬০	জি. ও. ডাইবেনফুর্ত	আন্তর্জাতিক	২৩.৫.১৯৩০	ই. শেচইণ্ডার,
১২	নেপাল—উঃ পূর্ব	২৩,৫৫৭	এল. শেচমাডেবাব	সুইস-জার্মান	১৯৩৯	ই. গ্রোব, এইচ. পাইদার এবং নেতা
১৩	পিবামিড	২৩,৪০০	বেণে ডিটার্ট	সুইস	৬.৬.১৯৪৯	আলফ্রেড সাটাব, জে. পারগাটজি, গিয়ালজেন, আজীবা, দাওয়া থাণ্ডুপ এবং নেতা।
১৪	টুইন্স	২৩,৩৬০				
১৫	পওহুন্বী	২৩,১৮০	এ. এম. কেল্লাস	বৃটিশ	১৭.৬.১৯১০	একজন মালবাহক, সোনাম এবং নেতা
১৬	তালুঙ	২৩,০৮২				
১৭	ল্যাংপো	২২,৮০০	এ. এম. কেল্লাস	বৃটিশ	১৪.৯.১৯০১	নেতা
১৮	কাঞ্চনঝাউ	২২,৭০০	সোনাম গিযাৎসো	ভাবতীয়	২১.১০.১৯৬১	জসবন্ত সিং, লাকপা তেনজিং ও নেতা

উচ্চতানুযায়ী শৃঙ্গের স্থান	শৃঙ্গের নাম	উচ্চতা (ফুট)	নেতা	সংগঠক	আরোহণের তারিখ/বছর	শিখরারোহণকারী
১৯	সিনিযলচু	২২,৬২০	পল বএব	জার্মান	২৩.৯.১৯৩৬	কাল উইয়েন, এ. গুটনার
			সোনাম ওয়াঙ্গিল	ভাবতীয	১৫.৫.১৯৭৯	গুবমে থিননন্‌লে, নিমা ওয়াঙচু, জি. টি. ভোটিয়া, ফু দোরজি, সেওয়াং থাণ্ডুপ এবং ফেণ্ডো ভোটিয়া।
২০	চোর্তেন নিযমা-পশ্চিম	২২,৪৮৬		বৃটিশ	১৯৩৫	
২১	ল্যাংপো—দক্ষিণ	২২,৪৮০	এল. শেচমাডেবায়	সুইস-জার্মান	১৯৩৯	নেতা
২২	চোমিওমা	২২,৪৩০	এ. ওম. কেল্লাস	বৃটিশ	জুন, ১৯১০	নেতা
২৩	চোমো ইয়ামো	২২,৪০৩				
২৪	বিম্‌বো	২২,৩৬০				
২৫	সিম্‌বু-দঃ পূর্ব	২২,২৮৯				
২৬	গোবদামা	২২,২০০	এবিক শিপ্‌টন	বৃটিশ	১৯৩৬	কেম্‌পসন এবং নেতা
২৭	ল্যাংচুং খাঙ	২২,১১০				
২৮	লাংতাচেন	২২,০৩২				
২৯	পাণ্ডিম	২২,০১০				
৩০	ছুসকু—২	২১,৯২০				

উচ্চতানুযায়ী শৃঙ্গের স্থান	শৃঙ্গের নাম	উচ্চতা (ফুট)	নেতা	সংগঠক	আরোহণের তারিখ/বছর	শিখরারোহণকারী
৩১	র‍্যাথং	২১,৯১১	বি. এস. জসওয়াল	ভারতীয়	২৯/৩০.১০.৬৪	সোনাম গিয়াৎসো এবং এগারোজন সদস্য দু' দলে দুদিনে দু'বার শিখরে আরোহণ করেন
৩২	কবিইয়াদা	২১,৭০০				
৩৩	খোবা কাঙ	২১,৬৫৮				
৩৪	ডোম (কাব্রু)	২১,৬৫০	বিশ্বদেব বিশ্বাস	ভারতীয়	১৯৬৪	
৩৫	লাচেন কাঙ	২১,৬০০				
৩৬	খোনপুক	২১,৬০০				
৩৭	সিমবু—উত্তর	২১,৪৭৩	পল বওর	জার্মান	২.১০.৩৬	এ গুট্নার, জি. হেপ্ এবং নেতা
৩৮	লোনাক—১	২১,২৬০	জি. বি. গুলে	বৃটিশ	১৩.১০.৩০	ডাব্লু. এভার্সডেন এবং নেতা
৩৯	সেন্টিনাল	২১,২৪০	এ. এম. কেল্লাস	বৃটিশ	মে, ১৯৩০	নেতা
৪০	সুগাবলোফ্	২১,১২৮	পল বওর	জার্মান	১৯৩১	এ. অলওয়েইন এবং ব্রেনার
৪১	লাচসি (চোমাংকঙ)	২১,১০০	এইচ. ডাব্লু. টিল্ম্যান	বৃটিশ	জুলাই, ১৯৩৮	নেতা ও দুজন শেরপা
৪২	ইউলহেথিং	২১,০৯০				
৪৩	তাসি লাপ্চা	২১,০০০		নেপালী	১৯৬২	
৪৪	কোকতাঙ—১	২০,৯৯০				

উচ্চতানুযায়ী শৃঙ্গের স্থান	শৃঙ্গের নাম	উচ্চতা (ফুট)	নেতা	সংগঠক	আরোহণের তারিখ/বছর	শিখরারোহণকারী
৪৫	চোম্বু	২০,৮৭২		ভাবতীয়	১৯৬১	
৪৬	কাঙলাচা	২০,৫২০		ভাবতীয়	১৯৬২	জসওয়ান্ত সিং, ডি. এস. সিসোদিয়া, লাক্‌পা তেনজিং, পি. ওয়াঙদান এবং নিমা দোরজি
৪৭	সাংলাফু	২০,৪২০				
৪৮	চুমাখাঙ	২০,৩৮২				
৪৯	ফর্কড	২০,৩৪০		ভাবতীয়	১৯৬৪	তাসি এবং আঙ কামি
৫০	নেভে	২০,৩৩০		বৃটিশ	১৯৪৫	
৫১	খোবা ছোনেকাঙ	২০,২৯৯				
৫২	কোকতাঙ—২	২০,১৬৬	কে. এস. বাণা	ভাবতীয়	২৬.৪.৬২	এইচ. পি. এস. আলুওয়ালিয়া, নওয়াং গম্বু, কালদেন, দোরজি এবং নেতা
৫৩	গোচা	২০,১০০				
৫৪	ইউলহেখাঙ	২০,০৯০				
৫৫	লোনাক—২	২০,০১৫				

লাদাখের পথে

অকালে স্বর্গাগতা আমার ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী গৌরী ঘোষ দস্তিদারের অমর আত্মার উদ্দেশে—

—বড়দা

সংসারে সব কাজের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। কার নির্দেশে এমনটি ঘটে, জানি না। কিন্তু তিনি আর যেই হোন, মানুষ নন। মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের অলক্ষ্যে বসে আর কেউ মানুষের জন্য তার কাজের সময়টা ঠিক করে রাখেন। সময় না হলে কাজটা কিছুতেই হয়ে ওঠে না।

ভ্রমণ কাজ কিম্বা অকাজ তা নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু ভ্রমণেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আমার এই ক্ষুদ্রজীবনে বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি। এবারে এই লাদাখ ভ্রমণে এসে আরেকবার সে প্রমাণ পেলাম।

১৯৬২ সালে প্রথম কাশ্মীরে এসেছি। মাসখানেক শ্রীনগরে থেকে কাশ্মীর উপত্যকার যাবতীয় দ্রষ্টব্যস্থল দর্শন করেছি। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস বলে বহু চেষ্টা করেও অমরনাথ যাবার মালবাহক কিম্বা সঙ্গী যোগাড় করতে পারি নি। অমরনাথ অদর্শনের জ্বালা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছি ঘরে।

তারপরে প্রায় প্রতি বছর পরিকল্পনা করেছি, অমরনাথ আসব। কিন্তু আসা হয় নি। হবে কেমন করে? তখনও যে অমরতীর্থ-অমরনাথ দর্শনের সময় হয় নি আমার, তীর্থের দেবতা ডাক দেন নি আমাকে!

সেই সময় হয়েছে ষোল বছর বাদে—১৯৭৮ সালে। সেবারে ঠিক করেছিলাম—অমরনাথ থেকে ফেরার পথে শ্রীনগর এসে লাদাখে চলে যাবো। কিন্তু আমি ঠিক করার কে? যিনি সবার অলক্ষ্যে বসে সবকিছু ঠিক করে দেন, তিনি আমার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নি। সুতরাং তখনও লাদাখ যাবার সময় হয় নি আমার। আমি আবার ঘরে ফিবে গিয়েছি।

এবারে বোধ করি সেই সময় হয়েছে। তাই আমাকে আবার আসতে হয়েছে কাশ্মীরে—শ্রীনগরে। আগামীকাল সকালে সত্যই আমি চলেছি লাদাখে—সিন্ধুতীরে, সেই বিচিত্র-সুন্দর চাঁদের দেশে।

।। এক ।।

পর্যটন প্রতিষ্ঠান 'ইনটুার' এই যাত্রার আয়োজন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রীমতী নন্দা দাস ও তার স্বামী পর্বতারোহী বিভাস আমাদের সঙ্গে চলেছে। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা হল বিভাসের চার ও সাত বছরের ছেলে-মেয়ে তোতা ও মহুয়া এবং করুণ বরুণ তরুণ স্বপন মানা ও মীরাদি। এছাড়া রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য হরেন ও কালী সঙ্গে চলেছে। অর্থাৎ আমরা তেরোজন। তাতে অবশ্য আমি মোটেই শঙ্কিত নই। কারণ কুম্ভমেলায় এবং সিকিমের সিনিয়লচু অভিযানেও আমরা 'আন্‌লাকী থার্টিন' ছিলাম। কোনো অঘটন ঘটে নি।

কথা ছিল ২৭শে মে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হব। সবাই একই সঙ্গে বলতালের পথে অমরনাথ দর্শন করে গতকাল শ্রীনগরে ফিরে আসব। আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করে আগামীকাল আবার লাদাখ রওনা হব। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমরা চারজন মানে আমি করুণ বরুণ ও স্বপন, নন্দাদের সঙ্গে আসতে পারি নি। নন্দা এবারে প্রায় তিরিশ জন অমরনাথের যাত্রী নিয়ে এসেছে। তাঁদের

মধ্যে কলকাতা দূরদর্শনের সলিল দাশগুপ্ত অন্যতম। সলিলবাবু সস্ত্রীক অমরনাথ যাত্রায় এসেছিলেন। তাঁরা উভয়েই উৎসাহী হিমালয়-পথিক।

দুর্ভাগ্যের কথা অমরনাথ যাত্রায় এসেও সলিলবাবুরা অমরতীর্থে পৌঁছতে পারেননি। কারণ ওঁরা শ্রীনগর আসার পর থেকেই সারা কাশ্মীর জুড়ে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছিল। তারই মধ্যে ওঁরা নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পথের বরফ ও আকাশের তুষারপাতের জন্য অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সয়ে গতকাল সন্ধ্যায় সবাই শ্রীনগরে ফিরে এসেছেন।

অমরনাথজীর যাত্রা যায় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। সে সময় বড্ড ভিড় হয় বলে কিছুদিন ধরে অভিজ্ঞ যাত্রীরা আষাঢ়ী (গুরু) পূর্ণিমায় অমরনাথ যাচ্ছেন। এই সময় কোনো সরকারী ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু যাত্রীদের খুব একটা অসুবিধে হয় না। বেসরকারী বন্দোবস্ত থাকে এবং পথে সব কিছুই পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে, আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই তুষারলিঙ্গ বড় হচ্ছে।

তাই আমার মতে এখন আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই অমরনাথ যাত্রায় যাওয়া উচিত, কিন্তু তার আগে নয়। কারণ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় আবহাওয়া ভাল থাকলেও পথে এত বরফ থাকে যে সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে পথচলা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং 'ইনট্যুর' জ্যৈষ্ঠ মাসের এই তৃতীয় সপ্তাহে অমরনাথ যাত্রার আয়োজন না করলেই ভাল করত।

আমরা চারজন কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি প্রায় এক সপ্তাহ পরে, ৩রা জুন (১৯৮১)। ওদের সঙ্গে না আসায় আমাদের কোনো অসুবিধে হয় নি। কারণ কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর কর্ণধার বন্ধুবর ফকির কুণ্ডু তাঁর কাশ্মীর প্যাকেজ ট্যুর-এর সঙ্গে আমাদের আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ট্যুর ম্যানেজার মলয় দাস ও কমল প্রামাণিক সর্বদা আমাদের দেখাশোনা করেছেন, কখনও বুঝতে দেন নি আমরা তাঁদের যাত্রী নই।

৩রা জুন সকালে হাওড়া থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেস-এ রওনা হয়ে পরদিন দুপুরে আমরা জম্মু-তাওয়াই পৌঁচেছি। স্টেশনের রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিয়ে দুখানি বাসে রওনা হয়েছি কাশ্মীর। সন্ধ্যার আগে পৌঁচেছি কুঁদ। সেখানকার ট্যুরিস্ট লজ-এ রাত কাটিয়ে গতকাল সকালে কুঁদ থেকে রওনা হয়ে বিকেলে শ্রীনগর এসেছি। আসার পথে আমরা ঝিলমের উৎস ভেরীনাগ দেখেছি।

মলয়বাবুদের সঙ্গে হোটেল প্যারাডিসো-তে রাত কাটিয়ে আজ দুপুরে আমি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। আজ ৬ই জুন।

বিভাস এবং সলিলবাবুর কাছে ওদের দুরবস্থার কথা শুনে নিজেদের সত্যি ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। কারণ আমরা জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত সর্বত্র চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছি। আজও সকাল থেকে খটখটে রোদ। সত্যি বলতে কি একটু গরম লাগছে। অথচ পরশুদিনও নাকি এখানে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই বিভাস বেশ বিচলিত। হওয়াই স্বাভাবিক। সে যাত্রীদের নিয়ে অমরনাথ যেতে পারে নি। ওরা বলতালের পথে অমরনাথ রওনা হয়েছিল। আমাদেরও বলতাল হয়েই লাদাখ যেতে হবে। পেরোতে হবে জোজি লা—হিমালয়ের একটি দুর্গমতম গিরিবর্ত্ম।

বিভাসকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য তাই গম্ভীর স্বরে বলি, "বৃষ্টি যা হবার হয়ে গেছে, আর হবে না।"

বিভাস বোধ করি একটু অবাক হয় আমার কথায়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "কেমন করে বুঝলেন?"

"এবারে আমি কাশ্মীরে এসে গেছি, আর এখানে অকাল-বর্ষণ হবে না।"

বিষাদের মেঘ মুহূর্তে কেটে যায়, ওরা সবাই হেসে দেয়।

কিন্তু আমি মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলি, "কথাটা হাসির নয়, সত্যই আর বৃষ্টি হবে না। আর তার প্রমাণও পেয়ে গেছিস। আমি পরশু জম্মুতে পদার্পণ করেছি, তার পর থেকে এ রাজ্যে আর বৃষ্টি নামে নি।"

"দুদিন বৃষ্টি হয় নি বলেই বলছেন, আর বৃষ্টি হবে না!" সলিলবাবু কথা বলেন এবারে, "আমাদের সঙ্গে এলে দেখতে পেতেন কাশ্মীরের বৃষ্টি কি বিশ্রী ধরনের।"

"তাই তো আমি আপনাদের সঙ্গে আসি নি। এবারে আপনারা আমার সঙ্গে লাদাখ চলুন, বৃষ্টিহীন হিমালয় ও কারাকোরাম দেখে আসবেন।"

আমার কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য হল না। পরশু শ্রীনগর আসার পর থেকে যে কথা কল্পনাও করতে পারি নি, আজ তা কঠিন বাস্তব হয়ে দেখা দিল। গতকাল সারাদিন ছিল খটখটে রোদ। রীতিমত গরম লেগেছে দুপুরবেলায়। হোটেলে গেঞ্জি গায়ে দিয়েই ছিলাম। তাই সন্ধ্যের সময়ে সলিলবাবুকে বৃষ্টিহীন হিমালয় দেখার নেমন্তন্ন করেছি।

অথচ রাত পোহাবার আগেই প্রকৃতি রূপ পরিবর্তন করেছে। আজ ভোরে ঘুম ভেঙেছে বৃষ্টির শব্দে। অবাক হয়েছি। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। আজ আমাদের হিমালয় অতিক্রম করে মধ্য-এশিয়ায় পৌঁছতে হবে। পেরোতে হবে দুর্গম গিরিবর্ত্ম জোজি লা। উপত্যকায় বৃষ্টি হলে জোজি লা-য় বরফ পড়বে, সে আরও বেশি দুর্গম হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমাদের অসুবিধে হবে বলে কি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হবে? না, নিয়ম নয়। জুন মাসে এমন বৃষ্টিকে নিয়ম বলা চলে না, বরং অনিয়ম বলাই উচিত হবে।

হিমালয়ের প্রকৃতি নিয়মের ধার ধারে না, সে তার আপন খেয়ালে চলে। এবং হিমালয়ে এসে প্রকৃতির খামখেয়ালীকে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের অন্য কোনো উপায় নেই। আমাদেরও তাই করতে হল। বৃষ্টির মধ্যেই বিছানা ছাড়লাম, গোছগাছ ও বাঁধাছাঁদা শেষ করে তৈরি হয়ে নিলাম। বৃষ্টি মাথায় করেই বাসস্ট্যাণ্ডে রওনা হলাম।

তিনখানি ট্যাক্সিতে করে আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে রওনা হয়েছি। আমরা পাঁচজন যাত্রী—আমি করুণ বরুণ স্বপন ও মীরাদি। আর ইনট্যুরের ছ'জন—বিভাস ও নন্দা, তাদের ছেলে-মেয়ে তোতা ও মহুয়া, নন্দার দুই সহকারী মানা ও তরুণ। এছাড়া আমাদের সঙ্গে চলেছে দুজন কাজের লোক হরেন ও কালী। তার মানে পাঁচজন যাত্রীর সঙ্গে আটজন কর্তৃপক্ষ। এতগুলো বাড়তি মানুষ যাওয়া ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর।

তবু ওরা চলেছে। চলেছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে ব্যবসাকে বড় করে তুলতে।

বাসস্ট্যাণ্ডে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন এসেছে—পিণ্টু, কিরণ ও সলিলবাবু। সলিলবাবুরা এসেছিলেন অমরনাথ দর্শন করতে। দর্শন না করেই তাঁরা আগামীকাল কলকাতায় ফিরে যাবেন। আর নন্দার আরেকজন সহকারী কিরণ। সে শ্রীনগরে থাকবে ইনট্যুরের পরবর্তী যাত্রার ব্যবস্থা করতে। আমরা ফিরে আসার পরে আরেকদল যাত্রীকে নিয়ে ওরা অমরনাথ যাচ্ছে।

একে ঠাণ্ডা জায়গা, তার ওপরে রান্নার বাসনপত্র ও খাবার-দাবার। ট্যাক্সির ছাদে অনেক মালপত্র। সুতরাং আমরা মালবাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ট্যাক্সি থামতেই তারা আমাদের ঘিরে ধরল।

বিভাস গাড়ি থেকে নেমে সবিনয়ে বলে, "ভাই, আমাদের সঙ্গে লোক আছে। আমরা নিজেরাই মাল 'বাস'-এ তুলব, আমাদের লোক লাগবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত স্বরে মালবাহকরা বলে ওঠে, "জরুর লাগে গা। হাম বিনা সামান বাসমে নহী চড়েগা।"

"কাহে নহী চড়েগা?" বিভাস প্রতিবাদ করে, "আপনা সামান হামলোগ খোদ নহী উঠানে সাকেঙ্গে?"

"নহী। নহী সাকেঙ্গে!" মালবাহকরা গর্জে ওঠে।

বিভাস দাস শুধু পর্বতারোহী নয়, সে একজন অভিজ্ঞ পরিচালক। প্রতি বছর সে বড় বড় দল নিয়ে হিমালয়ে আসে। তাই এবারে সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, "আপলোগ জুলুম করেগা!"

"করেগা।"

"হামলোগ আপনা সামান বাসমে খোদ চড়ায়গা। আপলোগকা মদৎ হাম নহী লেঙ্গে।"

"নহী লেঙ্গে!" ভিড় ঠেলে জনৈক দীর্ঘদেহী কাশ্মীরী এগিয়ে আসে ট্যাক্সির কাছে। চোখ-মুখ লাল করে সে বিভাসের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, "হামলোগকো মদৎ নহী লেঙ্গে তো দেখো হাম কেয়া করনে সাকতা।" আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই সে হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সির ওপর থেকে মালপত্রগুলো ধাক্কা দিয়ে বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত বাসস্ট্যাণ্ডে ফেলে দিতে থাকে। মানা ও বিভাস তাকে বাধা দেয়, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

বরুণ ছুটে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনে। লোকটির সঙ্গীরা আমাদের উপর চড়াও হবার আগেই গোলমাল থেমে যায়। পুলিশ লোকটিকে নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গীরাও কেটে পড়ল এবারে।

জানি না লোকটি কোনো শাস্তি পাবে কিনা? জানি না পুলিশ আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে কিনা? তবে আমাদের যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছে। মালপত্রগুলো সব জলে কাদায় লেপালেপি হয়ে গেছে। ধরাধরি করে সেইভাবেই সেগুলো ছাদে তুলে নিই।

মালগুলোতে কাদা লাগলেও প্রকৃত ক্ষতি একটা তেমন কিছু হয় নি। কারণ প্রত্যেকটি কিট্‌ব্যাগ ও রুকস্যাকের ভেতরে প্লাস্টিকের থলি রয়েছে। জল দিয়ে

ধুয়ে নিলেই বাইরের কাদা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু তাতে মনের দাগ মুছবে কি? লাদাখ রওনা হবার ঠিক আগে কাশ্মীরের মানুষদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম, তা কি কোনদিন ভুলে যাওয়া সম্ভব?

এ্যাড্ভেঞ্চারের মোহ, সৌন্দর্যের আকর্ষণ কিম্বা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যই আমরা হিমালয়ে আসি না। হিমালয়কে ভালোবাসি বলেই হিমালয়ে আসি। আর এই ভালোবাসা কেবল তার পবিত্র তীর্থ, রমণীয় উপত্যকা ও দুর্গম শিখরমালার প্রতি নয়, তার সরল সুন্দর ও উদার মানুষগুলির জন্যও বটে। এই মানুষগুলো হিমালয়ের পথে পথে প্রতিপদে আমাদের সাহায্য করে, আমরা তাদের পারিশ্রমিক দিই। কিন্তু সেখানেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। তাই বিদায়বেলায় ওদের জন্য চোখের জল না ফেলে পারি না। ওরাও আমাদের জন্য ডুকরে কেঁদে ওঠে।

গাড়োয়াল কুমায়ুন ও হিমাচলে এমন ঘটনা আমার জীবনে বার বার ঘটেছে—মুরলীধর, বীর সিং, দেবী দত্ত, সেতীরাম, টিকারাম আরও কতো। এদের কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না। কিন্তু তিনবার কাশ্মীরে এসেও কোনো কাশ্মীরী মালবাহক, টাঙ্গাওয়ালা কিম্বা মাঝি-মাল্লাকে মনে করতে পারছি না। পারছি না কারণ তারা কেউ আমার মনে ভালোবাসার মধুর পরশ বোলাতে পারে নি। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধুই দেওয়া-নেওয়ার।

কাশ্মীরের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যটকদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আর ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী বাঙালী। অথচ বাঙালীদের ওপরে এরা সবচেয়ে বেশী চড়াও হয়। একটু আগে তারই আবেকটা প্রমাণ পেলাম। ওরা ভুলে গিয়েছে বাংলার শ্যামাপ্রসাদ ওদের জন্য কাশ্মীবের মাটিতে শহীদ হয়েছেন। ওরা জানে না যে কাশ্মীরের বাইরে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বইখানি বাংলাভাষায় রচিত, নাম 'কাশ্মীর কুসুম'—লেখক রাজেন্দ্রমোহন বসু। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭৫ সালে এবং এখানি সম্ভবতঃ হিমালয়ের ওপরে রচিত প্রথম প্রকাশিত বাংলা ভ্রমণকাহিনী।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—পর্যটকদের প্রতি স্থানীয়দের এই জুলুমের কারণ এরা মনে করে—প্রকৃতি যখন কাশ্মীরের ওপর এমন মুক্তহস্ত, তখন আমরা ওদের জুলুম সহ্য করেও পতঙ্গের মতো ছুটে আসব। আর সত্যি বলতে কি আমরা তাই আসি। অন্তত আমি তো আসছি বারে বারে।

আসছি, তবে আমি এই মানুষগুলোকে ভালোবাসতে পারি নি। আর তাই এতবার এসেও আমি কাশ্মীর উপত্যকার ওপরে এখনও কোনো বই লিখি নি। এমনটি কিন্তু আমার জীবনে আর কখনও হয় নি। হিমালয়ের আমি যেখানেই গিয়েছি, একখানি করে বই লিখে ফেলেছি। কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে বোধ করি তার ব্যতিক্রম হয়ে রইল। কি করব? ওরা যে কাশ্মীরে এলে আমাকে প্রশ্ন করে—আপ ইণ্ডিয়াসে আয়া হ্যায়? আপ ইণ্ডিয়ান?

কিন্তু থাক, আর ওদের কথা নয়, এবারে নিজেদের কথা ভাবা যাক্। মালপত্র ছাদে তুলে আমরা বাসে উঠে বসেছি। বৃষ্টি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং বেড়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড়ো হাওয়া। বরুণদেবের এই দাপাদাপি কখন থামবে, তা বোধ করি সূর্যদেবও বলতে পারেন না।

এই আবহাওয়ায় ওদের আর আটকে রাখা উচিত হবে না। তাই সলিলবাবুদের হোটেলে ফিরে যেতে অনুরোধ করি। বলি, "ট্যাক্সি করে তাড়াতাড়ি ফিরে যান। সবাইকে নিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমরা বাস থেকে হাত নাড়ব।"

আমাদের হোটেলটি খৈয়ম চৌকে, বাসরাস্তার ওপরে। ঐ রাস্তা দিয়েই এ বাস যাবে।

সুতরাং সলিলবাবুর প্রস্তাবটি পছন্দ হয়। তিনি পিণ্টু ও কিরণকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপেন। হাত নেড়ে বিদায় নেন আমাদের কাছ থেকে।

আমরা বাসে বসে বাস ছাড়ার অপেক্ষায় রয়েছি আর চেয়ে চেয়ে চারিদিকে দেখছি। কাশ্মীর উপত্যকায় রেল নেই। কিন্তু এটি হিমালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপত্যকা। মোটরযানই এই উপত্যকার প্রধান পরিবহন। সরকারী বাস ও ট্রাক এই রাজ্যের অধিকাংশ যাত্রী ও মালপত্র বহন করে থাকে। এই বাসস্ট্যাণ্ডটি সরকারী বাসের প্রধান ঘাঁটি। সুতরাং অত্যন্ত কর্মব্যস্ত।

সকালে শ্রীনগর থেকে বাস শুধুই ছাড়ে, আসে না বড় একটা। আর সকালই বা বলছি কেন? শেষরাত থেকেই তো শ্রীনগরের বাস ছুটতে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এবং রাজ্যের বাইরে। অতএব মাঝে মাঝেই বাস ছাড়ছে। আমি বাসে বসে বাস ছাড়া দেখছি।

আমি আজ সত্যই চলেছি লাদাখে—চাঁদের দেশে। এতকাল হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ যাচ্ছি হিমালয়ের পরপারে—কারাকোরামের পদপ্রান্তে।

লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অংশ। 'লে' (Leh) লাদাখের প্রধান শহর। আমরা সেখানেই চলেছি। শ্রীনগর থেকে লে ৪৩৪ কিলোমিটার। পথে কার্গিল শহরে আজ রাত কাটাতে হবে। এখান থেকে কার্গিল ২০৩ কিলোমিটার। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণতঃ এই পথে বাস চলাচল করতে পারে। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন সকালে শ্রীনগর ও লে থেকে একাধিক সরকারী বাস ছাড়ে। তারা পরদিন বিকেলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়।

পাকিস্তানী হানাদার ও চৈনিক আগ্রাসনের জন্য ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য লাদাখের পথ বন্ধ ছিল। এখন দেশী-বিদেশী সব পর্যটকই লাদাখ যেতে পারেন। কোনো পারমিট নেবার দরকার হয় না। সবাই সেখানে ছবি তুলতে পারেন। ফলে লাদাখে এখন পর্যটকদের সংখ্যা প্রচুর। এবং বিদেশী পর্যটকদের ভিড় বেশ বেশি। আমাদের এই বাসেও তার প্রমাণ পাচ্ছি। আমার সহযাত্রীদের প্রায় অর্ধেকই বিদেশী।

কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পরে আলাপ করা যাবে। দুদিন আমরা এক বাসে থাকব। এখন নিজেদের কথা ভাবা যাক্।

।। দুই ।।

আমাদের বারোখানি টিকেট। সিট নম্বর পড়েছে ১৪ থেকে ২৫ পর্যন্ত। টিকেট পরীক্ষা করে কণ্ডাক্টর আমাদের মাথা গুনল। তারপরে গম্ভীর স্বরে বিভাসকে বলল,

"বারা টিকস্ তেরা আদমী! আউর এক টিকস্‌কা কেয়া হোগা?"

বিভাস তেতা ও মহুয়াকে দেখিয়ে বলে, "এদের দুজনের দুটো 'হাফ' টিকেটের বদলে একটা 'ফুল' টিকেট নিয়েছি।"

"ইয়ে ক্যায়সে হোগা? বারা সিট আউর তেরা আদমী! নহী হোগা।"

"কিন্তু আপনাদের বুকিং ক্লার্কই তো আমাকে জোর করে গছালেন। আমি এগারোখানি 'ফুল' ও দুখানি 'হাফ' টিকেট চেয়েছিলাম। তাতে আমার লাভ হত, একটা সিট বেশি পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি তা দিলেন না, দুটো হাফ টিকেটের বদলে একটা ফুল টিকেট গছিয়ে দিলেন।"

আমরাও বিভাসের সাহায্যে এগিয়ে আসি। কণ্ডাক্টরকে বোঝাবার চেষ্টা করি বুকিং ক্লার্ক দুখানি হাফ টিকেটের বদলে একখানি ফুল টিকেট দিয়ে আমাদেরই লোকসান করেছেন। এতে আপনারা একজন বেশি যাত্রী নিতে পারছেন, অতএব আমাদের টিকেট ঠিক আছে, আপনি বাস ছাড়ুন।

কিন্তু কণ্ডাক্টর যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা করে না। তার সেই একই কথা—"বারা টিকস্‌মে তেরা আদমী নহী হোগা। এক আদমী উতার যাইয়েগা!"

"উতার যাইয়ে গা?"

"জী! নহী তো এক হাফ টিকস্‌কা দাম দিজীয়েগা, ছাব্বিশ রূপেয়া।"

বিভাসকে বলি, "একবার বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করলে হোত না?"

বিভাস আপত্তি করে। বলে, "প্রথমতঃ সেখানে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সে এখন ডিউটিতে নাও থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এরা আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। বাস ছেড়ে দেবে।"

"কিন্তু একে টাকা দেওয়া মানে তো অন্যায়কে মেনে নেওয়া?"

"উপায় নেই, তাই মানতে হবে।" বিভাস পকেট থেকে টাকা বের করে কণ্ডাক্টরকে ছাব্বিশ টাকা দিয়ে দেয়।

টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে কণ্ডাক্টর এগিয়ে যেতে থাকে।

আমি বলে উঠি, "টিকেট!"

"টিকস্ নহী মিলেগী।" কণ্ডাক্টর একবার মুখ ঘোরায়। তারপরে আবার চলতে চলতে বলে, "লেকিন কোই তকলীফ নহী হোগা, আপ আরামসে বৈঠে রহিয়ে।"

"তার মানে লোকটা টাকাগুলো মেরে দিল!" বরুণ বলে ওঠে।

বিভাস নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।"

সে কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ সে অভিজ্ঞ পর্যটক। সে জানে, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না।

কণ্ডাক্টর এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে কি বলতেই বাসের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি—ন'টা। সত্যি বলতে কি বাসে বসে থেকেও এতক্ষণ ভাবতে পারি নি যে ঠিক সময়ে বাস ছাড়বে। ভাবব কেমন করে? এখনও যে বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। দুর্গম ও দুস্তর পথ। বৃষ্টি মাথায় করে রওনা হব, ভাবতেই পারি নি।

কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের বাস ছেড়ে দিল। হর্ণ দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে ড্রাইভার বাসখানি স্ট্যাণ্ডের বাইরে নিয়ে এলো।

বড় রাস্তায় এসেছি, বাস চলতে শুরু করেছে। তার মানে আমরা রওনা হলাম লাদাখে—চাঁদের দেশে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা অবহেলা করে হিমালয় পাড়ি দিতে চললাম। তাহলেও আমরা তাঁর করুণাপ্রার্থী। ভরসা করি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি সহায় হবেন এবং তাঁর করুণায় আমাদের যাত্রা সফল হবে।

কিন্তু বাস বাঁয়ে বাঁক নিল কেন? এদিকে তো যাবার কথা নয়! এ রাস্তা তো জম্মু গিয়েছে!

একটু বাদেই কারণ বোঝা গেল। তাহলে এখনও যাত্রা শুরু হয় নি। ড্রাইভার তেল নিতে এসেছে। তেল না হলে গাড়ি চলে না, লাদাখ যাওয়া যায় না।

তেল নিয়ে বাস আবার বাসস্ট্যাণ্ডের সামনে এলো, কিন্তু থামল না। বড়বাস্তা ধরে এগিয়ে চলল উত্তরে—ডাল-গেটের দিকে।

জম্মু-কাশ্মীব সবকারী পরিবহন সংস্থার চাব রকমের বাস আছে—লাক্সারী, 'এ' এবং 'বি' ক্লাস আর সিটি বাস। আমাদের এটি 'বি' ক্লাস বাস। এখন প্রতিদিন অন্তত একখানি করে 'বি' ক্লাস বাস শ্রীনগর থেকে লাদাখের সদর 'লে' রওনা হয়। আমরা তারই সওয়ার হয়েছি।

আমাদের বাসটিতে বসার ব্যবস্থা সাধাবণ যাত্রীবাহী বাসেব মতো। এক সারিতে দুটি করে সীট—পাঁচজন বসতে পারে। একটায় তিনজন, আরেকটায় দুজন—মাঝখানে যাতায়াতের পথ। দুজনের সীটটায় তবু দুজন বসা যায় কোনমতে, কিন্তু তিনজনের সীটে তৃতীয় ব্যক্তিকে শরীরের প্রায় অর্ধাংশ বাইরে বের করে রাখতে হয়। আমাদের ভাগে এমনি দুখানি সীট পড়েছে। এবং আমি তারই একখানির প্রান্তভাগে উপবেশন করেছি। বিভাস অবশ্য বলেছে—কারও পক্ষে আগাগোড়া পাশে বসা সম্ভব হবে না। কারণ দু-দিনের পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে জায়গা পালটে বসতে হবে।

আমার পাশে করুণ ও মানা। করুণ মানে আমার 'অমরতীর্থ-অমরনাথ' পথের সঙ্গী জনৈক যুবক অধ্যাপক ডঃ করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। আর মানা নন্দার সহকারী তরুণ পর্বতারোহী। আমাদের পাশের সীটে বসেছে বরুণ ও স্বপন। প্রখ্যাত হিমালয়বিশারদ ও চিত্রকর সদ্যপ্রয়াত মণি সেন মহাশয়ের দৌহিত্র ও আলোকচিত্রকর বরুণ রায়। তার পাশে হিমালয়প্রেমিক স্বপন সাহা। বরুণ ও স্বপন দুজনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আমাদের সামনের সীটে বিভাস ও নন্দা বসেছে তাদের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে। আর তাদের পাশের সীটে কালী ও হরেন এবং সামনে তরুণ ও মীরাদি। তরুণও অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। সেও নন্দাকে সাহায্য করবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলেছে। আর মীরাদি মানে শ্রীমতী মীরা ঘোষ আমাদেরই মতো জনৈকা যাত্রী। হিমলায়ের তাবৎ তীর্থ দর্শন করে লাদাখ দেখতে চলেছেন। মীরাদির পাশে, জানলার ধারে বসেছে জনৈকা জার্মান তরুণী, নাম রোজালিন স্মিট্। নাম যাই হোক, ওর কচি কোমল মুখখানি দেখে আমি ওকে বাঙালী মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। মেয়েটি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। ভারতীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই এদেশে এসেছে। আড়াই মাস ধরে সমতল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে এবারে হিমালয় দেখছে। কাজ চালাবার মতো ইংরেজী জানে তবে কথা খুবই

কম বলে। মেয়েটি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী।

মীরাদির পাশে এবং সামনের সব সীটগুলোতেই বিদেশী পর্যটক। ওদের মধ্যে কেবল দুজন ইংরেজ যুবক-যুবতী, বাকি সকলেই এসেছেন বেলজিয়াম থেকে। তাঁরা বারোজন। তবে আমাদের মতো তাঁদের দলে কোনো শিশু কিম্বা কাজের লোক নেই। ওঁদের একজন ম্যানেজার-কাম-গাইড, নাম জাঁ লুই (Jean Louis)। বাকী এগারোজনই যাত্রী।

ম্যানেজারের কথা পরে হবে, আগে যাত্রীদের দিকে নজর দেওয়া যাক। এগারোজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র দুজন যুবক-যুবতী, বাকি সকলে হয় প্রৌঢ় নয় বৃদ্ধ। বৃদ্ধাও আছেন তিনজন। তাঁরা স্বামীদের সঙ্গে লাদাখ ভ্রমণে চলেছেন।

বেলজিয়ামে প্রচলিত ভাষা তিনটি, একটি নিজস্ব অপর দুটি জার্মান ও ফরাসী। এই দলের অধিকাংশই ফরাসী জানে। সুতরাং বরুণের খুব সুবিধে হয়েছে। বরুণ বেশ ভালো ফরাসী বলতে ও লিখতে পারে। আগামী বছর সে ফরাসী দেশে বেড়াতে যাবে। অতএব সে খুব জমিয়ে নিয়েছে। ভালই করেছে, ওর কাছ থেকে এই বিদেশী ভারত-পথিকদের কিছু কথা জানা যাবে।

শঙ্করাচার্য মন্দিরকে ডানদিকে রেখে বাস ডাল-গেটে পৌঁছল। না, বুলেভার্ড রোড ধরে আমরা ডাল-লেকের দিকে এগোলাম না। বুলেভার্ড রোড শ্রীনগরের হৃদ্‌পিণ্ড। পথটি যেমন চওড়া, তেমনি রমণীয় এখানকার দৃশ্য। তাছাড়া শ্রীনগরের সবচেয়ে ভাল হাউসবোটগুলো এবং অধিকাংশ ভাল হোটেল ওখানে। শিকারা ভ্রমণের জন্য সবাই বুলেভার্ড রোডে আসেন এবং ঐ রাস্তা ধরেই দেখতে যান পরী মহল, গুপ্ত গঙ্গা, গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ এবং বর্জিহামা আর চার-মিনার ও নেহেরু পার্ক। দেখতে যান বিশ্ববিখ্যাত মোগল উদ্যান—চশমা শাহী, নিশাত বাগ ও শালিমার গার্ডেন্‌স।

শ্রীনগরের সেই প্রাণকেন্দ্র বুলেভার্ড রোডের দিকে না এগিয়ে আমাদের বাস বাঁয়ে বাঁক নিল। ডাল ও ঝিলমের সঙ্গমে ছোট পুলটি পেরিয়ে ঝিলমের তীরে এলাম। এগিয়ে চললাম উত্তরে।

"জেঠু, আমাদের বাড়ি আসছে!"

মহুয়ার কথায় কথাটা মনে পড়ে। সে বাড়ি বলতে হোটেল বুঝিয়েছে। ঠিকই বলেছে—সামনেই খৈয়ম চৌক। সেখানেই আমাদের হোটেল। সলিলবাবুরা সবাই সেখানে রয়েছেন। ওঁরা হাত নেড়ে বিদায় জানাবেন। আমরাও তৈরি হয়ে নিই।

হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছি। বৃষ্টি মাথায় করে ওঁরা সবাই সারি বেঁধে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা চেঁচিয়ে ওঠেন, হাত নাড়েন। আমরাও হাত নাড়ি। ওঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, আমরা এগিয়ে চলি। বৃষ্টির জন্য ওঁদের অমরনাথ যাত্রা বিফল হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় করে আমরা লাদাখ রওনা হলাম। আমাদের যাত্রা সফল হবে কি?

এটা শ্রীনগর শহরের পুরনো পাড়া, নাম খানিয়ার—ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। একটু বাদেই বাঁদিকে রোজাবল মসজিদের পথ। বাস এগিয়ে চলেছে বিশ্ববিখ্যাত হজরতবাল

মসজিদের দিকে। শুধু ধর্মীয় ঐতিহ্যে কিম্বা প্রাচীনত্বের পরিচয়ে নয়, অভিনব গঠনবিন্যাস এবং অপরূপ অবস্থানের জন্যও হজরতবাল পর্যটকদের অবশ্য দর্শনীয়।

কিন্তু না, আমি এখন হজরতবাল মসজিদের কথা ভাবছি না। কিছুক্ষণ বাদেই ডাল হ্রদের তীরে সেই অপরূপ মসজিদ দর্শন করতে পারব। আমি ভাবছি রোজাবল মসজিদের কথা। এইমাত্র আমাদের বাস সেই মোড় ছাড়িয়ে এলো। এখান থেকে মাত্র মিনিট তিনেকের হাঁটাপথ। বাঁদিকে হেঁটে গিয়ে বাড়ি-ঘরের মাঝখানে ছোট মসজিদ। শ্রীনগরের একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিদর্শন।

মসজিদ বললে সাধারণতঃ যা বোঝায়, রোজাবল বা রাউজাবল (Rauzabal) ঠিক তা নয়। মসজিদ না বলে বোধ করি সমাধি-মন্দির বলাই উচিত হবে। এবং সে সমাধি স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের।

বারান্দাযুক্ত ছোট মন্দির। ইহুদি স্থাপত্যের অনুকরণে একখানি বড় ঘর। কাশ্মীরের অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিসৌধের মতো বৌদ্ধ কিংবা ইসলামী স্থাপত্যের কোনো ছাপ নেই। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সমাধি দর্শন করতে হয়। সমাধির চারিদিকে জালির ঘেরা—পীর-পয়গম্বরদের সমাধি যেমন হয় আর কি। কেবল জালির ওপরে হিব্রু ভাষায় খোদিত একখানি শিলালিপি রয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা সেটির এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

সামনে একখানি ইংরাজী সাইনবোর্ড—অনেক কিছু লেখা। ওপরের প্রথম সারিতে লেখা রয়েছে—'ZIARATI HAZRATI YOUZA ASOUPH...'

অর্থাৎ এটি ইউজা আসফের সমাধি-মন্দির। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইউজা মানে সংগ্রাহক যীশু অর্থাৎ তিনি এবং যীশুখ্রীষ্ট একই মহামানব।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের প্রথম ঐতিহাসিক মোল্লা নাদিরি (Mulla Nidiri) লিখেছেন যে কাশ্মীররাজ গোপাদত্তের রাজত্বকালে (৪৯—১০৯ খ্রীঃ) হজরত ইউজা আসফ পবিত্রভূমি প্যালেস্টাইন (Bait-ul-Muqaddas) থেকে পবিত্র উপত্যকা কাশ্মীরে আসেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ (Prophet) বলে দাবী করেন। ঐসময় তৎকালীন শ্রীনগব (বর্তমানে শঙ্করাচার্য) মন্দিরের গম্বুজে একটা ফাটল দেখা দেয়। তাই পারস্য দেশ থেকে সুলাইমান (Sulaiman) নামে জনৈক স্থপতিকে শ্রীনগরে নিয়ে আসা হয়। সুলাইমান সেই ফাটল মেরামত করেন। মেরামতের সময়ে তিনি মন্দিরের সিঁড়িতে পারস্য ভাষায় দুটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। শিলালিপি দুটির ইংরেজী অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'At this time Yuz Asaf proclaimed his prophethood, year fifty and four.' এবং 'he is Jesus, prophet of the children of Isreal.'

মোল্লা নাদিরি দাবী করেছেন যে তিনি তৎকালীন একখানি কাশ্মীরী গ্রন্থে পেয়েছেন—ইউজা আসফই হজরত ইসা বা যীশুখ্রীষ্ট। তাঁর মতে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পরে আরোগ্যলাভ করেন। পাছে তাঁর শত্রুরা তাঁকে আবার মেরে ফেলার চেষ্টা করে, তাই তিনি প্যালেস্টাইন থেকে পালিয়ে কাশ্মীরে আসেন। এবং এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন। দেহরক্ষার পরে ঐ খানিয়ার মহল্লায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

'ভবিষ্য মহাপুরাণে'ও এই মতের সমর্থন মেলে। যাঁরা এই মতে বিশ্বাসী, তাঁরা বাইবেল এবং বিভিন্ন প্রচীন হিব্রু গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বলেন—কাউকে সোজাসুজি মেরে ফেলার জন্য সেকালে ক্রুশবিদ্ধ করা হোত না। ক্রুশবিদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষটাকে নরকযন্ত্রণা দেওয়া। তারপরে তাকে তিন-চারদিন সেইভাবে ঝুলিয়ে রাখা হত। শীত অথবা গ্রীষ্মে পিপাসা ক্ষুধা ও যন্ত্রণায় মানুষটা শেষ পর্যন্ত মরে যেত।

কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করার পরেই যদি কাউকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে চিকিৎসা করা হত, খেতে দেওয়া হত, তাহলে সে বেঁচে যেতে পারত। যীশুর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় শুক্রবার দুপুরে। শনিবার ইহুদিদের পবিত্র ছুটির দিন (Sabbath Day)। তাই সন্ধ্যের আগেই তাঁকে নামিয়ে দিতে হয। তার মানে যীশু ঘণ্টা তিনেকের বেশী ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন না।

ক্লান্তিতে ও যন্ত্রণায় যীশুর মাথাটি কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছিল। তাঁর খুবই আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস বইছিল। শত্রুরা ভাবল—এখুনি তিনি মরে যাবেন। তখন তারা শুক্রবার সন্ধ্যার আনন্দ আসরে যোগদানের জন্য ব্যাকুল। তাই তাড়াতাড়ি জীবিত যীশুকেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

মরে যাওয়া তো দূরের কথা, যীশুর তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাই মাটিতে ফেলে দেবার সময় তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠেন। একজন সৈনিক বল্লম দিয়ে যীশুর উরুতে খোঁচা দেয়। যীশুর উরু থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। অর্থাৎ তখনও তাঁর প্রাণ ছিল। কিন্তু তারপরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। শত্রুরা ভাবল—তিনি মারা গেলেন। তারা খুশি হয়ে যীশুর দেহ তাঁর বন্ধুদের উপহার দিয়ে শুক্রবারের সান্ধ্য-আসরে যোগ দিতে ছুটল।

বন্ধুরা যীশুকে নিয়ে জোসেফ এ্যারিমাথিয়ার (Joseph Arimathea) বাড়িতে এলেন। জোসেফ শুধু যীশুর বন্ধু ছিলেন না, তিনি যীশুর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে যীশুর অনুরক্ত রোমান গভর্নর পণ্টিয়াস পাইলেটের (Pontius Pilate) সঙ্গে দেখা করলেন। জোসেফ তাঁকে অনুরোধ করলেন—আপনি আমার বাড়িতে যীশুকে কবর দেবার আদেশ দিন।

পণ্টিয়াস সেই আবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন জোসেফের বাড়িতে একটা বিরাট কবর খোঁড়া হল। তিনদিন সময় লাগল সেই কবর খুঁড়তে। এই তিনদিন জোসেফের বাড়িতে বদ্ধঘরে যীশুর চিকিৎসা চলল। তারপরে সকলের সামনে সেই কবরে যীশুকে রেখে কবরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধু ও শিষ্যরা সমবেত দর্শকদের চোখে ধুলো দিয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কারণ সেই কবরটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মাটির নিচে একখানি প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে প্রচুর আলো-হাওয়া যাবার পথ ছিল। ছিল যাতায়াতের পথ।

প্যালেস্টাইনে যীশুর সমাধি খালি পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষ কবর পরীক্ষার পরে জোসেফকে বন্দী করে। যীশুর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের জন্য তাঁকে দায়রায় সোপর্দ

করা হয়। তারা রেজারেক্‌শান (Resurrection) বা যীশুর পুনরুত্থানের কাহিনী বিশ্বাস করে নি।

যীশু মেরীর সামনে আবিভূর্ত হলেন। তিনি জানতেন শাসককুল রেজারেক্‌শানের অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করবে না। সুযোগ পেলেই তাঁকে ধরে মেরে ফেলবে। তাই তিনি শিষ্যদের জেরুজালেম থেকে দেড়শ' মাইল দূরের গ্যালিলীতে (Galilee) চলে যাবার নির্দেশ দিলেন।

ক্রুশবিদ্ধ হবার আটদিন পরে যীশু গোপনে গ্যালিলীতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে পানাহার করলেন। কয়েকজন শিষ্য যীশুকে অশরীরী ভেবে ভয় পেলেন। যীশু তাঁদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—'Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me and see; for a spirit hath not flesh, and bones as you see me have' (Ibid, XXIV: 39)

তাঁর এই আবির্ভাবের কথা চারিদিকে রটে যেতেই যীশু আবার আত্মগোপন করলেন। কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র হলেও মানুষ। ক্রুশবিদ্ধ হবার নরকযন্ত্রণার কথা তাঁর মনে ছিল। আবার ধরা পড়ে তিনি শত্রুদের শিকার হতে চান নি। তাই তিনি পাহাড়ী পথ ধরলেন। দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে পথ চলতেন। এই ভাবে পথ চলে যীশু অবশেষে গেথসেম (Gethsemme) বা মাউন্ট্‌ অব্‌ অলিভ্‌স-এর শিখরে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা শিষ্যদের বললেন—"I go my way, and ye shall seek me, and ye shall in your sins; whither I go you cannot come. (John vii, 21)

শিষ্যরা দেখতে পেলেন আকাশ থেকে মালার মতো মেঘ এসে যীশুকে ঢেকে ফেলল। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মেঘমালা অপসৃত হল কিন্তু তাঁরা আর তাঁদের ঈপ্সিত মহাপুরুষকে দেখতে পেলেন না। হয়তো ভাবলেন—মহামানব মেঘলোকে আরোহণ করেছেন।

কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ইতিহাস বলে—মেঘলোকে আরোহণ নয়, মানুষের মুক্তিদাতা মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। মানুষের বঞ্চনা আর অত্যাচার তাঁকে মানুষের প্রতি বিমুখ করে তোলে নি।

মানুষের মঙ্গলের জন্য যীশু দেশের পর দেশ পেরিয়ে পথ চলতে থাকলেন। তিনি বনের ফলমূল আর ঝরণার জল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন আর সারারাত ধরে পথ চলতেন। তিনি আবার তাঁর বাল্যভূমি নাজারেথ এলেন। সেখান থেকে সিরিয়া ও মেসোপেটেমিয়া হয়ে নিসিবিস্‌। কিন্তু মানুষের সমাজ তাঁকে আশ্রয় দিল না। বরং কিছু মানুষ তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করল। বাধ্য হয়ে যীশু নূতন নাম নিলেন ইউজা আসফ। তিনি আবার পথচলা আরম্ভ করবেন।

অবশেষে মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ ধরে যীশু এগিয়ে চললেন। প্রথম জীবনে অর্থাৎ চোদ্দ বছর বয়সে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য যীশু এই পথে লাদাখে এসেছিলেন।

একনাগাড়ে প্রায় পনেরো (কারও মতে আঠারো) বছর ভারতে কাটিয়ে ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি জেরুজালেমে ফিরে যান। লাদাখে তাঁর প্রচুর পরিচিত মানুষ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করবেন।

তবু বোধ করি শত্রুদের শক্তির কথা ভেবে যীশু মধ্য-এশিয়ার এই প্রান্ত ভূখণ্ডকে নিরাপদ বাসভূমি বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি হিমালয় অতিক্রম করে কাশ্মীরে এলেন। মহারাজ গোপাদত্তের সুশাসনে কাশ্মীর তখন শান্তির নীড়।

শ্রীনগরে এসেও যীশু কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করলেন না। ইউজা আসফ নামেই পরিচিত হলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রেমের পরিচয় পেয়ে দলে দলে মানুষ ছুটে এলেন তাঁর কাছে। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সবাই সসম্মানে বরণ করলেন তাঁকে। তাঁরা নানারকম যৌতুকসহ নিয়মিত তাঁর উপদেশ শুনতে আসতেন। রাজা গোপাদত্ত নিজেও তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলেন। দেশের মানুষ যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল, ভারতের মানুষ তাঁকে অন্তরের অন্তস্তলে বরণ করে নিল—পরম সমাদরে।

যীশু যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, প্রায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত খ্রীষ্টান জগতে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধরূপে দেখাবার প্রচলন হয় নি। এই প্রচলন হয়েছে পরবর্তীকালে। সম্ভবতঃ জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবার জন্যই যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটির প্রচলন হয়। এবং কালক্রমে সেটি খ্রীষ্টধর্মের পুণ্যপ্রতীকে পরিণত হয়ে যায়।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম। পর্যটক যীশু শেষ পর্যন্ত শ্রীনগরেই স্থায়ী হন। এবং বাকী জীবনটা তাঁকে ভারতেই অতিবাহিত করতে হয়। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি আর দেশে ফিরতে পারেন নি। কারণ ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর কাছে খবর এলো, তিনি রোম সম্রাটদের কাছে এতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন যে কেউ সে রাজ্যে প্রকাশ্যে তাঁর নাম নিলে তাঁকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বলা বাহুল্য অত্যাচার করে রাজশক্তি খ্রীষ্টধর্মের জয়যাত্রা স্তব্ধ করতে পারে নি। বরং সেই জয়যাত্রার জোয়ারে রোমসাম্রাজ্য খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে।

কিন্তু সেসব কথা আমার ভাবনা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। কথিত আছে তৎকালীন খ্রীষ্টধর্মের সবচেয়ে বড় প্রচারক সেণ্ট পিটারকে সম্রাট বন্দী করে রেখেছিলেন। খ্রীষ্টভক্ত কারাকর্মীদের সহায়তায় পিটার একদিন পালাতে সমর্থ হলেন। তিনি কাশ্মীরে এসে যীশুর সঙ্গে দেখা করেন। তারপরে গুরুর উপদেশ নিয়ে দেশে ফিরে যান। তিনি রোমে গিয়ে আবার ধর্মপ্রচার শুরু করেন। কিছুদিন বাদে সম্রাটের সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে। এবং এবারে আর কারাগার নয়। তাঁকে ভ্যাটিকান পর্বতশিখরে নিয়ে গিয়ে উল্টোভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন ইউজা আসফকে তাঁর শিষ্যরা বলতেন ঈশাইনাথ বা সংক্ষেপে ঈশা। তিনি ১০২ বছর বয়সে শ্রীনগরে দেহরক্ষা করেন। অর্থাৎ যীশু জীবনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় ভারতে কাটিয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আধুনিক যুগের আগে ভারতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হল না কেন? যীশু কি এদেশে ধর্মপ্রচার

করেন নি?

নিশ্চয়ই করেছেন। তবে এদেশে তাঁর শিষ্যরা নিজেদের খ্রীষ্টান না বলে নাথযোগী বলেছেন। আর তাঁরা ইউজা আসফ বা যীশুকে বলতেন ঈশা—ঈশাইনাথ। যীশু শুধু মহানুভব ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর দেশে তিনি যেভাবে ধর্মপ্রচার করেছেন, আর্যভূমি ভারতবর্ষে সেভাবে ধর্মপ্রচার করলে কেউ তাঁর কথা শুনবে না। তাই তিনি তাঁর মূল আদর্শ—সত্য, প্রেম ও ক্ষমাকে অবিকৃত রেখে নূতনভাবে ধর্মপ্রচার করেছেন। ঈশাইনাথ নামটির মধ্যেও আমরা যীশুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাই। কারণ 'ঈশ' শব্দের অর্থ শিব। প্যালেস্টাইনে তখন শৈবধর্ম প্রচলিত ছিল। তাই যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে ঈশাইনাথ বলে পরিচয় দিতেন। তিনি তাঁর এই নবধর্মে ভারতীয় ঐতিহ্যকে যোগ্যস্থান দিয়েছেন। তাঁর এই ধর্মমতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুরুবাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সঙ্গে তার কোনো সংঘাত হয় নি। বরং দলে দলে মানুষ নাথযোগী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ ধর্মত্যাগী বলেন নি। এই সম্প্রদায় পৃথক ধর্মাবলম্বীরূপে বিবেচিত হন নি। বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে তাঁরা আবার হিন্দুজাতির উদার ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

যাকগে ইউজা আসফের কথায় ফিরে আসা যাক। বাকি জীবনটা আনন্দে অতিবাহিত করে তিনি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনগরে দেহরক্ষা করেন। আমরা সৌভাগ্যবান—সেই মহামানবের সমাধিমন্দির দর্শন করে নিজেদের জীবন ধন্য করতে পেরেছি।

।। তিন ।।

ডানদিকে হজরতবাল মসজিদ। আমরা দর্শন করি। বাস এগিয়ে চলে। একটু আগে ডাল ও নাগিন হ্রদের সঙ্গম পেরিয়ে এসেছি। ডাইনে ডাল, বাঁয়ে নাগিন। ডালের ওপারে নিশাত বাগ—মোগল উদ্যান।

হজরতবাল মসজিদের পরে শ্রীনগর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা ছাড়িয়ে চলি।

জনবসতি কমে এসেছিল কিছুক্ষণ থেকেই। তবু এতক্ষণ কিছু কিছু বাড়ি-ঘর ছিল। এবারে তাও হারিয়ে গেল। তাই তো যাবে। প্রকৃতপক্ষে এখানেই শহর শেষ হয়ে গেল। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ শহর শ্রীনগরের সীমারেখা।

এখন আমরা উত্তর-পশ্চিমে চলেছি। এইভাবে পথ চলে প্রথম পৌঁছব নারবল—উরি ও সোনামার্গ পথের সঙ্গম। ১৯৪৭ সালের আগে সবাই উরি-বারমুলা-পাটনের পথ দিয়ে সমতল ভারত থেকে কাশ্মীরে আসতেন। শঙ্করাচার্য থেকে বিবেকানন্দ, জাহাঙ্গীর থেকে জওহরলাল পর্যন্ত সবাই সেই পথে কাশ্মীরে এসেছেন। দেশ বিভাগের ফলে অনন্তকালের সেই পথ চির-রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

নারবলের পরে পৌঁছব হৈগমরাখ্। সেখানে পথটি বেঁকে যাবে ডাইনে। অর্থাৎ

আমরা পুবদিকে চলা শুরু করব। একে একে পার হব গাণ্ডারবল, কঙ্গন, গুন্দ্ ও কুলন। অবশেষে সোনামার্গ—শ্রীনগর থেকে ৮৪ কিলোমিটার। সেখানেই দুপুরের খাওয়া। কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। সবে সকাল দশটা। বোধ করি বেলা বারোটার আগে আমরা সোনামার্গ পৌঁছতে পারব না।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পার হবার পরে বেশ কিছুক্ষণ আমরা ডাল হ্রদের তীর ধরে পথ চলেছি। ভারি সুন্দর পথ—মসৃণ ও সমতল। পথের পাশে গাছের সারি—চিনার আর পপ্লার। বাঁদিকে আপেল বাগান। বাগানে আপেল নেই, কুঁড়িও আসে নি। তবু দেখতে ভালো লেগেছে। মাঝে মাঝে ক্ষেত—ধানক্ষেত। আর পথের ডানদিকে ডাল। দুদিকেই দূরে পাহাড়ের ধূসর রেখা।

হঠাৎ খেয়াল হয় কথাটা। তাই তো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে নীল আকাশ। রোদ উঠেছে—সোনালী রোদ। সহাস্যে নন্দাকে বলি, "দেখলে তো! আমি কাশ্মীরে এসেছি, আর কি বেশিক্ষণ বৃষ্টি হতে পারে?"

নন্দা মৃদু হাসে, বলে না কিছু। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না তোতা। সে বৃদ্ধ-বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছো জেঠু। তুমি এসেছো তো, তাই এত তাড়াতাড়ি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, জেঠুর তুক-তাকের সমজদার এই একজনই আছে।" বিভাস হাসতে হাসতে বলে। হেসে ওঠে মানা তরুণ ও স্বপন।

বরুণ জনৈক বেলজিয়াম পর্যটকের সঙ্গে কথা বলছিল। আমাদের হাসির শব্দে তাদের কথা থেমে যায়। তারা আমাদের দিকে তাকায়।

বরুণের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। তাই সংক্ষেপে কথাগুলো বলি ওকে। সে ফরাসী ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় ভদ্রলোককে। এবারে তিনিও হেসে দেন।

পর্যটক ভদ্রলোকের নাম টোলি বাইণ্ডার (Toly Binder)। তাঁর বয়স তেপ্পান্ন। তিনি বিবাহিত কিন্তু একাই এসেছেন। তাঁর পেশা অধ্যাপনা, বিষয় বায়োলজি। স্বাস্থ্যবান এবং সুশ্রী। বরুণ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়।

টোলি এতক্ষণ বরুণের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলছিলেন। কিন্তু কাজ চালাবার মতো ইংরাজী শিখে তিনি ভারতের পথে পা বাড়িয়েছেন। বিদেশী পর্যটকরা সবাই তা করেন, ইংরেজী শিখে ভারতে আসেন। আর আমরা ভারতবাসীরা সেই ইংরেজীকে তাড়িয়ে দিতে চাইছি। এই আচরণ শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়, একে আত্মহনন বলা যেতে পারে।

কিন্তু ইংরেজীর কথা থাক, ইংরেজীতে টোলি কি বলছেন তাই শোনা যাক। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি তাহলে গিয়ে লাদাখের ওপরে একখানি ভ্রমণকাহিনী লিখছেন?"

"ঠিক করি নি কিছু, তবে ভাল লাগলে হয়তো লিখব।" উত্তর দিই।

টোলি একটু হেসে বলেন, "তার মানে লিখবেন। কারণ লাদাখ আপনার ভাল লাগবেই, সবারই লাগে।"

এবারে আমি প্রশ্ন করি, "লাদাখ দেখে দেশে ফিরে যাবার পরে আমি যদি

আপনাকে লাদাখ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাই, উত্তর পাবো?"

"নিশ্চয়ই।" টোলি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। তারপরে বলেন, "আপনাকেও কিন্তু আমার উত্তরগুলো কেমন লাগল তা জানাতে হবে।"

"বেশ, জানাবো।" সম্মত হয়ে আমি জানতে চাই, "আপনাদের পর্যটন পরিকল্পনা কি?"

টোলি উত্তর দেন, "গতকালই দেশ থেকে শ্রীনগর পৌঁচেছি। আমরা দশ দিন লাদাখে থাকব। বিভিন্ন গুম্ফা এবং হেমিসের উৎসব দেখব। পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারে জঁ লুই। কারণ তার স্ত্রী আনা লুই Explotra নামে যে পর্যটন প্রতিষ্ঠান খুলেছে, আমরা সেই প্রতিষ্ঠানের যাত্রী হয়ে এসেছি। মিসেস লুই এই ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছে।"

"কিন্তু তাঁকে তো আপনাদের সঙ্গে দেখছি না?"

"কে? মিসেস লুই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সে গত সপ্তাহে একা 'লে' চলে এসেছে। আগামী কাল লে বাসস্ট্যাণ্ডে সে আমাদের 'রিসিভ' করবে।

"এখন তাহলে মিঃ লুই আপনাদের নেতা?"

"Yes, for and on behalf of his wife."

মনে মনে ভাবি, বিভাসেরও তো একই অবস্থা। নন্দার পরিকল্পিত ভ্রমণে নেতৃত্ব করার জন্য আমাদের সঙ্গী হয়েছে।

টোলির কথা শুনে সবাই সোচ্চার স্বরে হেসে ওঠে। লুইয়ের কিন্তু লক্ষ্য নেই এদিকে, সে মহুয়া ও তোতাকে ক্যারিকেচার দেখাতে ব্যস্ত। মুখ দিয়ে কখনও কুকুরের ডাক, কখন বিড়ালের ডাক, ভেড়ার ডাক অথবা মোরগের ডাক ডেকে চলেছে। সেই সঙ্গে দু-হাতের দশটি আঙ্গুল দিয়ে কুকুর বিড়াল ভেড়া কিম্বা মোরগ বানাচ্ছে। তার ভাব-ভঙ্গি গলার স্বর ও হাতের কাজ দেখে সবাই মজা পাচ্ছে। মহুয়া আর তোতা হেসে অস্থির। তোতা তার নাম দিয়েছে মজার সাহেব।

Jean যতই মজার মানুষ হোক, তার বয়স বেশি নয় কিন্তু। বড় জোর বছর তিরিশ। লোকটি 'ইকনোমিস্ট'। ভাল চাকরি করত। বছর দুয়েক আগে ছোটবেলার সাথী আনা বোয়ারকে বিয়ে করেছে সে। আনা কিন্তু একটু অন্য প্রকৃতির মেয়ে। বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী কিন্তু চাকরি-বাকরি পছন্দ করে না, পার্টি আর নাচগানও ভাল লাগে না তার। কলেজে পড়ার সময়েই সে আল্‌পস-এর গহন-গিরি-কন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে। গত বছর হানিমুন করতে ভারতে আসে, হিমালয়ে ঘুরে বেড়ায়—লাদাখে যায়।

ব্যস, পড়ে রইল সংসার, ভুলে গেল দেশের কথা। স্বামীকে বলে বসল—তুমি দেশে ফিরে যাও, আমি এখানেই থেকে যাবো। একটা ট্র্যাভেল এজেন্সী খুলব। তুমি দেশে গিয়ে পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা করে কিছু 'মাউণ্টেনীয়ারিং ইকুইপমেণ্ট' কিনে ফেলো আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'ট্যুরিস্ট' যোগাড় করো। তারপরে

তাদের পাঠিয়ে দাও কাশ্মীরে। আমি এখানে তাদের থাকা-খাওয়া ও গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখব, পদযাত্রার বন্দোবস্ত করব। তারা কত টাকা করে আমাদের দেবে, তা আমি হিসেবপত্র করে তোমাকে জানিয়ে দেবো। আমি বলছি, বেশ ভাল আয় হবে আমাদের। এবং আমরা খুবই আনন্দে থাকব।

না। Jean উত্তর দিয়েছে। বলেছে—আমরা মোটেই আনন্দে থাকব না। কারণ তুমি থাকবে ইণ্ডিয়ায় আর আমি থাকব বেলজিয়ামে।

ওমা, তা কেন? আনা স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে—তুমি তো মাঝে মাঝেই ট্যুরিস্ট্দের নিয়ে চলে আসবে হিমালয়ে। তখন আমরা মহানন্দে একসঙ্গে থাকব।

বার বার আমি আসব কেমন করে? Jean জিজ্ঞেস করে—আমার চাকরি?

চাকরি! আনা যেন অবাক হয়েছে—নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে—এই ব্যবসা করলে তুমি চাকরি করবে কেমন করে? চাকরি তোমাকে ছাড়তেই হবে। চাকরি না ছাড়লে তুমি ব্যবসার মূলধন পাবে কোথায়? ইকুইপমেণ্ট কেনার আর বিজ্ঞাপন দেবার পয়সাই বা আসবে কোথা থেকে?

চাকরি ছাড়লে পয়সা পাবে! ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি Jean।

আনা স্বামীর অজ্ঞতায় মনে করে নি কিছু। বরং সে স্বামীকে বুঝিয়ে দিয়েছে—চাকরিতে ইস্তফা দিলেই তুমি প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকাগুলো পেয়ে যাবে। তাই হবে আমাদের ব্যবসার মূলধন।

সাবধানী সংসারীদের কাছে প্রস্তাবটা আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রস্তাব মেনে নিয়েছে Jean, তবে সে আনাকে একা লাদাখে রেখে দেশে ফিরে যায় নি। দুজনে লাদাখের প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থানে গিয়েছে। তারপর শ্রীনগর ও দিল্লীতে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যবসার ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে ভাল করে। অবশেষে দুজনে দেশে ফিরে গিয়েছে। স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে Jean চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুয়িটির টাকা দিয়ে 'Explotra' নামে পর্যটন প্রতিষ্ঠান খুলেছে।

আশাতীত সাড়া পেয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে আনা গত সপ্তাহে লাদাখে চলে এসেছে। সে এখন লে শহরে এদের জন্য অপেক্ষা করছে। এগারো জনের এই প্রথম দলকে নিয়ে Jean গতকাল শ্রীনগর পৌঁচেছে। আজ সে তাঁদের নিয়ে লে চলেছে। আগামী সপ্তাহে আরও চোদ্দজন আসছেন। তাঁরা নিজেরাই শ্রীনগর চলে আসবেন। Jean শ্রীনগর এসে তাঁদেরও এইভাবে লাদাখ নিয়ে যাবে।

Jean ইচ্ছে করলে আরও অনেক বেশি যাত্রী পেতে পারত। কিন্তু একে প্রথম বছর, তার ওপর তাঁবু ও স্লীপিংব্যাগের অভাব। এবারের লাভ দিয়ে ওরা আগামী বছর আরও কিছু সাজ-সরঞ্জাম কিনে ফেলবে। প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার নেবে। আগামী বছর অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশজন যাত্রীর উপযোগী সাজসরঞ্জাম কিনে ফেলতে হবেই। তাহলে ওরা প্রতি বছর দুটি দলে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন বেলজিয়ামবাসীকে হিমালয় ও কারাকোরম দেখাতে পারবে।

Jean কিন্তু বরুণের মারফতে এসব কথা বলল না আমাকে। সে বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারে। Jean ইদানীং ইংরেজী শিখেছে। ব্যবসার প্রয়োজনেই শিখতে হয়েছে তাকে।

ওদের কথা শুনে আমার বার বার জাপানী পর্বতারোহিণী জাঙ্কোর (Junko Tabei) কথা মনে পড়ছে। ছত্রিশ বছরের এই গৃহবধূ আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে (১৯৭৫) এভারেস্ট (২৯,০২৮') শিখরে আরোহণ করে বিশ্বের নারীসমাজকে চিরস্মরণীয় গৌরব দান করেছেন। কিন্তু এই উপহার দেবার জন্য তিনি অভিযানের আগে যে আত্মত্যাগ করেছিলেন, তা কিছু কম স্মরণীয় নয়। জাঙ্কো তাবেই মধ্যবিত্ত গৃহবধূ। স্বামী-স্ত্রী চাকরি করে সংসার চালাতেন। তখন তাঁদের মেয়ের বয়স তিন বছর। ১৯৭৩ সালে জাঙ্কো উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে অভিযানে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। কিন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে জানান যে যোগদানকারী সদস্যাদের অভিযানের অর্ধেক ব্যয় বহন করতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দিতে হবে। বহু চেষ্টা করেও স্বামী-স্ত্রী টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। অবশেষে স্বামীর সম্মতি নিয়ে জাঙ্কো চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকা দিয়ে উদ্যোক্তাদের দাবী মিটিয়ে দিলেন।

জাঙ্কোর আত্মত্যাগ বিফল হয় নি। আমার বিশ্বাস জাঁ লুইয়ের আত্মত্যাগও সফল হবে। অদূর ভবিষ্যতে এক্সপ্লোত্রার ছত্রছায়ায় বহু বেলজিয়ামবাসী হিমালয় দর্শন করবেন। ভারত এবং বেলজিয়ামের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে, মধুর হবে।

কিন্তু আনা লুই এবং জাঙ্কো তাবেই বোধ করি য়ুরোপ অথবা জাপানেই সম্ভব। আর তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্য খেলা-ধূলা অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওঁরা আমাদের থেকে এত এগিয়ে। আমরা পর্বতারোহণ পছন্দ করি, হিমালয়কে ভালোবাসি। কিন্তু পর্বতারোহণ কিম্বা হিমালয়ের জন্য এমন বেহিসেবী হতে পারি না। অথচ ব্যালান্সশীট কষে আর যাই করা যাক, হিমালয়ের পথকে জীবনের পথে পরিবর্তিত করা যায় না।

Jean একে একে তার যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথমেই পরিচয় করায় তার দলের একমাত্র তরুণীটির সঙ্গে। তার নাম কারিণ—মিস কারিণ। ছোটখাটো ভারী সুশ্রী মেয়ে। বয়স বাইশ বছর। কলেজে পড়ে। একাই এসেছে। ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। তবু আমাদের কথা শুনে সর্বদা হাসছে আর মাঝে-মাঝেই তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লজেন্স এবং বিস্কুট বের করে সমানে বিতরণ করছে। বলা বাহুল্য আমরাও বাদ পড়ছি না।

কারিণের পরে Jean যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় তার নাম Jannes Ronald—বয়স বছর তিরিশেক। সুশ্রী ও সাধারণ স্বাস্থ্যের যুবক। অবিবাহিত, পেশা ফটোগ্রাফী। আরও একবার ভারতে এসেছিল, হিমালয়ও দেখে গেছে। সেবারে লাদাখ যেতে পারে নি। তাই আবার এসেছে। রোনাল্ড মোটামুটি ইংরেজী বলতে পারে।

লুই-য়ের অপর আটজন যাত্রী হলেন চার বৃদ্ধ দম্পতি। তাঁদের কথা পরে

বলব। তার আগে এক ও দুই নম্বর সিটের ইংরেজ তরুণ-তরুণীদের কথা বলে নেওয়া যাক। ছেলেটির নাম জন পিটার ও মেয়েটির নাম মেরি থম্পসন। নাম শুনেই বুঝতে পেরেছি তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। সে প্রশ্ন অবশ্য ওঠা উচিত নয়। কারণ দুইজনেরই বয়স পঁচিশ পেরোয় নি। এত অল্প বয়সে ওদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বিয়ের ঝামেলার মধ্যে যায় না। ওরা বোধ করি পড়াশোনার প্রয়োজনেই এদেশে এসেছে। কারণ ওদের দেশে—'Travelling is a part of education.' সবচেয়ে মজার কথা, ওরা দুজনে ইংরেজ হলেও এদেশে এসে ওদের আলাপ। সেই থেকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং এদের আচার-আচরণ দেখে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

আমরা তাই ভাবি। কলকাতা কিম্বা অন্য কোথাও পথে পথে আমরা যখুনি জোড়ায়-জোড়ায় বিদেশী পর্যটকদের দেখি, তখুনি তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ধরে নিই। কিন্তু সে ভাবনা প্রায়ই সত্য নয়। এমন কি তাদের অনেকে এক দেশেরও অধিবাসী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেড়াতে এসে এই দেশে বসে প্রথম পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, তারপরে পথের সাথী—জীবনপথের নয়, ভ্রমণপথের। তারা দিনে একসঙ্গে বেড়ায়, রাতে হোটেলের একঘরে শোয়। সংযমের বড় একটা ধার ধারে না। পাশ্চাত্ত্য সমাজ যৌবনের ধর্মকে অস্বীকার করে না, দেহের দবীকে মেনে নেয়। তারপরে ভ্রমণ-শেষে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। না, বিদায়বেলায় কেউ কারও জন্য চোখের জল ফেলে না। হাসিমুখে দুজনে দুজনের ঘরে ফেরে। পথের সাথীকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। ভুলতে পারে কারণ 'সেক্স' বস্তুটিকে ওরা দৈহিক প্রয়োজনের বাইরে কোনো স্থান দেয় না। যৌনসম্পর্ক কখনই ওদের মনকে প্রভাবিত করতে পারে না। এবং সমাজ ওদের দেশে বড় একটা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না।

তবে সমাজের এই বধিরতা য়ুরোপ ও আমেরিকার জনমানসে শান্তি আনতে পারে নি। ভোগ তাদের সংসারে সুখ এনে দেয় নি। আর তাই বোধ করি হেনরি ফোর্ডের পৌত্র এসে 'ইসকন'-এর সদস্য হয়েছেন—পাতলুন ছেড়ে গেরুয়া ধরেছেন।

কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক। তার চেয়ে পথের দিকে তাকানো যাক, কাশ্মীরের পথে। পথের রোদটুকু মিলিয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তবে বৃষ্টি নামে নি, কেবল বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা বাতাস। আমরা আবার জানলার কাচ টেনে দিই।

বাইরের জগতে কিন্তু জানলা খোলার হাতছানি। পথের ধারে আপেল উইলো পপ্লার আর চিনারের সারি। মাঝে মাঝে বিস্তৃত সমতল, কোথাও বা সোনালী ধানক্ষেত। ক্ষেত ছাড়িয়ে বহুদূরে পাহাড়ের সারি।

ইতিমধ্যে আমরা গাণ্ডারবল ছাড়িয়ে এসেছি। ওখান থেকেই মানসাবল ও উলার হ্রদের পথ আর প্রকৃতপক্ষে ওখানেই সিন্ধুনালা সমতলে অবতরণ করেছে। শ্রীনগর থেকে গাণ্ডারবল ১৯ কিলোমিটার। আর সেখান থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে তুলামুলা গ্রামে বিখ্যাত ক্ষীরভবানী মন্দির।

আমরা সেদিকে যাই নি। শ্রীনগর-লে রোড ধরে এগিয়ে এসেছি বায়ুল, আরও

১০ কিলোমিটার। এখন বাস ছুটে চলেছে কঙ্গনের দিকে। কঙ্গন থেকে শ্রীনগর ৩৮ কিলোমিটার।

সকাল সাড়ে দশটার সময় আমাদের বাস কঙ্গন বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নিশ্চল হল। কণ্ডাক্টর জানালো—পনেরো মিনিটের জন্য যাত্রা-বিরতি। অর্থাৎ আমরা বাস থেকে নেমে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে পারি, এক গ্লাস গরম চা খেতে পারি।

অতএব গাড়ি থেকে নামা গেল। সবার শেষে নামল Jean—তোতা ও মহুয়ার হাত ধরে। ওরা কেউ কারও ভাষা জানে না, তবু বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ভাষার ব্যবধান প্রাণের পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না।

কঙ্গন বেশ বড় জায়গা। পথের পাশে সারি সারি দোকান—মুদি-মনোহারী, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চা-জলখাবারের দোকান। কয়েকটি হোটেলও রয়েছে।

এখান থেকে একটা মোটরপথ গিয়েছে ওয়াঙ্গাট গ্রামে। দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার। উচ্চতা ৬৮০০ ফুট। ওয়াঙ্গাট থেকে গঙ্গাবল হ্রদ ২২ কিলোমিটার। পথে ১৪ কিলোমিটার দূরে (১০,৮০০ ফুট) ট্রাঙ্কল। সেখানে ডাকবাংলো আছে। যাত্রীরা সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে ওয়াঙ্গাটে বাস থেকে নেমে সেদিনই ট্রাঙ্কল হেঁটে যান—ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করেন। পরদিন ১৬ কিঃ মিঃ হেঁটে গঙ্গাবল দর্শন করে ওয়াঙ্গাটে ফিরে আসেন। হরমুখ পর্বতের পাদদেশে ১১,৭২০ ফুট উঁচুতে প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ও দেড় কিলোমিটার প্রশস্ত অনিন্দ্যসুন্দর সুবিশাল সরোবর গঙ্গাবল।

আমরা শ্রীনগর থেকে ৩৮ কিলোমিটার এসেছি। সোনামার্গ আরও ৪৬ কিলোমিটার।

চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দেখা হল গিলগিটের একদল নারী-পুরুষের সঙ্গে। গিলগিট এখন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে, কিন্তু এরা সকলেই বৌদ্ধ। তীর্থদর্শনে এসেছে। শ্রীনগর হয়ে সমতল ভারতে যাবে—দর্শন করবে বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও সাচী স্তূপ ইত্যাদি। পাকিস্তান সরকারকে ধন্যবাদ, তাঁরা ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়েও এদের ভারতে এসে তীর্থদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের কথা চীনের কমিউনিস্ট সরকার আমাদের এমন স্বাধীনভাবে মানস-সরোবর দর্শনের সুযোগ দিতে পারলেন না।

চা খেয়ে উঠে আসি বাসে। ড্রাইভারও এসে গিয়েছে। কিন্তু বাস ছাড়তে পারছে না। কারণ কারিণ এখনও ফিরে আসে নি। কিন্তু তাকে তো চায়ের দোকানেও দেখি নি। গেল কোথায় মেয়েটা!

বরুণ বলে, "চা খেলেও পথে নেমে চা খেয়ে সময় নষ্ট করে না সে। সুযোগ পেলেই পায়চারি করতে করতে চারিদিকটা দেখে নেয়। সে জানে পনেরো মিনিটের যাত্রা-বিরতি। এখুনি এসে যাবে।"

তার অনুমান মিথ্যে হয় না। মিনিট দুয়েক বাদেই হাসিমুখে কারিণ বাসে উঠে আসে। আমরা তারই জন্য অপেক্ষা করছি জানতে পেরে লজ্জা পায়। আমাদেরি মতো হাতজোড় করে আপন ভাষায় ক্ষমা চেয়ে নেয়। ভাষা না জানলেও কারিণের আন্তরিক অনুশোচনা বুঝতে পারি সবাই। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে।

সুম্বাল ছাড়িয়ে এলাম। এখান থেকে শ্রীনগর ৫৪ কিলোমিটার। এখন বেলা

সওয়া এগারোটা। তার মানে বারোটার আগে আমরা সোনামার্গ পৌঁছতে পারব না। সোনামার্গ আরও প্রায় ৩০ কিলোমিটার।

পথের পাশে তেমনি গাছের সারি—আপেল পপ্‌লার আর উইলো, চেরী ও চিনার। তারপরে ছোট ছোট সবুজ পাহাড়। তাদের পায়ের কাছে সমতল ক্ষেত আর গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত—ধানক্ষেত। ডানদিকে ক্ষেতের বুক চিরে বয়ে চলেছে নদী—সিন্ধুনালা, অমরনাথের অমরগঙ্গা ও পঞ্চতরণী নদীর মিলিতধারা। এর সঙ্গে মহাসিন্ধু নদের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু এর নাম সিন্ধুনালা। সলিলবাবুরা এই নদীর জন্মস্থান অর্থাৎ অমরগঙ্গা ও পঞ্চতরণী নদীর সঙ্গম থেকে ফিরে গিয়েছেন।

সিন্ধুনালা নদী নয়, নর্তকী। মুক্তোর মালা গলায় পরে সাদা ঘাঘরা আর ওড়না গায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে নিচে চলেছে। অমরতীর্থ অমরনাথের অমৃতধারা নিয়ে মর্ত্যলোকে যাত্রা করেছে।

মাঝে মাঝে নদী একেবারে পথের পাশে এসে হাজির হচ্ছে। পথের প্রায় সমান্তরাল হয়ে উল্টোদিকে বয়ে চলেছে। হিমালয়ের পথে পদচারণা করার সময় এমন নৃত্যরতা অপরূপা নদী আমি আরও দেখেছি। কিন্তু মোটরপথের পাশে পাশে এমন স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী খুব বেশি নেই হিমালয়ে।

সহসা করুণকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর কানে আসে—

‘ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা॥...
ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা—
আমার চলা যায় না বলা—আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা॥
ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,...’

কয়েক বছর ধরে করুণ রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে গবেষণা করছে। কাজেই তার পক্ষে এই নদী দেখে গানটি গেয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিপদ হচ্ছে বাসের অধিকাংশ যাত্রী বিদেশী আর করুণের গলাটি ভেঙে গিয়েছে।

সুতরাং তার আকস্মিক উচ্চগ্রামের সঙ্গীতধ্বনি বাসের সবাইকে, বিশেষ করে বেলজিয়ামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবং তাঁদের নেতা মজার সাহেব মহুয়ার সঙ্গে খেলা বন্ধ করে করুণকে জিজ্ঞেস করে, "Monsieur! (মঁসিয়ে) Are you singing?"

"Yes." করুণ সানন্দে মাথা নাড়ে। বলে, "This is Rabindra Sangeet, that means a song on river composed by Rabindranath Tagore."

"Tagore! You mean the Great Poet Tagore?"

"Yes." করুণ সগর্বে উত্তর দেয়।

"Very well, then please do not stop, kindly go on with the song of Tagore."

অর্থাৎ ভাঙা গলায় হলেও রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে আপত্তি নেই এদের। কারণ ভারত এদের কাছে অপরিচিত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত—তিনি এদের অতি আপনজন। ভারতের মাটিতে জন্ম নিলেও রবীন্দ্রনাথ তো শুধু ভারতের নন, তিনি বিশ্বকবি। তাহলেও করুণ কিন্তু আর গান গায় না।

একটা পুল পেরিয়ে নদীর বাঁ তীরে এলাম। তবে তা স্বল্পক্ষণের জন্য। মিনিট দশেক বাদেই আবার আরেকটা পুল পেরিয়ে বাস নদীর ডান তীরে চলে এলো। আর তখনি দূরে দেখতে পেলাম সোনামার্গের সবুজ প্রান্তর।

এখন বেলা সওয়া বারোটা। তার মানে শ্রীনগর থেকে ৮৪ কিলোমিটার পথ আসতে তিন ঘণ্টার মতো সময় লাগল।

।। চার ।।

তিব্বতী ভাষায় গিরিবর্ত্মকে বলে 'লা'। জোজি লা (Zoji La) মানে জোজি গিরিবর্ত্ম। ৩৫২৯ মিটার (১১,৫৭৮′) উঁচু এই গিরিবর্ত্মটি কাশ্মীর থেকে লাদাখের প্রবেশ-তোরণ। এই পথে সোনামার্গ কাশ্মীর উপত্যকার শেষ বড় জনপদ। আপাতত সেখানে এসে আমাদের সাময়িক যাত্রাবিরতি ঘটেছে।

সোনামার্গ মানে সোনার ময়দান বা তৃণভূমি—'Meadow of Gold.' চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা একটি অনিন্দ্যসুন্দর সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে পাইনের অপরূপ বিস্তার আর উপত্যকার বুক চিরে সিন্ধুনালার সুমধুর তান। এই উপত্যকাটি একটি আদর্শ স্কি-গ্রাউণ্ড (Ski Ground)। কারণ পাশের পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসা ২৭৪০ মিটার উঁচু (৯০০০′) এই সবুজ প্রান্তরটি শীতকালে চমৎকার তুষারক্ষেত্রে পরিণত হয়।

কিছুকাল আগেও যখন পায়ে হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে লাদাখ যেতে হত, তখন যাত্রীরা জোজি লা-য় আরোহণ করার আগে এখানে শেষ শিবির স্থাপন করতেন। ইংরেজ পর্যটকরা সোনামার্গকে বলতেন—'Jumping off point for trips to Ladakh.'

এখানে 'ট্যুরিস্ট্ হাট' ও 'রেস্ট হাউস' আছে। আছে বেশ কিছু দোকান—হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং নানারকম কাশ্মীরী জিনিসপত্রের দোকান। কাশ্মীর দর্শনার্থীরা প্রতিদিন দলে দলে এখানে আসেন।

আজও এসেছেন। বহু 'বাস' এসেছে। কিন্তু কেউ নামতে পারছেন না। আমাদেরি মতো তাঁরাও বাসে বন্দী হয়ে রয়েছেন। কারণ আবার বৃষ্টি নেমেছে—প্রবল বৃষ্টি।

আমাদের অবশ্য বাস থেকে নামার তেমন দরকার নেই। কারণ আমরা সোনামার্গ দেখতে আসি নি, আর আমাদের সঙ্গে খাবার রয়েছে। শ্রীনগর থেকে লুচি তরকারী ডিমসিদ্ধ ও হালুয়া বানিয়ে এনেছি। তাই দিয়ে লাঞ্চ সারা গেল। মানা ও তরুণ বৃষ্টিতে ভিজেই চা নিয়ে এলো।

বেলজিয়ামের যাত্রীদেরও সঙ্গে খাবার রয়েছে। তাঁরাও বাস থেকে নামেননি। বাসে বসে যতটা সম্ভব সোনামার্গকে দেখে নিচ্ছেন। বৃষ্টি কেবল কারিণকে বাসে বন্দী করে রাখতে পারে নি। সে একটা উইণ্ড-প্রুফ পরে ঠিক নেমে গেছে বাস থেকে। এবং একা যায় নি। সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে রোনাল্ডকে। রোনাল্ড বেচারীর এই বৃষ্টি মাথায় করে শীতের মধ্যে ঘোরাঘুরি করার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করবে? যুবক বয়স, তরুণী ও সুন্দরী সহযাত্রীর পাণিপীড়ন করে পদচারণার লোভ সামলাতে পারে নি।

তবে এদের জন্য আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে ওরা ফিরে এলো কিছুক্ষণ বাদে। Jean গম্ভীর স্বরে নিজেদের ভাষায় কি যেন বলল। রোনাল্ডের মুখ দেখে বুঝতে পারি Jean ওদের তিরস্কার করছে। এবং সে লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু কারিণ নেতার ধমকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপরে তোয়ালে দিয়ে হাত-পা ও মাথা মুছতে মুছতে অনর্গল কি যেন বলে গেল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বোধ করি বৃষ্টি মাথায় করে সোনামার্গে ছুটোছুটি করা কেমন মজার, তারই বর্ণনা দিচ্ছে মাজার সাহেবের কাছে। তার কথা শুনে দলের সবাই হাসতে থাকল। এবং অবশেষে নেতাকে গাম্ভীর্য বিসর্জন দিতে হল।' সে-ও সবার সঙ্গে হেসে উঠল।

ওরা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিয়েছে। তবে আস্তে আস্তে বাস চলছে। একে বৃষ্টি তার ওপরে পথের পাশে সারি সারি ট্যুরিস্ট্ বাস। প্রতিদিনের মতো আজও শত শত দর্শনার্থী সোনামার্গ দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু কেউ বাস থেকে নামতে পারেন নি। তাই বাসগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শনার্থীরা গাড়িতে বসেই যতটা সম্ভব সোনামার্গের সোনার সৌন্দর্য দু-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছেন।

"আমাদেরও সেদিন ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।" হঠাৎ মীরাদি বলে ওঠেন।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না। তাই তাঁর দিকে তাকাই। মীরাদি আবার বলেন, "সেদিন অমরনাথের পথে বলতালে যাবার সময়ও আমাদের সোনামার্গ দেখার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেদিনও বাস থেকে নামতে পারি নি।"

কথাটা আমার অজানা নয়। কিন্তু অনেক সময় জানা কথাও মনে অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এখনও তাই হোল। বৃষ্টির মধ্যে রওনা হয়ে ওরা অমরনাথ পৌঁছতে পারে নি, আমরা কি লাদাখ পৌঁছতে পারব?

কেন পারব না? একথা সত্য যে জোজি লা খুবই দুর্গম। কিন্তু এটা তো স্বেন হেডিনের (Sven Hedin) যুগ নয়, ১৯৮১ সাল। সেকালের সেই দুর্গম পথকে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সহায়তায় যতটা সম্ভব নিরাপদ ও সহজ করে ফেলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হেডিন কিম্বা স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যামের মতো আমরা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছি না, যাচ্ছি শক্তিশালী ও আরামপ্রদ মোটরগাড়িতে চড়ে। আর পারা না পারার প্রশ্ন তো আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ড্রাইভারের। সুতরাং এ ভাবনা থাক।

আমরা সোনামার্গ থেকে বলতাল চলেছি। জোজি লা-র পাদদেশে অবস্থিত অনিন্দ্যসুন্দর

উপত্যকা বলতাল। দূরত্ব সোনামার্গ থেকে ১৩ কিলোমিটার আর উচ্চতা ২৭৪৩ মিটার। অর্থাৎ সোনামার্গ থেকে মাত্র ৩ মিটার উঁচু। বলতাল ছোট জনপদ। ওখানে একটি বিশ্রামভবন ও সরকারী শিবির আছে। সিন্ধুনালার তীরে চমৎকার তৃণাচ্ছাদিত প্রায় সমতল প্রান্তর বলতাল। দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ৯৭ কিলোমিটার।

অমরতীর্থ অমরনাথের দ্বিতীয় পথটি এই বলতাল থেকে—দূরত্ব মাত্র ১৫ কিলোমিটার। শ্রীনগর থেকে কেউ যদি ভোর চারটে নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে বের হন, তবে তিনি বলতাল এসে ঘোড়ায় চড়ে অমরনাথ দর্শন করে সেদিনই রাত ন'টার মধ্যে শ্রীনগর ফিরে যেতে পারেন।*

তবে হ্যাঁ, হিমালয়ের মেজাজটি শান্ত থাকা দরকার। নইলে মীরাদিদের মতো তাঁকেও মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসতে হবে।

বহুকাল থেকেই রমণীয় স্থানরূপে বলতালের নাম বহুল প্রচারিত। শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন—'এমন নিঃসঙ্গ, জনবিরল ও আনন্দদায়ক স্বাস্থ্যাবাস কাশ্মীরে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। এটি জলাশয় প্রান্তবর্তী নিম্ন অধিত্যকা—মনোরম অরণ্যশোভায় সমৃদ্ধ। চারিদিকের ভয়াল ভীষণাকার দৈত্য-রাক্ষস দলের প্রহরার মাঝখানে একটি সুন্দরী শিশুবালিকা যেন নীলনয়না নদীকূলে বসে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আপন মনে পুষ্পমালাহার গেঁথে চলেছে। নিঃশব্দ ও নিঝুম 'বলতাল' সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একক। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপি অঞ্চলটুকু দুইটি ভারতীয় ভূভাগের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। একটি কাশ্মীর, অন্যটি লাদাখ।'

প্রবোধদা বলতাল সম্পর্কে আরও একটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন—বিবাহের অনতিকাল পরে পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রীমতী কমলা নেহেরু বলতালে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিলেন। প্রবোধদার ভাষায়—'তিনি (জওহরলাল) এই অমরাবতীর (বলতাল) অমর্ত্য মহিমার থেকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য যে-মন্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, সেই অমোঘ মন্ত্রটি পরবর্তীকালে নবভারত রচনার কাজে লেগেছিল।'

বলতালের কথা ভাবতে ভাবতে আমি সোনামার্গ থেকে বলতালের পথে এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু বলতাল পৌঁছতে পারলাম না। তার আগেই বাস থেমে গেল।

এ জায়গার নাম নীলগাড। চড়াই পথের ডানদিকে গাড়ি দাঁড়াবার জন্য একফালি জমি রয়েছে। আমাদের বাস পথ থেকে সরে এসে সেখানে আশ্রয় নিল। আগেও কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানা বলে, "ওপর থেকে কন্‌ভয় আসছে।"

কন্‌ভয় মানে মিলিটারী ট্রাকের শোভাযাত্রা। এপথে সর্বদা কন্‌ভয়ের অগ্রাধিকার। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়—'First preference.' অতএব যতক্ষণ না কন্‌ভয় চলে যায়, ততক্ষণ আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।

বৃষ্টির জন্য এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। বেলা দেড়টা বাজে। এতক্ষণে আমাদের জোজি লা পেরিয়ে যাবার কথা। তার ওপরে কন্‌ভয়। জানি না কখন এখান থেকে ছাড়া পাবো, কখন কারগিল পৌঁছব? কারগিল এখনও প্রায় ১১৮ কিলোমিটার,

---

*লেখকের 'অমরতীর্থ-অমরনাথ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গম গিরিবর্ত্ম জোজি লা।

জোজি লা-র প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ডঃ স্বেন হেডিনের কথা—যাঁর কাছ থেকে বিশ্ববাসী এযুগে প্রথম নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের কথা জানতে পেরেছে।*

বড়লাট লর্ড কার্জনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর হেডিন স্টক্‌হোম (সুইডেন) থেকে রওনা হন। তখনকার দিনে য়ুরোপ থেকে ভারতে আসাই ছিল সময়সাপেক্ষ। তার ওপর তিব্বতে যাওয়া। সুতরাং বিদায়বেলায় তাঁর মনে হয়েছে—'it seemed far more uncertain whether I should see all my dear ones again;' কারণ তিনি যে দুর্গম ও দুস্তর পথে রওনা হচ্ছিলেন, সেখানে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি।

যাই হোক্ হেডিন তুরস্ক পারস্য বেলুচিস্তান হয়ে সাত মাস পরে ১৯০৬ সালের ২০শে মে ভারতে পৌঁছোন। তিনি দিল্লী না গিয়ে সিমলা এলেন। কারণ তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই সিমলাতেই ভারত সরকারের সদর দপ্তর।

হেডিন সিমলায় পৌঁছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠলেন। সেখানে তাঁর পুরনো বন্ধু স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড-এর সঙ্গে দেখা হল। হেডিন খুবই খুশি হলেন।

কিন্তু পরদিন বৈদেশিক সচিবালয়ে গিয়ে হেডিন জানতে পারলেন—'The Government in London refuses you permission to pass into Tibet across the Indian frontier...probably because the present Government wishes to avoid everything which may give rise to friction on the frontier.'

হেডিন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর তিব্বতে যাবার উদ্দেশ্য নিবেদন করলেন। লিখলেন—তিনি ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্যই তিব্বত যেতে চাইছেন, তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

তবু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল না। এমন কি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো নিজে চেষ্টা করেও কোনো সুবিধে করতে পারলেন না।

হেডিন কিন্তু তবু পরাজয় স্বীকার করলেন না। করবেন কেমন করে? এই অভিযানের আয়োজন করতে তাঁকে যে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য কেবল বন্ধুদের কাছ থেকেই তখনকার দিনে তাঁকে প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি ভাবলেন—কাশ্মীরে এসে মহারাজার অনুমতি নিয়ে লাদাখ হয়ে তিব্বতে যাবেন।

১৩ই জুন হেডিন সিমলা থেকে বিদায় নিলেন। কালকা আম্বালা ও লাহোর হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছলেন। ১৫ই জুন সেখান থেকে টাঙ্গা করে শ্রীনগর রওনা হলেন। শ্রীনগর পৌঁছতে প্রায় এক সপ্তাহ লেগে গেল। তিনি ২২শে জুন বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল পিয়ার্সের সঙ্গে দেখা করলেন। বুঝতে পারলেন বৃটিশ সরকার তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। কারণ কর্ণেল পিয়ার্স

*'Trans Himalaya'—by Sven Hedin (1910)

তাঁকে জানালেন—"Indian Government has ordered me...not to permit you to cross frontier between Kashmir and Tibet.'

হেডিন তবু নিরাশ হলেন না। তিনি লণ্ডনের সুইডিশ মন্ত্রীকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর জন্য একখানি চীনা পাসপোর্ট সংগ্রহ করার অনুরোধ জানালেন।

ইতিমধ্যে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড কর্ণেল পিয়ার্সের পরিবর্তে কাশ্মীরে বৃটিশ রেসিডেন্ট্ হয়ে এলেন। এবার এই হিমলায়-প্রেমিক ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে হেডিনকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি হেডিনকে বললেন—চীনা পাসপোর্ট পৌঁছবার আগেই আপনি লাদাখ চলে যান। সেখানে গিয়ে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করুন। তবে আপনি দয়া করে 'লে' ত্যাগ করবেন না। পাসপোর্ট হাতে পাবার পরে আপনি নিজ দায়িত্বে তিব্বতে প্রবেশ করবেন।

হেডিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভাবলেন এতদিনে বোধ হয় ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সদয় হয়েছেন। লোকজন যোগাড় ও কেনা-কাটা শেষ করে হেডিন ১৬ই জুলাই (১৯০৬) সদলবলে শ্রীনগর ত্যাগ করলেন। মালপত্র সব ঘোড়ার পিঠে পাঠিয়ে তিনি নিজে নৌকায় গাণ্ডারবল পৌঁছলেন। পরদিন ঘোড়ায় চড়ে 'লে' রওনা হলেন। চতুর্থ দিনে সোনামার্গ ও পঞ্চম দিনে হেডিন বলতাল এলেন। পরদিন অর্থাৎ ২২শে জুলাই হেডিন সদলবলে জোজি লা অতিক্রম করে মাটায়ন পৌঁছোন। ষোড়শ দিনে অর্থাৎ ১লা আগস্ট হেডিন আলচি থেকে 'লে' পৌঁছলেন। অর্থাৎ বাসে যে পথ আমরা দুদিনে যাবো, সেই পথটুকু পাড়ি দিতে হেডিনের ষোল দিন সময় লেগেছিল। আর এই তিব্বত যাত্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর খরচ হয়েছে ৭,২০০ পাউণ্ড। এই অর্থ তিনি নিজেই সংগ্রহ করেছেন, কোনো সরকারী সাহায্য পান নি।

কিন্তু সেকথা থাক। এখন আমাদের যে পথটুকু পাড়ি দিতে হবে, তারই কথা হোক। পঁচাত্তর বছর আগে বলতাল থেকে জোজি লা পার হওয়া প্রসঙ্গে হেডিন কি লিখেছেন, নিশ্চল বাসে সেই কথাই ভাবা যাক। হেডিন লিখেছেন, তখন বলতাল থেকে জোজি লা পর্যন্ত পথ তৈরি হচ্ছিল। প্রায় পাঁচশ' লোক সারা পথ জুড়ে কাজ করছিল। তারই মধ্যে ঘোড়া ও মানুষের বিরাট বাহিনী নিয়ে হেডিন চড়াইপথে এগিয়ে এসেছিলেন। জুলাই মাস, কর্দমাক্ত পথ। তাই হেডিনকে প্রত্যেকটি মালবাহী ঘোড়ার সঙ্গে দুজন করে লোক রাখতে হয়েছিল। আস্তে আস্তে হেডিন দুর্গম গিরিবর্ত্ম জোজি লা-র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হেডিনের ভাষায়—'Slowly and carefully we march up...in which a small winding path has been worn out by the traffic. Water trickles and drops...and here and there small rivulets issue from openings in the snow. After a stretch of good road comes a steep slope along a wall of rock—a regular staircase, with steps of timber laid across the way. It was hard task for laden animals to struggle up.'

ঘোড়াগুলোকে দিয়ে হেডিনকে সেই কঠিন কাজই করাতে হয়েছিল। সেখান

থেকে সিন্ধুনালাকে বহু নিচে সুতোর মতো মনে হচ্ছিল। হেডিনকে সর্বদা মনে রাখতে হয়েছিল যে পা পিছলে কোনো ঘোড়া কিংবা মানুষ যদি নিচে পড়ে যায়, তাহলে তার আর কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হেডিনের ভাবনা থেমে গেল। আমাদের গাড়ি গর্জন করে উঠেছে। তাহলে বোধ হয় কন্‌ভয় শেষ হল। হ্যাঁ, আগের গাড়িগুলো চলা শুরু করেছে। ঘড়ি দেখি—সওয়া তিনটে। তার মানে প্রায় পৌনে দু ঘণ্টা নীলগাডে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তোতা সহসা বলে ওঠে, "জেঠু, একশ' ছেচল্লিশটা গাড়ি গেল।"

মহুয়াও ভাইকে সমর্থন করে।

কন্‌ভয় আসতে দেখেই ওরা দুজনে গাড়িগুলো গুনতে শুরু করে দিয়েছিল। না, ছেলে-মেয়ে দুটোর উৎসাহের প্রশংসা করতে হবে বৈকি।

কিন্তু কন্‌ভয় নয়, আমি ভাবি—আমাদের কথা। এখুনি বিকেল সওয়া তিনটে। এখান থেকে কার্গিল ১১৮ কিলোমিটার। মাঝখানে পেরোতে হবে দুর্গম জোজি লা এবং বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম জনবসতি দ্রাস উপত্যকা। পাঁচ-ছ' ঘণ্টার আগে কিছুতেই কার্গিল পৌঁছতে পারব না। আজ অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে বুঝতে পারছি।

জোজি লা-র চড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। বাসের ইঞ্জিন ফুঁসতে আরম্ভ করেছে। বাস ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। আর আবহাওয়া?

ভাল হওয়া তো দূরের কথা, ক্রমেই যেন আরও খারাপ হচ্ছে। সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আলো খুবই কমে এসেছে। এখুনি যেন সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অথচ এখানে আটটার আগে সন্ধ্যে হয় না। তার এখনও অনেক বাকী।

সহসা বিভাস বলে ওঠে, "নদীর ওপারে যে কয়েকখানি ঘর দেখছেন, ওটা সরবাল গ্রাম। ছোট একটা পাহাড়ী নদী ঐ গ্রামের গা ছুঁয়ে বয়ে এসে সিন্ধু নালায় পড়েছে। সেই ছোট নদীর পাশে পাশে পায়ে-চলা-পথ আছে। ঐ পথ দিয়ে পৌঁছনো যায় কোলাহাই হিমবাহে, সেখান থেকে যাওয়া যায় পহেলগাঁও।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। ইদানীং একটা প্রশ্ন উঠেছে—কোন্ পথে অমরনাথ দর্শন করা উচিত? আমি উত্তর দেব—অমরনাথ যাত্রা পহেলগাঁও থেকেই শুরু করা উচিত। কারণ চন্দনবাড়ি শেষনাগ ও পঞ্চতরণীর পথ অনন্তকালের তীর্থপথ। আচার্য শঙ্কর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সবাই এই পথে অমরনাথ দর্শন করেছেন। কিন্তু দর্শনের পরে যাত্রীরা ইচ্ছে করলে বলতালের পথে ফিরে আসতে পারেন। তাতে পরিশ্রম সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। যাত্রীরা যেদিন সকালে পঞ্চতরণী থেকে গুহাতীর্থে রওনা হবেন, দর্শন করে সেদিন বিকেলেই বলতাল পৌঁছে যাবেন। পরদিন সকালে তাঁরা পায়ে হেঁটে সোনামার্গ গিয়ে সেখান থেকে শ্রীনগরের বাস পাবেন। কুলি বা ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে আগে কথা বলে নিলে, তারা তেমন আপত্তি করবে না।

পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই-পথ। পথের ডানদিকে নদী আর তার দু-তীরে তৃণাচ্ছাদিত প্রায়-সমতল উপত্যকা বলতাল। উপত্যকার ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা একটি পথ। একখানি জীপ যাচ্ছে। দূরে কতগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে, খেলাঘরের মতো মনে হচ্ছে।

মীরাদি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন সব। তাঁর নিশ্চয়ই সেদিনের কথা মনে পড়ছে। ওঁরা যেদিন পায়ে পায়ে ঐ পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন অমরনাথের দিকে। ব্যর্থ হলেও হিমালয়ের পথে পদচারণা সর্বদা সুখ-স্মৃতি। মীরাদি সেই স্মৃতিচারণা করছেন।

"এ জায়গাটার নাম রঙ্গা।" মানা মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "ডানদিকে যে কাঁচা মোটরপথটি বলতালের সমতলে নেমে গেছে, এটা দিয়ে এগিয়ে গেলেই আপনি অমরনাথের হাঁটাপথে পৌঁছতে পারবেন। এখান থেকে অমরনাথ ১৫ কিলোমিটার।"

আমি পথটিকে দেখি—খাড়া উৎরাই হয়ে বলতালের সমতলে নেমে গেছে। চমকে উঠি! এই কি সেই পথ?

অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক ও কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতি কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শ্রীনগরে বাস করছিলেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি স্ত্রী সুজাতা দেবী ও ছোটছেলে রাজর্ষিকে নিয়ে চন্দনবাড়ির পথে অমরনাথ দর্শন করেন। ফেরার পথে ২৮শে জুলাই বলতাল হয়ে শ্রীনগর চলে যেতে চান। বলতাল পৌঁছবার আগেই তাঁরা একটা মিনিবাস পেয়ে যান। বাসটা যাত্রী ধরবার জন্য আইনের নিষেধ অমান্য করে অমরনাথের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। এই শ্রীনগর-লে পথে পৌঁছবার একটু আগে গাড়িটা পথের পাশে পড়ে যায়। কালিদাসবাবু ও সুজাতা দেবী শহীদ হন। রাজর্ষির কিন্তু কিছুই হয় নি। হতভাগ্য পুত্র পিতামাতাকে হারিয়ে দাদাদের কাছে বড় হচ্ছে।*

আমাদের বাস ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। জল আর কাদার দুর্গম চড়াই-পথ। তার ওপরে সামনে গাড়ির সারি। মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছে।

পথের বাঁদিকে মাটি আর পাথরের খাড়া পাহাড়। কোনো গাছপালা নেই। অথচ নিচে ডানদিকে বলতালের সবুজ প্রান্তর। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা।

কিন্তু আবার গাড়ি থামল কেন? আস্তে হলেও এগিয়ে চলেছিলাম, এবারে যে আবার থেমে গেল। বিভাসের দিকে তাকাই। সে বলে, "সামনের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, বোধ হয় কন্‌ভয়।"

"আবার কন্‌ভয়!" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ।" মানা বলে, "মনে হয় একই কন্‌ভয়। তাই তখন সবুজ পতাকাবাহী গাড়িটা যায় নি। কোনো কারণে কিছু গাড়ি পেছনে পড়ে গিয়েছে, এবারে সেগুলো যাবে।"

মানা হয়তো ঠিকই বলেছে এবং তার মানে আবার কন্‌ভয়।

সত্যিই তাই। আমরা তেমনি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর আমাদের ডানদিক দিয়ে একটার পর একটা মিলিটারি ট্রাক নিচে নামতে থাকল। তোতা ও মহুয়া গাড়ি গুনতে শুরু করেছে—এক, দুই, তিন...। আবার কন্‌ভয় পেয়ে ওরা বেজায় খুশি। ওদের তো আমাদের মতো পৌঁছবার ভাবনা নেই। ওদের মতো

---

*লেখকের 'অমরতীর্থ-অমরনাথ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

হতে পারলে আমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।

কিন্তু আমার পক্ষে যে ওদের মতো ভাবনা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। আমি তাই ভেবে চলি। আমার কথা নয়, প্রবোধদার কথা। প্রবোধদা বলেছেন—'জোযি লা'। 'জোযি' শব্দটা শিবজীর অপভ্রংশ। বলেছেন, 'শিবজী, শিয়োজী, শোষি, সর্বশেষ জোযি। এটি শাখাসিন্ধু উপত্যকার প্রান্তভাগ।' তিনি সিন্ধনালাকে বলেছেন 'শাখাসিন্ধু' আর সিন্ধুনদকে 'মহাসিন্ধু'।

সিন্ধুর কথা এখন নয়, তার সঙ্গে দেখা করা আমার এই যাত্রার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কাল দেখা হবে সিন্ধুর সঙ্গে, তখন তার কথা ভাবা যাবে। এখন জোযি লা-র কথা হোক। প্রবোধদা লিখেছেন—'যেটি ছিল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, একালে সেটিকে বৃহৎ ও প্রশস্ত করা হয়েছে। লাদাখ বিজয়ের পরে জরোয়ার সিংয়ের লোকরা এই পথটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন। এটি কাশ্মীর উপত্যকার প্রধানতম ও প্রচীনতম তোরণদ্বার। সেই কারণে এই জোযি লার নির্বিঘ্ন নিরাপত্তার অন্য অর্থ হল, কাশ্মীর তথা ভারতের সামগ্রিক নিরাপত্তা।'

ডঃ সি. এল. দত্ত তাঁর 'Ladakh and Western Himalayan Politics' বইতে জোযি লা সম্পর্কে লিখেছেন—'It connects Ladakh with Kashmir Valley, and is situated "in one of the densest snow belts in the world.'

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম জোযি লা-র এই পথ সম্পর্কে তাঁর 'Ladak' বইতে লিখেছেন—'No road can well be worse than the few marches on the Kashmirian side of the pass (Zoji La) which are still in the same state as described by Izzet Ullah in 1812.' কানিংহ্যাম ১৮৪৬-৪৮ সালে লাদাখ এসেছিলেন।

ডানলোপিলো দেওয়া আসনে বসে কাচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখেই আজ জোযি লা-কে আমার দুর্গম বলে মনে হচ্ছে। অথচ এই দুর্গম গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়েই সেকালে ছিল মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ বা Central Asian Trade Route. আজকের এই মোটরপথের সঙ্গে সেকালের সেই হাঁটাপথের তুলনা করা যাবে না। অথচ সেই পথ দিয়েই সারাবছর ধরে দলে দলে বণিক ঘোড়ার পিঠে পণ্যসম্ভার নিয়ে নিয়মিত পূর্ব তুর্কিস্তান ও চীন থেকে ভারতে যাওয়া-আসা করতেন। তখন পৃথিবীর মানুষ এত সভ্য হয় নি কিন্তু সেই যাওয়া-আসায় কোনো রাজা কোনকালে কোনো বাধা দেন নি। কারণ তখন কোনো 'ইজম্'-এর জন্ম হয় নি এ জগতে।

যাই হোক আজকের চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর ও দুর্গম সেই পথই ছিল সেকালে মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে আসার সবচেয়ে জনপ্রিয় পথ। সেকালের পথিকদের সাহস ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা সত্যই কল্পনাতীত। বিজ্ঞান আমাদের কেবল আরামপ্রিয় স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনা করে তোলে নি, সেই সঙ্গে ভীরু অস্থির এবং কর্মবিমুখও করে তুলেছে।

।। পাঁচ ।।

তোতা ও মহুয়া একালের ছেলে-মেয়ে। সুতরাং তারা সেকালের ধৈর্য পাবে কোথায়? বেশ কিছুক্ষণ ধরে গাড়ি গোনার পরে তারা যখন দেখল কন্‌ভয়ের শেষ নেই, তখন গোনা বন্ধ করে আবার তাদের মজার সাহেবের সঙ্গে আঙ্গুলের খেলায় মেতে উঠল।

আর তার একটু বাদেই মানা সহসা বলে উঠল, "মহুয়া, ঐ দেখো সবুজ নিশান নিয়ে কন্‌ভয়ের শেষ গাড়ি আসছে।"

মহুয়া কিন্তু মানার কথার কোনো উত্তর দিল না। কেনই বা দেবে? আগেই বলেছি কন্‌ভয় শেষ হওয়া আর না-হওয়া ওদের কাছে একই কথা। তবে মানার কথায় আমি পুলকিত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি পথের দিকে তাকাই। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই পরম ঈপ্সিত সবুজ পতাকাটি দেখি। গাড়িখানি চলে যায়, কন্‌ভয় শেষ হয়।

তবু গাড়ির শোভাযাত্রা থামে না। কন্‌ভয়ের পরে বেশ কয়েকখানি বাস ট্রাক ও প্রাইভেট গাড়ি রয়েছে। তারাও কন্‌ভয়ের মর্যাদা নিয়ে আমাদের অতিক্রম করছে। ওরা লাদাখ থেকে যাত্রী অথবা মালপত্র নিয়ে শ্রীনগর ফিরছে।

শোভাযাত্রা শেষ হল ঠিক বিকেল পাঁচটায়। তার মানে এখানেও আমাদের ঘণ্টাখানেক দাঁড়াতে হল। এই একঘণ্টায় কিন্তু আবহাওয়ার কোনো উন্নতি হয় নি। বরং আরও অবনতি ঘটেছে। তারই মধ্যে আবার যাত্রা হল শুরু।

বিভাস ভরসা দেয়, "আজ বোধ হয় আর কোনো কন্‌ভয় আসবে না।"

তার আশ্বাসে আশ্বস্ত হই না। বরং 'বোধ হয়' শব্দটায় অস্বস্তির কারণ রয়েছে। তবু আশা করি—আজ আর কোনো কন্‌ভয় আসবে না। এখন থেকে আমরা একটানা পথ চলে কার্গিল পৌঁছতে পারব।

তাহলেও যে রাত দশটা বেজে যাবে। একে ছোট জনপদ, তার ওপরে একদিনে ১৭৬৮ মিটার থেকে ২৬৫০ মিটারে পৌঁছব। অত রাত্রে সেখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে কি? কি খাবো? শীতের হাত থেকেই বা কেমন করে পরিত্রাণ পাবো? কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে কি লাভ? যা হবার তখন হবে। এখন পশ্চিম হিমালয়ের শেষ গিরিবর্ত্ম জোযি লা-কে দেখা যাক।

আমরা জোযি লা-য় উঠছি। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। পড়বে কেমন করে? এখানে যে জল আর জল হয়ে থাকতে পারে না। ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যায়। তাই বৃষ্টির বদলে পেঁজা তুলোর মতো তুষার পড়ছে—অবিশ্রান্ত ধারায়। প্রায় এক বছর পরে তুষারপাত দেখছি। ভারী ভাল লাগছে।

আবার পথের দিকে তাকাই, শিউরে উঠি। সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা চড়াই-পথ। মাটি বরফ আর জল মিলে কর্দমাক্ত। প্রচণ্ড শব্দ করে দুলতে দুলতে বাস কোনোরকমে এগিয়ে চলেছে।

পথের একপাশে গভীর খাদ, আরেক পাশে মাটি আর পাথরের বৃক্ষহীন পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে তুষারের আস্তরণ। কোথাও সেই তুষারগলা জলের ধারা নেমে

আসছে পথে আবার কোথাও বা দু-একটি করে শহীদস্তম্ভ। তাদের গায়ে দুর্ঘটনা কিম্বা যুদ্ধে মৃত সেই শহীদদের নাম লেখা। তাঁদের স্মৃতিরক্ষা ছাড়াও বোধ করি এই সব শহীদস্তম্ভ নির্মাণের আরেকটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো এই পথে অসাবধানতার পরিণামটি মোটরচালকদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাম-না-জানা সেই শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করি আর ভাবি—যে কোনো মুহূর্তে তো আমাদের এই দোদুল্যমান বাসখানিও পাশের খাদে পড়ে যেতে পারে। আর তাহলে হয়তো কর্তৃপক্ষ আমাদের স্মৃতিরক্ষার্থেও এখানে একটি শহীদ বেদি নির্মাণ করে দেবেন।

না, এ ভাবনায় বিচলিত হবার কিছু নেই! মরতে তো একদিন হবেই। সে মৃত্যু যদি কালিদাসবাবুর মতো হিমালয়ের পথে হয়, তাহলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?

গাড়ির 'উইণ্ড-স্ক্রীণ'-এর ওপর অবিশ্রান্ত ধারায় তুষার পড়ছে। শক্ত বরফ নয়, নরম তুষার—ফ্লেক্স। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীণের ওপর জমে যাচ্ছে—সাদা একটা আস্তরণের মতো হয়ে থাকছে। 'ওয়াইপার' আপ্রাণ চেষ্টা করে কেবল এক চিলতে জায়গা পরিষ্কার রেখেছে কোনোমতে। সেইটুকু দিয়েই ড্রাইভারকে তার দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে হচ্ছে।

সেই ফাঁকা জায়গাটুকুর ভেতর দিয়ে আমারও দৃষ্টি পড়ে পথের দিকে। আর তখুনি দেখতে পাই লেখাটা। পথের পাশে একখানি পাথরে লেখা রয়েছে—

'Leh 334 Kms.
Gumri 10 Kms.'

গুম্‌রি থেকেও অমরনাথের একটি হাঁটাপথ আছে। কিন্তু গুম্‌রির কথা এখন থাক, এখন জোষি লা-র কথা হোক। এই গিরিবর্ত্ম সম্পর্কে ডাঃ এ. স্টেইন্‌ বলেছেন, 'Zoji La also forms ethnographic watershed between Kashmir and..the Indus region. It often brings refreshing winds and storms into the Dras valley....It was through it that in 1532 Mirza Haider first invaded Kashmir. Later in1681-84, It was through this pass that the Mughal forces saved Ladakh from the strangle-hold of the Tibeto-Sokpa (Mongol) invaders.'*

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রায় সীট থেকে পড়ে যাই। কোনোমতে সামলে নিই নিজেকে। ভাবনা থেমে যায়। বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা বাসে করে জোষি লা-য়ে চলেছি। মনে মনে জোষি লা-র কথাই ভাবছিলাম বসে বসে।

না, কোনো দুর্ঘটনা নয়। একটা খাড়া বাঁক ফেরার সময় বাসটা অমন দুলে উঠেছিল। এখন আবার স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চলেছে।

মানা মৃদু হেসে বলে, "আমরা ক্যাপ্টেন মোড় পার হয়ে এলাম।"

এই ক্যাপ্টেন ভদ্রলোকের নাম জানি না। তবে শুনেছি এখানে পথ তৈরি

করার সময় তিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁকে দেখি ।ন, কেবল দেখতে পেলাম তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত একটা ভয়ঙ্কর মোড়। বাসের ব্রেক নেহাৎ বিশ্বস্ত বলেই বাঁকটি পেরিয়ে আসতে পারলাম। টাটা কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়ে জোযি লা-র করুণা প্রার্থনা করি।

এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তুষারপাত কিছু কমেছে, কিন্তু থেমে যায় নি। দু-দিকে খানিকটা অবধি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে একটা বরফের দেওয়াল বা 'আইস ওয়াল'। তার তলা দিয়ে জল চুঁইয়ে পথে নেমে আসছে। পথে বরফের কাদা। মাঝে মাঝে চাকা ফসকাচ্ছে। ড্রাইভার সজোরে 'ব্রেক্' চেপে গাড়ি সামলাচ্ছে—যাতে আমরা পেছনদিকে গড়িয়ে না পড়ি। ডাইনে পাহাড়। তার গায়ে তুষারপ্রলেপ। তবে মাঝে মাঝে পাথর বেরিয়ে আছে—নানা রঙের পাথর। লাল সাদা কালো, আরও কতো রং—ভারী সুন্দর।

আবার শিউরে উঠি। পথের পাশে ছোট একটা মন্দির। না, দেবালয় নয়। মন্দিরের মতো হলেও এটি একটি শহীদবেদি। তার মানে দুর্ঘটনাস্থল। কেউ বা কারা সুন্দরকে দেখতে দেখতে ভয়ঙ্করের শিকার হয়েছেন।

'Zoji La'. পথের ধারে একখানি চৌকো পাথরে লেখা।

পুলকিত হয়ে উঠি। প্রকৃতির প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে আমরা জোযি লা-র ওপরে উঠে এসেছি। দু-দিকের পাহাড় দূরে সরে গিয়েছে। মাঝখানে মাটি আর বরফের প্রায়-সমতল প্রান্তর। তারই ওপর দিয়ে আমাদের বাস অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন বিকেল পৌনে ছ'টা।

ইতিমধ্যে তুষারপাত আরও কমে গেছে। এখন অনেকটা দূর অবধি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুদিকে পাহাড়—মাঝখানে সামান্য উঁচু-নিচু তুষারাবৃত উপত্যকা। তবে তুষারের ঘনত্ব এক নয়, তাই সর্বত্র সাদার উজ্জ্বলতা সমান নয়। কোথাও মেঘের মতো হালকা সাদা, কোথাও রূপোর মতো ঘন সাদা, কোথাও বা ধূসর কিম্বা কালচে সাদা। সাদার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে কিছু কিছু কালো পাথর জেগে আছে। কালো হলেও তারা কিন্তু নিকষ কালো নয়। কোনোটি খয়েরী কালো, কোনোটি লালচে কালো, কোনোটিতে আবার সাদা সাদা ছোপ।

আমরা গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে চলেছি। মাত্র ৩৫২৯ মিটার (১১,৫৭৮') উঁচু, কিন্তু এটি হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিবর্ত্মগুলোর অন্যতম। আমি পর্বতাভিযাত্রী নই, একজন অতি সাধারণ হিমালয়-পথিক। সুতরাং দুর্গম গিরিবর্ত্মের ওপর উপস্থিত হতে পারার জন্য আমি মোটেই পুলকিত নই। আমি আনন্দিত অন্য কারণে। জোযি লা শুধু লাদাখের প্রবেশতোরণ নয়, জোযি লা আর্যাবর্ত ও মধ্য এশিয়ার মিলনবিন্দু—হিমালয়ের শেষ সীমা। আমি আজ হিমালয় পেরিয়ে কারাকোরামের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলাম।

ঠিক তিরিশ বছর আগে সিমলায় প্রথম হিমালয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপরে

*Ladakh and Western Himalayan Politics'

বহুবার হিমালয়ে এসেছি। কখনও গাড়ি করে, কখনও বা পায়ে পায়ে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু অসীম হিমালয়ের সীমা দেখতে পাই নি। আজ সেই সীমাহীন হিমালয়ের সীমা দর্শন হোল। হিমালয়ের পথ ধরে আমি হিমালয় পেরিয়ে এলাম।

হিমালয় তোমাকে প্রণাম! না, না, তোমার কাছে বিদায় চাইছি না। আবার আমি আসব ফিরে। ফিরে আসব তোমার কোলে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো—কারাকোরাম যেন তোমারই মতো করুণা করে আমাকে।

একে ভাঙা-চোরা, তার ওপরে নরম তুষার। মূল-পথটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাই ড্রাইভার বাস নামিয়ে নিয়ে এলো পথের পাশে। তুষারাবৃত সমতলের ওপর দিয়ে চলল এগিয়ে।

হেলে-দুলে ধীরে ধীরে বাস চলেছে। আমরা দেখছি আর দেখছি। তবু আশ মিটছে না।

বেশ খানিকটা মাটির ওপর দিয়ে চলে বাস আবার মূল-পথে উঠে এলো। একটু উঁচু বলেই বুঝতে পারছি পথ। নইলে যে যেখান দিয়ে পেরেছে গাড়ি নিয়ে গিয়েছে। ফলে সারা সমতল জুড়েই গাড়ির চাকার দাগে পথ তৈরি হয়ে গেছে। সেগুলো যে পথ নয়, ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই।

ড্রাইভার আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে—গাড়ি থামায়। তাড়াতাড়ি নেমে আসি পথে। না, গিরিবর্ত্মের ওপরে। চেয়ে চেয়ে চারিদিকে দেখি—ঠিক সমতল নয়, কয়েকটা স্তর। দুদিকের পাহাড় থেকে সমতলটা কয়েকটি স্তরে নেমে এসেছে এখানে। প্রায় সর্বত্র নরম তুষার। তারই ওপরে পদচারণা করি। বরুণ ছবি নেয়। ছবি নেয় অন্যান্য দেশী-বিদেশী দর্শনার্থীরা।

আবার সেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি। আমি আজ অসীম হিমালয়ের সীমান্তে পদচারণা করছি। এতকাল কেবল হিমালয়ের একদিকেই আরোহণ কিম্বা অবরোহণ করেছি। আজ আমি হিমালয়ের অপরদিকে অবতরণ করব—পৌঁছব মধ্য এশিয়ায়, কারাকোরামের পদপ্রান্তে।

ক্ষুদ্র এই জীবনে এর আগে বহুবার গাড়ি চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে হিমালয়ের অনেক গিরিবর্ত্মে আরোহণ করেছি। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর ও সুন্দর গিরিবর্ত্ম জীবনে খুব বেশি দেখি নি। চারিদিকে কোমল তুষার। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। বেশ জোরে জোরে বাতাস বইছে। বাতাস তো নয়, বরফের হুল। অল্প হলেও একটু একটু বরফ পড়েছে বৈকি! তার মধ্যে পরমানন্দে পায়চারি করছি। এমন দৃশ্যের মাঝে দাঁড়াবার সুযোগ তো বেশি আসবে না এ জীবনে।

তাহলেও জোযি লা-র বুকে বেশিক্ষণ পদচারণা করার সুযোগ পেলাম না। ড্রাইভার সমানে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল। বিরক্ত মনে গাড়িতে উঠে বসি।

কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি ছাড়তে পারে না। যথারীতি কারিণ ফিরে আসে নি। সে কি! মেয়েটা গেল কোথায়?

কোথায় আবার যাবে? খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আপনমনে জোযি লা-কে দেখছে। গাড়ির হর্ন বোধ করি ওর কানে ঢুকছে না। খুবই স্বাভাবিক। সে যে সুদূর বেলজিয়াম থেকে এসেছে। বেড়াতে বেরিয়েও যারা পিছুডাক শুনতে পায়, কারিণ তাদের দলে নয়। সে জোযি লা-কে দু'চোখ ভরে দেখছে আর তার কথা শুনছে দু কান দিয়ে।

কিন্তু কণ্ডাক্টর তাকে আর সে সুযোগ দেয় না। সে ছুটে যায় কারিণের কাছে। তাকে ধরে নিয়ে আসে।

কারিণ বাসে ওঠে। জাঁ তাকে যেন কি বলল। বোধ করি তিরস্কার করল। তার জন্য যে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কারও কোনো লোকসান হয়েছে কি? না। বরং কিছু লাভ হল। কারিণের জন্য জোযি লা-য় আমরা কয়েক মিনিট বেশি থাকতে পারলাম।

বাস চলতে শুরু করেছে। তুষারাবৃত প্রায়-সমতল পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। বাঁয়ে-ডাইনে, সামনে-পেছনে সেই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্য। বাইরে বরফ সামান্যই পড়ছে। তবে হাওয়া রয়েছে। কিন্তু গাড়ির সব জানালা বন্ধ। ভেতরে বসে পবনদৈত্যের দাপাদাপি তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

মিনিট পাঁচেক পরে আমরা গুম্‌রি পৌঁছলাম। আগেই বলেছি এখান থেকে সোজা দক্ষিণে অমরনাথ যাবার একটি পথ আছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য সে পথ নয়। কারণ পথে প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার ফুট উঁচু গুম্‌রি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হয়। বেশ বিপজ্জনক পথ, দূরত্বও কম নয়—প্রায় পনেরো কিলোমিটার। বিভাস মানা স্বপন তরুণ কিরণ ও বরুণ সেই পথে অমরনাথ থেকে এখানে এসেছে। সে যাত্রায় বিভাসের সঙ্গে আরও কয়েকজন পর্বতাভিযাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে মানিক, দীপঙ্কর ও অসিত আমার পরিচিত।

গুম্‌রি ছাড়বার পরেই পথের বরফ প্রায় শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল উৎরাই। অর্থাৎ আমরা হিমালয়ের অপর পারে অবতরণ করছি। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যে হিমালয় পেরিয়ে এসেছি।

বরফ পড়ছে না কিন্তু পথের পাশে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কিম্বা বাঁদিকের নদীতে ও নদীর তীরে বেশ বরফ জমে আছে। অবশ্য এতক্ষণ যে বরফ দেখেছি, তার তুলনায় কিছুই নয়।

এখন বিকেল সাড়ে ছ'টা। শ্রীনগর থেকে জোযি লা ১১০ কিলোমিটার। এই পথটুকু আসতে ন' ঘণ্টার বেশি লাগল। আজ আমাদের আরও অন্তত নব্বুই কিলোমিটার পথ যেতে হবে।

আজ অবশ্য পথে আর কন্‌ভয়ের অত্যাচার সইতে হবে না। কেবল দ্রাস-এ দাঁড়াতে হবে একবার। একে তো বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম জনবসতি দ্রাস উপত্যকাকে ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে চাই, তার ওপরে এক গেলাস গরম চা না হলে আর বসে থাকা যাচ্ছে না। তাই মনে হয় কার্গিল পৌঁছতে আরও অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে—তার মানে রাত প্রায় বারোটা হয়ে যাবে। পাহাড়ী

পথে রাতে বাস চালানো নিষেধ। তাহলে কি আমরা আজ কার্গিল পৌঁছতে পারব না? কোথায় থাকব? দ্রাসে? ওরে বাবা, সেখানে যে ভীষণ ঠাণ্ডা!

কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করি, "সর্দারজি, আজ রাতে আমরা কোথায় থাকব?"

"কার্গিল।" সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেয়।

"কখন পৌঁছব?"

"আউর চারঘণ্টা লাগেগা। আগে অচ্ছা রাস্তা মিলেগী।"

কণ্ডাক্টরের কথায় আশ্বস্ত হই। নিশ্চিন্তে আবার পথ দেখা শুরু করি। পথের ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে পাহাড়ী নদী। কোথাও বরফে ঢাকা, কোথাও দু-তীরে বরফ, মাঝখানে জলধারা, কোথাও বা শুধু স্রোতস্বিনী। সেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

তাই তো চলবে। এখন থেকে সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে পৌঁছে দেবে দ্রাস উপত্যকায়। আর তাই এই গিরিনদীর নাম দ্রাস নালা।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে আবার পিচ্ রাস্তার দেখা পাওয়া গেল। এখন আর পথের পাশে তুষার নেই। নদীও বরফমুক্ত। শুধু তাই নয়, দিনের আলো অনেক বেড়েছে। রোদ নেই কিন্তু সামনে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

তাই তো দেখাবে। আমরা যে মেঘের দেশ পেরিয়ে এসেছি। হিমালয় অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ার মালভূমিতে পদার্পণ করছি। এসেছি তিব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণ—ভারতের শেষ ভূখণ্ড লাদাখে। এখানে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই।

লাদাখ একটি পার্বত্য প্রদেশ, কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক অঞ্চল। সামুদ্রিক জলীয় বাষ্প হিমালয় অতিক্রম করে এখানে আসতে পারে না, ফলে যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। তবে গ্রীষ্ম খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং শীত দীর্ঘস্থায়ী। এখানে সেপ্টেম্বর থেকে মে পর্যন্ত শীতকাল। জুলাই হচ্ছে সবচেয়ে গরম মাস আর জানুয়ারী সবচেয়ে ঠাণ্ডা। শীতকালে এই দ্রাস উপত্যকায় শুনেছি বিশ ফুটের মতো বরফ পড়ে।

লাদাখে আর্দ্রতা এতই কম যে কাশ্মীর উপত্যকায় যেসব গাছে জল দেবার দরকার হয় না, সেসব গাছও এখানে জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। অথচ লাদাখে জলের একমাত্র উৎস নদী। তাই নদীর কাছাকাছি সমতল ক্ষেত্রগুলোতে কেবল কিছু বার্লি ও ফলের গাছ বাঁচে।

জলাভাব লাদাখের নিত্যসহচর। এখানে শুষ্কতা এত বেশি যে কখনো বজ্রপাত হয় না, বিদ্যুৎ চমকায় না।

পিচ্‌রাস্তা হলেও মাঝে মাঝে ভাঙা। তার ওপরে আঁকাবাঁকা। গাড়ি দুলতে দুলতে নিচে নেমে চলেছে। পাশের পাহাড়ের গায়ে গাছপালা নেই। তবে এখানে ওখানে একটু-আধটু ঘাস দেখতে পাচ্ছি।

পথের বাঁদিকে খানিকটা নিচে দ্রাস নদীর তটভূমিতে একফালি সবুজ ময়দান—প্রায় সমতল। যেমন অবস্থান, তেমনি সৌন্দর্য। একটি আদর্শ শিবিরস্থলী বা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি।

মানা বলে, "জায়গাটার নাম মীনামার্গ। আগে যখন পায়ে হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায়

চড়ে জোযি লা পেরোতে হত, তখন যাত্রীরা এখানে রাত্রিবাস করতেন।"

খুবই স্বাভাবিক। লাদাখের যাত্রীরা দুর্গম জোযি লা পার হবার আগে এখানে শক্তিসঞ্চয় করে নিতেন। আর কাশ্মীরের যাত্রীরা জোযি লা পেরিয়ে এসে এখানে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মীনামার্গের মিল নেই। এ যেন মরুভূমির মাঝে মরূদ্যান। বলতালের পরে আর এমন সবুজ চোখে পড়ে নি। সবুজ সর্বদা চোখ দুটিতে স্নিগ্ধতার পরশ বোলায়। আমি তাই অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি মনোমুগ্ধকর মীনামার্গের দিকে।

বাস বেশ জোরে চলেছে এখন। মীনামার্গ পেছিয়ে পড়ে, আমরা এগিয়ে আসি। পথের পাশে একখানি পাথরে লেখা—'Kargil 89 kms.' দ্রাস নদীর তীর ধরে আমরা উত্তর-পূবে ছুটে চলেছি। দ্রাস নদী আমাদের মতো স্বেন হেডিনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি লিখেছেন—'The Dras is an imposing river; its waters pour over numerous blocks that have fallen into its bed, and produce a dull grinding sound...'

পঁচাত্তর বছর পরেও দ্রাস তেমনি মনোরম নদী। আজও তার বুকে তেমনি প্রস্তরপ্রবাহ, তাদের ওপর দিয়ে একই ভাবে বয়ে চলেছে গর্জনশীলা স্রোতস্বিনী।

বিকেল সাতটায় আমরা মাটায়ন এলাম। সেই বলতাল ছাড়াবার পরে এই প্রথম বাড়ি-ঘর পেলাম। ছোট হলেও একটি সুন্দর ও সবুজ উপত্যকা মাটায়ন। পথের পাশে উইলো গাছের সারি। তারা ভূমিক্ষয় থেকে রক্ষা করছে এই উপত্যকাটিকে। কিছু ক্ষেত কয়েকটি বাড়ি-ঘর এবং একটি গুম্ফা নিয়ে মাটায়ন।

প্রাচীন গ্রাম মাটায়ন। হেডিনের আমলেও এখানে গ্রাম ছিল। শ্রীনগর থেকে যাত্রা করে তিনি ষষ্ঠ রাত এখানে কাটিয়ে সপ্তম দিনে দ্রাস পৌঁছেছিলেন। তখন এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। তারই মধ্যে তাঁকে তাঁবু টাঙ্গাতে হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯০৬ সালের জুলাই মাস।

রাত্রিবাস তো দূরের কথা, ড্রাইভার একবারটি থামল না পর্যন্ত। কণ্ডাক্টর তার হয়ে ওকালতি করে—এখানে ভাল চায়ের দোকান নেই। দ্রাসে চা খাবেন। দ্রাস এসে গেছে। আর মাত্র ১৭ কিলোমিটার।

কিছুক্ষণ আগে সতেরো কিলোমিটার শুনে পুলকিত হতে পারতাম না। কারণ সোনামার্গের পরে ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে জোযি লা পৌঁছতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেগেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সতেরো কিলোমিটার সত্যই খুব দূর নয়। কারণ উচ্চতা যাই হোক, প্রায় সমতল ও সোজা পথ। বাস বেশ জোরে চলেছে।

পথের পাশে পাহাড়। পাহাড়ের রং কিন্তু সাদা নয়, বরফ নেই কোথাও। পাথরগুলিও কালো নয়, লালচে—ভারী সুন্দর। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখছি আর দেখছি। এ যেন এক নূতন দেশ। বৃক্ষহীন শুষ্ক অথচ বিচিত্র বর্ণের অনিন্দ্যসুন্দর পার্বত্যপ্রদেশ। এত বছর ধরে দেখা হিমালয়ের সঙ্গে এর নেই কোনো মিল। আমিও কবির মতো অনায়াসে গেয়ে উঠতে পারি—

'এলেম নূতন দেশে—

তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে॥
অচিন মনের ভাষা শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙীন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল—
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে॥
এলেম নতুন দেশে...'

প্রবোধদাও তাই বলেছেন—'নূতন বিশ্বভুবন।...৫/৭ মাইলের ব্যবধান মাত্র, কিন্তু দৃশ্যমান জগতে এমন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, যেটি কতক্ষণের জন্য বিস্ময় ও স্তব্ধতা আনে।'

সন্ধ্যের আগেই আমরা দ্রাস পৌঁছে গেলাম। শ্রীনগর থেকে ১৪৭ কিলোমিটার এলাম। ঘড়ি দেখি—সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ। সন্ধ্যা না হলেও গোধূলিবেলা। তবে এখনও কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর দূরে কেমন একটা মোহময় পরিবেশ। সেই মোহ যেন নিঃশব্দে কাছে এসে আমাদের মনগুলোকে মোহাবিষ্ট করে তুলছে।

পথের পাশে উইলো আর পপ্লারের সারি। তাদের ছায়ায় দোকানপাট বাড়িঘর। তারপর প্রশস্ত উপত্যকা—অনেকটা জুড়ে ভুট্টা ও যবের ক্ষেত। দু-দিকের পাহাড় বহুদূরে সরে গেছে।

আগেই বলেছি ১১,১৯৬ ফুট উঁচু দ্রাস পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম জনপদ। প্রবোধদা বলেছেন, প্রথমটি নাকি আলাস্কা। সেই সঙ্গে প্রবোধদা দ্রাস সম্পর্কে লিখেছেন, 'কিন্তু প্রকৃতির এই সাংঘাতিক চেহারার কাছে দ্রাস পরাজয় স্বীকার করে নি। লোকসমাগম এখানে প্রচুর এবং এই তুহিন উপত্যকার এখানে-ওখানে একাধিক গ্রাম বা জনপদ দেখতে পাচ্ছি।'

বাস থামতেই নেমে এসেছি পথে। চায়ের দোকান থেকে এক গেলাস চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি আর এই শীতল উপনিবেশের কথা ভাবছি। ভাবতে ভাল লাগছে আমি এখন এশিয়ার শীতলতম জনপদে পদচারণা করছি।

আর তারই মধ্যে আজকের দিনটির অবসান হল। দিনের আলো গেল মিলিয়ে, লাদাখের বুকে নেমে এলো আঁধার। সিন্ধুর দেশে সন্ধ্যা হল। এই সুন্দর সন্ধ্যাটির কথা অনেকদিন মনে থাকবে আমার।

বেশিক্ষণ বিচরণের অবকাশ পাওয়া গেল না। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। সে নিরুপায়। আমরা শ্রীনগর থেকে মোটে ১৪৭ কিলোমিটার এসেছি। আরও ৫৬ কিলোমিটার পথ যেতে হবে। না গেলেও চলতে পারে। কারণ এখানে নির্মাণ বিভাগের একটি বিশ্রাম-ভবন আছে। কিন্তু শীতের ভয়ে এখানে কেউ থাকতে চায় না। আমরাও থাকব না।

গেলাসটা দোকানীকে ফিরিয়ে দিয়ে উঠে আসি গাড়িতে। আর এসেই অবাক হতে হয়—কারিণ তার জায়গাটিতে চুপচাপ বসে আছে। তার এমন সুশীলা হবার

কারণ বুঝতে পারছি না।

ড্রাইভার স্টার্ট দেয়, গাড়ির হেডলাইট জ্বলে ওঠে। রাতের আঁধার নেমে এসেছে লাদাখের শীতল মাটিতে। সেই আঁধারের বুক চিরে পথ করে নিয়ে আমাদের যেতে হবে এগিয়ে।

আমরা পারব, নিশ্চয়ই পারব পৌঁছতে। এ তো আজকের পথ নয়, অনন্তকালের পথ। যুগাতীত কাল ধরে কত অসংখ্য মানুষ এই পথে যাওয়া-আসা করেছেন। সেকালে এ পথ এমন প্রশস্ত ছিল না, ছিল না এমন সমতল, ছিল না কোনো কলের গাড়ি। পায়ে হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা যাওয়া-আসা করেছেন। আর আমরা কলের গাড়ির সওয়ার হয়ে পৌঁছতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সবে আটটা। আর মাত্র ৫৬ কিলোমিটার। উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রায় সোজা ও সমতল পথ। বড়জোর ঘণ্টা তিনেক লাগবে। রাত এগারোটার মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই কার্গিল পৌঁছে যাবো।

॥ ছয় ॥

আমার অনুমান কিন্তু সত্য হয় নি। আর তাতে ভালই হয়েছে। গতকাল দ্রাস থেকে রওনা হয়েছিলাম সন্ধ্যা আটটায়। ভেবেছিলাম ৫৬ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ, রাত এগারোটার আগে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু আমরা সাড়ে দশটায় পৌঁছে গিয়েছি এখানে।

কার্গিল একটি পাহাড়ী শহর। উচ্চতা ২৬৫০ মিটার (৯০০০´)। লাদাখ শীতের দেশ। সুতরাং সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জনজীবনে তন্দ্রা নেমে আসার কথা, তাই অত রাতে দোকানপাট ও হোটেল খোলা থাকতে দেখে অবাক হয়েছি। পরে বুঝেছি—শ্রীনগর এবং লে থেকে আসা শেষ বাসখানি না পৌঁছনো পর্যন্ত কার্গিল ঘুমোতে যায় না। কারণ সে বাসযাত্রীদের রাতের আশ্রয়। কাল কার্গিল তাই আমাদের জন্য জেগে বসেছিল।

হোটেলের লোকও দাঁড়িয়েছিল বাস স্ট্যাণ্ডে—ক্রাউন হোটেল। নন্দা আগেই তাদের চিঠি দিয়েছিল। লোকটি একটা ঠেলা ঠিক করে মালপত্র হোটেলে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং আশ্রয় পেতে কোনো অসুবিধে হয় নি। চিঠি না লিখলেও অসুবিধে হত বলে মনে হয় না। কারণ এখানে বহু হোটেল ও অন্যান্য আশ্রয়। তবে বাস থেকে নেমে একটু শীত করেছে। করারই কথা। আমরা ১৭৬৮ মিটার উঁচু শ্রীনগর থেকে একদিনে সোজা ২৬৫০ মিটারে উঠে এসেছি। তার ওপর লাদাখের শীত ভুবনবিখ্যাত। তবে হোটেলে পৌঁছবার পরে আর তেমন শীত টের পাই নি।

হোটেলটি বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে। একেবারে নূতন বাড়ি। দোতলায় সব ডাবল-বেড রুম। আমরা পাশাপাশি পাঁচখানি ঘর নিয়েছি। একখানি ঘরে এ্যাটাচ্‌ড বাথ, বাকি চারখানির জন্য দুটি বাথরুম।

হরেন ও কালী স্টোভ ধরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাল ও তরকারি রেঁধে ফেলেছে। রুটি ও মাংস হোটেলেই পাওয়া গেছে। আমাদের ডাল-তরকারির দরকার ছিল না। কিন্তু ডঃ করুণকৃষ্ণের শুধু পদবী ব্রহ্মচারী নয়, সে একান্তই নিরামিষাশী। তাই কাল কালীকে ডাল-তরকারি রাঁধতে হয়েছে।

খাবার পরেই শুয়ে পড়েছি। কিন্তু বিভাস মানা হরেন ও কালী শুতে যেতে পারে নি। ওরা চারজন আজকের ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ তৈরি করেছে। ওরা কাল কখন শুয়েছে বলতে পারছি না, তবে রাত দেড়টা-দুটোর আগে নয় নিশ্চয়। কারণ আমরাই শুয়েছি সাড়ে বারোটায়। তখন হোটেলের আলো নিভে গেছে। না, লোডশেডিং নয়, কার্গিলে কলকাতার মতো লোডশেডিং নেই।

বাইরের বিদ্যুৎ এখনও এসে পৌঁছয় নি কার্গিল শহরে। তাহলেও এখানে বিদ্যুৎ আছে। রয়েছে একটা ডিজেল জেনারেটার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেটিকে চালু করা হয় এবং রাত ঠিক বারোটা পর্যন্ত চালু থাকে। ফলে কাল আমরা খেতে বসার আগেই হোটেলের আলো নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। কারণ ব্যাপারটা বিভাসের জানা আছে। তাই সে আলো নেভবার আগেই ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে কিচেনে পেট্রোম্যাক্স ধরিয়ে ফেলেছিল।

বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোর অভাব হয় নি, কিন্তু আমরা তখন বড্ড নিঃসঙ্গ বোধ করেছি। কার্গিলে কোনো কলকারখানা নেই। জেনারেটারের শব্দটাই এখানকার একমাত্র যান্ত্রিক শব্দ। আমরা শহরের মানুষ। সুতরাং ঐ শব্দটাকে জীবনের স্পন্দনরূপে অনুভব করছিলাম। শব্দটা থেমে যাবার পরে তাই কেমন একটা প্রাণহীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। শহরবাসীদের কাছে নৈঃশব্দ্য মৃত্যুর নামান্তর।

কিন্তু থাক, কালকের কথা আর নয়, আজকের কথায় আসা যাক। গতকাল রাতে বাস থেকে নামার সময়েই কণ্ডাক্টর বলে দিয়েছিলেন—সুবা পাঁচবাজে আ যাইয়ে, সওয়া পাঁচমে বাস ছোড়েগী।

সুতরাং রাত সাড়ে বারোটায় শুয়ে আবার ভোর চারটায় বিছানা ছাড়তে হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে তুষারশীতল জল দিয়ে বাথরুম সেরে কোনোমতে বাঁধাছাদা শেষ করেছি। তবু কুলি ডেকে আনতেই প্রায় পাঁচটা বেজে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি বাস স্ট্যাণ্ডে। এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। বুঝতে পেরেছি সর্দারজী সওয়া পাঁচটায় বাস ছাড়তে পারবেন না। কারণ অধিকাংশ যাত্রী এসে পৌঁছতে পারে নি।

বাসের ছাদে মালপত্র তুলে দিয়ে আমরা একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এক গেলাস গরম চা হাতে নিয়ে কার্গিলকে দেখছি। গতকাল রাতে আমার তাকে দেখাই হয় নি। আজ তাই দেখি আর ভেবে চলি তার কথা—

কার্গিল লাদাখ জেলার দ্বিতীয় শহর এবং মহকুমা সদর। এই মহকুমাটি কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কার্গিল শহরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়ের প্রাচীর। এটি একটি মাঝারি আকারের উপত্যকা। উপত্যকার বুক বেয়ে নদী আর এই পথ—শ্রীনগর-লে জাতীয় সড়ক।

পথের ধারে বাড়িঘর আর পপ্লার এবং উইলো গাছের সারি। বাড়িগুলোর অধিকাংশই দোতলা। একতলায় সারি সারি দোকান—মুদি-মনোহারী, জামা-কাপড় ও শয্যাদ্রব্য, বাসনপত্র তরি-তরকারি, ফল আর চা ও খাবারের দোকান। তারই একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঊষার প্রথম আলোয় আমি কমনীয় কার্গিলকে দেখেছি।

দ্রাস ও সুরু নদীর সঙ্গমে প্রচীন জনপদ কার্গিল। দ্রাস এসেছে জোষি লা থেকে সুরু জাঁসকার থেকে। জাঁসকারের কথা পরে হবে, এখন কার্গিলের কথা হোক। আরও কয়েকটি নদী কার্গিল উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শিগার-সিংগো, ওয়াখা এবং সিন্ধু নদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুরু এবং দ্রাসের মিলিত ধারা সোজা উত্তরে প্রবাহিত হয়ে মারোল নামে একটা জায়গায় সিন্ধুনদে বিলীন হয়েছে। এই নদীর তটভূমি দিয়ে কার্গিল শহর থেকে সিন্ধু উপত্যকার দূরত্ব মাত্র বিশ কিলোমিটার। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি মানতে গিয়ে আমরা এই অঞ্চলটি পাকিস্তানকে উপহার দিয়েছি।

সিন্ধু উপত্যকার কথা পরে হবে, এখন কার্গিলের কথাই ভাবা যাক। সুপ্রাচীন কাল থেকেই কার্গিল একটি বড় জনপদ এবং জনপ্রিয় ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে জনপদ গড়ে ওঠার কারণ এটি একটি সুবিশাল উপত্যকা। তুলনায় এখানকার উচ্চতা কম ও শীত সহনীয়। মাটিও মোটামুটি উর্বরা। এখানে প্রচুর খুবানি গাছ (Apricot) জন্মায় এবং এই ফলটি কার্গিলের মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য।

কার্গিল একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠার কারণ লাদাখের এই উষ্ণ ও উর্বর উপত্যকাটি রাশিয়া-চীন-আর্যাবর্ত বাণিজ্যপথের ওপরে অবস্থিত। অবস্থানটিও চমৎকার—এখান থেকে লে ও শ্রীনগরের দূরত্ব প্রায় সমান। আর তাই কার্গিল আজও এই পথের রাতের আশ্রয়। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে কিছু সরকারী আশ্রয় এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারী হোটেল।

ইদানীং জাঁসকার উপত্যকার সদর পাদাম পর্যন্ত মোটরপথ প্রসারিত হওয়ায় কার্গিলের মূল্য আরও বেড়ে গিয়েছে। পর্যটকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় এই বাজারে। কেবল পাওয়া যাবে না মদ। কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই সিয়া মুসলমান। তাঁরা মদ স্পর্শ করেন না।

কার্গিল একটি পর্বতময় মহকুমা—উচ্চতা ৮,৫০০ ফুট থেকে ১১,৫০০ ফুট। কিন্তু শীত কম ও মাটি উর্বর বলে এখানে নদীর ধারে প্রচুর পপ্লার এবং উইলো গাছ জন্মায়। লাদাখ বৃষ্টিহীন ভূখণ্ড। তাহলেও এই উপত্যকায় সামান্য কিছু বৃষ্টি হয়। ফলে এখানে গম যব শাক-সবজী ও কিছু ফল জন্মায়।

কার্গিল মহকুমার সরকারী নাম পুরিগ। স্থানীয় ভাষার নামও তাই—পুরিগ ভাষা। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান অধিকৃত স্কার্দু (Skardu) অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে এই পুরিগ ভাষার মিল খুবই বেশি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানী হানাদাররা স্কার্দু ও গিলগিটসহ প্রায় সমগ্র পশ্চিম বালতিস্তান দখল করে নেয়। তথাকথিত শান্তির জন্য যুদ্ধবিরতির নামে সেই অন্যায় অনুপ্রবেশ অনুমোদন করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ

অর্থাৎ কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদদেশটি আমরা পাকিস্তানকে উপহার দিয়েছি। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য যে কেবল আমাদের দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে তা নয়, আফগানিস্তানকেও এর খেসারত দিতে হচ্ছে। কারণ নাদির শাহের আগ্রাসী আত্মাটি জন্মমুহূর্ত থেকেই পাকিস্তানের কাঁধে চেপে বসে আছে।

কার্গিল লাদাখের দ্বিতীয় শহর ও তহশীল-সদর। স্থায়ী জনসংখ্যা হাজার তিনেকের মতো। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জাঁসকারসহ সমগ্র কার্গিল মহকুমার জনসংখ্যা ৫২,৫৩৯ জন। এবারের জনগণনায় অর্থাৎ গত দশ বছরে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই কিছু বেড়েছে। তবে এই বৃদ্ধির হার সমতলের চেয়ে অনেক কম হবে। কারণ গত দেড়শ' বছরে লাদাখের জনসংখ্যা প্রায় কিছুই বাড়ে নি। ১৮২২ সালে প্রখ্যাত পর্যটক উইলিয়াম মুরক্রফট অখণ্ড লাদাখের জনসংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজার বলে অনুমান করেছেন। তখন বালতিস্তান ও লাহুল-স্পিতি লাদাখের মধ্যে ছিল। ১৯৭১ সালে ঐ দুটি অঞ্চল বাদ দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান লাদাখের জনসংখ্যা ছিল ১,০৫,২৯১ জন। অথচ আয়তনের বিচারে আজও লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বৃহত্তম জেলা। চীন এবং পাকিস্তানের জবরদখলের পরেও এই জেলার বর্তমান আয়তন ৫৮,৩২১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাবার প্রধান কারণ বহুপতি প্রথা এবং লামাতন্ত্র। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। লাদাখীদের শতকরা নব্বুইজনই কৃষিজীবী। লাদাখের প্রধান শষ্য যব ও গম। চাষের জমির আয়তন প্রায় ৪৫,০০০ একর। সবই কৃত্রিম জলসেচের ওপরে নির্ভরশীল। লাদাখের চারটি কৃষি-খামার আছে। তার একটি এই কার্গিলে। বাকি তিনটি নুব্রা, চাঙথান ও সাসপোলে অবস্থিত।

কার্গিলের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, সুতরাং এখানে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে দুটি মসজিদ, তার একটির নাম জুমা মসজিদ। ছোট হলেও শুনেছি সুন্দর। যাবার পথে বাস থেকে মসজিদটি দেখতে পাবো।

স্বাভাবিক কারণেই কার্গিলের মেয়েরা পর্দানসীন। তাঁরা বড় একটা পথে বের হন না। এখন পর্যন্ত আমরা কার্গিলে কোনো স্থানীয় মহিলা দেখতে পাই নি।

কার্গিলের প্রধান পথ এই একটাই—শ্রীনগর-লে রোড। রাস্তাটি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত। শহরে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আরেকটি ছোট মোটরপথ নির্মিত হয়েছিল, সেটি উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এই পথটাই এখন জাঁসকার মহকুমার সদর পাদাম পর্যন্ত প্রসারিত। মাত্র কিছুদিন হল এটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

গতকাল কার্গিল শহরে প্রবেশ করে পথের ডানদিকে আমরা প্রথম পেয়েছি পাঠাগার। তারপরে থানা ও ডাকঘর। অবশেষে এই বাজার ও বাস স্ট্যাণ্ড—আমি যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কার্গিলকে দেখছি। আমার বাঁদিকে 'আরগালি' ও 'ডি লুক্স' হোটেল আর ডানদিকে 'ফ্রন্টিয়ার' হোটেল, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের অফিস, সরকারী মডেল প্রাইমারী স্কুল এবং হাই স্কুল। তারপরে টীচারস্ ট্রেনিং স্কুল ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম-ভবন। সেখানে তাঁবু ভাড়া পাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে একটা ট্যুরিস্ট্ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ আছে। সেটি আরও খানিকটা এগিয়ে এই

'লে' সড়কের ওপরে অবস্থিত। যাবার পথে দেখতে পাবো।

আরও বেশ কয়েকটি হোটেল আছে কার্গিল শহরে। তার মধ্যে 'জোবি লা', 'দি সুরু ভিউ' এবং 'ইয়াক্ টেইল' হোটেলের নাম শুনেছি। তবে 'ক্রাউন' হোটেলটি বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে হলেও আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পক্ষে খুবই ভাল।

কার্গিলের কথা বলতে হলে জাঁস্কারের কথা ভাবতেই হবে। কারণ জাঁসকার কার্গিলের ছোট ভাইয়ের মতো। জাঁস্কার শব্দের অর্থ তামা। দুটি পাহাড়ী নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা জাঁস্কার—গড় উচ্চতা ১৩,১৫৪ ফুট। তাহলেও মোটামুটি ফসল জন্মায়। পপ্লার গাছও প্রচুর আছে।

জাঁস্কার কার্গিলের দক্ষিণে অবস্থিত আর জাঁস্কারের দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশের লাহুল উপত্যকা। কার্গিল থেকে জাঁস্কারের মোটরপথটি এই সুরু নদীর তীরে তীরে। ৪৪০১ মিটার উঁচু পেন্সি লা পার হয়ে পাদাম পৌঁছতে হয়। পথে পড়ে রিংদম গুম্ফা। মানালী থেকেও লাহুলের ভেতর দিয়ে পাদামের একটা পথ আছে। হেঁটে যেতে ৯/১০ দিন সময় লাগে।

কিন্তু কারগিলের ভাবনা আর নয়। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। চা-য়ের গ্লাস ফেরৎ দিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে চলি। সকাল ঠিক পৌনে ছ'টায় আমাদের বাস ছাড়ল। বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। শীতল দেশ, সবে ভোর হয়েছে। তবু এরই মধ্যে বেশ কিছু দোকান খুলে গিয়েছে। জুমা মসজিদকে বাঁদিকে রেখে বাজার ছাড়িয়ে এলাম।

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আমার বেলজিয়ামবাসী বন্ধুরা গেলেন কোথায়? তাঁরা তো বাসে নেই। তাহলে কি ওঁরা এখানে যাত্রা-বিরতি ঘটালেন? আগে জাঁস্কার যাবেন? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে? প্রথমতঃ ওঁরা তাহলে 'লে' পর্যন্ত টিকেট কাটবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ আগামী কাল থেকে হেমিস গুম্ফার উৎসব আরম্ভ হচ্ছে। লাদাখে এসে হেমিসের উৎসব দেখবেন না! এমনটি তো হতে পারে না। তাহলে ওঁরা কোথায় গেলেন?

কিন্তু কাউকে এ প্রশ্ন করতে হল না। ভাবনা শেষ হবার আগেই বাস থামল ট্যুরিস্ট হোটেলের সামনে। তাকিয়ে দেখি Jean তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে।

বেলজিয়ামবাসীরা সহাস্যে উঠে বসেন গাড়িতে। ওঁরা জায়গায় বসেন। বাস এগিয়ে চলে।

সুরুর সঙ্গে দেখা হল—জাঁসকারের সুরু নদী। এখানে এসে দ্রাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপরূপ সঙ্গমটি দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে। কিন্তু সেদিকে না এগিয়ে পথটা ডাইনে বাঁক নিল। আর সেই বাঁকের মুখে নদীর তীরে একফালি সবুজ বনভূমি—উইলো আর পপ্লারের বন। বন ছাড়িয়ে উপত্যকা—ধাপে ধাপে ক্ষেত। চমৎকার জলসেচের ব্যবস্থা। ক্ষেত আর বনের মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ি-গ্রাম। শুনেছি পাঁচ থেকে দশটি পরিবারের জন্য এক-একটি গ্রাম। সেই গ্রামের ক্ষেত-খামার সবই তাঁদের।

ভারী ভাল লাগছে দেখতে। গতকাল বলতাল ছাড়বার পরে এমন সবুজ বন কিম্বা উপত্যকা আর দেখতে পাই নি।

একটা পুল পেরিয়ে সুরুর অপর তীরে এলাম। তাই আসতে হবে। কারণ সুরুর সঙ্গে তথা সুরু ও দ্রাসের মিলিত ধারার সঙ্গে এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই আমাদের। আগেই বলেছি, সে পথ হানাদার অধিকৃত।

সুরু প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে আর আমরা চলেছি দক্ষিণ-পূর্বে, তারই তীরভূমি ধরে। দু-তীরেই উপত্যকা—দেখতে দেখতে চলেছি। এপার থেকে ওপারের দৃশ্য আরও সুন্দর। তাই নিয়ম। সুন্দর সর্বদা দূর থেকে সুন্দরতর।

এই উপত্যকার পাশেই জাঁসকার পর্বতশ্রেণী—আমাদের দক্ষিণে। বেশ কয়েকটি সুউচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে জাঁসকার পর্বতমালায়। তাদের মধ্যে প্রথম মনে পড়েছে 'নুন্' ও 'কুন্' শৃঙ্গদুটির কথা, উচ্চতা ৭১৩৫ ও ৭০৭৭ মিটার। তাছাড়া অনতিদূরে কিস্তোয়ার-হিমালয়ের ভারতীয় অংশে রয়েছে ৬৫৭৫ মিটার উঁচু 'সিক্‌ল মুন্' ও ৬৯৩০ মিটার উঁচু 'পিনাকেল্'। আরও আছে—৬৪১৬ মিটার ব্রহ্মা এবং ৬৪২৬ মিটার লোলাহাই। শেষের এই চারটি শৃঙ্গের পাদদেশে পৌঁছবার সহজ পথ কিস্তোয়ার ও কোলাহাই থেকে। বাটোট থেকে চন্দ্রভাগার তীরপথে কিস্তোয়ার যেতে হয়। (লেখকের 'ব্রহ্মলোকে' বইখানি দ্রষ্টব্য।)

জাঁসকার পর্বতশ্রেণীর ওপারে জাঁসকার উপত্যকা। তারপরে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা ও হিমাচল প্রদেশের লাহুল। আর আমাদের উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের কিস্তোয়ার এবং উত্তর-পূর্বে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী। কিস্তোয়ারের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নাঙ্গাপর্বত (৮১২৬ মিটার), এটি বিশ্ব-পর্বতারোহণের ইতিহাসে খুনী পাহাড় বা 'Killer Mountain' নামে কুখ্যাত।*

গতকাল আমরা হিমালয় পেরিয়ে এসেছি, আজ এগিয়ে চলেছি কারাকোরামের দিকে। কারাকোরাম সংলগ্ন সিন্ধু উপত্যকায় পদচারণা করার জন্যই আমাদের এই যাত্রা। সেই কারাকোরাম এখন আমাদের উত্তর-পূর্বে। এই পর্বতশ্রেণীর প্রধান শৃঙ্গ হল ৮৬১১ মিটার (২৮,২৫০´) উঁচু মাউণ্ট্ গডউইন অস্টেন বা সংক্ষেপে 'K-2'। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশিখর। কারাকোরামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্গ হল গাসেরব্রুম ও মাসেরব্রুম, উচ্চতা যথাক্রমে ৮০৬৮ ও ৭৮২১ মিটার।

কিন্তু কারাকোরামের কথা এখন থাক, আমাদের কথা হোক। সুরু নদীর তীর ধরে আমরা দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলেছি। নদীর ওপারে অনেকটা দূরে আর এপারে পথের পাশে পাহাড়ের সারি। তাদের শিরে শিরে সকালের সোনালী রোদ। গতকাল সারাদিন সূর্যের মুখ দেখি নি। আজ আবার সূর্য-প্রণামের সুযোগ পাওয়া গেল।

সবে সকাল সাড়ে ছ'টা। সব পাহাড়ের গায়ে এখনও রোদ পৌঁছায় নি। সেখানে কুয়াশা আর পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা চলেছে।

রোদ নয়, কুয়াশা নয়, পাথর। আমি অপলক নয়নে শুধু পাথর দেখছি। মনে পড়ছে বরুণের দাদু প্রখ্যাত হিমালয়পথিক ও সুমহান শিল্পী মণি সেন মহাশয়ের কথা। তিনি বরুণকে একদিন বলেছিলেন—যদি পাথরের রং দেখতে চাস, তাহলে একবার লাদাখে চলে যাস।

কথাটা যে কতখানি সত্যি, তা লাদাখে এসে আমি এই প্রথম প্রভাতেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। এক-একটি পাহাড়ের এক এক রকম রং। কোনোটি কালো, কোনোটি ধূসর, কোনোটি খয়েরী, কোনোটি লাল, কোনোটি বা গোলাপী—আরও কত রং।

শুধু রং নয়, বিচিত্র তাদের গড়ন, অধিকাংশই সাধারণ পাহাড়ের মতো ত্রিভুজাকৃতি নয়। কোনোটি মন্দিরের মতো, কোনোটি মসজিদ কিম্বা গীর্জার মতো, কোনোটি বা ভগ্ন-দুর্গের মতো। ভারী সুন্দর—যেন পটে আঁকা ছবি। মনে হচ্ছে হাজার হাজার শিল্পী শত শত বছরের শ্রান্তিহীন শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে আলপনার মতো পথ। পাহাড়ে গাছপালা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে নিচে নদীর ধারে সবুজ খেত আর পপ্লারের বন। এই উপত্যকার প্রতি পাকিস্তানের লোভ সুবিদিত। তাই স্বাধীনতার প্রহরী জওয়ানদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।

বাস বেশ জোরে চলেছে। গতকাল পথ যেমন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল, আজকের পথ তেমনি প্রথম থেকেই আনন্দময়। শুধু পথ নয়, আবহাওয়াও চমৎকার। পথের ওপর এখন রোদ এসে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু দূরে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা তার উষ্ণ-পরশের প্রতীক্ষায় রয়েছি। এ পথ লাদাখের প্রাচীন রাজধানী লে নগবের পথ। সুপ্রাচীনকাল ধরে যে নগর হয়ে সংখ্যাতীত পথিকের দল তিব্বত ও চীন থেকে সমতল ভারতে এসেছেন, আর্যাবর্ত থেকে মধ্য-এশিয়ায় গিয়েছেন। কেউ এসেছেন পণ্যসম্ভার নিয়ে, কেউ গিয়েছেন ধর্মপ্রচার করতে, কেউ রাজনৈতিক কারণে, আবার কেউ বা নিছক ভ্রমণে।

মনে মনে তাঁদের কথাই ভেবে চলি, বিগত যুগের সেইসব দুঃসাহসী পর্যটকদের কথা—

লাদাখকে বলা হয় 'লিট্‌ল টিবেট' বা ক্ষুদ্র তিব্বত। লাদাখের পাহাড় বৃক্ষহীন, মাটিতে বালির ভাগ খুবই বেশি। কিন্তু সে বালির রং সোনালী। লাদাখের আকাশ ঘন-নীল—সে আকাশে মেঘ নেই। দূরের বৃক্ষহীন রঙীন পাহাড়গুলো সেই নীলাকাশকে চুম্বন করছে। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে লাদাখকে মনে হয় চাঁদের দেশ। তাই লাদাখের অপর নাম 'মুন ল্যাণ্ড'।

এই বৃক্ষহীন মরুভূমি সদৃশ চাঁদের দেশেও মাঝে মাঝে মরূদ্যানের মতো পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা রয়েছে। আর লাদাখের এই বিচিত্রসুন্দর প্রকৃতি যুগ যুগ

ধরে দূর দেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে। তাঁদের কেউ এসেছেন এই মালভূমি সদৃশ উঁচু দেশের ভৌগোলিক তথ্য আহরণ করতে, কেউ এসেছেন জাতিবিদ্যা (Ethnology) অথবা নৃবিদ্যা (Anthropology) নিয়ে গবেষণা করতে—তাঁদের মতে লাদাখ পৃথিবীর প্রাচিনতম মনুষ্য বসতির অন্যতম। কেউ এসেছেন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে—আবার কেউ বা এসেছেন শুধুই লাদাখের এই রঙীন পাহাড়গুলো দেখতে—যে পাহাড়গুলো কোটি কোটি বছর ধরে সমুদ্রের নিচে ছিল। তবে যিনি যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসে থাকুন, তিনিই কিন্তু এদেশের সরল ও সেবাপরায়ণ মানুষগুলির উষ্ণ-আতিথ্যে অভিভূত হয়েছেন।

যে দুজন বিদেশী পর্যটক তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে প্রথম এই সুপ্রাচীন দেশের কথা লিখে গিয়েছেন, তাঁরা দুজনেই চৈনিক। তাঁদের নাম 'ফা-হিয়েন' এবং 'ও-কঙ' (Ou-Kong)। তাঁরা আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন।

তাঁরা বলেছেন—লাদাখ একটি পার্বত্য প্রদেশ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য এখানে কোনো গাছপালা জন্মায় না। তাঁরা লাদাখীদের বরফের দেশের বৌদ্ধ নামে অভিহিত করেছেন।

তাঁদের এই নামকরণ কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত হয় নি। কারণ লাদাখ তুষাররেখার ওপরে অবস্থিত। ফলে লাদাখের অধিকাংশ স্থানে তুষারপাত হয় না।

লাদাখের ভূ-সংস্থান (Topography) সম্পর্কে আমরা প্রথম বিবরণ পাই অনেক পরে, মাত্র ষোড়শ' শতাব্দীতে মির্জা হায়দার দুগ্‌লাত-এর তারিখ-ই-রসিদী গ্রন্থে। দুগ্‌লাত ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ আক্রমণ করেছিলেন।

লাদাখে প্রথম পাশ্চাত্ত্য পর্যটক দিয়াগো দি আলমেরা (Diago D'Almeira)। এই পর্তুগীজ পর্যটক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ লাদাখে আসেন এবং দু বছর এখানে থাকেন।

তারপরে লাদাখে আসেন দুজন জেসুইট মিশনারী। তাঁদের নাম এ্যাজেভেদো (Father F. De Azevedo) এবং অলিভিরো (G. De Oliviro)। তাঁরা ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখে আসেন।

ডিসিদেরি (I. Disideri) এবং ফ্রেইয়ার (Freyre) নামে আরও দুজন জেসুইট মিশনারী ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখে আসেন। তাঁরা শ্রীনগর থেকে লাসা যাবার জন্য জোজি লা অতিক্রম করে ২৬শে জুন লে শহরে উপস্থিত হন।*

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসিদেরিকে লাসা থেকে আবার ডেকে পাঠানো হয়। এবং তারপরেই তিব্বতে মিশনারী কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরবর্তী প্রায় শ'খানেক বছর কোনো য়ুরোপীয় পর্যটক 'লে' আসে নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ থেকে লাদাখে প্রথম আসেন সেই দুই প্রখ্যাত পর্যটক উইলিয়াম মূরক্রফ্‌ট এবং জর্জ ট্রেবেক। তাঁরা তাঁদের ছ'বছর ব্যাপী (১৮১৯-১৮২৫ খ্রীঃ) সুদীর্ঘ হিমালয় ও মধ্যএশিয়া অভিযানকালে কিছুদিন লে শহরে বাস করেছেন।**

---

*'Early Jessuite Travellers in Central Asia'

**লেখকের 'নীলাভূমি-লাহুল' বইখানি দ্রষ্টব্য।

ডঃ হেণ্ডারসন (Henderson) নামে জনৈক পাশ্চাত্ত্য পর্যটক ইসমাইল খান নাম নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লে শহরে আসেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছুদিন বাদে ভিয়োঁ (Vigne) নামে আরেকজন য়ুরোপীয় পদযাত্রী লে শহরে পদার্পণ করেন।

তারপরে প্রখ্যাত বৃটিশ শাসক ও ঐতিহাসিক স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম। তিনি ১৮৪৬ সালে লাদাখে আসেন এবং 'Ladak' নামে একখানি প্রামাণ্য ও সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। বইখানি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে লাদাখের ওপরে রচিত এমন বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

এ্যাডল্ফ (Adolf) এবং রবার্ট শ্র্যাজিন্টোইট (Robert Shragintweit) নামে দুজন জার্মান পর্যটক ১৮৫৬ সালে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে মানালী থেকে লাহুল হয়ে লে আসেন।***

ভূতাত্ত্বিক জনসন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লে আসেন। তিনিই প্রথম লাদাখের ভৌগোলিক সমীক্ষা করেন।

১৮৬৭ সালে বৃটিশ শাসক শ' (Shaw) রাজনৈতিক মিশনে ইয়ারখন্দে যাবার পথে কয়েকদিন লে শহরে বাস করেন।

পরের বছর হেওয়ার্ড (Hayward) শ্রীনগর-লে সড়ক জরীপ শুরু করেন। এই কাজ শেষ করতে তাঁর দু'বছর সময় লেগেছে।

১৮৭৩ সালে ফোরসিথ (Forsyth), গোল্ডেন, ট্রটার (Trotter) এবং হেণ্ডারসন পামির যাবার পথে লে আসেন। তাঁরাও কাশ্মীর ও তুর্কিস্তানের (মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া) স্বার্থ সংক্রান্ত একটি রাজনৈতিক মিশনে সেখানে গিয়েছিলেন।

১৮৮১ সালে প্রথম একজন বিদেশী মহিলা লাদাখ ভ্রমণে আসেন। তাঁর নাম মিসেস উজিফারভি (Ujifarvy)। তিনি স্বামীর সঙ্গে রাশিয়া থেকে কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে 'লে' এসেছিলেন।

১৮৯০ সালে র‍্যান্সডেল (Ransdel) খোতান হয়ে 'লে' শহরে উপস্থিত হন। পরের বছর বাওয়ার (Bower) লাদাখে আসেন।

ওয়েল্বি (Welbie) এবং ম্যাল্কম (Malcom) ১৮৯৬ সালে আবার লাদাখ জরীপ করেন।

এই সময় মোরেভিয়ান মিশনারীরা লে শহরে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষা বিস্তার, কুটিরশিল্পের বিকাশ, পথ নির্মাণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজসেবার কাজও তাঁরা করতেন। এই মিশনের ডাঃ কার্ল মার্কস (কমিউনিজমের জনক 'Kapital' রচয়িতা Dr. Heinrich Karl Marx নন) "Books of the Kings of Ladakh' নামে একখানি বই অনুবাদ করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য, এই মিশনের এ.এইচ. ফ্রাঙ্কি (A.H. Franckie) প্রভূত পরিশ্রম করে লাদাখের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। বইখানির নাম 'History of Western Tibet'।

***'Easly Jessnite Travellers in central ASIA

১৯০৭ সালে প্রকাশিত এই বইখানি আজও লাদাখের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসরূপে সমাদৃত।

আমার এই স্মৃতিতারণে শেষ অভিযাত্রী লাদাখের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক ডঃ স্বেন হেডিন। তিনি প্রায় সমস্ত লাদাখ এবং তিব্বতের বিস্তৃত সমীক্ষা করেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ এবং ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ এই পাঁচ বছর তিনি তিব্বত ও লাদাখের পথে-প্রান্তরে, পাহাড়ে-পর্বতে ও গ্রামে-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বিনাস্বার্থে আর কেউ হিমালয় ও কারাকোরাম অঞ্চলের এমন বিস্তৃত সমীক্ষা করেছেন বলে জানা নেই আমার।

সেই সমীক্ষার ওপরে তিনটি সুবৃহৎ খণ্ডে রচিত হেডিনের 'Trans Himalaya' গ্রন্থটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় তেরশ' পৃষ্ঠার এই বইখানি বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ।

সেকালে যখন পথ ছিল না, ছিল না পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম এবং কলের গাড়ি, তখন এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযাত্রীরা অমানুষিক দুঃখকষ্ট সহ্য করে এই অজানা জগতের সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও মানবপ্রেম বিশ্ব-ইতিহাসের অক্ষয় অধ্যায়। তাঁরা সবাই প্রাতঃস্মরণীয়। তাই তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি প্রণাম নিবেদন করে আমি আজ আমার লাদাখ পরিক্রমা শুরু করছি।

॥ সাত ॥

একটি ছোট গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে আমরা সুরু উপত্যকা থেকে ওয়াখা উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। গিরিবর্ত্মটি কেবল দুটি উপত্যকার মিলনভূমি নয়, দুটি ধর্মেরও সঙ্গম। একটি ইসলাম—কার্গিল অঞ্চলের ধর্ম, অপরটি বৌদ্ধ—লাদাখ মূল ভূখণ্ডের ধর্ম।

বাস এগিয়ে চলেছে। সামান্য চড়াই। বিস্তৃত উপত্যকার ওপর দিয়ে পথ। উপত্যকার দু-দিকে নেড়া পাহাড়—তেমনি বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র গড়নের অসংখ্য পাহাড়। কোনটি মাটির ঢিবির মতো, কোনটি পাথরের ভগ্ন দুর্গের মতো, কোনটি বা দেবালয়ের মতো, কোনটি হাতি কিম্বা ঘোড়ার মতো, আবার কোনটি বা বিশালাকার মানুষের মতো। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি। বেশ লাগছে।

শার্গোল এসে গেল। ছোট গ্রাম শার্গোল। দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ২৩৭ কিলোমিটার। তার মানে আমরা কার্গিল থেকে ৩৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলাম। এখন সকাল সাতটা।

গতকাল শ্রীনগর থেকে রওনা হবার বাইশ ঘণ্টার মধ্যে শার্গোলে পৌঁছে গেলাম। এতেও আমরা খুশি নই। অথচ হেডিন সাহেবের শ্রীনগর থেকে এখানে আসতে বারো দিন সময় লেগেছিল—তারিখটা ১৯০৬ সালের ২৭শে জুলাই। সেকালের অভিযাত্রীরা কত কষ্ট করে হিমালয়ের পথে পাড়ি দিতেন!

পথের ডানদিকে নদীর অস্তিত্ব অনুভব করছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। কেবল

দেখছি পাহাড়ের গায়ে মাঝামাঝি জায়গায় একটি গুম্ফা—ছোট গুম্ফা।

মানা বলে, "দুজন লামা ও একজন সন্ন্যাসিনী শুধু থাকেন। গুম্ফাটি খুবই ছোট। তবে কয়েকখানি দেখার মতো দেওয়ালচিত্র আছে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার—হেডিন লাদাখে এসে প্রথম এই গুম্ফাটি দর্শন করেন। আমরাও এই পথে প্রথম গুম্ফা পেলাম। পঁচাত্তর বছর পরেও লাদাখ বুঝিবা একই রয়ে গিয়েছে!

পাহাড়ের পাদদেশে কিছু গাছপালা আর কয়েক ফালি চাষের জমি নিয়ে শার্গোল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম লাদাখী গ্রাম। লাদাখী বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁদের বুঝে থাকি, তাঁদেরই কয়েকজনকে পথের পাশে দেখতে পাচ্ছি। কার্গিল লাদাখে হলেও কার্গিলবাসীদের লাদাখী বলে না। শুনেছি পঁয়ত্রিশখানি ঘর আর ২১০ জন বাসিন্দা নিয়ে শার্গোল গ্রাম। গ্রাম আর গ্রামের মানুষ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

'মুলবেখ!" সহসা মানা বলে ওঠে।

জাঁ মাথা নেড়ে সমর্থন করে তাকে। বলে, "ইয়া, মানবেক।"

বাস থামে। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়।

বিভাসের দিক তাকাই। সে বলে, "হ্যাঁ, বাস থেকে নামতে হবে। এখানে একটা বড় মূর্তি আছে। অদৃষ্ট ভাল হলে মূর্তি দর্শনের সঙ্গে এক গ্লাস গরম চা পেয়ে যাবেন।"

এই শীতের সকালে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে? অতএব তাড়াতাড়ি নেমে আসি পথে। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনালী মিঠে রোদ তার উষ্ণ বাহু দিয়ে সস্নেহে আলিঙ্গন করে আমাকে। আমি আমোদিত হয়ে উঠি।

গতকাল সারাদিন রোদ দেখতে পাই নি। আজ অবশ্য সকাল থেকে বাসে বসে রোদের লুকোচুরি খেলা দেখেছি। কিন্তু তার পরশ পাই নি। এই প্রথম তার উষ্ণমধুর স্পর্শ লাভ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু পুলকিত হয়ে উঠল।

ঘড়ি দেখি—সওয়া সাতটা। তার মানে দেড় ঘণ্টায় ৪১ কিলোমিটার এসেছি। মুলবেখ মূর্তি শ্রীনগর থেকে ২৪৪ কিলোমিটার।

বাস দাঁড়িয়েছে পথের বাঁদিকে। আমরা দল বেঁধে ডানদিকে আসি। পথের পাশে ঢালু জায়গা, তারপরে একটা ছোট পাথুরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সুবিশাল দণ্ডায়মান মূর্তি। এটি 'চাম্বা' মূর্তি নামে বিখ্যাত। লাদাখীরা বলেন—মৈত্রেয় বা ভবিষ্যবুদ্ধ।

বৌদ্ধদের মতে 'তথাগত' হলেন গৌতমবুদ্ধ। তাঁর আগে কয়েকজন বুদ্ধের আগমন ঘটেছে এবং তাঁর পরেও কয়েকজন বুদ্ধের আগমন ঘটবে। তথাগতের আগে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম দীপঙ্করবুদ্ধ এবং পরে যিনি আসবেন তিনিই মৈত্রেয়বুদ্ধ। ইনি মৈত্রীর মহামন্ত্র প্রচার করবেন।

আমরা অবশ্য অত সব বুঝি নে। আমাদের কাছে সবই এক, প্রেম আর মৈত্রীর পরমাবতার গৌতমবুদ্ধ।

তাঁকে দর্শন করি—তাঁর চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত। যেন জগতের মঙ্গল কামনায় ধ্যান করছেন। চতুর্ভুজ মূর্তি—এক হাতে কমণ্ডলু, এক হাতে মালা, একখানি হাত খালি আর অপর হাতখানিতে কি আছে বুঝতে পারছি না এখান থেকে। তবে গলায় হার ও উপবীত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অথচ পরমপ্রশান্ত মুখশ্রী। আমরা প্রণাম করি।

পথের পাশে পর্যটকদের জন্য একখানি সাইনবোর্ড। লেখা রয়েছে—

"This statue of Maitreya was carved probably in the First Century B.C., during Kushan period. According to Buddhist belief the Fifth Buddha will be Maitreya in the series of one thousand Buddha who are to visit this world. Certain inscriptions perhaps in the Kharoshti script on the back of the rock are reported to have been buried. This is a landmark in the History of Ladakh.'

মূর্তির পাশে পাহাড়ের ওপর ছোট একখানি ঘর—গুম্ফা। হালে তৈরি—১৯৭৫ সালে। এই মূর্তি দেখাশোনা করার জন্য জনৈক লামা বাস করছেন ঐ গুম্ফায়।

ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসি। কিন্তু বিভাস যে বলেছিল, এক গ্লাস গরম চা পাওয়া যাবে! কোথায়? এখানে তো কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না!

উঠে আসি গাড়িতে। একটু বাদে বাস চলতে শুরু করে। বিভাসের দিকে তাকাই।

সে সবিনয়ে বলে, "আমি ভুল বলেছিলাম, এখানে চা পাওয়া যায় না। তবে চা পাবেন।"

"কখন?"

"এখনি।" বিভাস উত্তর দেয়। বলে, "এখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে মুলবেখ গ্রাম, সেখানে গাড়ি থামবে এবং চা পাবেন।"

মিনিট তিনেকের মধ্যে মুলবেখ গ্রামে বাস থামে। নেমে আসি পথে। বাঁ দিকে রাজপ্রাসাদ। আর তারই চারিদিকে ঘর-বাড়ি—প্রাচীন গ্রাম মুলবেখ।

গ্রামের ওপরে পাহাড়ের ঢালে একজোড়া গুম্ফা, নাম—সারদুং (Serdung) এবং গ্যাণ্ডেণ্ট্সে (Gandentse)। গ্রাম থেকে গুম্ফায় যাবার দুটি পায়ে-চলা পথই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। তবে দুটি পথই যেমন সরু, তেমনি খাড়া। সুতরাং মন্দির দর্শনের পুণ্যকর্মটি কোনমতেই সহজ নয়।

শুনেছি ঐ গুম্ফা থেকে ওয়াখা উপত্যকার দৃশ্য খুবই বৈচিত্র্যময়। হেডিনের ভাষায়—

'The fantastic contours of the mountains stand out sharply with their wild pinnacles of rock and embatted crests...'

চায়ের পালা শেষ হতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। সকাল আটটায় গাড়ি ছাড়ল।

যাত্রীদের মাঝে অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে অনেক আগে। তাহলেও সবাই

কিন্তু সমান আড্ডা দিচ্ছে না। সেই ইংরেজ যুবক-যুবতী হয় ঘুমুচ্ছে, না হয় মৃদুকণ্ঠে নিজেরা দুজনে কথা বলছে। ওরা আজও আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক হয় নি।

আর কথা কম বলছে জার্মান মেয়ে রোজালিন। সে বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারে। কিন্তু সে গল্প না করে সমানে গাইডবুক আর মানচিত্র দেখে যাচ্ছে।

বেলজিয়ামের বন্ধুরা কিন্তু সমানে আড্ডা দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। ওঁরা সবাই ইংরেজী জানেন না। তাই বরুণ মহানন্দে দোভাষীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, হিংসে হচ্ছে ওর ওপরে আর সেই সঙ্গে বিরক্ত হচ্ছি নিজের ওপর। কলেজ-জীবনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে জার্মান শিখতে শুরু করেছিলাম, শেষ করতে পারি নি। পারলে আজ আর বরুণের সাহায্য নিতে হত না। এঁরা অনেকেই জার্মান জানেন।

সবে সকাল আটটা। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ চড়া রোদ উঠে গেছে। প্রায় প্রত্যেকেই কোট কিম্বা ফুলহাতার সোয়েটার খুলে ফেলেছি। রোদের তেজ দেখে কল্পনাই করা যায় না, আমরা এগারো-বারো হাজার ফুট উঁচুতে বিচরণ করছি। প্রবোধদাও লাদাখের এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেছেন—'রাত্রে সেখানে তিনখানা কম্বল জড়িয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে হয়, দিনের বেলা সেখানে রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আগাগোড়া।'

প্রশস্ত উপত্যকার ওপর দিয়ে চড়াই পথ। আমরা এখন ১২,২২০ ফুট উঁচু নামিকা গিরিবর্ত্মের দিকে এগিয়ে চলেছি। মুলবেখ থেকে নামিকা লা ১৫ কিলোমিটার।

উপত্যকার দু-পাশে তেমনি বিচিত্র বর্ণের ও বিচিত্র গড়নের বৃক্ষহীন পাহাড়। সবুজশূন্য পাহাড় যে এমন অপরূপ হতে পারে, তা লাদাখে না এলে জানা হত না। আমি তাই দেখি, দু-চোখ ভরে শুধুই দেখি আর ভাবি। ভেবে চলি এই বিচিত্রসুন্দর দেশের কথা—

সর্বকালের প্রকৃতি-প্রেমিকরাই লাদাখের ডাক শুনতে পেয়েছেন। দুঃসাহসীরা সকল বাধা উপেক্ষা করে ছুটে এসেছেন এই চাঁদের দেশে। কিছুক্ষণ আগে আমি তাঁদের কয়েকজনের কথা বলেছি। কিন্তু আরও অনেকে আছেন। তাঁদের কথা বলা হোল না।

না হোক। আমি তো তাঁদের মতো অভিযাত্রী কিম্বা গবেষক নই, একজন নিতান্তই সাধারণ পর্যটক। কলের গাড়িতে সওয়ার হয়ে লাদাখ দেখতে এসেছি। সুতরাং সেই দুঃখজয়ী দুর্গমযাত্রীদের কথা আর নয়। তার চেয়ে একালের লাদাখের কথা ভাবা যাক।

সাতচল্লিশ সালের পাকিস্তানী হানার পর থেকে পর্যটকদের জন্য লাদাখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সরকার সবে যখন এই পথ খুলে দেবার কথা ভাবছিলেন, তখুনি (১৯৬২) আবার ঘটল চীনা আক্রমণ।

ভাইয়ের মুখোশ পরে সরল ভারতকে ভুলিয়ে রেখে সাম্যবাদীরা পেছন থেকে ছুরি মারল আমাদের। আর তাই অপ্রস্তুত ভারতকে হারাতে হল আকসাই চিন—মুজতাগ-কারাকোরামের পূর্বদিক থেকে কুয়েনলান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ৩৭,৫৫৫ বর্গকিলোমিটার।

একে জনবসতিহীন দুর্গম ও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল, তার ওপরে বন্ধুরাষ্ট্র। সুতরাং সেখানে আমাদের সীমান্তরক্ষার সামান্য ব্যবস্থাই ছিল। ফলে সাম্যবাদী আগ্রাসীদের এই পররাজ্য-গ্রাস-পর্বটি সমাধা করতে কোনো বেগ পেতে হয় নি।

অনেকের ধারণা, আকসাই চিন গ্রাস করার পরে চীন আর দয়া করে এগিয়ে আসে নি বলেই লাদাখের বাকি অংশ রক্ষা পেয়েছে। আমি তখন কাশ্মীরে ছিলাম। তাই আমি প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে জানি ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আকসাই চিনে নিজেদের ঘাঁটি মজবুত করতে চীনাদের দিন দশেক সময় লেগেছিল। সেই দশ দিন ভারতীয় জওয়ানরা দুর্বার বেগে এগিয়ে গিয়েছেন এই পথে। তাঁরা চুসুলে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

সেই সময় শ্রীনগরে তাঁর স্ত্রীকে লেখা জনৈক মেজর মুখার্জির একখানি চিঠি আমি দেখেছি। মেজর লিখেছিলেন—তোমাদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না। যদি না হয়, বাবলু ও বীণাকে ব'লো, তাদের বাবা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আর তুমিও ভেঙে প'ড়ো না, কারণ সংসারে ক'জনের স্বামী দেশের জন্য বীরের মৃত্যু বরণ করতে পারে? তবে একটা কথা শুধু তোমাকে বলে রাখি—সাত দিন সময় পেলে আমরা কিছুতেই চীনাদের চুসুল নিতে দেব না।

ভারতীয় জওয়ানরা সেকথা রেখেছেন। তাঁরা দশ দিন সময় পেয়েছিলেন। তাই চুসুলের সেই প্রতিরোধের সামনে চীনা আগ্রাসন চুরমার হয়ে গিয়েছে। চীনা সমরবিশারদরা বুঝতে পেরেছে, আর ফাঁকা মাঠে ডাণ্ডাবাজি করা যাবে না। ফলে সাম্যবদীদেব সেই সাম্রাজ্যবদী খোয়াব খান খান হয়ে ভেঙে গেছে—হয়তো বা চিরকালের মতো।

যাক্ গে যে কথা বলছিলাম, ১৯৬২ সালের চীনা অনুপ্রবেশের পরে ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী আক্রমণ। প্রতিবারেই লাদাখ সীমান্তে হামলা হযেছে। আর তাই সরকার পর্যটকদের জন্য লাদাখের দরজা খুলে দিতে পারেন নি। অবশেষে ১৯৭৪ সালে সেই বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের কাছে এই পথ উন্মুক্ত করে দেবার সময় তৎকালীন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাশিম যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি উল্লেখ করবার মতো। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—

'Ladakh enjoys a unique distinction in the country, not only because of its strategic importance but essentially because of its rich cultural heritage. There is no other place in the country, where Buddhism still exists in the same undestorted form as it does in Ladakh, as original as it could have been...'

১৯৭৪ সালে এই পথ পর্যটকদের জন্য খুলে দেবার পরে প্রথম যে বিদেশী পর্যটকরা লাদাখে আসেন, তাঁরা দুজনেই জাপানী পর্বতারোহী। তাঁদের নাম—মাসাহিরো ইয়ামাদা এবং মাসাতো ওকি।

তারপর থেকে প্রতি বছর লাদাখে বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এর কারণ লাদাখ শুধু সুন্দর নয়, সে পরম বৈচিত্র্যময় এবং সে আজও তার বুকে বৌদ্ধসংস্কৃতির সুপ্রচিন ধারাকে অক্ষয় করে রেখেছে। আর তাই লাদাখ একটি বিশ্ববিখ্যাত বিচিত্রসুন্দর ও পরমপবিত্র প্রদেশ।...

আমার ভাবনা থেমে যায়। বাস থেমে গেছে। কি ব্যাপার?

কণ্ডাক্টর উত্তর দেয়—রাস্তা সারানো হচ্ছে, পথ বন্ধ।

সে নেমে যায় গাড়ি থেকে। ফিরে আসে একটু বাদে। গম্ভীর স্বরে বলে—দেরি হবে। আপনারা নিচে নেমে আরাম করতে পারেন।

'আরাম হারাম হ্যায়।' কিন্তু যেখানে বসে থাকার চেয়ে হেঁটে বেড়ানো বেশি আরামদায়ক, সেখানে আরাম করায় কারও বোধ করি আপত্তি থাকা উচিত নয়।

অতএব নেমে আসি বাস থেকে। আমি একা নয়, আমার সঙ্গে অনেকে। লক্ষ্যহীনভাবে পথের পাশে পায়চারি করি আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। জ্ঞান হবার পর থেকে এতকাল ধরে আমার যে পরিচিত ভারতকে দেখে এসেছি, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। থাকবে কেমন করে? এ যে আর্যাবর্ত নয়, হিমালয় নয়, হিমালয়পারে লাদাখ। ভারত এখানে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত।

মরুভূমি সদৃশ একটি বালিময় উপত্যকায় পায়চারি করছি। বালিগুলি রৌদ্রদগ্ধ সোনালী প্রস্তরভস্মের মতো, আর উপত্যকাটি অবিকল মালভূমি। এ যেন এক যাদুকরের দেশ। এদেশে সর্বদা উদ্ধত পবনের মাতামাতি।

মনে হচ্ছে অপরিচিত এই যাদুকরের দেশের সঙ্গে আমার পরিচিত পৃথিবীর একমাত্র যোগাযোগ এই কালো পাহাড়ী পথটি। যে পথ আমাকে এই অজানা জগতে নিয়ে এসেছে, যে পথ আমাকে অপরিচিত লাদাখের অন্তরলোকে নিয়ে চলেছে, যে পথ বন্ধ বলে আমি এখানে পায়চারি করছি।

দুদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিভিন্ন গড়নের অসংখ্য পাহাড়। ঐ পাহাড় এবং এই পথ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। গাছপালা পশু-পাখি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই তৃণহীন প্রাণীশূন্য তপ্ত-শীতল রঙিন প্রকৃতির জন্যই পুলকিত পর্যটকরা লাদাখের নাম রেখেছেন চাঁদের দেশ। আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি যেন সত্যই চাঁদের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।

এক ঘণ্টা পরে বেলা দশটায় পথ মুক্ত হল, বাস ছাড়ল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

আজও আমরা সেই কয়টি দেশী-বিদেশী মানুষ, গতকাল সকালে যারা এই সরকারী বাসটিতে আশ্রয় নিয়েছি। আমরা অনেকেই অনেকের নাম জানি না, কিন্তু কেউ আর কারো অপরিচিত নই। ভাষার বৈষম্য আমাদের মাঝে কোনো বিভেদের প্রাচীর তুলতে পারে নি। ইংরেজী ও হিন্দীর সাহায্যে যথাসাধ্য মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছি।

আগেই বলেছি, কেবল ব্যতিক্রম ঐ ইংরেজ যুবক-যুবতী। দরজার পাশে একটা 'ডাব্‌ল সীট'-এ বসেছে ওরা। গতকাল থেকেই দেখছি, ওরা আর কারও সঙ্গে

কথা বলে না। হয় নিজেরা দুজনে কথা বলে, না হয় খায় কিম্বা ঘুমায়। কখনও ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখে মেয়েটি ঘুমায়, কখনও মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখে ছেলেটি ঘুমায়, আবার কখনও দুজনে দুজনের ওপর ভর করে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হয়। গতকাল কার্গিলে ওরা আমাদের হোটেলেই ঠাঁই নিয়েছিল। হোটেলের খাতায় সই করার সময় দুজনে প্রায় হাতাহাতি লেগে গিয়েছিল আর কি! কারণ ছেলেটি মেয়েটিকে তার 'মিসেস' বলে লিখে ফেলেছিল। ছেলেটি ক্ষমা চাইবার পরে মেয়েটি নিজের হাতে সে ভুল সংশোধন করেছে এবং বন্ধুর সঙ্গে একঘরে রাত্রিবাস করতে আর কোনো আপত্তি করে নি।

ওরা দুজন ছাড়া বাকি বিদেশী সহযাত্রীরা প্রায় সবাই সমানে আড্ডা দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। কেবল জঁা ব্যস্ত রয়েছে মহুয়া আর তোতাকে নিয়ে। সে আজও তাদের সঙ্গে তেমনি খেলা করছে। মজার সাহেব সত্যই মজার মানুষ।

ওয়াখা নদী এখনও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। থাকবেই তো। আমাকে যে তার পৌঁছে দিতে হবে সিন্ধুনদের তীরে। আমরা সিন্ধুহীন হিন্দুস্থানের হিন্দু। গতকাল ধরে আমি তাই শুধু সিন্ধুর স্বপ্ন দেখেছি। আজ সেই সিন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আমার। আমি স্বপ্ন-সিন্ধু সন্দর্শনে চলেছি।

নদীর ওপারে তেমনি পাহাড়। একটির পরে একটি রঙীন পাহাড়। কোনটি লাল, কোনটি হলুদ, কোনটি বেগুনী, কোনটি ধূসর, কোনটি কালো, আবার কোনটিতে কালোর ওপরে সাদা সাদা ছোপ। শুধু রঙের বাহার নয়, সেই সঙ্গে গড়নের বৈচিত্র্য। দূরের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে ঢেউ-খেলানো আলপনা আর কাছেরগুলি যেন জীবন্ত জলছবি।

এই রং আর গড়নের বৈচিত্র্যই পাহাড়ী লাদাখের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা সকাল থেকেই দু-চোখ ভরে দেখছি। দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

একটা পুল পেরিয়ে নদীর ডান তীরে এলাম। নদী আমাদের উল্টোদিকে বইছে। ওয়াখা সিন্ধুনদের শাখানদী। তার মানে সে যেখান থেকে এসেছে, আমরা সেখানে চলেছি।

ইংরেজ বান্ধবী মিস্ টম্সনের ঘুম ভেঙেছে। বন্ধু জনের কাঁধ থেকে মাথা তুলে সে সোজা হয়ে বসে। তারপরে উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেটের পকেট থেকে 'চেরী' বের করে খেতে থাকে। বন্ধু নিঃশব্দে দেখছে। কিন্তু বান্ধবী তার দিকে তাকাচ্ছে না, মহানন্দে চেরী চিবোচ্ছে।

বন্ধু বোধ করি আর লোভ সামলাতে পারে না। সে বান্ধবীর কাছে হাত পাতে। না, বান্ধবী তাকে ফিরিয়ে দেয় না। কয়েকটি চেরী তার হাতে দেয়। বন্ধু বান্ধবীর আনন্দের অংশীদার হয়।

নামিকা গিরিবর্ত্মে উঠে এলাম। গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি অক্লেশে। কণ্ডাক্টর না বলে দিলে বুঝতেই পারতাম না এটা কোনো গিরিবর্ত্ম এবং এর উচ্চতা ৩৭১৮ মিটার (১২,২২০´)। নামিকা জোজি লা-য়ের চেয়ে সাতশ' ফুট উঁচু। অথচ চারিদিকে কোথাও একফোঁটা বরফ দেখতে পাচ্ছি না। গিরিবর্ত্মের ওপর

অক্ষত মসৃণ ঝক্‌ঝকে পথ। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা!

শ্রীনগর থেকে নামিকা লা ২৫৯ কিলোমিটার আর কার্গিল এখান থেকে ৫৬ কিলোমিটার। এখন বেলা এগারোটা। তার মানে এই পথটুকু আসতে সওয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগল। এর মধ্যে অবশ্যি ঘণ্টাদেড়েক সময় নষ্ট হয়েছে। তাহলেও এত দেরি হওয়া উচিত ছিল না।

কণ্ডাক্টর জবাবদিহি করে—ফাতু লা পেরোবার পরে বাস রকেটের মতো ছুটবে।

দেখা যাক। কিন্তু দূরত্বের কথা মনে পড়লে স্বভাবতই আশ্বস্ত হতে পারি না। লে এখনও ১৭৫ কিলোমিটার।

কাংরাল গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম। কয়েকখানি ঘর আর কয়েকফালি জমি নিয়ে ছোট গ্রাম। এখান থেকে বাঁদিকে একটি কাঁচাপথ চলে গেল—স্টাক্‌চে, সামরা, চিক্‌তান, সিহাকার ও সান্‌জার গ্রামে। চিক্‌তানে একটি প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে।

নদীর তীরে তীরে পথ। এই উপত্যকার প্রধান জনপদ বোধ-খারবু। আমরা এখন সেখানেই চলেছি।

বোধ-খারবু এসে গেল, কিন্তু বাস থামল না। বরং সমতল পথ পেয়ে ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। বোধ করি 'রকেট' হবার চেষ্টা চলেছে। আমরা তারই মধ্যে জানলা দিয়ে দেখে নিচ্ছি জায়গাটা।

বেশ বড় উপত্যকা। গাছপালা ক্ষেত-খামার ঘর-বাড়ি আর পথের পাশে কয়েকটা দোকান। একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে মানা বলে, "ওটা নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম ভবন। ওখানে পর্যটকদের জন্য দুখানি ঘর নির্দিষ্ট করা আছে।"

বরুণ জিজ্ঞেস করে, "তার মানে আমরা এখন ইচ্ছে করলে এখানে থেকে যেতে পারি?"

"না।" মানা উত্তর দেয়, "আগের থেকে চিঠি লিখে ঘর রিজার্ভ করতে হয়।"

"কেন, খুব ভিড় বুঝি?"

"হ্যাঁ, এখানে যে উন্নয়নের কাজ চলেছে। সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে তাই নানা কাজে এখানে বাইরের লোক আসা-যাওয়া করেন।"

বোধ-খারবু কার্গিল থেকে ৭১ কিলোমিটার। গত পনেরো মিনিটে ১৫ কিলোমিটার পথ এসেছি। এইভাবে চললে 'রকেট' হতে আর বাকী কী? এবং আমরা সন্ধ্যার আগেই 'লে' পৌঁছে যাবো।

কিন্তু আবার যে চড়াই শুরু হল! তাই তো হবে। এবারে আমাদের ফাতু লা অতিক্রম করতে হবে। ১৩,৪৭৯ ফুট উঁচু সেই গিরিবর্ত্মটি এ পথের উচ্চতম স্থান। এখান থেকে ফাতু লা ২১ কিলোমিটার আর ফাতু লা থেকে 'লে' ১৩৯ কিলোমিটার। দূরত্বের কথা ভাবলেই বুকটা কেঁপে ওঠে।

কিন্তু আমার তো এমন আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। দূর আর দুর্গম বলেই যে আমি এপথে এসেছি। অজানাকে জানা আর দূরকে নিকট করবার জন্যই যে আমার এই লাদাখের পথে আসা। সে তো আর দূরে নয়, আমি যে লাদাখে পৌঁছে গিয়েছি। তাকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। চলেছি আমার স্বপ্নধারা

মহাসিন্ধুর কাছে। আমি ফিয়াং দেখব, 'লে' দেখব, হেমিস দেখব। সিন্ধুনদের তীরে তীরে পদচারণা করব। আমি মনমরা হয়ে পড়ছি কেন? তাছাড়া সংসারে যে কোনো পথই অন্তহীন নয়। এতটা পথ যখন পেরিয়ে এসেছি, তখন বাকি পথটুকুও যাবে ফুরিয়ে।

শার্গোল পৌঁছবার পর থেকেই মাঝে মাঝে পথের ধারে, দোকানপাটে কিম্বা ক্ষেতে-খামারে লাদাখী মেয়ে-পুরুষ দেখতে পাচ্ছি। আগেই বলেছি কার্গিল লাদাখে হলেও লাদাখী বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁদের বুঝে থাকি, তাঁরা কার্গিলের বাসিন্দা নন। লাদাখী বলতে আমরা বুঝি লাদাখের প্রচিন অধিবাসী। এঁরা সকলেই বৌদ্ধ। লাদাখের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মতই বিচিত্র এঁদের পোশাক। ছেলেরা সরু পাজামা ও লম্বা আলখাল্লা পরেন, পায়ে চামড়ার জুতো ও মাথায় টুপি। এই টুপিটাই দেখবার মতো। মেয়েদের পোশাকও অনেকটা ছেলেদের মতোই। তবে তাদের গায়ের জামাটি কিঞ্চিৎ হাল্কা ও ছোট। সেটির ওপরে তাঁরা একটি রঙীন জ্যাকেট গায়ে দেন আর পিঠের সঙ্গে হরিণ কিম্বা অন্য কোনো জন্তুর একখানি সুবিরাট চামড়া ঝুলিয়ে নেন। হাতে পায়ে গলায় ও কোমরে নানা রঙের পাথর ও ধাতুর গয়না পরেন। তাঁদের টুপি এবং চুল বাঁধা দুটোই দেখবার মতো।

আজকাল অবশ্য শুনেছি, শহরবাসী ছেলেরা অধিকাংশই প্যাণ্ট-কোট পরছেন, আর মেয়েরাও স্কার্ট কিম্বা শাড়ী পরতে শুরু করেছেন। তবে এইসব আধুনিক পোশাক গ্রামাঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়।

আগেই বলেছি, লাদাখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না বললেই চলে। ৫৮,৩২০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা মাত্র এক লক্ষের কিছু বেশি। এবং এই সংখ্যাটি শ'খানেক বছর ধরে প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ বহুপতি প্রথা এবং প্রতি পরিবারে অন্তত একজনের বিয়ে না করে গুম্ফায় চলে যাওয়া। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে মারাত্মক সমস্যাটি সমতল ভারতের সকল শান্তি বিনষ্ট করতে বসেছে, লাদাখে সে সমস্যা নেই বললেই চলে।

কেবল বহুপতি প্রথা নয়, বহুবল্লভা হবার অপরাধেও লাদাখের সমাজ বোধ করি কোনোদিন কোনো নারীকে শাস্তি দেন নি। স্বামীদের নির্দেশে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রথাও প্রচলিত এদেশে। কিছুকাল আগেও দলে দলে বণিক সারা বছর এইপথে মধ্যএশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং সমতল ভারতে যাওয়া-আসা করতেন। সংসার থেকে নির্বাসিত দুর্গম পথে ভ্রমণরত শ্রান্ত সেই সব সচ্ছল মহাজনরা লাদাখের গ্রামে-গঞ্জে এসে সাময়িক দারপরিগ্রহ করতেন। রীতিমত বিবাহ করে স্ত্রী গ্রহণ। অর্থের বিনিময়ে স্বামীরা সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর অস্থায়ী বিয়ে দিতেন। এমন কি একদিনের জন্য পর্যন্ত বিবাহ হত। বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতেই বণিকের শয্যাসঙ্গিনী হতেন। এবং এর ফলে তিনি সন্তানসম্ভবা হলে সে সন্তান তাঁর স্বামীদের সন্তানরূপে সমাজে স্বীকৃতি পেতো।

বলা বাহুল্য আধুনিকতার প্রভাবে এইসব প্রথা এখন প্রায় অবলুপ্ত। লে এবং অন্যান্য বর্ধিষ্ণু জনপদে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহুপতি প্রথাও প্রায়

বিলুপ্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে আধুনিকতার কলুষ লাদাখের সমাজ জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুখের কথা, মোটরপথ থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলিকে এখনও আধুনিকতার অক্টোপাস গ্রাস করতে পারে নি।

॥ আট ॥

আমরা লাদাখ জেলার মধ্যাঞ্চল দিয়ে পূর্বপ্রান্ত থেকে প্রায় পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করছি—জোজি লা থেকে লে যাচ্ছি। পরে আরও পশ্চিমে এগিয়ে হেমিস পৌঁছব। এই অংশটাই মূল লাদাখ ভূখণ্ড। কয়েকটি নদী দিয়ে বিধৌত এই অঞ্চল। নদীর উপত্যকাগুলি লাদাখ জেলার এক-একটি বিভাগ। শুধু প্রাকৃতিক নয়, শাসনতান্ত্রিক বিভাগও বটে। ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিং ১৮৪২ সালে লাদাখ জয়ের পরে এই উপত্যকাগুলিকেই পরগণারূপে স্থির করেছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আজও সেই বিভাগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এই বিভাগ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে নুব্রা উপত্যকার কথা। এটি নুব্রা এবং শিয়োক নদী বিধৌত অঞ্চল অর্থাৎ লাদাখ জেলার পশ্চিমাংশ। এই উপত্যকার ওপর দিয়েই ছিল সেকালে মধ্যএশিয়ার বাণিজ্যপথ—ইয়ারখন্দ থেকে আর্যাবর্তের পথ।

উত্তর-পূর্বাংশ ছাড়া এই উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং উর্বর। ওখানে আপেল আঙ্গুর খুবানি প্রভৃতি ফল জন্মায়।

নুব্রা উপত্যকার উত্তর-পূর্বাংশ আকসাই চিন। সেখানকার উচ্চতা যোলো থেকে সতের হাজার ফুট। মনুষ্য-বসতিহীন এই অজন্মা অঞ্চলটার কিন্তু ভারতের নিরাপত্তা রক্ষায় অসাধারণ গুরুত্ব ছিল। আগেই বলেছি বাষট্টি ষালে এই (৩৭,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার) অঞ্চলটি চীনারা দখল করে নিয়েছে। আর তারই ফলে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ করে নিতে পেরেছে।

দ্বিতীয় বিভাগটি হল সিন্ধু উপত্যকা। এটি লাদাখের মধ্যাঞ্চল এবং সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ উর্বর অংশ। লাদাখ বললে সাধারণতঃ আমরা এই অঞ্চলটিকেই বুঝে থাকি। এর আয়তন চার হাজার বর্গমাইল। আমার লাদাখ পরিক্রমা এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় বিভাগটির নাম জাঁসকার উপত্যকা। তখন কার্গিলে বসে আমি এই অংশের কথা কিছু বলেছি। অঞ্চলটি লে শহরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। এটি জাঁস্কার নদীর উপত্যকা, আয়তন তিন হাজার বর্গমাইল। তবে অধিকাংশই পর্বতশৃঙ্গ ও হিমবাহে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১৩,১৫৪ ফুট।

রুপ্সু অথবা রুক্সু উপত্যকা লাদাখের চতুর্থ প্রাকৃতিক বিভাগ। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় খাম্পা। উপত্যকার গড় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৯২ ও ৬২ মাইল, আয়তন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল। সর্বনিম্ন উচ্চতা ১৩,৫০০

ফুট। চারিপাশের পর্বতশ্রেণীতে ২০/২১ হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। গাছপালা প্রায় হয় না বললেই চলে। আকসাই চিনের মতো এই উপত্যকায়ও লবণহ্রদ রয়েছে।

লাদাখের শেষ বিভাগটি দ্রাস-পুরিগ-সুরু উপত্যকা। গতকাল বিকেলে এবং আজ সকালে আমরা এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে এসেছি। এই অঞ্চলের আয়তন ৪২০০ বর্গমাইলের মতো।

বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা লাদাখের অংশ ছিল। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিং বন্ধুত্বের বিনিময়ে এই উপত্যকা দুটিকে বৃটিশদের দিয়ে দেন। তাঁরা লাদাখের এই অংশকে পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। বর্তমানে লাহুল-স্পিতি নবগঠিত হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।*

লাদাখ একটি পর্বতময় ভূখণ্ড। অবস্থান ৩২°৪৫′ থেকে ৩৫°৫০′ উত্তর-অক্ষরেখা এবং ৭৫°৪৫′ থেকে ৮০°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমায়। এই জেলার পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। ফলে উপত্যকার ওপর দিয়ে নদীগুলিও একই দিকে প্রবাহিত। লাদাখের প্রধান নদী সিন্ধু। কিন্তু সিন্ধুর কথা পরে হবে। আগে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলির কথা ভেবে নিই।

অন্যান্য নদীর প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে শিয়োক নদীর কথা। এটি সিন্ধুনদের পশ্চিম উপনদী। লে শহরের উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে কিরিস নামে একটা জায়গায় এসে সিন্ধুতে পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ মাইল।

নুব্রা নদী শিয়োকের উপনদী। সাইচান হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে লোকঝুঙ গ্রামের কাছে এসে শিয়োকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটি প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ।

জাঁস্কার নদী সিন্ধুনদের একটি প্রধান উপনদী। এটি দুটি নদীর মিলিতধারা—জাঁস্কার ও সুমগাল। লাদাখ ও লাহুলের সীমায় অবস্থিত বারালাচা গিরিবর্ত্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে জাঁস্কার পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিম্মু গ্রামের কাছে এসে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০ মাইল। এই নদীপথ ধরেও লাদাখ থেকে লাহুলের একটি মোটর পথ তৈরি হয়েছে। এই পথে ৫১০০ মিটার উঁচু শিঙ্গো লা পেরোতে হয়। আর তাই কেবল গ্রীষ্মকালে মোটর চলতে পারে। অনুমতি নিয়ে নিজেদের গাড়িতে কিম্বা আগের মতো পায়ে হেঁটেও যাওয়া যাবে।

এবারে সিন্ধুর কথা ভাবা যাক। তার কথা যে ভাবতেই হবে আমাকে। আমার এই লাদাখে আসার অন্যতম প্রধান কারণ তাকে দেখা এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হব।

লাদাখের প্রধান নদী সিন্ধু। সিন্ধু একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ—সমুদ্র। অর্থাৎ মহাসিন্ধু মানে মহাসমুদ্র।

পশ্চিম তিব্বতে এই নদীর নাম 'সিন্‌হ-খা-বাব্' (Sinh-Kha-bab)। অর্থাৎ যে নদী সিংহের মতো মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর এই নদীর লাদাখী নাম—'সিংগে

*লেখকের 'লীলাভূমি-লাহুল' বইখানি দ্রষ্টব্য।

চু'। সিকিমের মতো লাদাখেও নদীকে 'চু' বলে।

সিন্ধুনদ ভারতবর্ষের পবিত্রতম প্রাচীনতম ও বৃহত্তম নদীগুলির অন্যতম। বর্তমান ভারতে লাদাখ ছাড়া আর কোথাও সিন্ধু নেই। সিন্ধুর বাকি অংশ তিব্বত ও পাকিস্তানে।

৩২° উত্তর-অক্ষরেখা এবং ৮১° পূর্ব-দ্রাঘিমায় মানসসরোবরের কাছে কৈলাস পর্বতের উত্তরাংশ থেকে সৃষ্ট হয়েছে সিন্ধু। ঐ একই অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভারতের আর দুটি মহানদী—শতদ্রু এবং ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু তাদের কথা থাক, সিন্ধুর কথাতেই ফিরে আসা যাক।

সিন্ধুনদের উৎসের উচ্চতা প্রায় সতেরো হাজার ফুট। উৎস থেকে সিন্ধু উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে 'ঘর' নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপরে তিব্বত থেকে প্রবেশ করেছে ভারতে—লাদাখে। নেমে এসেছে তেরো/চৌদ্দ হাজার ফুটে। লাদাখেও সিন্ধু মোটামুটি ভাবে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত।

লে ছাড়িয়ে আসার পরে বাঁদিক থেকে জাঁস্কার নদী এসে সিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। কার্গিলের কাছে ঐ একই তীরে দ্রাস ও সুরু নদীর মিলিতধারা সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

লাদাখ থেকে সিন্ধু বালতিস্তানে প্রবেশ করেছে। প্রবাহিত হয়েছে প্রায় সেই একই উত্তর-পশ্চিম দিকে। স্কার্দু পৌঁছবার কিছু আগে নুব্রা এবং শিয়োকের মিলিতধারা ডানদিক থেকে মহাসিন্ধুর মাঝে বিলীন হয়েছে।

স্কার্দু পেরিয়ে সিন্ধু পৌঁচেছে হরমোষ পর্বতের পাদদেশে। সে স্কার্দুর কাছে একটি সুগভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। আর তারপরেই সিন্ধু গিলগিটের সমতলে অবতরণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়েছে। অবশেষে সিন্ধু পাকিস্তানে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের উদ্দেশে তার যাত্রা করেছে শুরু।

আটক শহরের কাছে কাবুল নদী এসে সিন্ধুতে পড়েছে। ওখানে পৌঁছবার পরেও কিন্তু সিন্ধুনদ তার অর্ধপথ পরিক্রমা পর্যন্ত পূর্ণ করে নি। কৈলাস থেকে আরব সাগরে সিন্ধুর সঙ্গম ১৮০০ মাইল। আর আটক থেকে আরব সাগরের দূরত্ব ৯৪০ মাইল।

আটকের উচ্চতা মাত্র ২০০০ ফুট। তার মানে সিন্ধু সেখানে সতেরো হাজার ফুট থেকে মাত্র দু'হাজার ফুটে নেমে গিয়েছে। এবং আটক থেকেই সিন্ধু সোজা দক্ষিণে চলা শুরু করেছে।

তারপরে হর নদী এসে সিন্ধুতে মিশেছে। লাখাদের কাছে সোহান নদী এসে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর মিঠানকোটের কাছে পাঞ্জাবের পঞ্চনদী তথা ঝিলম, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর মিলিতধারা বাঁদিক থেকে এসে সিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। মিঠানকোটের উচ্চতা মাত্র ২৬০ ফুট। অবশেষে করাচীর কাছে পৌঁছে সিন্ধু তার ১৮০০ মাইল পথপরিক্রমা পূর্ণ করে সাগরে বিলীন হয়েছে।

আগেই বলেছি সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র। এই নদীর বিশালত্ব এবং জলপ্রবাহের গতিবেগ ও পরিমাণের জন্যই বোধ করি এমন নামকরণ। তবে তিব্বত ও লাদাখের

অধিবাসীরা এই নদীকে বড় একটা সিন্ধু নামে অভিহিত করেন না। বাব্বুরের পর থেকেই সিন্ধু নামটি সুপ্রচলিত। এই নদীর প্রবাহপথে অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ। সিন্ধুর বদ্বীপের আয়তন ৩০০০ বর্গমাইল এবং সিন্ধু ৩,৭২,৭০০ বর্গমাইল এলাকাকে জলসিক্ত করেছে।

গ্রীক ও লাতিন গ্রন্থে এই নদীর নাম যথাক্রমে 'সিন্থোস' ও 'সিন্দাস'। বলা বাহুল্য হিন্দুস্থান ও হিন্দু শব্দদুটির উৎপত্তি সিন্ধু থেকে। ঋগ্বেদে যে সপ্তসিন্ধুর কথা বলা হয়েচে, তা হল পঞ্চনদ সরস্বতী ও সিন্ধু। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সিন্ধুর তীরে ঔষধী পাওয়া যায়। বাইবেলেও এই নদীর উল্লেখ রয়েছে।

মহাভারতের যুগে জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন। জয়দ্রথ ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা এবং অভিমন্যুহন্তা সপ্তরথীদের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন তাঁকে বধ করেন। মহাভারতের যুগেও সিন্ধুদেশের ঘোড়া খুব বিখ্যাত ছিল।

হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কৃত হবার পরে বিশ্বের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বঙ্গগৌরব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে একটি বৌদ্ধস্তূপের নিচে মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন যে তৎকালীন সিন্ধুসভ্যতা অত্যন্ত উন্নত এবং সুবিস্তৃত ছিল। সিমলা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে সেকালের প্রায় ষাটটি জনপদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন কি সৌরাষ্ট্রে পর্যন্ত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

হরাপ্পা পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টেগোমারী জেলায় অবস্থিত আর মহেঞ্জোদড়ো হল সিন্ধুর লারখানা জেলায়। সিন্ধু সভ্যতার আনুমানিক সময় খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার থেকে দেড় হাজার বছর। অনুমান করা হয় তখন সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হত, ছিল প্রচুর বন-জঙ্গল ও পশুপাখি। সিন্ধু ছাড়াও ঐ অঞ্চলে মিহ্‌রান নামে আরেকটি বড় নদী ছিল। নদীটি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পায় যেসব দুর্গতোরণ, শস্যভাণ্ডার, কবরস্থান, বিদ্যালয়, সভামণ্ডপ, স্নানাগার ও প্রতিরক্ষা প্রাচীর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সেই সিন্ধুসভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার সূতিকাগার। এবং বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেকালের ভারতবাসীরা সেই সভ্যতায় উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁরা তামার ব্যবহার জানতেন, নিয়মিত কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এবং তাঁদের বাণিজ্যপথ মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা যুদ্ধবিদ্যায়ও কম পারদর্শী ছিলেন না। তাঁরা চিত্রদ্বারা লিখনপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা আজও এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারি নি। শুধু বুঝতে পারা গিয়েছে তাঁরা ডানদিকে থেকে বাঁদিকে লিখতেন। এবং অনেকের মতে এই লিপি ব্রাহ্মীলিপির জনক।

সেযুগে মনে হয় সমাজে মেয়েদের প্রভাবই বেশি ছিল। কারণ দেবীপূজার প্রচলনই অধিক ছিল বলে মনে হয়। তবে শিব বা পশুপতির মতো কিছু দেবতাও তাঁদের পূজার্চনায় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁরা পশু-পাখি, অর্ধমানব, লিঙ্গ এবং যোনি পূজাও

করতেন। মনে হয় সিন্ধুসভ্যতায় যোগাভ্যাসের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

যে নদীকে অবলম্বন করে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, একটু বাদে আমি সেই সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করব। আজ আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হবে, আমার হিন্দুজন্ম সার্থক হবে।

মহাসিন্ধু-বিধৌত মহান লাদাখ, তোমাকে নমস্কার! হে মহামতি মহাসিন্ধু, তুমি এই গাঙ্গেয়-পথিকের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো।

দেখতে দেখতে আমরা উঠে এলাম ফাতু গিরিবর্ত্মের ওপরে। ৪০৯৪ মিটার (১৩,৪৭৯´) উঁচু ফাতু লা শ্রীনগর-লে রোডের উচ্চতম স্থান। তার মানে এই গিরিবর্ত্মটি জোজি লা-র চেয়ে প্রায় দু-হাজার ফুট বেশি উঁচু। কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো তুলনা করা চলে না। সেখানে ছিল বরফ আর এখানে মাটি, সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, এখানে খটখটে রোদ। তবু যা হোক হাওয়া রয়েছে, নইলে নিশ্চয়ই গরম লাগত। সাড়ে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে গরম!

শুধু তাই নয়, একে মোটেই গিরিবর্ত্ম বলে মনে হচ্ছে না। একটা ময়দানের মধ্য দিয়ে বাস চলেছে যেন। আমরা শ্রীনগর থেকে ২৯৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম।

দক্ষিণদিকে দুটি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। বিভাস ম্যাপ খোলে। দেখেশুনে বলে, “নুন-কুন”।

গিরিবর্ত্মের ওপরে গাড়ি থামল না। এগিয়ে চলল। একটু বাদেই বাস নামতে শুরু করে। আঁকাবাঁকা পথে আমরা নিচের সবুজ উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছি। মানা বলে, “ওটা লামায়ুরু”।

লামায়ুরু পৌঁছনো গেল। শ্রীনগর থেকে ৩১০ কিলোমিটার এলাম, আরও ১২৪ কিলোমিটার যেতে হবে। এখন বেলা বারোটা বেজে বিশ।

সিন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও, কিন্তু আমরা সিন্ধু-উপত্যকায় এসে গিয়েছি। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু-উপত্যকা শুরু হল।

পথের ডানদিকে খানিকটা দূরে ছোট একটি পাহাড়ের ওপরে লামায়ুরু বা লামাগুরু গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। এটি লাদাখের প্রাচীনতম গুম্ফা।

কথিত আছে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের আমলে এখানে একটি স্বচ্ছ সরোবর ছিল। সেই হ্রদে নাগদেবতারা বাস করতেন। একদা ভবিষ্যদ্বাণী হল—হ্রদের জল যাবে শুকিয়ে এবং সেখানে একটি গুম্ফা নির্মিত হবে।

ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে কিন্তু সময় লাগে। তার আগেই খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নরোপা নামে জনৈক মহাজ্ঞানী এই উপত্যকায় আসেন এবং বহু বছর এখানে ধ্যানমগ্ন থাকেন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে সহসা লাদাখের রাজা আদেশ দিলেন, এখানে একটি গুম্ফা নির্মিত হবে। রাজার আদেশে দশম শতাব্দীর শেষদিকে রিণ্চেন জ্যাংবো এই গুম্ফা নির্মাণ করলেন।

তখন পাঁচটি বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। এখন কেবল মাঝখানের বড় বাড়িটি অক্ষত রয়েছে। বাকি বাড়িগুলো সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের ধ্বংসস্তূপ আজও চারিদিকে পড়ে আছে।

শুনেছি এই গুম্ফার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন একাদশ শিব এবং একহাজার চক্ষুসমৃদ্ধ বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিগুলি নাকি অবিস্মরণীয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য মন্দ। আমরা এ গুম্ফা দর্শন করতে পারলাম না।

গুম্ফাটি মূল পথ থেকে দূরে নয়, কিন্তু দর্শন করতে হলে বাসটিকে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে। ড্রাইভার কিছুতেই রাজী হল না। এমন কি জনপ্রতি পাঁচ টাকা বাড়তি ভাড়ার লোভ দেখিয়েও তার মন গলানো গেল না। যাত্রীবাহী সরকারী বাসে এলে এই অসুবিধে। পথে কিছুই দেখা যায় না। রিজার্ভড বাস কিম্বা নিজেদের গাড়িতে এলে দেখতে দেখতে যাওয়া যেত। আমরা কয়েকদিন লাদাখে থাকব কিন্তু লামায়ুরু দেখা হবে না। লে থেকে অতটা পথ এসে গুম্ফা দেখে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

অতএব অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি প্রাচীন দেবালয়ের দিকে। চলমান বাসে বসে ভেবে চলি—

লাদাখের প্রত্যেক গুম্ফারই কিছু জমি-জায়গা আছে। আগে রাজারাও নিয়মিত সাহায্য করতেন। ফলে সেকালে প্রত্যেক গুম্ফায় বহু লামা বাস করতেন। শুনেছি এই গুম্ফায় প্রায় চারশ' লামা থাকতেন। এখন রাজার সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে, ভক্তরাও তেমন দান-ধ্যান করেন না। ক্ষেতের ফসলে অত মানুষের ভরণপোষণ সম্ভব নয়। তাই এখন এখানে মাত্র বিশ-ত্রিশজন লামা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বাকি লামারা পুরোহিত কিম্বা শিক্ষকের কাজ নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

লাদাখে প্রত্যেক বড় গুম্ফার অধীনে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট গুম্ফা নির্মিত হয়েছে। গ্রামবাসীরা সেইসব গুম্ফায় সাধ্যমত সাহায্য করেন। অধীনস্থ গুম্ফার লামারা বাড়তি আয় পাঠিয়ে দেন বড় গুম্ফায়।

এই গুম্ফার অধীনস্থ লামাগণ প্রতি বছর মার্চ ও জুলাই মাসে এখানে এসে প্রার্থনা উৎসবে যোগ দেন। তখন লামায়ুরু গুম্ফায় মুখোশনৃত্যের আসর বসে।

আগেই বলেছি লামায়ুরু লাদাখের প্রাচীনতম গুম্ফা। তাই ষোড়শ শতাব্দীতে এই দেবালয় মোক্ষক্ষেত্র বলে ঘোষিত হয়। তখন খুন ও নারীধর্ষণের মতো গর্হিত অপরাধ করেও কেউ যদি এই গুম্ফায় এসে আশ্রয় নিতে পারত, তাহলে সে রাজদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যেত। আজও তাই এই গুম্ফার নাম 'থারপা লিঙ' বা স্বাধীন ভূমি।

লাদাখে প্রত্যেক গুম্ফায় একটি পবিত্র দেওয়াল আছে। ধস কিংবা বাতাসের ক্ষয় থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্যই এই দেওয়াল। ভক্তরা পাথর বয়ে এনে ঐ দেওয়াল নির্মাণ করে দেন। দেওয়ালে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' কথাটা লেখা থাকে বলে এর নাম 'মণি দেওয়াল'। গুম্ফা-দর্শনার্থীদের অবশ্যই এই দেওয়াল পরিক্রমা করতে হয়। দর্শনকালে দেওয়ালটিকে বাঁদিকে রেখে এগোতে হয়।

লামায়ুরু কেবল লাদাখের প্রচীনতম গুম্ফা নয়, বর্তমান লাদাখের একমাত্র প্রচীন গুম্ফা। উনবিংশ শতাব্দীর ডোগরা আক্রমণের সময় লাদাখের প্রায় সমস্ত বড় গুম্ফা ধ্বংস হয়ে যায়। তখন নাকি গুম্ফাগুলো দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর তারই ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাহলেও ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিংকে আমি নির্দোষ বলতে পারছি না। কারণ হিন্দুজাতির ইতিহাসে ধর্মস্থান ধ্বংস করার নজির প্রায় নেই বললেই চলে।

যেভাবেই হোক লামায়ুরু গুম্ফাটি মূল পথের প্রায় পাশে অবস্থিত হয়েও আংশিক অক্ষত রয়ে গিয়েছে। আর তাই আজ এটি লাদাখের প্রচীনতম পবিত্র স্মৃতিরূপে সমাদৃত।

পাহাড়ের গা বেয়ে পথটা নেমে এলো উপত্যকায়। বাস ছুটে চলল উর্বরা উপত্যকার ওপর দিয়ে। পথের পাশে বাড়ি-ঘর আর ক্ষেত-খামার, তারপরে পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপর গুম্ফা। এই উপত্যকার নাম দ্রোগ্‌পো।

সেকালের যাত্রীদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা না করে পারছি না। তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে ধীরে-সুস্থে পথ চলতেন। শ্রীনগর থেকে লামায়ুরু আসতে তাঁদের এগারো-বারো দিন সময় লেগে যেত। অনেক কষ্ট করে তাঁদের পথ চলতে হত। কিন্তু তাঁরা পথের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে পেতেন।

পথের ডানদিকে একটা খাড়া উৎরাই মোটরপথ উপত্যকায় নেমে গেছে। কণ্ডাক্টর জানায়—এটাই গুম্ফায় যাবার পথ।

গাড়ি যাবার পথ আছে কিন্তু বাসযাত্রীদের গুম্ফা দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয় না। অথচ এই একই সরকারী সংস্থার বাস জম্মু-শ্রীনগর পথে চলাচল করে। সেখানে সামান্য কিছু বেশি ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রীদের ঝিলমের উৎস ভেরীনাগ দেখিয়ে দেওয়া হয়। মূল পথ থেকে ভেরীনাগের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার।

যাই হোক দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আর কি হবে? তার চেয়ে লাদাখকে দেখা যাক। পথের পাশে পাথরে পাথরে মাঝে মাঝেই লেখা রয়েছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'। মনে পড়ছে সিকিমের কথা, মনে পড়ছে লাহুল আর স্পিতি উপত্যকার কথা। সেখানেও পথে পথে এই একই মন্ত্র লেখা দেখেছি। তার মানে প্রাকৃতিক প্রচীর ও রাজনৈতিক বিভেদ ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে নি।

যতদূর জানা যায় সম্রাট অশোকের আমলে (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ ২৩৬) হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে লাদাখেও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে কুষাণ যুগে (খ্রীঃ পূর্ব ৫০ থেকে ২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এইসব অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব আরও বেশি শক্তিশালী হয়। কিন্তু তারপরে নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে এই সুমহান ধর্মের প্রভাব মানুষের মন থেকে মুছে যেতে থাকে। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে একদিন স্বোয়াত উপত্যকার উদ্দিয়ানা থেকে একজন সন্ন্যাসী রিওয়ালসার এলেন। সেখানে এক ধর্মসভায় তিনি বিবদমান তান্ত্রিকধর্ম ও পৌত্তলিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক আশ্চর্য ভাষণ দান করেন। তান্ত্রিকদর্শনের রহস্য এবং মূর্তিপূজার সেই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তাঁকে অচিরেই জনপ্রিয় করে তুলল। কিছুকালের

মধ্যেই তিনি যুগাবতাররূপে স্বীকৃত হলেন সারা হিমালয়ে।

যুগাবতার পদ্মসম্ভব (৭৫০-৮০০ খ্রীঃ) কেবল মহাপণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন একজন অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু পর্যটক। তিনি সিকিম, ভূটান, নেপাল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, কাশ্মীর, লাদাখ, লাহুল-স্পিতি ও তিব্বতের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। তাঁরই নির্দেশে হিমালয়ের পাথরে পাথরে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' কথাটি লেখা হয়েছে। এবং সহস্রাধিক বছর পরেও সেই মহামন্ত্রের সমান সমাদর রয়েছে।

"শঙ্কুদা, তাকিয়ে দেখুন ল্যাঙরু লুপ।"

মানার কথায় আমার ভাবনা হারিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পথের দিকে তাকাই। বিস্মিত হই। বহু বছর আগে প্রথমবার দার্জিলিং যাবার পথে বাতাসিয়া লুপ দেখে এমনি বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর। সেখানে পথটা বৃত্তাকারে একবার ঘুরেছে, আর এখানে অর্ধবৃত্তাকারে বহুবার—অনেকটা ইংরেজী 'S' অক্ষরের মতো। এঁকেবেঁকে ওপরে উঠেছে।

এক-একটা বাঁক পেরিয়ে আমরা এক-একটি ধাপ ওপরে উঠছি। দু-দিকেই পথের সারি। ওপরে ও নিচে একসঙ্গে পথের বেশ কয়েকটা করে ধাপ দেখা যাচ্ছে। প্রতি ধাপে চলমান গাড়ি। গাড়িগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধাপে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলেছে। পাশাপাশি দুটি ধাপে বিপরীত দিকে ছুটেছে। দেখতে ভারী মজা লাগছে। এগুলো যেন সত্যিকারের গাড়ি নয়। কতগুলো খেলনার মোটরকে বুঝিবা চাবি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আমার দু-পাশে, ওপরে ও নিচে যথেচ্ছ ছুটোছুটি করছে।

দেরি হয়ে যাবে বলে ড্রাইভার আমাদের লামায়ুরু গুম্ফা দেখায় নি। কিন্তু 'মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' তার তাড়াতাড়ি পৌঁছবার পরিকল্পনা সফল হল না। ল্যাঙরু লুপ থেকে সমতলে নেমে আসার আগেই থামতে হল আমাদের। নিচের থেকে কন্‌ভয় আসছে।

অপেক্ষাকৃত একটু চওড়া জায়গা দেখে ড্রাইভার পাহাড়ের গায়ে গাড়ি থামিয়েছে। এখান থেকে ওপর-নিচে পথের অনেকগুলি ধাপ দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি, নিচের থেকে সারি সারি গাড়ি উঠে আসছে। একটু বাদেই সেই গাড়ির শোভাযাত্রা আমাদের গাড়িকে অতিক্রম করতে থাকল।

গতকালের কন্‌ভয়-ভীতি আজও মন থেকে মুছে যায় নি। কাল কন্‌ভয়ের জন্য প্রায় তিন ঘণ্টা পথে বসে থাকতে হয়েছে। জানি না, আজ অদৃষ্টে কি আছে?

তবে কালকের মতো আজ অত খারাপ লাগছে না। কাল বৃষ্টি হচ্ছিল, আজ ঝক্‌ঝকে রোদ। কাল কন্‌ভয় দেখেছি, আজ রোমাঞ্চকর পথটিকে দেখছি—একটি নয়, অনেকগুলো পথ পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। আর তাদের বুকের ওপর দিয়ে কতগুলো গাড়ি ইতস্তত ছুটোছুটি করছে।

না, কালকের মতো অতক্ষণ দাঁড়াতে হল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে পৌনে দুটোর সময় কন্‌ভয় শেষ হয়ে গেল। শুরু হল অবরোহণ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা নেমে এলাম সমতলে। তার মানে পাঁচ মিনিট আগে এলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বেঁচে যেত।

যা হবার নয়, তার জন্য আপসোস করা বৃথা। কী পাই নি তার হিসেব না মিলিয়ে, যা পেয়েছি তারই কথা বলা যাক। এবং সে পাওয়া আমার জীবনের পরমপ্রাপ্তি।

লূপ থেকে নেমে আসার পরেই দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে। আমার শৈশব-স্বপ্ন সত্য হল, হিন্দুজন্ম সার্থক হল। আমি মহাসিন্ধুকে দর্শন করি। দু-হাত জোড় করে তাকে প্রণাম জানাই।

পথের পাশে পাথুরে বেলাভূমি, তারপরে স্বপ্নসিন্ধু। সে চলেছে আমার বিপরীত দিকে। গঙ্গার মতো সেও স্বর্গের অমৃতধারা বহন করে মর্ত্যলোকে নিয়ে চলেছে। তাই সে স্বচ্ছসলিলা নয়, গঙ্গোদকের মতই গৈরিকধারা। আমি এই কৈলাসপুত্রের পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করতে পারব, তার তীরে তীরে পদচারণা করতে পারব। আমি আজ ভারতীয় সভ্যতার সূতিকাগার সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমি ধন্য।

এখানে জাঁস্‌কার গিরিশ্রেণী শেষ হয়ে গেল। এবারে আমরা লাদাখের মূল পর্বতশ্রেণীতে প্রবেশ করব। সেখানে বেলেপাথর আর চুনামাটি, গ্রানিট প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ পুনরায় প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন আসন্ন।

পাথুরে নদীতীরের উৎরাই পথ বেয়ে বাস একটা পুলের ওপরে এসে উঠল। এটাই খালসি পুল। এই পুলটি উত্তর ও দক্ষিণ লাদাখের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে। হেডিন শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে ত্রয়োদশ দিনে এখানে পৌঁছেছিলেন।

এই পুলের ওপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য তাঁর বড়ই ভাল লেগেছিল। তিনি লিখেছেন....“It is a grand sight, and I halt for sometime on a swinging wooden bridge to gaze at the vast volume of water which, with its great load and its rapid current, must excavate its channel ever deeper and deeper....’

এখন আর সেই ঝুলন্ত কাঠের পুল নেই, তার জায়গায় তৈরি হয়েছে আধুনিক ‘ব্রিজ’। কিন্তু সিন্ধু বোধ করি আজও তেমনি দুর্বার। পঁচাত্তর বছরেও তার যৌবন জলতরঙ্গে ভাঁটার টান পড়ে নি।

কিন্তু আমি যে সরকারী বাসের সওয়ার হয়ে লাদাখ দর্শনে এসেছি। হেডিনের মতো দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে সিন্ধু-সন্দর্শনের সময় কোথায় আমার? বাস পুলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

হেডিনের আমলের পুলটি সম্ভবত উজির জরোয়ার সিং তৈরি করিয়েছিলেন। লাদাখ জয়ের পরে এই বিচক্ষণ ডোগরা সেনাপতি বুঝতে পেরেছিলেন, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রীনগর থেকে লে পর্যন্ত পথের সংস্কার সাধন করান।

জরোয়ার সিং-য়ের লাদাখ বিজয়ের অনতিকাল পরে স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহ্যাম লাদাখে আসেন। তিনি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘Ladak’ বইতে লিখেছেন—“The greater portion of this road, which lies in Ladak, was made by Zorawar

Singh after the conquest of the country.....The large bridge over the Indus at Khallach (Khalsi), as well as the smaller bridges.... were all built by the energetic General, who knowing the value of communications, have since kept them in excellent repairs.'

পুল পেরিয়ে আমরা সিন্ধুনদের ডানতীরে এলাম। শুরু হল সিন্ধুর তীরে তীরে পথ চলা। এখন যে ক'দিন আমি লাদাখে থাকব, সিন্ধু সর্বদা সঙ্গে থাকবে আমার। আমি প্রতিদিন প্রতিপদে সিন্ধুর স্নেহস্পর্শ লাভ করব।

ডাইনে নদী, বাঁয়ে একফালি পাথুরে উপত্যকা, তারপরে পাহাড়ের সারি—নেড়া পাহাড়।

না, পাহাড়গুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের রং ফিরছে। সবুজের ছোঁয়া লাগছে।

এখন আর একটাও নেড়া পাহাড় নেই, সবই সবুজ। শুধু তাই নয়, পাহাড় সরে গিয়েছে বহুদূরে। তার জায়গায় দেখা দিয়েছে একটি উর্বর উপত্যকা। ক্ষেত-খামার বাড়ি-ঘর আর দোকানপাট। আমরা খালসি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি।

ভারী সুন্দর গ্রাম। পথের পাশে উইলো আর পপ্‌লারের সারি। তাদের কচি সবুজ পাতাগুলি বাতাসে দোলা খেতে খেতে আমাকে রূপসী বাংলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি গঙ্গাতীর থেকে সিন্ধুতীরে এসেছি, তবু সোনার বাংলাকে বিস্মৃত হই নি। তাই লাদাখের খালসিতে এসে আমার বরিশালের গাভা গ্রামের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ঢাকুরিয়ায় আমার ছোট্ট বাগানটির কথা।

।। নয় ।।

বেলা ঠিক দুটোর সময় খালসি বাজারে এসে বাস থামল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের যাত্রা-বিরতি ঘটল। আজ সওয়া আট ঘণ্টায় আমরা ১৩৪ কিলোমিটার এসেছি। ভালই বলতে হবে। কারণ এর মধ্যে মুলবেখে চা খাওয়া এবং পথে কন্‌ভয়ের জন্য সওয়া ঘণ্টার মতো থামতে হয়েছে। তার মানে গড়ে ঘণ্টায় ১৯/২০ কিলিমিটার বেগে বাস চলেছে।

শ্রীনগর থেকে ৩৩৭ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম। এখান থেকে লে ৯৭ কিলোমিটার—শুধু সাতানব্বুই। ভাবতেও ভাল লাগছে।

যাওয়া-আসার পথে প্রায় সবাই এখানে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে নেন। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে বহু রেস্তোরাঁ ও খাবারের হোটেল। এখন অবশ্য এখান থেকে কার্গিলের একটি নূতন পথ তৈরি হচ্ছে। সেই পথে যাত্রীদের আর নামিকা লা এবং ফাতু লা পেরোতে হবে না। পথটির দূরত্ব কত হবে জানা নেই আমার। তখন কোথায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের স্থান নির্দিষ্ট হবে, তাও জানি না। অন্য কোথাও হলে খালসি নিশ্চয়ই তার মূল্য ফেলবে হারিয়ে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই ভোজনস্থলী

আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেব। খুবই খিদে পেয়েছে। অতএব সবার সঙ্গে নেমে আসি বাস থেকে।

আমরা খাবার বানিয়ে এনেছি। হরেন ও কালী সেগুলো গাড়ি থেকে নামাচ্ছে। নন্দা ও মানা তদারকি করছে। পরিবেশনের কিছু দেরি আছে। এই ফাঁকে খালসি জায়গাটাকে একটু দেখে নেওয়া যাক।

বরুণ ও স্বপনের সঙ্গে পথে পায়চারি শুরু করি। বেশ ভাল লাগছে। একে অনেকক্ষণ একভাবে বাসে বসে ছিলাম, এখন হেঁটে বেড়াতে বেশ আরাম লাগছে। তার ওপরে জায়গাটিও জমজমাট। নানা রঙের বিচিত্র বেশে নারী-পুরুষ দোকানী তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসে আছেন। সত্যই এ এক নূতন দেশ।

পথের পাশে ছোট ডাক ও তার ঘর। সামনে সুবিরাট একটা আখরোট গাছ। কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়িয়ে আসার পরে আর এত বড় আখরোট গাছ দেখি নি।

আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। একজন বৃদ্ধ লাদাখীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি মোটামুটি হিন্দী বলতে পারেন। আমরা কলকাতা থেকে আসছি শুনে মানুষটি বেজায় খুশি।

কথায় কথায় তিনি জানান—খালসিকে আমরা বলি খালাৎসে। এটি শুধু বড় গ্রাম নয়, চারিপাশের সমস্ত গ্রামের প্রাণকেন্দ্রও বটে।

"শঙ্কুদা, আসুন। খাবার নিয়ে যান।"

নন্দার ডাক কানে আসে। খেতে ডাকছে। খুবই খিদে পেয়েছে। তাই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসের কাছে ফিরে আসি।

পথের ধারে গাছের ছায়ায় একখানি বড় পাথরের ওপর খাবার সাজিয়ে রেখেছে—কাগজের থালায় লুচি তরকারী ও হালুয়া। এক-একখানি করে প্লেট তুলে নিয়ে আমরা খেতে শুরু করি।

খাবার পরে পাশের দোকানের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সবাই চা খেয়ে নিই। তারপরে উঠে আসি গাড়িতে।

বেলা পৌনে তিনটায় বাস ছাড়ে। বাঁদিকে বাড়ি-ঘর, ডানদিকে সিন্ধুনদ। একটু বাদে বাড়ি শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় ক্ষেত। কয়েক মিনিট পরে ক্ষেত ফুরিয়ে গেল। আর তার পরেই সবুজ উপত্যকাটি গেল হারিয়ে। সিন্ধু শুধু সঙ্গে রয়ে গেছে। তাকে তো থাকতেই হবে সঙ্গে। আমি যে তারই কাছে এসেছি। গঙ্গাতীর থেকে সিন্ধুতীরে।

উপত্যকা পেরিয়েই পথটা চড়াই হল। অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। আবার সমতল—মালভূমির মতো। সেই সমতলের বুক বেয়ে পথ। পথের ডানদিকে নদী। নদীর ওপারে পাহাড়। আর বাঁদিকে বেশ খানিকটা বালি আর কাঁকরের ভূখণ্ড। তারপরে আবার পাহাড়।

না, পাহাড় নয়। পাহাড় বলতে এতকাল যা বুঝে এসেছি, কোনমতেই তা নয়। এদেরই দেখে হিমালয়-পথিক প্রবোধদা বলেছেন, 'সে নয়, সেই যাকে সুদূর পূর্বলোক থেকে দেখতে দেখতে এসেছি। যাকে দেখেছি নামচা-বারোয়ায়, ভূটানের

ভেতরে ভেতরে....সেই ব্যাঘ্রচর্মাসন ভূজঙ্গভূষণ চীরবাসা মহাজট এখানে নেই,—এ যেন অন্যরূপী ভৈরব, এ যেন যোগতন্দ্রা-সমাহিত মহাস্থবির কর্কশ কঙ্কাল শ্মশান-শয্যায় শায়িত। সর্বাঙ্গে তার মধ্যএশিয়ার চিতাভস্ম মাখা।'

এই পথ আর ঐ পাহাড় দেখে প্রবোধদার মনে হয়েছে, 'এ একটা আদিম পৃথিবী—যেটা স্থানু, পরিবর্তনের ধারা কোনও চিহ্ন যেখানে রাখে নি। দু'হাজার বছর আগে যে পাথরের টুকরোটি পথের ধারে ঠিক যেখানে পড়েছিল, আজও ঠিক সেইখানে সেটি পড়ে রয়েছে।'

বাস থামল। কণ্ডাক্টর বলে—চেক্ পোস্ট্।

এই রে, সেরেছে! এবারে নিশ্চয়ই তল্লাসীর নামে শাস্তি শুরু হবে। আমাদের অনেক মালপত্র। অধিকাংশ চট দিয়ে মুড়ে সেলাই করা। সেগুলো খুলে ফেললে যে খুবই মুশকিলে পড়ব।

কিন্তু না, লাদাখের পুলিস দেখছি অতিশয় অমায়িক এবং ভদ্র। কেবল আমাদের নয়, বিদেশী বন্ধুদের কথা পর্যন্ত তাঁরা বিশ্বাস করলেন। কাউকে বিন্দুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না করে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে থাকলেন।

সুযোগ পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে উঠি। না, পুলিস নয়, লাদাখের বাতাস। গাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। তাই বাসে বসে পবনদেবের এই উন্মত্ত আচরণ এতক্ষণ টের পাই নি। কিন্তু পথে নামতেই তিনি আমাকে অস্থির করে তুললেন। মনে হচ্ছে যেন ঝড় বইছে। উন্মাদ পবনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে এসে আশ্রয় নিই।

তল্লাসী শেষ হয়। পুলিসদল বাস থেকে নেমে যান। বাস চলতে শুরু করে। আমাদের ডানদিকে সিন্ধু—সোনার সিন্ধু। সত্যই সোনা পাওয়া যায় সিন্ধু ও তার উপনদীদের তীরে তীরে। লাদাখের রাজা একসময় 'গঙ্গে' ও 'রুডক' থেকে যথাক্রমে ২১৮৬'২৫ গ্রাম এবং ১৯১৮'১০ গ্রাম সোনা রাজস্ব হিসেবে পেতেন। তবে সে সোনার সামান্য অংশ দিয়েই রাণীদের অলঙ্কার তৈরি হয়েছে। সেই সোনার অধিকাংশই রাজারা গুম্ফায় দান করে দিতেন।

গুম্ফার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল রিজঙের কথা—রিজং গুম্ফা। এরই কোনো জায়গা থেকে বোধ করি সেখানে যাবার পথ। কথাটা কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়—ঐ যে বাঁদিকে রিজঙের পথ।

একটু বাদেই সেখানে বাস আসে। পথটাকে ভাল করে দেখি—মাটির মোটরপথ।

এবারে মানা কথা বলে, "আমরা খালসি থেকে ২৬ কিলোমিটার এসেছি। এ জায়গাটার নাম উলে-টোক্পো। 'সীতা ওয়ার্লড্ ট্র্যাভেল্স' এখানে একটি স্থায়ী শিবির করেছেন। ঐ দেখুন, সামনে সারি সারি রঙীন তাঁবু দেখা যাচ্ছে।"

আমি দেখি। রিজঙের পথ ছাড়িয়ে মাত্র শ'দুয়েক মিটার পরে, কয়েকখানি কাঠের ঘর ও কয়েকটি রঙীন তাঁবু। ভারী সুন্দর শিবির। 'সীতা ওয়ার্লড্ ট্র্যাভেল্স' একটি বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন সংস্থা। নিজেদের গাড়িতে করে তাঁরা পর্যটকদের এখানে নিয়ে আসেন। এখান থেকে যাত্রীরা চারিপাশের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখেন। আর সেই

সঙ্গে লাদাখের অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির মাঝে বসবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

জাঁ কিন্তু ভারী মনোযোগ দিয়ে সীতার শিবিরটিকে দেখছে। কি জানি কি মতলব? হয়তো 'লে' শহরে পৌঁছেই বলে বসবে—এসো, আমরাও একটা ভাল জায়গা বেছে সীতার মতো শিবির করে ফেলি।

কিন্তু ওদের কথা থাক, তার চেয়ে রিজং গুম্ফার কথা ভাবা যাক। একটু আগে আমরা যে পথটি ছাড়িয়ে এলাম, সেই পথ দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে গেলেই একটা নদী পাওয়া যাবে। পুলের ওপর দিয়ে নদী পার হতে হবে। তারপরে ডান দিকের পথ ধরে ঘন্টাখানেক হাঁটলে একটা খুবানি বাগানে পৌঁছব, জায়গাটার নাম জুলিচেন। সেখানে রিজং গুম্ফার সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটা আশ্রম রয়েছে। তাঁদের দু-চারজনের সঙ্গে দেখাও হবে আমাদের। দেখব তাঁরা উল বুনছেন। তাঁরাই গুম্ফার পথটি দেখিয়ে দেবেন।

পথের শুরুতেই একটা নীল পতাকাদণ্ড। তারপরে সারি সারি মণিপাথর। প্রত্যেকটি পাথরে রঙীন চিত্র ও নানা উপদেশ লেখা। পাথরগুলো পেরিয়ে একটা গাছপালাহীন পাথুরে উপত্যকা। জুলচিন থেকে প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে আমরা প্রথম চোর্তেনটির কাছে পৌঁছব, দেখব তার পাশে একখানি কাঠের ওপর ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—"Refrain from smoking, drinking and eating here."

ধূমপান এবং মদ্যপান বোঝা গেল, কিন্তু 'eating' কেন? এই গুম্ফার লামারা কি প্রতিদিন উপোস করেন যে দর্শনার্থীদের খেতে নিষেধ করেছেন! না, তা নিশ্চয়ই নয়। মনে হয় দর্শনার্থীরা যেখানে-সেখানে বসে যাতে সঙ্গের খাবার না খান, তারই জন্য বিধিনিষেধ।

সেই সাইনবোর্ডের পরেই পথটা ঢালু হয়ে উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উর্বর অংশে প্রসারিত হয়েছে। আর সেখানেই দক্ষিণদিকে পাহাড়ের পাদদেশে গুম্ফা। উচ্চতা ৩৪৫০ মিটার।

১৮২৯ সালে গুম্ফাটি নির্মিত হয়েছে। এখন জন-তিরিশেক লামা স্থায়ীভাবে গুম্ফায় বাস করছেন। মানালী ও ধর্মশালার লামা হচ্ছেন রিজঙের প্রধান লামা। এখন অবশ্য প্রধানতম লামা নিজেই ধর্মশালায় থাকেন। তিব্বত থেকে পালিয়ে আসার পরে মহামান্য দালাই লামা ধর্মশালাকেই তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করেছেন।

রিজং গুম্ফায় মূল মন্দিরটি সত্যই দেখবার মতো। তারপরেই দেখতে হবে পাথরের প্রার্থনা-ঢোলটি। পাথর হলেও ঢোলের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। সেই শব্দের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে প্রতিদিন লাদাখের ঘুমন্ত প্রকৃতি জেগে উঠে ভক্তদের সঙ্গে বুদ্ধের জয়গানে যোগ দেয়।

মেয়েরা এই গুম্ফায় রাত্রিবাস করতে পারেন। সঙ্গে মহিলা থাকলে তাই দর্শনের পরে তাঁদের জুলিচেন আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাঁরা সেখানে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে রাত কাটাবেন। পরদিন ফেরার পথে সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে বাসপথে আসতে হবে। বাসপথ থেকে রিজং গুম্ফা ৬ কিলোমিটার। অদূর ভবিষ্যতে নাকি

গুম্ফা পর্যন্ত মোটরপথ প্রসারিত হবে। তখন লাদাখ দর্শনার্থীদের আমার মতো বাসে বসে রিজং গুম্ফার কথা ভাবতে হবে না। 'লে' যাতায়াতের পথে তাঁরা গুম্ফাটি দর্শন করে নিতে পারবেন।

বাস এগিয়ে চলেছে। সাসপোল বোধ করি আর দূরে নয়। খালসি থেকে সাসপোল ৩৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে আমরা অন্তত তিরিশ কিলোমিটার পেরিয়ে এসেছি। তাহলে এবার কণ্ডাক্টরকে আল্‌চি গুম্ফার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়। গুম্ফা তো দেখা হবে না, গুম্ফার যাবার পথটিকে অন্তত দেখে যাওয়া যাক।

আমার প্রশ্ন শুনে কণ্ডাক্টর মাথা নাড়ে। বলে—হ্যাঁ, খালসি থেকে ২৬ কিলোমিটার পরে রিজঙের পথ আর ৩৩ কিলোমিটার পরে আল্‌চির পথ। এই এসে গেল বলে, আমি দেখিয়ে দেব।

শুনেছি সিন্ধুর ওপারে এক বিস্তৃত উপত্যকায় আল্‌চি গ্রাম। সেখানেই একাদশ শতাব্দীর সেই সুপ্রাচীন গুম্ফা। কিন্তু সেটিও আক্রমণকারীদের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয় নি। কারণ গ্রামটি লে-শ্রীনগর পথের ওপরে নয় এবং অন্যান্য জায়গার মতো গুম্ফাটি পাহাড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সমতলে অবস্থিত। দূর থেকে গুম্ফাটি দেখা যায় না। এই গুম্ফার বুদ্ধমূর্তি এবং কাঠের ওপর খোদাই কাজ নাকি দেখবার মতো।

কিন্তু দেখা হল না আমাদের। সরকারী বাস থামিয়ে আল্‌চি দেখে আসার সুযোগ নেই এখন, আর পরে 'লে' থেকে এই ৬৪ কিলোমিটার এসে গুম্ফা দর্শন করে যাওয়াও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—এই যে পুলের ওপর দিয়ে আল্‌চি গ্রামের পথ চলে গেল।

কণ্ডাক্টরের কথা শুনে তাড়াতাড়ি পথের ডানদিকে তাকাই। মূল পথ থেকে একটা কাঁচা মোটরপথ গেছে সিন্ধুর বেলাভূমিতে। সেখানে একটা কাঠের পুল। জীপ যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে নাকি ঐ পুল এবং পথের সংস্কার-সাধন করা হবে। তখন কার্গিল থেকে লে যাবার পথে বাসগুলো ইচ্ছে করলে আল্‌চি ঘুরে যেতে পারবে। কিন্তু যাবে কী?

বেলা চারটের সময় সাসপোল পৌঁছনো গেল। আমরা শ্রীনগর থেকে ৩৭২ ও কার্গিল থেকে ১৬৯ কিলোমিটার এলাম। এখান থেকে 'লে' আর মাত্র ৬২ কিলোমিটার। পথে কন্‌ভয়ের ঝামেলা না হলে সাড়ে ছ'টার মধ্যে 'লে' পৌঁছতে পারব। এখানে আটটায় সন্ধ্যে হয়। দিনের আলো থাকতে থাকতে 'লে' পৌঁছতে পারলে বড় ভাল হত, আজই তাকে একটু দেখে নেওয়া যেত।

সুতরাং সবাই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিই। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস ছেড়ে দেয়।

বাসে বসে সাসপোলকে দেখি। বাঁদিক অর্থাৎ উত্তরের পর্বতশ্রেণী থেকে নেমে আসা একটা অস্বাভাবিক উপত্যকায় এই সমৃদ্ধ গ্রাম সাসপোল। পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গুহা দেখবার মতো। পাহাড়ের ওপরে একটি দুর্গও দেখতে পাচ্ছি। গ্রামের বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে এলাম। পথের পাশে কতগুলি চোর্তেন। তারপরে আর কিছু

নেই। ক্ষেত নেই, গাছ নেই, পশু-পাখি নেই, মানুষ নেই—শুধুই পাহাড়। পাহাড় আর পাহাড়—লাদাখের বিচিত্র-সুন্দর পাহাড়।

পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে পথ। সেই পথে বাস ছুটে চলেছে। আবার চড়াই। আমরা ওপরে উঠছি।

বাইরে চড়া রোদ। এখানে হাওয়া কম। তাই কিছুক্ষণ আগে সবাই জানলা খুলে দিয়েছে। জানলা দিয়ে রোদ আসছে। গরম লাগছে—বেশ গরম। সত্যই আশ্চর্য ব্যাপার। এগারো-বারো হাজার ফুট ওপরে গরম লাগছে!

আরে তাই তো! সিন্ধু কোথায় গেল? আমার স্বপ্নসিন্ধু? তাকে যে দেখতে পাচ্ছি না! সে তো সর্বদা সঙ্গে রইবে আমার! তাকে ছাড়া আমি পথ চলব কেমন করে?

না, না, সে আছে। মনে পড়েছে কথাটা। সিন্ধু এখানে একটা গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। তাই তাকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তাহলেও সিন্ধু আছে আমার কাছে, খুবই কাছে। আমি যে সিন্ধু-উপত্যকায় এসেছি।

আবার বাতাস উঠেছে। বালি উড়ছে। তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিই। কাচের ভেতর দিয়ে লাদাখকে দেখি। যতদূর দেখা যায় শুধু বালি আর বালি। পথে বালি, উপত্যকায় বালি, পাহাড়গুলোর গায়ে পর্যন্ত বালির প্রলেপ। মনে হচ্ছে বালির পাহাড় ধীরে ধীরে নেমে এসেছে বালির উপত্যকায়। এ যেন একটা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বাস চলেছে।

মরুভূমি? হ্যাঁ, মরুভূমি কথাটাই আবার মনে আসছে। তবে শুধু মরুভূমি নয়, মাঝে মাঝে মরুদ্যানও রয়েছে। পথের পাশে এখানে-ওখানে এক এক টুকরো সবুজ সমতল। কিছু পপ্‌লার আর উইলো গাছ। দু-এক ফালি ক্ষেত, দু-চারটি ঘর আর গুটিকয়েক মানুষ। তারপরে আবার প্রাণশূন্য পরিবেশ—মরুদ্যানের পরে মরুভূমি।

কণ্ডাক্টরের কথা কানে আসে—সাব্‌, এই হল লিকির গুম্ফায় যাবার পথ। আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি যেতে পারে। তারপরে লিকির নদী। পুল পেরিয়ে হাঁটাপথ।

পথটিকে দেখি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। কিন্তু পথের কথা থাক। সেই বিখ্যাত গুম্ফাটির কথা ভাবা যাক। শুনেছি শ'খানেক লামা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। একখানি তক্তা বাজিয়ে তাঁরা প্রার্থনা-ঘণ্টার কাজ চালান।

লাদাখী সমাজের নিয়ম, প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একটি ছেলে বাড়ি ছেড়ে গুম্ফায় চলে যাবে এবং লামা হবে। গুম্ফায় এসে সেইসব ছেলেদের বেশ কয়েক বছর লেখাপড়া করতে হয়। লিকির গুম্ফায় তাদের জন্য একটি লামা-বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ে তিব্বতী হিন্দী ও ইংরেজী শেখানো হয়। এছাড়া ভারত সরকারও লিকির গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দিয়েছেন।

আবার একটা 'লুপ্‌'। ল্যাণ্ডরু লুপের মতো অতগুলো রাস্তা নয়। তাহলেও বেশ কয়েকটি ধাপ বেয়ে আমরা অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। পৌঁছলাম একটা

বৃক্ষহীন সুবিশাল সমতলে। পথের বাঁপাশে তেমনি পাহাড়ের সারি আর ডানদিকে খানিকটা দূরে অদৃশ্য-সিন্ধু। তাকে দেখতে না পেলেও, তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। সিন্ধুর ওপারে তেমনি পাহাড়—নানা রঙের পাহাড়।

পাঁচটা বাজে কিন্তু এখনও খটখটে রোদ রয়েছে। আকাশে কয়েকটুকরো জলহীন হাল্কা মেঘ। খুব নিচু দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের ছায়া পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। চলমান ছায়া। ছায়ার মায়ায় অবিরত রঙীন পাহাড়ের রং বদলাচ্ছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আবার তেমনি ধাপের পরে ধাপ পেরিয়ে নিচে নামছি। অর্থাৎ এটাও একটা লুপ। নিচে সবুজ উপত্যকা। বড় বড় গাছ, ক্ষেত আর বাড়ির সারি। একপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে মন্দির।

দেখতে দেখতে নেমে এলাম সবুজ সমতলে—বাসগো গ্রামে। আর সেই সঙ্গে আবার সিন্ধুর দেখা পেলাম। মনটা শান্ত হল।

এখন একটি গণ্ডগ্রাম হলেও একদা এই বাসগো লাদাখের রাজধানী ছিল। সেদিনের সেই গৌরবের সাক্ষী হয়ে পাশের পাহাড়ের ওপর ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি এখনও রয়েছে দাঁড়িয়ে। তখন এটি লাদাখের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল।

শুনেছি এখানকার গুম্ফা দুটি অবশ্য দর্শনীয়। কারণ বেশ কয়েকটি দেখার মতো বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। গুম্ফার দেওয়াল-চিত্রগুলিও খুবই সুন্দর। তবে তাদের অধিকাংশই জল লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

প্রথম গুম্ফায় দোতলার সমান উঁচু একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। সোনালী রঙের সেই মূর্তিটি লাদাখের দ্বিতীয় উচ্চতম বুদ্ধমূর্তি। তাও তো তিনি বসে আছেন। দণ্ডায়মান মূর্তি হলে সেটি লাদাখের উচ্চতম মূর্তি হত। গুম্ফায় কয়েকটি ছোট চাম্বামূর্তি এবং সাদা শাড়ী পরিহিতা চামুণ্ডা মূর্তি আছে। সেগুলিও দেখবার মতো।

অথচ দেখাবার জন নেই। গুম্ফায় কোনো লামা বাস করেন না। লামারা থাকেন গ্রামে। কারও দর্শন করার ইচ্ছে হলে গ্রামে গিয়ে বড় লামাকে বলতে হয়। তিনি একজন লামাকে চাবিসহ দর্শনার্থীর সঙ্গে দেন। লামাজী তাঁদের জনহীন দেবালয়টি দেখিয়ে দেন।

আমাদের সে সুযোগ নেই। অতএব বাসগো আর তার গুম্ফার কথা স্মরণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এমন কি গ্রামখানি পর্যন্ত ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম না। বাসগো গ্রাম ছাড়িয়ে বাস চলল এগিয়ে। শ্রীনগর থেকে বাসগো ৩৯২ কিলোমিটার। আর মাত্র ৪২ কিলোমিটার।

পথের পাশে আবার তেমনি সুবিশাল পাথুরে সমতল। তারপরে পাহাড়। পাহাড় তো নয়, সেই মঠ-মন্দির প্রাসাদ-দুর্গ কিম্বা পশু-পাখির সারি সারি মূর্তি।

আমরা দেখি আর দেখি। কিন্তু জানলা খুলতে পারি না। এখানেও তেমনি প্রবল বাতাস—সেই মত্ত পবন। না, কোনো কারিগর নয়, এই দুর্বার বাতাসের ক্ষয়কার্যের ফলেই পাহাড়গুলি অমন রূপ নিয়েছে।

এখন বিকেল সওয়া পাঁচটা। আবার একটি সবুজ জনপদের ভেতর দিয়ে চলেছি।

এ গ্রামটির নাম নিম্মু। আমরা শ্রীনগর থেকে ৩৯৮ কিলোমিটার এলাম।

গ্রামখানিকে দেখি। পথের বাঁদিকে একখানি সাইনবোর্ড—'Forest Plantation, Nimmu.' তারপরে বাড়ি-ঘর আর ক্ষেত। একখানি বড় বাড়ির সামনে লেখা 'High School'. তার মানে নিম্মু বেশ সমৃদ্ধ জনপদ।

জনপদ ছাড়িয়ে এসেছি। কিন্তু এখনও জনজীবনের ছোঁয়া লেগে রয়ে গিয়েছে। পথের পাশে পর পর চারটি চোর্তেন—বেশ বড় বড়। চোর্তেন হল তিব্বতী ঢঙের সমাধি-মন্দির।

পথটা আবার এঁকেবেঁকে ওপরে উঠেছে। সেই পথ বেয়ে আমরাও উঠে এলাম ওপরে। সিন্ধু পড়ে রইল নিচে।

একটু বাদেই আরোহণ শেষ হল, শুরু হল অবরোহণ। আবার নেমে এলাম রুক্ষ সমতলে, দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে।

না, একা সিন্ধু নয়, তার সঙ্গে রয়েছে জাঁস্কার। জাঁস্কার পর্বতশ্রেণীর তুষার বিগলিত ধারা জাঁস্কার নদী এখানে এসে মহাসিন্ধুকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গমটি ভারী সুন্দর। আমরা দেখি—অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই নয়নাভিরাম সঙ্গমের দিকে। সুন্দর সর্বদা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই শুভদৃষ্টি সংক্ষিপ্ত।

তা হোক্ গে। তবু জাঁস্কারের প্রাণধারা আবার আমাকে জাঁস্কার-হিমালয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করায় তার প্রতিবেশী কিন্তোয়ার-হিমালয় ও লাহুল-হিমালয়ের কথা। মানালী থেকে রোতাং গিরিবর্ত্ম (১৩,০৫০') পেরিয়ে লাহুল যেতে হয়। লাহুলের জেলাসদর কেলং থেকে লাদাখের জেলাসদর লে পর্যন্ত একটি মোটরপথ নির্মিত হয়েছে।

এই পথের কথা এর আগেও একবার স্মরণ করেছি। তবু আরেকবার মনে করা যাক। কেলং থেকে দরচা জিংজিংবার হয়ে বড়লাচা (১২,৪৮০') গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পথটি লে এসেছে। বড়লাচায় ওপর থেকে হিমালয় ও কারাকোরামের দৃশ্য অপরূপ। তাই আজকাল এপথে প্রচুর দর্শনার্থী যাতায়াত করেন। তাঁদের অনেকে বড়লাচায় গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। তারপরে হাঁটাপথে ফিরতসে লা (১৭,৩৭১') গিরিবর্ত্ম পার হয়ে জাঁস্কার সদর পাদাম পর্যন্ত চলে যান। কোনো কোনো পদযাত্রীদল আবার বড়লাচা না এসে দরচা থেকেই পাদামের হাঁটাপথ ধরেন। তাঁদের ১৬,৭২৮ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম শিঙ্গো লা অতিক্রম করতে হয়। এ পথটি অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও বিপজ্জনক। (এই পথেই ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেহালা সরশুনার ছ'জন তরুণ পদযাত্রী শহীদ হয়েছেন।

দুটি পথেই মোটরপথ থেকে পাদাম পৌঁছতে দিনসাতেক হাঁটতে হয়। পাদাম থেকে বাসে করে কারগিল আসা যায়।

কিন্তু যাক্ গে, জাঁস্কারের কথা। এ যাত্রায় আমরা জাঁস্কার যাচ্ছি নে। অতএব জাঁস্কার নদী ও সিন্ধুর সঙ্গম পড়ে থাকে পেছনে, আমরা এগিয়ে আসি সামনে। এখান থেকে 'লে' আর মাত্র ৩৪ কিলোমিটার। আমরা শ্রীনগর থেকে ৪০০ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এলাম।

প্রায় সমতল ও সোজা পথ কিন্তু পথের দু-পাশেই পাহাড়। সামনে খানিকটা দূরে পথের ওপর একটা পাহাড়। মনে হচ্ছে পাহাড়টাকে কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। একটু বাদেই বুঝতে পারি আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

আবার আঁকাবাঁকা পথ। কখনও নিচে নামছি, কখনো ওপরে উঠে আসছি। কেবল বাতাস আর রোদের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিকেল সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে কিন্তু রোদের তেজ একটুও কমে নি।

বাস থেমে গেল। পথের বাঁদিকে একখানি বড় ও কয়েকখানি ছোট ঘর। চায়ের দোকানও রয়েছে। বড় ঘরখানির সামনে সাইনবোর্ড—

'Gurudwara, Pathar Sahib
Laman Guru Shree Nanak Devji
Foundation of Gurudwara
laid by
Shree Kushak Bakula
President,
Goompha Association, Ladakh
May, 1977'

বুঝতে পারি স্থানীয় শিখগণ নির্মাণ করেছেন এই গুরুদ্বার। কিন্তু লাদাখের মাটিতে এসে গুরু নানক লামাগুরু হয়ে গেছেন। আর সে গুরুদ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন লামাপ্রধান শ্রীকুশোক বাকুলা। ধর্মকে হতে হবে স্থানোপযোগী এবং কালজয়ী। গতিশীলতা ধর্মীয় অগ্রগতির প্রধান পাথেয়।

ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আমরাও নেমে আসি বাস থেকে। ওরা পাগড়ি মাথায় গুরুদ্বারে প্রবেশ করে। আমরা চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াই।

শিখ দোকানী জিজ্ঞেস করে—আপনাদের দর্শন হয়ে গেছে?

লজ্জা পাই। স্বপন জবাব দেয়—না।

—তাহলে যান, আগে দর্শন করে আসুন, তার পরে চা পাবেন।

না, দোকানী অন্যায় কিছু বলে নি। যে-কোন তীর্থক্ষেত্রের নিয়ম ধুলোপায়ে তীর্থের দেবতাকে দর্শন করে নিতে হয়। তারপরে আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা। ধার্মিক শিখদের কাছে এটি একটি তীর্থক্ষেত্র বইকি।

অতএব নতমস্তকে গুরুদ্বারের দিকে এগোতে হয়। পাথর আর টিনের একখানা প্রকাণ্ড ঘর। সামনে নানা রঙের পতাকা—শুধু শিখদের নয়, বহু তিব্বতী পতাকাও রয়েছে।

খালি মাথায় গুরুদ্বারে প্রবেশ নিষেধ। তাই দরজার পাশে একগুচ্ছ রুমাল ঝুলানো রয়েছে। তারই একখানি মাথায় বেঁধে ভেতরে আসি।

সাধারণ একখানি বড় ঘর। ঘরের মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা। শেষপ্রান্তে কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থসাহেবের সিংহাসন। বাঁদিকে ছোট একটি পাঠ-মঞ্চ। আর পেছনের

দেওয়ালে শিখগুরুদের কয়েকখানি ছবি। কোথাও কোনো বাহুল্য নেই, কিন্তু সর্বত্র ভক্তি ও যত্নের পরশ।

কয়েকজন প্রার্থনা করছেন, কয়েকজন প্রণাম করছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের কণ্ডাক্টর এবং ড্রাইভারও রয়েছেন। কৃতজ্ঞ ভক্তরা গুরুকে প্রণাম করছেন। তাঁদেরই আশীর্বাদে যে ড্রাইভার এই দুর্গম ও দুস্তর পথ পেরিয়ে বাসখানি শ্রীনগর থেকে লাদাখে নিয়ে আসতে পেরেছে।

আমরাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করি। তারপরে বেরিয়ে আসি গুরুদ্বার থেকে।

এবারে দোকানী আর চা দিতে আপত্তি করে না। চা খেয়ে নিয়ে গাড়িতে এসে বসি। কিন্তু ড্রাইভার কোথায়? আর শুধু ড্রাইভারের কথাই বা বলি কেন? বিদেশী বন্ধুদের অনেকেই নেই। না, দূরে যায় নি, পথের ওপরেই ঘোরাঘুরি করছে। যতটা পারছে দেখে নিচ্ছে। এবং বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে রোজালিন ও কারিণ রয়েছে। রোজালিন একা, কিন্তু কারিণ একা থাকার মেয়ে নয়। বেচারা রোনাল্ডের জন্য সত্যি দুঃখ হচ্ছে। সুন্দরী বান্ধবীর অনুরোধ উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়, অথচ ওর নাকি এত ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগে না।

না, এবারে কিন্তু কারিণের জন্য আমাদের আর দেরি করতে হয় না। ড্রাইভার এসে হর্ন দিতেই সে রোনাল্ডের হাত ধরে গাড়িতে উঠে আসে।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। ঘড়ি দেখি। আমরা প্রায় পঁচিশ মিনিট এখানে কাটালাম। কণ্ডাক্টর ভরসা দেয়—এখান থেকে লে ২৫ কিলোমিটার। পথ খুবই ভাল। আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।

আধঘণ্টা! আর মাত্র আধঘণ্টা! আধঘণ্টা পরেই পাহাড়ী পথে আমার জীবনের দীর্ঘতম বাসযাত্রা শেষ হবে। আমি পৌঁছব লাদাখের জেলাসদর 'লে' শহরে। আনন্দে সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে।

কণ্ডাক্টর ঠিকই বলেছে, উচ্চতা যাই হোক, প্রায় সমতল ও সোজা পথ। বাস বেশ জোরে চলেছে। দু-পাশের পাহাড়ী সৌন্দর্য কিন্তু অবিকৃত। কাছের পাহাড়গুলোয় নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশ আর দূরের ধূসর রঙের পাহাড়গুলির মাথায় মাথায় সাদা প্রলেপ। না, সাদা নয়, সেখানে সোনালী পরশ। অস্ত রবির রক্তিম রশ্মি রুপোলি শিখরে সোনা ঢেলে দিয়েছে। আমি লাবণ্যময় লাদাখের অন্তরলোকে পৌঁছে গিয়েছি।

শুধু সিন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি। বেশ বুঝতে পারছি সে আছে, কেবল খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে। তাই কোনো বেদনা বোধ করছি না। কারণ জানি—সে আসবে, আবার আসবে আমার কাছে। আমি যে তারই কাছে এসেছি।

সামনে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের মাথায় সুবিরাট প্রাসাদ আর নিচে পথের ধারে বাড়ি-ঘর ও কিছু গাছপালা।

কণ্ডাক্টর বলে—ফিয়াং গুম্ফা।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াই।

বিভাস বলে, "আগামীকাল আমরা এই গুম্ফা দেখতে আসব। এখান থেকে 'লে' মাত্র ১৬ কিলোমিটার।"

সকাল থেকে একটার পর একটা গুম্ফার নাম শুনেছি আর বসে বসে কেবল তাদের কথা ভেবেছি। দেখতে না পারার জন্য শুধুই আপসোস করেছি। এতক্ষণে জানতে পারলাম, এই গুম্ফাটি দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু কালকের দেখা কাল হবে। আজ গাড়িতে বসে যতটা পারা যায় দেখে নেওয়া যাক না! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—বেশ বড় গুম্ফা। অনেকটা উঁচুতে—একটা পাহাড়ের গায়ে। আশ্চর্য সুন্দর ও বিচিত্র অবস্থান। আগামীকাল বিকেলে আমরা ঐ গুম্ফা দর্শন করব, ওখানে দাঁড়িয়ে আমি এই পথটিকে দেখব। তখনও হয়তো একখানি বাস যাবে এই পথ দিয়ে। আমি বাসযাত্রীদের উদ্দেশে হাত নাড়ব। আগন্তুকদের অভিনন্দন জানাবো।

ফিয়াং গুম্ফাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আসি। বাস বেশ জোরে চলেছে।

হঠাৎ বাস থেমে যায়। বিরক্ত হই। আবার থামল কেন? কণ্ডাক্টরের আধঘণ্টার যে আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে। আবার থামলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে 'লে' পৌঁছব কেমন করে? আমি কণ্ডাক্টরের দিকে তাকাই।

সে বলে—চেক্ পোস্ট্।

আবার চেক্ পোস্ট্! কিন্তু কণ্ডাক্টর তো তখন এর কথা বলে নি!

কয়েকজন পুলিস গাড়িতে উঠে আসেন। এই রে সেরেছে! তখন বেঁচে গিয়েছি, কিন্তু এবারে বোধ করি মালপত্র সব তছনছ না করে ছাড়বে না।

কিন্তু না, তাঁরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না। তাঁদের একজন আমার বিদেশী বন্ধুদের উদ্দেশে সবিনয়ে বলেন—আমরা আপনাদের পাসপোর্টগুলো একবার দেখব। আর আপনারা এই ফর্মখানি পূরণ করে দিন।

জনদুয়েক পুলিস বিদেশী যাত্রীদের হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে একখানি করে 'সাইক্লোস্টাইল্ড ফর্ম' দিয়ে দিলেন। তারপরে পাসপোর্টগুলো নিয়ে নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। বাকিরা ফর্ম পূরণে সাহায্য করবার জন্য রয়ে গেলেন গাড়িতে।

আমরাও সাহায্য করি তাঁদের। ওঁরা যে অনেকেই ভাল ইংরেজী জানেন না। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারি এটা বিদেশীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা কেন্দ্র, সুতরাং সাধারণ অর্থে কোনো চেক্ পোস্ট্ নয়।

পরীক্ষার কোনো কড়াকড়ি নেই। কেবল কর্তৃপক্ষকে ওঁদের নামসহ জানিয়ে দিতে হচ্ছে ওঁরা কোথা থেকে এবং কেন ভারতে এসেছেন আর কতদিন লাদাখে থাকবেন।

পরীক্ষা যতই সহজ হোক, সব মিলিয়ে কিন্তু আধঘণ্টা লেগে গেল। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি হওয়া অবশ্য সম্ভব নয়। তবে আমার কেবলি মনে পড়ছে কণ্ডাক্টরের আধঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

পৌনে সাতটায় বাস ছাড়ল। কণ্ডাক্টরকে বিশ্বাস নেই। তাই মানাকে জিজ্ঞেস করি, "আর কতক্ষণ লাগবে?"

"আধঘণ্টা।"

সেই একই উত্তর। তাহলে কি মানার সঙ্গে কণ্ডাক্টরের গোপন চুক্তি হয়েছে—ভদ্রলোকের এক কথা!

বলি, "ঠিক বলছিস, আধঘণ্টায় পৌঁছে যাবো?"

"হ্যাঁ।" মানা উত্তর দেয়, "১৬ কিলোমিটার পথ, ভাল রাস্তা। আধঘণ্টার বেশি লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"পথে আর কোথাও চেক্ পোস্ট্ নেই?"

"না।"

"কোনো কন্‌ভয় আসবে না?"

এবারে মানা হেসে ফেলে। বিভাস ও নন্দা তার সঙ্গে যোগ দেয়। হাসি থামলে বিভাস বলে, "কন্‌ভয় এলেও এখন তাদের পথ দেবার জন্য পথে দাঁড়াতে হবে না। দেখছেন না, কেমন চওড়া পথ!"

"তাহলে বলছিস, আধঘণ্টায় পৌঁছে যাব?"

"আশা করছি।"

আশ্বস্ত হই। সন্ধ্যার আগেই আমরা লে শহরে পদার্পণ করতে পারব।

প্রশস্ত ও উৎরাই পথ বেয়ে নেমে চলেছি সামনের সবুজ উপত্যকায়। বাস বেশ জোরে ছুটছে। কিন্তু তার চেয়েও জোরে ছুটছে আমার মন—'লে' এসে গেল বলে।

আমার আশা পূর্ণ হল, আবার দেখা হল সিন্ধুর সঙ্গে। সে এসে হাজির হয়েছে আমার ডানপাশটিতে—খানিকটা নিচে। মানা বলে, "ডানদিকে দেখুন, পাহাড়ের ওপর স্পিতুক গুম্ফা।"

নন্দা যোগ করে, "কাল ফিয়াং থেকে ফেরার পথে আমরা দর্শন করব।"

আমি আবার ডানদিকে তাকাই—এই সড়ক থেকেই একটা মোটরপথ প্রসারিত হয়েছে পাহাড়টার পাদদেশ পর্যন্ত। পাহাড়ের ওপরে গুম্ফা, আমরা আগামীকাল দর্শন করব।

কণ্ডাক্টর কথা বলে এতক্ষণে—এখান থেকে লে শহর মাত্র ১০ কিলোমিটার, দশ মিনিটে পৌঁছে যাবেন।

তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, সেই আধঘণ্টার দশ মিনিট এখনও তার হাতে আছে আর তারই মধ্যে সে আমাদের লে শহরে পৌঁছে দেবে।

তবে যেরকম জোরে বাস ছুটছে তাতে মনে হচ্ছে সত্যই দশ মিনিটে পৌঁছে যাবো। ভাবতে বড়ই ভাল লাগছে। পাহাড়ীপথে জীবনের দীর্ঘতম বাসযাত্রার যতি আসন্ন।

অবশেষে সিন্ধুতীরের পথ বেয়ে নেমে এলাম সুবিশাল সমতলে। সামনে সারি সারি বাড়ি আর বিমানক্ষেত্র। দুদিন বাদে আমরা যেন আবার প্রবেশ করছি নাগরিক সভ্যতার মাঝে।

পেরিয়ে এলাম ক্যান্টনমেন্ট আর বিমানক্ষেত্র। আগে শুধু এয়ারফোর্স-এর বিমান

যাওয়া-আসা করত। এখন দিল্লী-চণ্ডীগড় ও জম্মু-শ্রীনগর থেকে নিয়মিত যাত্রীবাহী বোয়িং যাতায়াত করছে। আমরা দুদিন বাসে বসে থেকে যে পথটুকু অতিক্রম করলাম, সেটুকু আসতে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু সে আসার এ আসার যে অনেক তফাৎ। বিমানযাত্রায় সুখ আছে আনন্দ নেই, আরাম আছে বৈচিত্র্য নেই, গতি আছে জীবন নেই। বিমানযাত্রায় শরীরের কষ্ট বাঁচে কিন্তু মনের খোরাক মেটে না। তবে যাঁরা সত্যি সত্যি বাসযাত্রার ধকল তেমন সইতে পারেন না, তাঁরা মোটরে এসে বিমানে ফিরে যেতে পারেন।

বিমানবন্দরের পরেই শহর শুরু হয়ে গেল—লে শহর। শুধু সুপ্রাচীন নয়, আধুনিক শহরও বটে। প্রশস্ত সমতল মসৃণ পথ। পথের পাশে ঝক্‌ঝকে বাড়ি-ঘর—হোটেল রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট। অধিকাংশ বাড়ি দু-তিনতলা। সর্বদা গাড়ি যাতায়াত করছে। এসব দেখে কে বলবে, আমরা প্রায় জোজি লা কিম্বা কেদারনাথ ধামের মতো উঁচুতে রয়েছি? লে শহরের উচ্চতা ৩৫০৫ মিটার (১১,৩৯১´)।

বিকেল ঠিক সোয়া সাতটার সময় টুরিস্ট্ রিসেপ্‌শন সেন্টারের সামনে এসে বাস স্তব্ধ হল। চারিদিক থেকে মালবাহকরা ঘিরে ধরল। তাদের ভিড় ঠেলে নেমে আসি পথে।

আমার পেছনে বাস থেকে নামে জঁ। পথের পাশে দাঁড়িয়ে জনৈকা যুবতী একটা বিচিত্র শব্দ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জঁ আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে যায় তার কাছে। মুহূর্তে দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। উভয়ে উভয়কে চুম্বন করে।

বুঝতে পারি এই উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেট পরা ছোটখাটো মেয়েটিই আনা—মিসেস আনা লুই। তারই পরামর্শে জঁ চাকরি ছেড়ে পর্যটন-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছে। দুজনে মিলে 'EXPLOTRA, Trans Himalayan Agency, Leh, Ladakh' নামে পর্যটন প্রতিষ্ঠান খুলেছে।

সেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে এই মেয়েটি একা বেলজিয়াম থেকে এখানে চলে এসেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে স্বামীর পথ চেয়ে বসে ছিল। এইমাত্র স্বামী এসে পৌঁছল, তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। শুধু তার স্বামী নয়, সেই সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যটকদল নিরাপদে 'লে' পৌঁছে গেছে। অতএব আজ ওদের বড় আনন্দের দিন।

এমন দিনে এই মধুর মুহূর্তে আমি এখানে উপস্থিত রয়েছি, ওদের এই আনন্দোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করছি। বড় ভাল লাগছে। সুখের সাক্ষী হবার সুযোগ জীবনে বড় বেশি আসে না। আমি আজ সত্যই ভাগ্যবান।

একটু বাদেই আমাকে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। জানি না জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা? তবে আজ আমি ওদের দেখে বড়ই আনন্দ পেয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাস ভিনদেশী এই যুবক-যুবতীর মহতী প্রচেষ্টায় ভারতের হিমালয় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, বিশ্ববাসীর কাছে লাদাখ আরও সুপরিচিত হবে।

জীবনদেবতার কাছে আমি তাই ওদের মঙ্গল কামনা করি। সেই সঙ্গে দেবতাত্মা

হিমালয়কে বলি—তুমি ওদের আশা আর আকাঙ্ক্ষাকে সত্য এবং সুন্দর করে তোলো।

অবশেষে বিদায়ের পালা। এই নিয়ম। পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে যায়। আমাকেও তাই নিতে হয় বিদায়। বিদায় নিই জাঁ এবং আনার কাছ থেকে, রোজালিন এবং কারিণের কাছ থেকে, টৌলি এবং রোনাল্ডের কাছ থেকে।

আমি বিদায় নিই টম্‌সন এবং তার বান্ধবীর কাছ থেকে, আমার সকল সহযাত্রীর কাছ থেকে। এরা আমার কেউ নয়। কিন্তু পাহাড়ী পথে আমার জীবনের দীর্ঘতম বাসযাত্রাটি সুসম্পন্ন হল এদের সঙ্গে। দুটি দিন সুখে-দুঃখে বিপদে ও আনন্দে সর্বদা একসঙ্গে ছিলাম। এখন তাই এদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, মনটা ভারী হয়ে উঠেছে।

তবু নিতে হয় বিদায়। আবার দেখা হবে, এই আশ্বাসে মনকে প্রবোধ দিয়ে ওদের ছেড়ে এগিয়ে আসি, বিভাসের সঙ্গে ট্যাক্সিতে এসে উঠি।*

লে শহরের জনবহুল পথ দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে 'হিমালয়ান হোটেলের' দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পথে—লাদাখের বুকে। সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রেখে এই গোধূলি-লগ্নে আমার আজ লে নগরীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল।

।। দশ ।।

একজন কর্মঠ মানুষের কতক্ষণ ঘুমানো উচিত?

ডাক্তারেরা কি উত্তর দেবেন জানি না। কিন্তু আমি বলব—চার-পাঁচ ঘণ্টা যথেষ্ট। সেই সঙ্গে যোগ করব—সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে দিনটা বড় হয়ে যায়। এবং এটা আমার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে।

আমি লাদাখে বেড়াতে এসেছি। এখানে লেখা নেই, বাজার নেই, অফিস নেই। তার ওপরে কাল শুতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। এই হিমালয়ান হোটেলে পৌঁছতেই তো সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। তারপরে ঘর পছন্দ করা, মালপত্র এনে গোছগাছ করা, রান্না-খাওয়া করা। সব সেরে যখন শুতে এসেছি, তখন ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে দিন পাল্‌টে গিয়েছে।

তবু যথারীতি ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভেঙেছে। পাশের খাটে করুণ গভীর ঘুমে অচেতন। কাচের জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে গেছে। লাদাখে ভোর হয়ে গিয়েছে।

এই একটা মজার ব্যাপার এ অঞ্চলে—আটটার পরে সন্ধ্যে হয়, আবার পাঁচটার আগেই ভোরের আলো ফুটে ওঠে। তার মানে এখানে রাতের চেয়ে দিন অনেক বড়। চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই দিন। এটি অবশ্যি গ্রীষ্মকালের হিসেব। শীতকালে স্বাভাবিক ভাবেই দিন ছোট, রাত বড়।

*দেখা হয়েছিল। কয়েক বছর পরে ব্রাসেল্‌স গিয়ে ফোন করতেই টৌলি ছুটে এসেছিল আমার কাছে।

কিন্তু তখনকার কথা থাক, আজকের কথাই হোক। সে শহরে আজ আমার প্রথম সকাল। কিন্তু ভোরের আলোয় যে সবার আগে চুপি চুপি তাকে ভাল করে দেখে নেব একবার, তার উপায় নেই। ঠাণ্ডায় কাচের জানালায় তুষারের প্রলেপ পড়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রোদ না উঠলে জানলা খোলা যাবে না। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।

অভ্যাসবশতঃ ঘুম ভেঙে গেছে, অথচ হাতে কোনো কাজ নেই। সহযাত্রীরা সবাই ঘুমুচ্ছে, বেড-টি পাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল। বরং শুয়ে শুয়ে লাদাখের কথা ভাবা যাক—

দুটি কারণে লাদাখ বিশ্বের মানচিত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রথমতঃ লাদাখ সীমান্তজেলা—চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমারেখা। সুতরাং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে লাদাখ অত্যন্ত মূল্যবান। দ্বিতীয়তঃ লাদাখে আজও মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃতি বিরাজমান। লাদাখের সরল ও পরিশ্রমী মানুষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছেন।

কুয়াশা আর উঁচু পাহাড়ে ঘেরা পাহাড়ী লাদাখ এক বিস্ময়কর যাদুর দেশ। এখানকার গুম্ফা অর্থাৎ মন্দির এবং লাল আলখাল্লা পরিহিত লামা অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা সর্বদা মধ্যযুগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

লাদাখ বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম জনবসতি এবং পৃথিবীর প্রচীনতম দেশসমূহের অন্যতম। শুধু তাই নয়, লাদাখের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীতে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশিখর—মাউন্ট্ গডউইন অস্টেন বা 'K-2' (২৮,২৫০´)। রয়েছে আরও কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত শৃঙ্গ। তাদের মধ্যে নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬২০´), গাসের ব্রুম (২৬,৪৭০´), মাসের ব্রুম্ (২৫,৬৬০´) ও সাসের কাংরী (২৫,১৭০´) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যের কথা, শেষের শৃঙ্গটি শুধু বর্তমান ভারতে। বালতিস্তান ও লাদাখের উচ্চতর অন্যান্য সব শৃঙ্গগুলি পাকিস্তান বেদখল করে নিয়েছে।

যাক্‌গে যে কথা বলছিলাম, এই বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও অবস্থানের জন্যই আজ সারা পৃথিবীর কষ্টসহিষ্ণু ও অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের দৃষ্টি পড়েছে লাদাখের পথে।

লাদাখ সত্যই পর্যটকদের স্বর্গ। রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ, অন্যান্য সীমান্তের মতো লাদাখে পর্যটকদের প্রতি কোনোরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় নি। আর এর ফলে লাদাখের অর্থনীতি প্রভূত লাভবান হচ্ছে। পর্যটন আজকাল কেবলমাত্র একটা খেয়াল কিম্বা অভিযান নয়। পর্যটন এখন একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। য়ুরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের বহু সমৃদ্ধ দেশ তাঁদের জাতীয় আয়ের ঘাটতি বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন পর্যটন-ব্যবসা থেকে। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পদে ভারত সেইসব দেশের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদশালী। সুতরাং আমরা যদি পর্যটকদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিতে পারি এবং প্রয়োজনীয় প্রচার করতে পারি, তাহলে আমাদের জাতীয় আয় অনেক বেড়ে যেতে পারে।

যাক্‌গে যে কথা ভাবছিলাম, লাদাখ পর্যটকদের কাছে এক অতুলনীয় এবং অনুপম অঞ্চল। এমন বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর জেলা ভারতে বোধ করি আর নেই।

আমি ভাগ্যবান—সেই বিচিত্র-সুন্দর লাদাখের মধ্যমণি লে শহরে শুয়ে লাদাখের কথা ভাবতে পারছি।

গতকাল সন্ধ্যায় আমরা লে পৌঁচেছি। কিন্তু এখনও শহরের পথে পদচারণা করার সুযোগ পাই নি। তবে বাস ও ট্যাক্সিতে বসে যতটা দেখেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছি, প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত হলেও লে এখন একটি আধুনিক শহরে উন্নীত। নাগরিক সভ্যতার সকল উপাদান এখানে সহজলভ্য। অথচ লে আজও তার ঐতিহ্যময় অতীতকে বিসর্জন দেয় নি। এই হোটেলে আসার পথে আমরা পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদটি দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার তিব্বতের রাজধানী লাসায় অবস্থিত মহামান্য দালাই লামার পোতালা প্রাসাদের কথা মনে পড়েছে। আমি সে প্রাসাদ দেখি নি। কিন্তু পর্যটকদের বিবরণ পড়ে এবং ফটো দেখে মনের ক্যানভাসে আমি সেই প্রাসাদের যে ছবি এঁকে রেখেছি, এটি যেন তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

গতকাল শার্গোল পৌঁছাবার পর থেকেই বিভিন্ন জনপদে মাঝে মাঝে লাল আলখাল্লা পরিহিত ও প্রার্থনাচক্র হাতে লাদাখী লামাদের দেখেছি। লে শহরের পথেও তাঁদের কয়েকজনকে দেখতে পেয়েছি। আধুনিক যানবাহনের শব্দে মুখরিত শহরের বাঁধানো রাজপথ দিয়ে তাঁরা হেঁটে চলেছেন, কিন্তু তাঁদের চোখে সেই উদাস দৃষ্টি, মুখে সেই পরম নিরাসক্তি। কেবল ঠোঁটদুটি আস্তে আস্তে নড়ছে। হয়তো বা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র জপতে জপতে পথ চলেছেন। আর তাঁদের মনে বোধ করি সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাস—এই মহামন্ত্র আমাকে মোক্ষদান করবে, সকল অকল্যাণ থেকে দূরে রাখবে।

লে শহরে পদার্পণ করে আমার তাই মনে হয়েছে, আধুনিক নগরী হলেও এখানে সর্বত্র পুরাতনের প্রভাব সুস্পষ্ট। লে নগরী নূতন ও পুরাতনের এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ।

লাদাখের সেই মধ্যমণি লে নগরীতে আমার জীবনের প্রথম রাতটি আনন্দে অতিবাহিত হল। এই নগরীর নামটি কিভাবে লেখা উচিত, তা নিয়ে কিন্তু কিছু মতানৈক্য রয়েছে। আর শুধু 'লে' নামটি নয়, লাদাখের অনেক জায়গার নাম নিয়েই এই সন্দেহ বিদ্যমান।

এর কারণ লাদাখ অতি প্রাচীন প্রদেশ। এই জায়গাগুলিও সুপ্রাচীন জনপদ। কিন্তু নামগুলি প্রথম লেখা হয় তিব্বতী ভাষায়—দশম শতাব্দীতে। তিব্বতীরা উচ্চারণ অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অনেক নামই ঠিকমত লেখা হয় নি। অথচ সেই তিব্বতী লেখা দেখেই পাশ্চাত্যের পর্যটকরা নামগুলো ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় লিখেছেন। আমরা নামগুলো নিয়েছি তাঁদেরই কাছ থেকে। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে মোরেভিয়ান মিশনারীরা এই শহরের নামটি লিখেছেন 'Leh' এবং তাঁদের এই বানান দেখে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নামটি লেখা হয়েছে 'লেহ্'। অথচ নামটির যা উচ্চারণ তা ঠিকমত লিখলে দাঁড়ায় 'sLe' অথবা 'sLes'। এখানে 's'-এর কোনো উচ্চারণ নেই। সুতরাং নামটির উচ্চারণ পরিষ্কার 'Le'—লে। অতএব ইংরেজীতে যাই লেখা হোক, এ শহবের নাম শুধুই 'লে', 'লেহ্' নয়।

লে নামটির অর্থ কিন্তু আজও স্থির হয় নি। ঐতিহাসিক ফ্রাঙ্কো সাহেব বলেছেন—'লে' শব্দের অর্থ গোচারণ ক্ষেত্র। কিন্তু এই অর্থ সম্পর্কে সকলে একমত নন।

"শঙ্কুদা, কি ভাবছেন?"

করুণের প্রশ্নে আমার ভাবনা থেমে যায়। তার ঘুম ভেঙেছে। সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি উত্তর দিই, "কি আর ভাবব! লাদাখে এসেছি, লাদাখের কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আর ভাবনা নয়। আমি যাচ্ছি কালী আর হরেনকে জাগাতে। ওরা বেড-টি দিক। তারপরে উঠে পড়ো। তৈরি হয়ে নাও। ব্রেকফাস্ট্ করেই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

দরজা খুলে বাগানে আসি। বাঁদিকে ডাইনিং হল। এখানে হরেন আর কালী শুয়েছে।

ওদের ডেকে তুলি। তাড়াতাড়ি বেড-টি দিয়ে সবার ঘুম ভাঙাতে বলি। ঠাণ্ডা জায়গা, গরম চা সামনে না নিয়ে এলে কেউ স্লীপিং ব্যাগের 'জিপ' খুলবে না।

ডাইনিং হল থেকে আবার ফিরে আসি বাগানে। ছোট বাগান কিন্তু অনেক ফুল। সবই মরশুমী—ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস ইত্যাদি।

কিছু গাঁদাফুলও রয়েছে। মে মাস, এখনও গাঁদাফুল ফুটছে। বারো মাসই ফোটে।

বাগানের পরে সবুজ লন। চারিদিকে বড় বড় গাছ, মাঝখানে সবুজ সমতল—অনেকখানি জায়গা জুড়ে, একেবারে বড় রাস্তা পর্যন্ত।

না, ফাঁকা ময়দান নয়। সমস্ত জায়গাটি জুড়ে রঙীন তাঁবু—হাই-অলটিচ্যুড টেন্ট্। অধিকাংশই টু-মেন টেন্ট্। জায়গাটা হোটেলের হলেও তাঁবুগুলো হোটেলের নয়। লে শহরের অধিকাংশ হোটেলেই ঘরের মতো ময়দান ভাড়া পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে যাঁরা 'ট্রেকিং' বা পদযাত্রার জন্য আসেন, তাঁরা সবাই সঙ্গে তাঁবু নিয়ে আসেন। তাঁদের আর ঘরভাড়া নেবার দরকার হয় না। তাঁরা জায়গা ভাড়া নিয়ে তাঁবু টাঙিয়ে নেন। হোটেলের বাথরুম ব্যবহার করেন, প্রয়োজনে খাওয়াদাওয়াও করে থাকেন। বাইরে গেলে হোটেলের দারোয়ান তাঁদের তাঁবু পাহাড়া দেয়।

চারদিকে বড় বড় গাছ, মাঝখানে লাল নীল হলুদ বেগুনী প্রভৃতি নানা রঙের নানা আকারের ঝক্‌ঝকে তাঁবু। ভারী সুন্দর লাগছে। ইনট্যুর প্রতিষ্ঠানটিরও এই রকম তাঁবু আছে। সেগুলো ওরা অমরনাথ নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখানে নিয়ে আসে নি। হোটেল থাকতে আমরা তাঁবুতে বাস করতে চাইব না ভেবে তাঁবুগুলো শ্রীনগরে রেখে আসা হয়েছে। নিয়ে এলে কেবল যে নন্দার পয়সা বাঁচত তা নয়, আমরাও বৈচিত্র্যের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ পেতাম। কিন্তু পাছে তার ব্যবসার 'গুড-উইল' নষ্ট হয়ে যায়, তাই বোধ করি নন্দা তাঁবুগুলো শ্রীনগরে রেখে এসেছে।

আমার সহযাত্রীরা সবাই 'বেড-টি'য়ের অপেক্ষায় শুয়ে আছে। কিন্তু তাঁবুর বাসিন্দারা বেশ কয়েকজন জলের কাছে জড়ো হয়েছেন। 'ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড্' বা শিবিরস্থলীর পাশেই জলের কল। তবে কলের জল নয়। হোটেল-কর্তৃপক্ষ নিজেদের পাইপ

দিয়ে খানিকটা দূরের ঝরণা থেকে জল নিয়ে এসেছেন। সেই জল একটি কলের মধ্য দিয়ে অবিরত পড়ে চলেছে। বলা বাহুল্য হিমশীতল জল।

বিদেশী পর্যটকরা সেই শীতল জলেই হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন। জনৈকা যুবতী তো কলের নিচে মাথা পেতে মিনিটখানেক বসে রইল। দেখতেও শীত লাগছে।

কিন্তু শীতের কথা থাক। সাড়ে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে জল তো ঠাণ্ডা হবেই। আমি ভাবি এই বিদেশী পর্যটকদের কথা। এরা যেমন ভোগী, তেমনি পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। বেড়াতে এসেছে, সুতরাং শীত এদের তাঁবুতে বন্দী করে রাখতে পারে নি। সকালে উঠে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। একটু বাদেই বেরিয়ে পড়বে পথে।

আমাদেরও তাই করতে হবে। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে ফিরে আসি ঘরে। কালীও চা নিয়ে আসে।

চা শেষ হতেই মানাকে বলি, "ব্রেকফাস্ট্-এর ব্যবস্থা কর। আর সবাইকে টেনে তোল। আটটার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"নিশ্চয়ই।" মানা উত্তর দেয়, "ন'টায় শঙ্কর গুম্ফা বন্ধ হয়ে যায়।"

"আমরা কি এখন শঙ্কর গুম্ফা দেখতে যাবো?" করুণ প্রশ্ন করে।

মানা উত্তর দেয় "হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। আধঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট্ আসছে।"

আলুর তরকারী, পরোটা, ওমলেট এবং কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট্ সেরে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। তাঁবুর কলোনী ছাড়িয়ে হিমালয়ান হোটেলের প্রাইভেট রোডে আসি। পথের পাশে কয়েকখানি ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি শ্রীনগরের গাড়ি। পর্যটকরা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসব গাড়িতে চড়ে বেড়াতে পারছেন না। কারণ লাদাখের গাড়ি ছাড়া লাদাখে 'সাইট সীয়িং' করা যায় না। ফলে গাড়ি এবং ড্রাইভার বিশ্রাম নিচ্ছে। বলা বাহুল্য এসব বড়লোকী ব্যাপার। আমরা গরীব মানুষ। সুতরাং গাড়ির ভাবনা থাক।

গাছে ছাওয়া পথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি; নাম শঙ্কর রোড। পথটা উত্তরপূর্বে প্রসারিত। একটু দূরে হলেও পাহাড়ের ওপরে রাজপ্রাসাদটি চমৎকার দেখাচ্ছে। আশ্চর্য সুন্দর অবস্থান। লে শহরের সব জায়গা থেকে প্রাসাদটি দেখা যায়। শুনেছি প্রাসাদ থেকেও সারা শহর দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রাসাদ পরে দেখা যাবে। এখন এগিয়ে চলি বিপরীত দিকে অর্থাৎ শহরতলীর পথে। আমরা চলেছি শঙ্কর গুম্ফা দেখতে। দেবালয়টি লে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় দর্শন।

পথের পাশে মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর। তবে অধিকাংশ জায়গা জুড়েই উপত্যকা। কোথাও ক্ষেত, কোথাও ফুলের বাগান, কোথাও বা পাথুরে বন্ধ্যা প্রান্তর।

পথচারীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে মাঝে মাঝে। কেউ কাজে যাচ্ছে, কেউ ক্ষেতে কাজ করছে। তবে তাদের অধিকাংশই মেয়ে। হিমালয়ের মতো কারাকোরামেও দেখছি মেয়েরাই বেশি কাজ করে।

শঙ্কর গুম্ফা মানে শঙ্কর গ্রামের বৌদ্ধমন্দির। লে শহরের বড় ডাকঘর থেকে গ্রামটির দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। কিন্তু আমাদের হিমালয়ান হোটেল থেকে বোধ করি এক কিলোমিটারের বেশি নয়। আমরা এখন সেই পথটুকু পাড়ি দিচ্ছি। সহজ ও সমতল পথ।

লে শহরের এবং তার উপকণ্ঠে অনেকগুলি গুম্ফা রয়েছে। এগুলির প্রধান হচ্ছে স্পিতুক। সেটি সবচেয়ে প্রাচীনও বটে। দূরত্ব শহর থেকে ১০ কিলোমিটার। তারপরেই শঙ্কর এবং লে গুম্ফার স্থান।

লে গুম্ফা লে প্রাসাদে অবস্থিত। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। তিনতলার সমান উঁচু আসনে অপরূপ বুদ্ধমূর্তি রয়েছে সেখানে। বুদ্ধদেবের ডানদিকে অবলোকিতেশ্বর ও বাঁদিকে মঞ্জুশ্রীর মূর্তি। শুনেছি কিছুদিন আগে নাকি গুম্ফাটিতে রং করা হয়েছে। আর সেখান থেকে শহর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সকাল সাতটা থেকে ন'টা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই গুম্ফা। আমরা অবশ্যই একবার দর্শন করব।

আরও কয়েকটি প্রাচীন গুম্ফা রয়েছে লে শহরে। যেমন প্রাসাদের বাঁদিকে বড় চোর্তেনের নিচে গুরু ল্যাখাং, প্রাসাদের দক্ষিণে চাম্বা ল্যাখাং এবং দক্ষিণ-পূবে চেনরেজিক ল্যাখাং। তবে এখন নাকি এগুলি খুবই অবহেলিত। পর্যটকরা বড় একটা দর্শন করেন না। তাহলেও রাজপ্রাসাদ দেখার সময় আমরা এগুলি দেখে নেব বৈকি।

সহসা মানা বলে ওঠে, "আমরা পৌঁছে গিয়েছি শঙ্কর গ্রামে।"

সত্যই তাই। এখন আর ক্ষেত কিংবা বন্ধ্যা প্রান্তর নয়, বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে পথ। আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছি গুম্ফার দিকে।

শঙ্কর গুম্ফা স্পিতুক গুম্ফার অধীন। কিন্তু স্পিতুকের প্রধান লামা পূজনীয় শ্রীকুশোক বাকুলা সাধারণত এখানেই থাকেন। তিনি জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রী এবং লোকসভার সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি লাদাখ গুম্ফা এসোসিয়েশনের সভাপতি। শ্রদ্ধেয় বাকুলা একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও প্রখ্যাত পর্যটক। তিব্বতের রাজধানী লাসায় তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে। তিনি ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় চার মাস ধরে পায়ে হেঁটে মধ্য-তিব্বতের সমস্ত মঠ দর্শন করেছেন। গৌরবের কথা সেই সুদুর্গম পথ-পরিক্রমায় একজন বাঙালী তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ। তিনি তখন লামাপ্রধান কুশোক বাকুলার ইংরেজীভাষী সচিব ছিলেন।

পূজনীয় শ্রীবাকুলা এখন কোথায় আছেন জানি না। তবে যদি লাদাখে থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর শঙ্কর গুম্ফায় থাকার সম্ভাবনাই বেশি। থাকলেও তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হবে কি?

শুনেছি শ্রীবাকুলা ছাড়াও বিশজন লামা শঙ্কর গুম্ফায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। গুম্ফাটি ছুটির দিনে প্রায় সারাদিন খোলা থাকে। কিন্তু কাজের দিনে সকাল ছ'টা থেকে ন'টা এবং বিকেলে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত দর্শন করা যায়।

সন্ধ্যার সময় আলো দিয়ে গুম্ফাটিকে ভারী সুন্দর করে সাজানো হয়। তাই বেশির ভাগ পর্যটক বিকেলেই এ গুম্ফায় আসেন। আমরা সকালে এসেছি, কারণ আজ বিকেলে ফিয়াং ও স্পিতুক গুম্ফা দেখতে যাবো।

হোটেল থেকে পথে নামার পরেই পাহাড়টার দিকে নজর পড়েছিল। এতক্ষণ আমরা তারই কাছে এগিয়েছি। এখন তার প্রায় পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। উপত্যকাটি এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে। আর এখানেই লে শহরের উপকণ্ঠে শঙ্কর গ্রাম—গ্রামের প্রান্তে গুম্ফা। পাহাড়টিকে এখন ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। নাম নামগিয়াল পর্বত।

বাড়ি-ঘরের মাঝে আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ পথ। কতকগুলো কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। মানা বলে, "ওদের দিকে একটু নজর রেখে পথ চলবেন। এই গ্রামের কুকুরগুলো বড়ই বেয়াড়া। হঠাৎ এসে কামড়ে দেয়।"

"সে কি!" আঁতকে উঠি। "পথের কুকুর, কামড়ে দিলেই তো ইঞ্জেক্শন নিতে হবে।"

"হ্যাঁ। তাই বলছি, একটু সাবধানে পথ চলবেন।"

তাই চলি, কিন্তু দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাই না। বছরতিনেক আগে আমাকে এ ঝামেলা সইতে হয়েছে।

চলতে চলতে বলি, "এত মানুষ এই গুম্ফা দর্শন করতে আসেন, আর কর্তৃপক্ষ এই বেওয়ারিশ কুকুরগুলো তাড়িয়ে দিতে পারছেন না?"

"উদাসীনতা আর কী!" মানা উত্তর দেয়।

এ ছাড়া সে আর কীই বা বলতে পারে?

অবশেষে শঙ্কর গুম্ফার সামনে পৌঁছনো গেল। আমরা এসেছি গুম্ফার পেছন দিক দিয়ে। তাই এতক্ষণ গুম্ফাটির অবস্থান ঠিক বুঝতে পারি নি। এখন দেখছি ভারী সুন্দর অবস্থান। সামনে চমৎকার একফালি খোলা মাঠ, আর পেছনে অনিন্দ্যসুন্দর নামগিয়াল পর্বত। মাঠ ও গুম্ফার মাঝখানে পথ। পথের একপাশে দুটি চোর্তেন, আরেক পাশে কাপড় দিয়ে সাজানো কাঠের তোরণ। চোর্তেনে কয়েকটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি।

তোরণ পেরিয়ে গুম্ফার ভেতরে আসি। প্রথমেই বহিরাঙ্গন, বাগানও বলা যেতে পারে—নানা জাতের নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। আর এখান থেকে পেছনের পাহাড়টাকে আরও সুন্দর লাগছে।

বাগানের মাঝখানে দুটি পতাকাদণ্ড। অঙ্গনের তিনদিকে দুতলা বাড়ি—সারি সারি ঘর, আরেকদিকে গুম্ফা—দর্শনীয় দেবালয়।

পাঁচ-ছয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে গুম্ফার বারান্দায় উঠে আসি। কাঠের মেঝে, কাঠের থাম, কাঠের সিলিং আর কাঠের দেওয়াল। কোথাও রং করা, কোথাও ছবি আঁকা। দেওয়ালে পাঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধের চিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই বারান্দাটি আমাদের নাটমন্দিরের মতো। এটিকে এঁরা 'দুখাং' বলেন।

বেশ বড় একটা কাঠের দরজা পেরিয়ে পরের ঘরখানিতে আসি। এখানিও তেমনি কাঠের তৈরি আর রং করা। প্রথমেই নজর পড়ল একপাশে রেখে দেওয়া তিনটি

সবুজ ঢাকের দিকে। কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি এই প্রার্থনা-ডঙ্কাকে এঁরা বলেন 'ডুং ডুং'।

মন্দিরের অপর প্রান্তে দেওয়ালের ধারে একখানি কাঠের সিংহাসনে একটি ব্যাঘ্রমূর্তি। সিংহাসনের বাঁদিকে বজ্রভৈরব—ভারী সুন্দর মূর্তি। পেছনের দেওয়ালে পূজনীয় দালাই লামা এবং অন্যান্য কয়েকজন শ্রদ্ধেয় লামাগুরুর ছবি টাঙানো। আমরা প্রণাম করি।

মন্দিরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। তার ওপরে সারি সারি কাঠের ডেস্ক। বোধ করি শিক্ষানবীশ লামাদের ক্লাস নেওয়া হয় এখানে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপরে আবার সেই সিংহাসনের কাছে আসি। এখানে একটি দরজা রয়েছে। সেটি দিয়ে আমরা পরের ঘরখানিতে আসি।

এটি শঙ্কর গুম্ফার মূল মন্দির—গর্ভগৃহ। প্রধান বিগ্রহ সঙ-খা-পা (Tsong-Kha-pa) এবং তাঁর দুই শিষ্যের। তাঁদের সামনে অতীশ দীপঙ্কর এবং শাক্যমুনির মূর্তি। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তিটি রয়েছে মন্দিরের বাঁদিকে—একেবারে এককোণে। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে আসি।

তিনি আর কেউ নন, তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। যিনি বুদ্ধত্ব অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব। দেবতা কিম্বা মানুষ, এমন কি অন্যান্য প্রাণীরাও বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, ঐতিহাসিক বুদ্ধও বটে। নাগার্জুন, পদ্মসম্ভব এবং অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি মানুষবুদ্ধ, মঞ্জুশ্রী বা অবলোকিতেশ্বর দেববুদ্ধ। আবার কোনো অশরীরীও বুদ্ধ হতে পারেন, যেমন অনাদি-অনন্ত। এঁকে আদিবুদ্ধ, কুলপতি বা ধ্যানীবুদ্ধ বলা হয়। পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন অমিতাভ বুদ্ধ।

যিনি বুদ্ধ অর্থাৎ যে দেবতা মানুষ কিম্বা প্রাণীর দেহে বোধি বিরাজ করেন, তিনি বোধিসত্ত্ব। যিনি নির্বাণ লাভের অধিকারী তিনিই বোধিসত্ত্ব। আবার যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেও নিজের নির্বাণে আগ্রহী না হয়ে ধর্মপ্রচার কিম্বা সমাজসেবা করেছেন, তাঁকেও বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধপ্রধান, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ইষ্টদেবতা। আমরা তাঁরই মূর্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নানা স্থানে তাঁর নানা মূর্তি পূজিত। এমন কি তাঁর সহস্রবাহু মূর্তি পর্যন্ত আছে। তবে এখানে যে মূর্তিটি রয়েছে, এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মূর্তির দুখানি পা কিন্তু আটখানি হাত ও এগারোখানি মুখ। তবে পেছনের দেওয়ালে আরও অনেক হাত আঁকা আছে। সব মিলিয়ে নাকি এক হাজার হাত।

মূল আটখানি হাতের দুখানি দিয়ে তিনি ভক্ত শিষ্য ও সাধারণ মানুষকে অভয় দান করছেন। যেন বলছেন—তোমরা বিচলিত হয়ো না, অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার এবং শোক ও তাপ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করব।

অবশিষ্ট ছয়খানি হাতের কোনটিতে যুদ্ধের অস্ত্র, কোনটিতে বা পূজার উপকরণ।

মুখগুলি পর পর পাঁচটি সারিতে সজ্জিত। নিচের তিন সারিতে তিনখানি করে মুখ, তারপরে দু-সারিতে দুটি। মুখগুলো নিচের থেকে ওপরে ক্রমে ক্রমে ছোট হয়েছে।

বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে আমরা মন্দিরের অপর কোণে অর্থাৎ ডানদিকে আসি। এখানে একটি কাচের বাক্সে অনেকগুলি তিব্বতী মূর্তি রয়েছে। সবই ব্রোঞ্জ্ দিয়ে তৈরি—ছোট হলেও ভারী সুন্দর।

এই মন্দিরের দেওয়াল-চিত্রগুলিও দেখার মতো। মনে হচ্ছে যেন সদ্য চিত্রিত। চিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগল—জীবনের চাকা (Wheel of life) এবং দীর্ঘায়ু বৃদ্ধ (Old man of long life)।

ঘরখানির দুপাশে দেওয়ালের সঙ্গে সুদীর্ঘ কাঠের আলমারি—অসংখ্য পুঁথি রয়েছে ভেতরে। গুম্ফা মানে কেবল দেবালয় নয়, বিদ্যাপীঠও বটে।

পাশে দেখছি আরেকটি ছোট মন্দির রয়েছে। আমরা সেখানে আসি। এ মন্দিরে আছে একটি তিব্বতী কামানের 'মডেল' এবং তিনটি বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তি তিনটি অতীত-বুদ্ধ, বর্তমান-বুদ্ধ ও ভবিষ্য-বুদ্ধের প্রতীক। আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাবতারকে প্রণাম করি।

তারপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। প্রথমেই একফালি বারান্দা—'করিডোর' বলাই উচিত হবে। এখান থেকে দোতলার বিভিন্ন অংশে যাবার দরজা। কিন্তু এরও দেওয়ালে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত। সবই রঙীন এবং অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু গুম্ফাজীবনের নিয়ম-কানুন।

বারান্দা থেকে দরজা ঠেলে একটি ছোট মন্দিরে আসি। এই মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তিটির নাম ডুক-কার (Duk-Kar) তথা উষ্ণীষ-সিতাতপত্রা—কালো ছাতা যে বুদ্ধের শিরস্ত্রাণরূপে ব্যবহৃত। তারপরে ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁরা কারুকার্যময় কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। পাশাপাশি পাঁচটি মূর্তি। সব মূর্তি সমান নয়, দুটি বেশ ছোট, তবে খুবই সুন্দর। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে দর্শন করি।

আরেক পাশে একসারিতে চোদ্দজন পূজ্যপাদ দালাই লামার মূর্তি। বলা বাহুল্য শেষে বসে আছেন চতুর্দশ অর্থাৎ বর্তমান দালাই লামা। সবার সামনে একটি করে জলপূর্ণ পাত্র। অর্থাৎ ধর্মাবতারদের জল দেওয়া হয়েছে।

আমরা শুধু প্রণাম করি। কিন্তু বরুণ দার্জিলিঙের ছেলে। তার তিব্বতী রীতিনীতি জানা আছে। তাই ঘরের একপাশে ঝুলিয়ে রাখা স্তূপ থেকে একখানি ওড়না Scarf নিয়ে সে পূজনীয় দালাই লামাকে নিবেদন করে। তারপরে প্রণাম জানায়।

সিকিম ভূটান নেপাল লাহুল-স্পিতি ও লাদাখ সর্বত্র এই একই নিয়ম। কেবল দেবতা নয়, কোনো পূজনীয় মানুষ এমন কি কোনো পর্বতশিখরকে প্রণাম করার সময়ও হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই মালার পরিবর্তে এই ওড়না নিবেদন করেন। পর্বতাভিযানে যাবার সময় তাই শের্পারা এই ওড়না সঙ্গে নিয়ে যান। শিখরে আরোহণ করতে পারলে ওড়না নিবেদনের মাধ্যমে শিখর-পূজা সমাধা করেন। নেপালীরা এই ওড়নাকে বলেন 'খাদা'।

দর্শন-শেষে আবার সেই বারান্দায় ফিরে আসি। ফল ও ফুল নিয়ে জনৈকা লাদাখী বৃদ্ধা এদিকে আসছেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি? এই ফুল ও ফল কাকে দেবেন? তাহলে কি পূজনীয় লামাপ্রধান এখন এখানে রয়েছেন?

কথাটা জিজ্ঞেস করি তাঁকে। বলা বাহুল্য হিন্দীতে প্রশ্ন করি। ভাগ্য ভাল, ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছেন। তবে তিনি কথা বলেন না। কেবল ঘাড় নাড়েন। ইসারা করে সামনের দরজাটি দেখিয়ে দিয়ে নিজে সেই দরজা খুলে ভেতরে চলে যান। দরজাটা আপনা থেকেই আবার বন্ধ হয়ে যায়।

বুঝতে পারি পরমপূজনীয় শ্রীকুশোক বাকুলা এখন এখানে আছেন এবং তিনি এই ঘরে বাস করেন। অতএব তাঁকে একটিবার দর্শন করার চেষ্টা করতেই হবে।

আমরাও দরজা ঠেলে ভেতরে আসি। এটি ড্রইংরুম। মেঝেতে পুরু কার্পেট, দামী আসবাবপত্র, সুচিত্রিত দেওয়াল। একখানি সোফায় সেই ভদ্রমহিলা বসে আছেন।

জনৈক যুবক ঘরে আসেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে লাদাখীতে কথা বলে আমাদের ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আপনারা কি দর্শনপ্রার্থী?"

সবিনয়ে বলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"একটু বসুন, আমি জিজ্ঞেস করে আসি।" তিনি ভদ্রমহিলাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান।

আমরা সোফায় বসি। আগেই বলেছি ঘরখানি অতিশয় সুসজ্জিত। দেওয়ালে দালাইলামা ও অন্যান্য মহাপুরুষদের ছবি। পূজনীয় বাকুলার কয়েকখানি ছবিও রয়েছে—কোনটি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, কোনটি বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। ভারী সুন্দর ও সৌম্য-শান্ত চেহারা। দেখলেই শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে মনে তাঁরই কথা ভেবে চলি।

পূজনীয় শ্রীকুশোক বাকুলা একজন 'নির্মাণকায়'। নির্মাণকায় মানে কোনো অশরীরী বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব কারও শরীরী প্রাণীর কায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

মহাযান বৌদ্ধমতের বেশ কয়েকজন মহাপুরুষকে নির্মাণকায় বলা হয়ে থাকে। যেমন অতীশ দীপঙ্কর হচ্ছেন জ্ঞানের দেবতা, মঞ্জুশ্রীর নির্মাণকায়। অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন নাগার্জুন প্রবর্তিত প্রজ্ঞা পথের সাধক এবং তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই নালন্দা বিক্রমশীলা ও তৎকালীন অন্যান্য বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ প্রচার করেছেন যে ইষ্ট এবং প্রজ্ঞার দেবতা মঞ্জুশ্রী অতীশ দীপঙ্করের দেহে আবির্ভূত হয়েছেন।

আবার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর হচ্ছেন করুণার দেবতা। তিনি আপন করুণায় আর্তকে আশ্রয় দেন এবং পাপীকে উদ্ধার করেন। তিব্বতের তৎকালীন রাজা স্রোঙ-চেন্-গাম্পো নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ও ব্রাহ্মী লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথ প্রশস্ত করেন। তাই তিনি আজও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বলে পূজিত হচ্ছেন।

মহাযান পুরাণে বলা হয়েছে, গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে 'ষোড়শ মহাস্থবির' বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করেছেন। তাঁদেরই একজন হলেন মহামুনি বকুল। এই বকুলের

'অবতারীলামা বা নির্মাণকায় হচ্ছেন পূজনীয় শ্রীকুশোক বাকুলা। লাদাখী ভাষায় কুশোক মানে নির্মাণকায়।* আমরা এখন তাঁরই দর্শনার্থী।

যুবকটি ফিরে আসেন। আমার ভাবনা থেমে যায়। পরম প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "উনি এখন খুবই ব্যস্ত রয়েছেন। তবু আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন শুনে দর্শনদানে সম্মত হয়েছেন।"

আর কিছু শোনার দরকার নেই। আমি আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়াই। কানে আসে ভদ্রলোক বলছেন, "উনি কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারবেন না।"

"না না, বেশি কথাবার্তা বলে আমরা তাঁর সময় নষ্ট করব না। আমরা শুধু তাঁকে একবার দর্শন করব।"

"তাহলে আসুন।" ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটি মেলে ধরেন।

তাড়াতাড়ি উঠে সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকি। আয়তন আগের ঘরখানির মতো কিন্তু অতো সুসজ্জিত নয়। ফুল ও ধূপের গন্ধে ঘরখানি মন্দিরের মতো মধুময় হয়ে আছে। মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা, অন্যান্য আসবাবপত্র কিন্তু সামান্যই। গালিচার ওপরই বসে আছেন বর্তমান লাদাখের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এবং সুমহান মানুষটি। বয়স্ক হলেও বয়সের ভারে ভেঙে পড়েন নি। সৌম্য শান্ত ও সুদর্শন মূর্তি। স্নিগ্ধ অথচ অতিশয় উজ্জ্বল দুটি চোখ। তিনি একখানি হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করেন। তারপরে ইসারায় বসতে বলেন।

আমরা লুটিয়ে পড়ি তাঁর পায়ের কাছে। সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রণাম পরি এই মহামানবকে।

তিনি আবার বসতে বলেন। অর্ধবৃত্তাকারে তাঁর সামনে বসে পড়ি। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারি না। কি বলব? কিছুই যে মনে আসছে না। তাই নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে।

তিনি কথা বলেন। জিজ্ঞেস করেন—তোমরা কি সবাই কলকাতায় থাকো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সবিনয়ে উত্তর দিই।

তিনি আবার বলেন—আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

একবার থামেন তিনি। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি প্রশ্ন করেন—কেন বলো তো?

উত্তর দিতে পারি না। শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

একটু বাদে তিনি নিজেই উত্তর দেন—তোমরা আমার অতীশ দীপঙ্করের দেশ থেকে এসেছো, আজ সকালে তোমরাই আমার প্রথম অতিথি।

কি আশ্চর্য মহানুভবতা! শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারার আগেই তিনি আবার বলেন—শ্রীচৈতন্য বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর বাংলা, বন্দেমাতরম্ মুক্তিমন্ত্রে উদ্গাতা সোনার বাংলা থেকে তোমরা আমার লাদাখে এসেছো, আমার কাছে এসেছো। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

---

* 'অতীশ দীপঙ্কর চরিত'—শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ।

গর্বে আমার বুকখানি ভরে ওঠে। আর সেই সঙ্গে এই সুমহান মানুষটির কথা ভাবি। এত বড় হয়েও তিনি কত ভাল। এমন ভাল বলেই বোধ হয় এত বড় হতে পেরেছেন।

তখন যুবকটি বলেছিলেন—তিনি খুবই ব্যস্ত, বেশি কথাবার্তা বলতে পারবেন না। অথচ তিনি অনেক কথা বললেন। জানতে চান—আমরা কে কি করি? কবে এসেছি? কোথায় উঠেছি? কদিন থাকব? কোথায় কোথায় যাবো?

জিজ্ঞেস করেন—লাদাখ সম্পর্কে বাংলার মানুষের কি ধারণা? আর লাদাখ তোমাদের কেমন লাগছে?

আমরা সানন্দে তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর দিই। তারপরে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াই।

তিনি আবার আমাদের আশীর্বাদ করেন।

অবশেষে বিদায় নিই এই পরিব্রাজক ও পণ্ডিত সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। বেরিয়ে আসি গুম্ফার বাইরে। আমার সমস্ত হৃদয় তৃপ্তির আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পূজনীয় বাকুলার আজকের দিনটি কতখানি আনন্দের জানা নেই আমার, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদে আমাদের লাদাখ দর্শন যে আনন্দময় হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

।। এগারো ।।

হোটেলের সামনে ফিরে এলাম। মীরাদি ও বাচ্চাদের নিয়ে নন্দা হোটেলে ফিরে গেল। তরুণ আর মানাও তার সঙ্গী হল। আমরা চারজন বিভাসের সঙ্গে এগিয়ে চলি বাজারের দিকে। আমাদের বাঁয়ে খানিকটা দূরে সেই রাজপ্রাসাদ। এই রাজপ্রাসাদকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এই শহর। এখন দিন দিন শহর বড় হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে প্রাসাদটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তাহলেও বলব প্রাসাদটির অবস্থান সত্যই অভিনব। আগেই বলেছি লে শহরের সব জায়গা থেকে প্রাসাদটি দেখা যায় এবং প্রাসাদ থেকে সারা শহরসহ সমগ্র সিন্ধু উপত্যকাটি অপরূপ দেখায়। একদিন দেখতে হবে।

প্রাসাদের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলি। এই প্রাসাদের স্থানীয় নাম 'লে খর' (Leh-Khar)। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ওখানে লাদাখের রাজবাড়ি। কিন্তু বর্তমান প্রাসাদটি তৈরি হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে। তৈরি করেছেন লাদাখী রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সেঙে নামগিয়াল। ন'তলা এই বাড়িখানি তৈরি করতে প্রায় বিশ বছর লেগেছে।

শুনেছি ন'তলা এই রাজপ্রাসাদে অসংখ্য ঘর। তার মধ্যে অনেকগুলি প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেগুলির দেওয়ালচিত্র নাকি দেখার মতো। আগেই বলেছি, প্রাসাদের চত্বরে তিনটি গুম্ফা আছে। সেখানে ঐ তিনটি দেবালয় রাজপরিবারের

মন্দিররূপে সমাদৃত হত। এখন একেবারেই অবহেলিত। কেবল একজন লামা সন্ধ্যাবাতি দেন। তিনিই এখন রাজপ্রাসাদের একমাত্র বাসিন্দা। তাহলেও আমরা দর্শন করব। হেমিস থেকে ফিরে এসে একবার প্রাসাদটি দেখে আসব।

কিন্তু রাজবাড়ির কথা আর নয়, এবারে পথের পাশে বাড়িগুলো দেখা যাক।

লাদাখীরা সাধারণতঃ মাটি পাথর কাঠ ও টিন দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। মাটির গাঁথুনি দিয়ে পাথরের দেওয়াল আর টিনের চালের বাড়ি। ইদানীং অবশ্য সিমেন্ট এবং লোহা ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক ডিজাইনের বেশ কিছু বাড়িও তৈরি হয়েছে লে শহরে। তবে সেগুলো সবই প্রায় সরকারী দপ্তর কিম্বা হোটেল। সাধারণ মানুষ অধিকাংশই প্রাচীন পদ্ধতির বাড়িতে বাস করেন।

লাদাখী পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ির বৈশিষ্টা, বাড়ির মধ্যে যে ঘরখানি সবচেয়ে বড়, তারই মাঝখানে রান্নার জায়গাটি নির্দিষ্ট। আজকাল প্রায় সব বাড়িতেই উনোনের ওপরে চিমনি বসানো হয়েছে। ফলে উনোনের ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে যায় কিন্তু ঘরখানি গরম থাকে।

আমরা বাজারে পৌঁছে গেছি। ডানদিকে ট্যুরিস্ট অফিসের পথ ছেড়ে এগিয়ে চলি সামনে। এটি লে শহরের সবচেয়ে চওড়া এবং জমজমাট রাস্তা। পথের দু পাশে দোকানপাট। শাক-সবজী, মুদি-মনোহারী, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাতের কাজের জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকান। একাধিক স্টুডিও এবং বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ রয়েছে পথের ধারে।

আমাদের এগোতে বলে যথারীতি বরুণ গিয়ে একটা স্টুডিওতে ঢুকল। অতবড় শিল্পীর দৌহিত্র এবং নিজে আলোকচিত্রকর। সুতরাং স্টুডিও দেখে সেখানে সে না ঢুকলেই অবাক হতে হত। যদিও জানি ওখানে ওর কোনো কাজ নেই।

যাক্ গে, বরুণকে বাসস্ট্যাণ্ডে আসতে বলে আমরা এগিয়ে চলি। না, বরুণ একা নয়। তার হরিহরআত্মা শ্রীমান স্বপনও সঙ্গী হয়েছে।

পথের তুলনায় পথচারীদের সংখ্যা সামান্য। গাড়ির অত্যাচার খুবই কম। সুতরাং গা বাঁচিয়ে চারিদিক দেখেশুনে মন্দাক্রান্তাতালে পদচারণা করতে করতে এগিয়ে চলেছি।

বাসস্টেশন তথা বাস-ডিপোতে আসা গেল। ফেরার রিজার্ভেশান করতে কোনো অসুবিধে হল না। কারণ নন্দা কয়েকদিন আগে শ্রীনগর থেকে ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আমাদের জায়গা রেখে দিয়েছেন।

টিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসি বাস-ডিপো থেকে। আর তখুনি বরুণ ও স্বপন এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে।

চারটি পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। একটি গেছে শহরের ভেতরে বাজারের দিকে, যে পথে আমরা এসেছি এবং যে পথে আমরা আবার ফিরে যাবো। একটি গিয়েছে প্রাসাদ ও লে গুম্ফার দিকে, আরেকটি টি. বি. হাসপাতালের দিকে প্রসারিত। চতুর্থ পথটির পাশে একখানি সাইনবোর্ড—

"BEACON HIGHWAY,
Highest Road of the world, Ht. 18,380′,
You can have dialogue with God."

বিশ্বের এই উচ্চতম পথ-পরিক্রমা করার সময় মোটরগাড়িতে বসে ভগবানের সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা জানি না। জীবনের কোনদিন এ পথে যেতে পারব কিনা, তাও জানা নেই আমার। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে পথটিকে দেখি আর তার কথা ভাবি।

১৮,৩৮০ ফুট উঁচু খারদুং লা ও সিয়োক উপত্যকা পেরিয়ে এই পথটি গিয়েছে নুব্রা উপত্যকার পানামিক পর্যন্ত। পৃথিবীতে আর কোনো মোটরপথ খারদুং লা-র মতো এত উঁচু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নি। তাই এটি বিশ্বের উচ্চতম মোটরপথ।

লে থেকে প্রায় সোজা উত্তরে এগিয়ে খারদুং লা পেরিয়ে পথটি সিয়োক উপত্যকায় উপনীত হয়েছে। খারদুং গ্রাম ছাড়িয়ে পৌঁচেছে খালসার গ্রামে—সিয়োকের তীরে। পুলের ওপর দিয়ে সিয়োক নদী পেরিয়ে পথটি সিয়োকের তীরে তীরে পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। পৌঁচেছে সিয়োক ও নুব্রা নদীর সঙ্গমে। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া এ পথে যাওয়া যায় না।

যাক্ গে যে কথা ভাবছিলাম—সঙ্গম ছাড়িয়ে নুব্রা নদীর ডানতীর ধরে পথটি প্রসারিত হয়েছে উত্তরে। তেগ্‌গার ও তিরিশা গ্রাম ছাড়িয়ে ১০,৬১০ ফুট উঁচু পানামিকে পৌঁছে পথ শেষ হয়েছে। পানামিক জায়গাটি সাসের-কাংরী পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। ২৫,১৭০ ফুট উঁচু সাসের-কাংরী বা 'K-22' ভারতের সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ। উচ্চতার বিচারে সাসের-কাংরী বিশ্বের ৫২তম ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর ২১তম শৃঙ্গ। কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর উচ্চতর শৃঙ্গগুলি সবই পাকিস্তানে।

কিন্তু পাকিস্থানের কথা থাক, ভারতের কথা ভাবা যাক—ভারতের উচ্চতর শৃঙ্গগুলি হল—কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৩৬′) এবং তার দক্ষিণ ও পশ্চিম শৃঙ্গ, নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫′), কামেট (২৫,৪৪৭′) ও নামচা বারোয়া (২৫,৪৪৫′)।

আবার পথটির কথায় ফিরে আসা যাক। শুধু সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পথটি খোলা থাকে। বাকী প্রায় দশ মাস ধরেই নুব্রা উপত্যকার উত্তরাংশ জুড়ে এত বরফ জমে যে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার বাজারে আসি। পথের পাশে কয়েকখানি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তারই একখানির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে বিভাস। এখন নন্দা নেই, সুতরাং বিভাসই আমাদের অভিভাবক।

অবশ্য কথা বলার তেমন কিছু নেই। জীপ হল লাদাখের ট্যাক্সী। কলকাতার মতো মিটার নেই। তবে প্রত্যেক গাড়িতে সই করা সরকারী 'রেট চার্ট' লাগানো রয়েছে। এরা ছ'জন করে যাত্রী নেয়। আমাদের দেড়দিনের জন্য দুখানি জীপ দরকার। আজ আধদিনে আমরা ফিয়াং (Phyang) ও স্পিতুক (Spituk) গুম্ফা দেখব আর আগামীকাল সারাদিন 'শে' (Shey), 'তিক্‌সে' (Tikse) এবং 'হেমিস'

(IIcmis) গুম্ফায় কাটাবো।

একই মালিকেব দু'খানি জীপ-ট্যাক্সী পাওয়া গেল। আজ বিকেল তিনটায ও কাল সকাল আটটায় হোটেলেব সামনে গাড়ি হাজিব হবে।

গাড়ি ঠিক কবে এগিয়ে চলি। একবাব স্টেট ব্যাঙ্কে যেতে হবে, কিছু ট্র্যাভেলবস্ চেক ভাঙানো দবকাব।

বরুণ সুযোগ পেযে করুণেব পেছনে লাগে। খানিকটা দূবেব একটা বেস্তোবাঁ দেখিযে করুণকে বলে, "ব্রহ্মচাবীদা, ওখানে চমৎকাব 'চিকেন-কাবী' পাওযা যাচ্ছে।"

আগেই বলেছি, করুণকৃষ্ণ জপতপ কবে। সে নিবামিষভোজী। তাব এসব কথা শোনাও পাপ।

কিন্তু কথাটা শুনে করুণ মৃদু হাসে। তাবপবে বরুণকে প্রশ্ন কবে, "আপনাবা খেযে এলেন বুঝি?"

"তা আব বলতে!" স্বপন উত্তব দেয়।

করুণ বলে, "ভালই হল। আজ ডাল-তবকাবি একটু বেশি পাওযা যাবে।"

"কেন বলুন তো!" বরুণ বিস্মিত।

করুণ গম্ভীব স্ববে বলে, "আপনাবা তো এখানেই লাঞ্চ সেবে নিলেন, আপনাদেব ভাগেব ডাল তবকাবি আমবা খেতে পাবো।"

সবাই সোচ্চাব স্ববে হেসে উঠি। হাসতে হাসতে পথ চলি।

স্টেট ব্যাঙ্কেব সামনে এসে অবাক হই। বেলা এগাবোটা বেজে গেছে, এখনও গেটে তালা। কি ব্যাপাব!

দাবোযান দুঃসংবাদ দেয—আজ ব্যাঙ্ক্ বন্ধ, স্থানীয ছুটি।

সর্বনাশ! কাল যে ববিবাব! তাব মানে সোমবাবেব আগে টাকা পাওযা যাবে না। আমবা যে কেউ এখনও নন্দাকে পুবো টাকা দিই নি। বিভাসেব কাছে নগদ টাকা যা ছিল, প্রায সবই বাসেব টিকেট কাটতে চলে গিযেছে। এখন চলবে কেমন কবে?

হঠাৎ বিভাস বলে ওঠে, "চলুন একবাব বর্মনদাব কাছে যাওযা যাক, তিনি নিশ্চযই একটা উপায় কবে দিতে পাববেন।"

"বর্মনদা কে?" জিজ্ঞেস কবি।

বিভাস উত্তব দেয়, "শ্রীভোলানাথ বর্মন। এখানে একটা হোটেল খুলেছেন।"

"বাঙালী?"

"হ্যাঁ।" একবাব থামে বিভাস। তাবপবে বলে, "তিনি যদি ট্র্যাভেলবস্ চেক নিযে কিছু নগদ টাকা দিতে পাবেন, তাহলে আমাদেব আব তেমন অসুবিধে হয় না।"

"কিন্তু তিনি বাজী হবেন কি?"

"তা হতে পাবেন।"

অতএব বিভাসকে অনুসবণ কবি।

আমবা বাজাবে প্রবেশ কবি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। নিচের তলায় রেস্তোরাঁ, ওপরে থাকার ঘর। এটাই ভোলানাথবাবুর 'বর্মন হোটেল'।

বিভাসের সঙ্গে ভেতরে আসি। ভোলানাথবাবু কাউণ্টারে বসেছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই সানন্দে আমন্ত্রণ জানান, "আসুন, আসুন। কবে এলেন?"

"গতকাল বিকেলে।" বিভাস উত্তর দেয়।

ভোলানাথবাবু বেরিয়ে আসেন কাউন্টার থেকে। আমাদের সঙ্গে সোফায় এসে বসেন। জনৈক কর্মচারীকে চা আনতে বলেন।

প্রতিবাদ করি। কিন্তু কোনো ফল হয় না। ভোলানাথবাবু বলেন, "তা কেমন করে হবে? আপনারা লাদাখে এসেছেন, দয়া করে আমার হোটেলে পদধূলি দিয়েছেন, আর এক কাপ চা খাবেন না?"

বিভাস একে একে আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি খুশি হন। আমাকে বলেন, "এবারে তাহলে আমরা লাদাখের ওপরে আরেকখানি বাংলা বই পড়তে পারব?"

"নিশ্চয়ই।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই স্বপন বলে ওঠে।

"তার মানে আপনিও একজন 'হিরো' হয়ে যাচ্ছেন।" সঙ্গে সঙ্গে করুণ স্বপনকে একহাত নেয়।

আমরা হেসে উঠি। হাসি থামলে বরুণ করুণকে বলে, "আপনি তো 'অমরতীর্থ-অমরনাথ' বইতে 'হিরো' হয়ে বসে আছেন, এবারে আমাদের পালা।"

চা আসে। আমরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভোলানাথবাবুর কর্মময় জীবনের কথা শুনি—বেড়াতে কিম্বা ব্যবসা করার জন্য তিনি লাদাখে আসেন নি, এসেছিলেন কাজ করতে—BEACON-এর রাস্তা তৈরির কাজ। সে বিশ বছর আগের কথা। কিছুকাল পরে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি লাদাখের মায়ায় পড়ে গেছেন। আর লে ছেড়ে চলে যেতে পারলেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা খাবার হোটেল খুললেন। কয়েক বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন। হোটেলটা দাঁড়িয়ে গেল। এটি কিন্তু লে শহরে একমাত্র বাঙালী পান্থনিবাস নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তার ছেলে শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনেকদিন আগেই 'SODNAM' নামে একটি ভাল হোটেল করেছেন—টুরিস্ট রিসেপ্শন সেন্টারের কাছে।

বড় বাড়ি পেলে মহাদেববাবু বোর্ডারের সংখ্যা বাড়াতে পারেন। কিন্তু তেমন বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। মহাদেববাবু যে নিজে বাড়ি করে নেবেন, তার উপায় নেই। স্থানীয় বাসিন্দা না হলে এ রাজ্যে ঘর-বাড়ি তৈরি করা যায় না। রবীনবাবুর এ সমস্যা নেই, কারণ তাঁর স্ত্রী লাদাখের মেয়ে।

অত্যন্ত অন্যায় একটা আইন চালু রয়েছে এই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। এ রাজ্যের যে কোনো অধিবাসী ভারতের যে কোনো জায়গায় গিয়ে জমি-বাড়ি কিনতে পারেন, কিন্তু অন্য রাজ্যের অধিবাসীরা এই রাজ্যে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারেন না। এই অন্যায় আইনটি যে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী, তা অনুধাবন করেও কর্তৃপক্ষ নীরব রয়েছেন। জানি না কবে এই নীরবতার অবসান ঘটবে!

কথায় কথায় ভোলানাথবাবু বলেন, "বিয়ে করেছি, তবে সময়ে বিয়ে করা হয়ে ওঠে নি। বিয়ে করেছি মাত্র বছর সাতেক আগে। আমাদের একটি ছেলে, বয়স পাঁচ বছর। স্থানীয় বাঙালী বলতে এখানে আমব' এবং রবীনবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। তবু আমার স্ত্রী বিয়ের পর থেকে এখানেই আছে। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এখানে পড়ে থাকার জন্য কখনও কোনো অভিযোগ করে না। সে সংসার দেখে, আমি ব্যবসার মধ্যে ডুবে আছি। সুখেই আছি বলতে পারেন।" শেষ করে হো হো করে হাসতে থাকেন ভোলানাথবাবু।

অবশেষে বিভাস কাজের কথা পাড়ে, ট্র্যাভেলরস চেক সমস্যার কথা বলে। শুনে ভোলানাথবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কত টাকা চাই?"

"যা দিতে পারেন।"

ভোলানাথবাবু তাঁর ম্যানেজারকে বলেন, "দেখো তো অনুপ, ক্যাশে কি আছে?"

ম্যানেজার অনুপ ঘোষ এতক্ষণ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিলেন। এবার তিনি কাউন্টারে ঢুকে ড্রয়ার খোলেন, টাকা গুনতে শুরু করেন।

একটু বাদে ম্যানেজার জানান, "তেরোশ' টাকার মতো আছে।"

আমার হাসি পায়, আবার তেরো! কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে নীরব থাকি।

ভোলানাথবাবু ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার তো চার-পাঁচশ' টাকা থাকলেই এখনকার মতো চলে যাবে?"

ম্যানেজার মাথা নাড়েন। ভোলানাথবাবু বিভাসকে বলেন, "আট-ন'শ টাকা পেলে চলবে কি?"

"তাই দিন।" বিভাস বলে।

ভোলানাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি বর্মন হোটেল থেকে। ভদ্রলোক সত্যিই আমাদের বড্ড উপকার করলেন।

লে শহরের পথ ধরে চলেছি হিমালয়ান হোটেলের দিকে। সবজী বাজারকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলি উত্তরে। 'খান লজ' ও থানা ছাড়িয়ে আসি। সামনে বাঁয়ে 'হোটেল সাংগ্রিলা' দেখা যাচ্ছে। এটি লাদাখের একটি বড় এবং বিলাসবহুল হোটেল। আর এই রাস্তার নাম শঙ্কর রোড।

এই পথটাই হিমালয়ান হোটেলের সামনে দিয়ে শঙ্কর গ্রামে চলে গেছে।

হঠাৎ পথের পাশে প্রস্তর-ফলকটির দিকে নজর পড়ে। লেখা রয়েছে—

'MORAVION CHURCH, LEH
Foundation 1885
Service :—
Summer 10 A. M.
Winter 11 A. M.

পথের ডানদিকে ছোট তোরণ। তারই পাশে দেওয়ালের ওপর প্রস্তরফলক। আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। খব বড় জায়গা জুড়ে নয়, তবে চারিদিক সুন্দর গোছানো।

তোরণ থেকে একটু এগিয়ে পথের ডানদিকে গীর্জা। ছোট গীর্জা, কিন্তু অতিশয় সুসজ্জিত। আমরা দর্শন করি।

গীর্জা থেকে বেরিয়েই দেখা হয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বিভাসকে দেখে বলে ওঠেন, "নমস্তে দাস সাহেব!"

প্রতিনমস্কারের পরে বিভাস তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে, "এর নাম আবদুল ঘনি শেখ, ইনি একজন লাদাখী লেখক।"

"খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।" আমি বলি, "আপনি যদি এই গীর্জার কথা কিছু বলেন, তাহলে বড় ভাল হয়।"

শেখসাহেব সবিনয়ে বলেন, "আমি সামান্যই জানি। তাই বলছি। আসুন এখানে বসা যাক।"

গীর্জার সামনে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসি সকলে। শেখসাহেব শুরু করেন: "সে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পাগেল (Pagell) ও হেইড (Heyde) নামে দুজন মোরেভিয়ান মিশনারী মঙ্গোলিয়া যাবার পথে এখানে আসেন। কিন্তু তৎকালীন তিব্বত সরকার তাঁদের তিব্বত অতিক্রম করার অনুমতি দিলেন না। ফলে তাঁদের লাদাখেই থেকে যেতে হল। এইসব মিশনারীরা শুধু ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন কর্মঠ সমাজসেবক। সুতরাং মিশনারীদ্বয় 'পু' (Poo) এবং 'কেলং'-এ (লাহুলের জেলাসদর) সমাজসেবা শুরু করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লে, খালসি ও কার্গিলে তাঁদের সেবাকার্য প্রসারিত হল।

"১৮৮৫ সালে এই গীর্জা নির্মিত হল। সেই বছরই এখানে একটি স্কুল আরম্ভ হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে সেটি পরে বন্ধ হয়ে যায়।

"পরবর্তীকালে মিশনারীরা এখানে একটি হাসপাতল খুলেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার এবং নার্সের অভাবে তাঁরা সেটি বেশিদিন চালাতে পারেন নি।" একবার থামেন শেখসাহেব। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই।

একটু বাদে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করেন, "যখন এখানে কোনো যন্ত্রযান ছিল না, ছিল না কোনো পথ, তখন সুদূর জার্মানী থেকে এই সব সেবকরা এদেশে এসে মানুষের সেবা করেছেন। লাদাখের সমাজজীবনে মোরেভিয়ান মিশনারীদের অবদান অসামান্য। তাঁরা শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসা করেছেন। পথ তৈরি করেছেন। তাঁরা স্থানীয়দের সবজী চাষ শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে শীতকালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করতে হয়, তার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। তাঁরা লাদাখী মেয়েদের মাঝে নানা কুটিরশিল্পের প্রচলন করেছেন। তাঁরাই প্রথম ইংরেজী-তিব্বতী অভিধান প্রণয়ন করেছেন আর লাদাখের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন।"

থামলেন শেখসাহেব। জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, এখন এঁরা কোনো স্কুল পরিচালনা করেন না?"

"করেন বৈকি।" শেখসাহেব উত্তর দেন। বলেন, "কারজু কম্পাউণ্ডে এঁদের বেশ বড় একটি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারী স্কুল আছে। শোয়া দু'শ ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। স্কুলটি ১৯৮০ সালে খোলা হয়েছে।"

"কোনো পাদরী নিশ্চয়ই এই গীর্জার দেখাশোনা করেন?" শেখসাহেব থামতেই বরুণ প্রশ্ন করে।

তিনি উত্তর দেন, "না। পাদরী বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁরা কেউ আর নেই এখানে। মিশনের প্রবীণ শিষ্যরাই এখন স্কুল ও গীর্জা দেখাশোনা করেন।"

অনেক বেলা হয়েছে। বিকেলে আবার বেরুতে হবে। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হয় শেখসাহেবের কাছ থেকে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসি মোরেভিয়ান মিশন থেকে। শঙ্কর রোড ধরে এগিয়ে চলি হোটেলের দিকে।

হোটেল সাংগ্রিলা-কে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছি আশ্রয়ের দিকে। কিন্তু না, সাংগ্রিলা যতই বিলাসবহুল হোটেল হয়ে থাক, আমি তার কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি লাদাখের কথা, তার ঐতিহ্যময় অতীতের কথা।

সে অতীত খুব সুপ্রাচীন কিম্বা সুস্পষ্ট নয়। বাস্তবিকপক্ষে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের আগে লাদাখের কোনো ইতিহাস আজও আবিষ্কার হয় নি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রথম তিব্বতী রাজবংশ লাদাখে কায়েম হয়। কিন্তু সেযুগের কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস আজও আমাদের হাতে আসে নি। ইতিহাস বলতে সেযুগের আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা সবই উপাখ্যান বা Chronicles, পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য প্রায় নেই বললেই চলে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নামগিয়াল বংশের রাজত্বকাল থেকে আমরা যেসব উপাখ্যান পাই, সেগুলির কিছু কিছু ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। সুতরাং পাঁচ শ' বছরের আগে লাদাখের কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অথচ লাদাখ পৃথিবীর প্রাচীনতম মনুষ্য-বসতিসমূহের অন্যতম।

ভারতের ইতিহাসে লাদাখের নাম প্রথম লেখা হয়েছে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর মোগলসম্রাট বাবর কাশ্মীর জয়ের চেষ্টা করে বিফল হন।

তারপরে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট হুমায়ূনের সাহায্যে মির্জা হায়দার কাশ্মীরের রাজাকে পরাজিত করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাদাখ আক্রমণ করেন। কিন্তু তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। তাই ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার আক্রমণ করে লাদাখ ও বালতিস্তান দখল করে নেন। কিন্তু হায়দার সে দখলদারী বেশিদিন ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫১ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তারপর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কাশ্মীরের দিক থেকে লাদাখে আর কোনো বিপদ আসে নি। বরং এই সময়টা লাদাখের এক অতিশয় গৌরবময় যুগ। কারণ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও শক্তিশালী শে-ওয়াঙ-নামগিয়াল (Tshe-Wang-Namgyal) তখন (১৫৩৫—৭৫ খ্রীঃ) লাদাখের রাজা। তিনি বালতিস্তান ও চিত্রল জয় করেছিলেন।

শে-ওয়াঙ লাদাখের দ্বিতীয় রাজবংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা, যিনি লাদাখের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে প্রথম রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি গুগে (পশ্চিম তিব্বত), লাদাখের তরাঘ অঞ্চল এবং বালতিস্তানের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু ১৫৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে লাদাখের এই বিশালত্ব স্থায়ী হল না।

রাজপরিবারের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে গুগে এবং বালতিস্থান স্বাধীন হয়ে গেল। শে-ওয়াঙের কোনো ছেলে ছিল না। প্রায় পাঁচ বছর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলার পরে শে-ওয়াঙের ভাই জাম-ওয়াঙ (১৫৭৫—৮৫ খ্রীঃ) লাদাখের সিংহাসনে বসেন। তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার চেষ্টা করে বিফল হলেন। শুধু তাই নয়, রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বালতিস্থানের শাসক আলি মীর খান লাদাখ আক্রমণ করেন। জাম-ওয়াঙ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আলি মীর জানতেন তিনি বেশিদিন লাদাখ অধিকার করে রাখতে পারবেন না, তাই এই ধর্মান্ধ শাসক লাদাখের প্রায় সমস্ত গুম্ফা ধ্বংস করে ফেললেন। পুঁথিগুলি পুড়িয়ে মূর্তিগুলো জলে ফেলে দিলেন। তারপরে রাজাকে বললেন—আপনি যদি আমার একটি মেয়েকে বিয়ে করেন, এবং সেই মেয়ের ছেলেকে যদি রাজা করতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি।

রাজা সে শর্ত মেনে নিলেন। জাম-ওয়াঙকে জামাই করে আলি মীর তাঁকে মুক্তি দিলেন। নববধূকে নিয়ে রাজা রাজধানীতে ফিরে এলেন। যথাসময়ে বালতি-স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বালতি-মায়ের বড়ছেলে সেঙে নামগিয়াল (Sengge Namgyal) ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখের সিংহাসনে বসলেন। তিনি ছিলেন আলি মীরের যোগ্য দৌহিত্র এবং শে-ওয়াঙ নামগিয়ালের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র।

আলি মীর তাঁর রক্তকে লাদাখের রাজবংশে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কারণ সেঙে ছিলেন যেমন বীর, তেমনি ধর্মপ্রাণ আর সে ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। তিনি একদিকে যেমন তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করেছেন, তেমনি আরেকদিকে লাদাখের মাটি থেকে মাতামহের ধর্মান্ধতার ছাপ মুছে ফেলেছেন। তিনি চারিপাশের প্রায় সমস্ত রাজ্য জয় করেছেন আবার হেমিস সহ অনেকগুলি গুম্ফার আমূল সংস্কার করেছেন। সেঙে নামগিয়াল নিঃসন্দেহে লাদাখের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। শাজাহান তখন দিল্লীর সম্রাট। লাদাখের ওপরে সেঙে নামগিয়ালের এই আধিপত্যে তিনি কোনো বাধা দেন নি। আর তাঁর রাজত্বকালে লাদাখ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে।

সেঙে নামগিয়ালের দেহরক্ষার পরে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুযোগ্য পুত্র দেলদান নামগিয়াল (Deldan) লাদাখের সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর পিতার যোগ্য সন্তান। তিনি লাদাখের নিম্নাঞ্চলে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে বালতিস্তান আক্রমণ করেন। বালতিস্তানের শাসক মোগলসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বয়ং বালতিস্তানে এলেন। বাধ্য হয়ে দেলদান নামগিয়ালকে মোগলসম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হল। কিন্তু এই স্বীকৃতির জন্য লাদাখের কোনো ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা, বরং ভবিষ্যতে অনেক লাভ হয়েছে। এর ফলে দেলদানের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেলদান পরলোকে গমন করেন, তখন লাদাখ তার ইতিহাসের বৃহত্তম রাজ্য। নুব্রা দ্রাস পুরিগ, নিম্ন-শিয়োগ, গুগে পুরাং, রুদক, লাহুল-স্পিতি, কিন্নরের উচ্চাংশ এবং জাঁস্কার উপত্যকা নিয়ে তখন

লাদাখ রাজ্য।

লাদাখের ওপর দালাই লামাদের নজর বহুদিনের। তাঁরা এই অঞ্চলে লাদাখের আধিপত্য কখনও মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু দেলদান নামগিয়াল যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন কিছু করে উঠতে পারেন নি। ফলে তলে তলে ঠাণ্ডা লড়াই চললেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় নি।

দেলদানের মৃত্যুর পরে দেলেগস্ (Delegs) নামগিয়াল লাদাখের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন নিতান্তই অনুপযুক্ত। আর তিব্বতে তখন পঞ্চম দালাই লামা প্রভুত্ব করছেন। তিনি ছিলেন যেমন শক্তিশালী, তেমনি উচ্চাভিলাষী। ফলে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ তিব্বতীরা লাদাখ আক্রমণ করল।

নিরুপায় রাজা শেষ পর্যন্ত মোগলসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সৌভাগ্যের কথা সম্রাট আওরঙ্গজেব লাদাখের ওপর তিব্বতের এই আক্রমণকে মোগলসাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করলেন। ফলে তিব্বতীদের হাত থেকে লাদাখ রক্ষা পেল। কিন্তু সেঙে ও দেলদানের স্বাধীন ও অখণ্ড লাদাখ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের মতো মিথ্যে হয়ে গেল।

তাহলেও লাদাখের সিংহাসনে নামগিয়াল রাজবংশ এর পরেও প্রায় দেড়শ বছর অর্থাৎ ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। তাঁরা কেউ তেমন বীর কিম্বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, তবু তাঁরা কোনদিন দালাই লামার তিব্বতী সরকারের অধীনতা স্বীকার করেন নি। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে রাজনৈতিক দিক থেকে চীন কিম্বা তিব্বত কখনও লাদাখে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সমর্থন হয় নি। বরং তিব্বতের গুগে কয়েকবার লাদাখের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে লাদাখের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। এই সময় কাশ্মীরের ডোগরা সেনাপতি উজির জরোয়ার সিং লাদাখ ও বালতিস্তান জয় করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ ও বালতিস্তান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তারপর থেকে একশ' এক বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর মহারাজের থানাদার বা ওয়াজার-ই-ওয়াজারাত লাদাখ শাসন করেছেন। এবং লাদাখের রাজবংশ সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

চীন ও পাকিস্তান যত চীৎকারই করুক, আকসাই চিনসহ সমগ্র লাদাখ এবং গিলগিটসহ সমগ্র বালতিস্তান চিরকাল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ইতিহাসের প্রতি ভারতবাসীর অনীহা সুবিদিত। তবু ইতিহাস বলে—খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের আমলে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ রাজত্বকালে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মহারাজা ললিতাদিত্যের সময়ে, চতুর্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সুলতান সাহাবুদ্দিনের আমলে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মোগল রাজত্বকালে বালতিস্তান ও লাদাখ আর্যাবর্তের অধীনতা মেনে নিয়েছে। সবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুটি অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কাশ্মীরের শেষ মহারাজা হরি সিং ১৯৪৭ সালে ব্রিগেডিয়ার ঘনশারা সিংকে এই অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার কয়েক বছর আগে (২৯/৫/৮২) এক বিবৃতিতে বলেছেন, "তখন যদি আমার

হাতে পর্যাপ্ত সৈন্য থাকত, তাহলে অবস্থাটা (বালতিস্তান) অন্যরকম দাঁড়াতো এবং পরে যে চক্রান্ত প্রকাশ পেলো, তা বানচাল করে দেওয়া যেত।"

রাজনৈতিক দিক থেকে লাদাখ ভারতের অংশ হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে লাদাখ বহুকাল ধরে তিব্বতীয় প্রভাবের অধীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি তিব্বত থেকে লাদাখে এসেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৪১ অব্দে সম্রাট অশোকের আমলে লাদাখে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কুষাণ রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম লাদাখে আরও উন্নত হয়। গতকাল আমরা মূলবেখে তার প্রমাণ পেয়ে এসেছি। লাদাখের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আর্যাবর্তের ধর্মীয় প্রভাব খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে তিব্বতে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের সিকিম থেকে লাদাখ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের প্রায় সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে, আর সেই ধর্মীয় প্রভাব ভারত সীমান্তের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

লাদাখের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে লাদাখের ধর্ম-জীবনে আর্যাবর্তের ধর্মীয় প্রভাব কমতে শুরু করে এবং তিব্বতের (তুলিঙ মঠের) প্রভাব বাড়তে থাকে। চতুর্দশ শতকে লাদাখ তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। ফলে তার সাংস্কৃতিক জীবনেও তিব্বতী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজও সেই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কারণ ভারতীয় রাজনীতি কখনও মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নি। উজির জরোয়ার সিং যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে লাদাখের যেসব গুম্ফা ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে কাশ্মীরের মহারাজারা সেইসব গুম্ফা নির্মাণ করে দিয়েছেন। মুসলমান আমলে ব্যাপক ধর্মান্তকরণের ফলেই কাশ্মীর মুসলমান-অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর বিজয়ের পরে ১২৮ বছরের রাজত্বকালে কাশ্মীরের কোনো রাজা প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। করলে হয়তো আজ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

যাক্ গে যে কথা ভাবছিলাম—লাদাখের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিব্বতের সেই প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবং পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আজ লাদাখ খাস তিব্বতের চাইতে বেশি তিব্বতী।

তিব্বতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। কিন্তু তিব্বত আজ আমাদের কাছে নিষিদ্ধ দেশ। লাদাখে এসে আমি তিব্বতী ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করলাম। আমার লাদাখ ভ্রমণ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠল।

।। বারো ।।

আমাদের আশঙ্কা সত্য হল না। তিনটে বাজার কয়েক মিনিট আগেই গাড়ি এসে হাজির হল। গাড়ি মানে জীপ—দুখানি জীপ। এখানে ট্যাক্সি বলতে জীপগাড়ি।

তবে আমরাও তৈরি ছিলাম। ড্রাইভার এসে সেলাম করতেই ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বড় রাস্তায় এসে গাড়িতে উঠে বসা গেল। গাড়ি এগিয়ে চলল।

গতকাল যে পথে কার্গিল থেকে লে এসেছি, সেই পথেই চলেছি এগিয়ে। আমরা ফিয়াং আর স্পিতুক গুম্ফা দেখতে যাচ্ছি। ফিয়াং ও স্পিতুক 'লে' শহর থেকে যথাক্রমে ১৬ এবং ১০ কিলোমিটার।

হোটেল সাংগ্রিলাকে ডানদিকে আর মোরেভিয়ান মিশনকে বাঁদিকে রেখে আমরা দক্ষিণদিকে চলেছি। পেরিয়ে এলাম পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স এবং খান লজ। খানিকটা এগিয়ে পথটা একটু বাঁয়ে বাঁক নিয়ে আবার সোজা হল। স্টেট ব্যাঙ্ককে ডাইনে রেখে সবজী বাজারের পাশ দিয়ে সেই দক্ষিণদিকেই অগ্রসর হচ্ছি। প্যালেস ভিউ গেস্টট হাউস, ড্রিমল্যাণ্ড হোটেল এবং হোটেল খাঙ্গিরকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলেছি। এখান থেকেই ডানদিকে স্কোরা গ্রামের পথ চলে গেল।

খানিকটা এগিয়ে লে শহরের সাধারণ গ্রন্থাগার। সময় পেলে আসব একবার। গ্রন্থাগার ছাড়িয়ে পথটা একবার বাঁয়ে ও তারপরে ডাইনে বাঁক ফিরে আবার সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হল।

এবারে বাড়ি-ঘর কমে এসেছে। মানে জনপদ ফুরিয়ে এলো বলে। পথের দু পাশেই প্রশস্ত উপত্যকা। বাঁদিকে উপত্যকার শেষে সিন্ধু—মহাসিন্ধু।

দূরে বাড়ি-ঘর একাধিক চোর্তেন দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি পোলো খেলার মাঠ, যক্ষ্মা হাসপাতাল ও সরকারী হস্তশিল্প কেন্দ্র। বাস-স্টেশন ওদিকেই। আমরা সকালে গিয়েছিলাম।

ফোর্ট রোডের মোড়ে এলাম। এখান থেকে একটি পথ বাঁদিকে প্রসারিত হয়েছে। এই পথে এগিয়ে গেলে টিবেট হোটেল, লে মোটেল এবং বেতারকেন্দ্রে যাওয়া যাবে। বেতারকেন্দ্র থেকে পথটি মণি-দেওয়ালের পাশ দিয়ে সেই বাসস্টেশনে চলে গেছে।

ফোর্ট রোডের মোড় ছাড়িয়ে পেট্রোল স্টেশনকে বাঁদিকে রেখে আবার দক্ষিণে এগিয়ে চলেছি।

বাঁদিকে হেমিসের পথ চলে গেল। পথটাকে ভাল করে দেখে নিই একবার। আগামীকাল আমরা হেমিস যাবো।

এখন বিমানবন্দরের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। গতকাল বিকেলে এই পথ দিয়েই ফিয়াং থেকে লে এসেছি আর আজ বিকেলে লে থেকে ফিয়াং চলেছি।

একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। কি সর্বনাশ! টায়ার ফাটল নাকি? কাদের গাড়ির? আমাদের কি?

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছে। ড্রাইভারের সঙ্গে আমরাও নেমে পড়ি—আমি বরুণ স্বপন করুণ মালা ও মীরাদি।

যা ভেবেছি! আমাদের গাড়িরই পেছনের একটা টায়ার ফেটেছে। বিভাসদের গাড়ি আগে চলে গেছে। ওরা আমাদের এই দুর্গতির কথা জানতেই পারবে না।

এখন উপায়?

ড্রাইভার ভরসা দেয়—ঘাবড়াবেন না স্যার! বাড়তি চাকা আছে। পনেরো মিনিটে লাগিয়ে নেব।

যাক্ বাঁচা গেল। তাহলে তেমন একটা বিপদে পড়ি নি। চাকা পাল্টাতে খানিকটা সময় লাগবে এই যা।

পথের পাশে এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের উপত্যকা ও নিচে সিন্ধু-নদকে দেখি। সিন্ধু এখানে সুপ্রশস্ত নদীখাতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। বহুধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে—নীল আলপনার মতো মনে হচ্ছে। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি, শুধু দেখি আর ভাবি—আমি ধন্য, আমি সিন্ধুতীরে দাঁড়িয়ে সিন্ধুর সৌন্দর্য দর্শন করছি।

গাড়ির হর্ন কানে আসে। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। হ্যাঁ, গাড়ি সারানো হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখি—মাত্র মিনিট বিশেক লেগেছে। ড্রাইভারটি বেশ চটপটে বলতে হবে। না হয়েই বা উপায় কি? তাকে যে প্রায়ই এই চাকা পাল্টাবার শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করতে হয়।

হাত মুছে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। গাড়ি এগিয়ে চলে।

বাঁদিকে স্পিতুক গুম্ফার পথ চলে গেল। ফেরার পথে আমরা ওপথে যাবো, এখন এগিয়ে চলি।

উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। চড়াই বেয়ে অনেকটা উঠে এলাম ওপরে। তার পরে আবার সমতল।

ডানদিকে পাহাড়ের ওপরে ফিয়াং গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। গতকাল বিকেলে ঐ গুম্ফার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আজকের কথা ভেবেছি। ভেবেছি আজ বিকেলে আমি ঐ গুম্ফা দর্শন করব। সেই সুসময় সমাগত প্রায়।

গুম্ফা দর্শন লাদাখ ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ। আজ সকালে আমরা শঙ্কর গুম্ফা দর্শন করেছি। কিন্তু লাদাখী গুম্ফা বলতে যা বোঝায়, শঙ্কর গুম্ফা ঠিক তা নয়। লাদাখে গুম্ফা হচ্ছে তিব্বতী ঢঙে তৈরি প্রাচীন দেবালয় এবং জনপদ। সেগুলো সবই পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। এটি হবে আমাদের প্রথম লাদাখী গুম্ফা দর্শন।

গতকাল যেখানে বাস দাঁড় করিয়ে আমার বিদেশী সহযাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হয়েছে, সেখানে পৌঁছবার আগেই বড় রাস্তা থেকে আমাদের গাড়ি ডানদিকে সামান্য চড়াইপথে উঠে এলো। আমরা পাহাড়টার পেছনদিকে অগ্রসর হচ্ছি। একটু বাদে চড়াই বাড়ল। গাড়ি পাহাড়ে উঠছে।

পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় বড় কয়েকটি বাড়ি। সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত বাড়িটি সবচেয়ে বড়—বোধ করি পাঁচতলা। মানা বলে, "ওটাই ফিয়াং গুম্ফা।"

নিচে বড় রাস্তাটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সেখানে পথের পাশে প্রায় সমতল প্রান্তরে অনেক ছোট ছোট বাড়ি—ফিয়াং গ্রাম। শুনেছি লিকির গুম্ফার সঙ্গে ফিয়াঙের প্রচুর মিল। সেখানেও গুম্ফার পাদদেশে এমনি একটি ছবির মতো সুন্দর গ্রাম আছে।

শুধু তাই নয়, দুটি গুম্ফার অবস্থানেও নাকি প্রচুর মিল। এই দুটি গুম্ফা লাদাখের অন্যান্য বড় গুম্ফাগুলির মতো ঠিক পাহাড়ের শিখরদেশে নির্মিত নয়, পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। অথচ দুটি গুম্ফাই উপত্যকা থেকে অনেকটা উঁচুতে খুবই শক্তিশালী ভিতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

এবারে গাড়ি গুম্ফার সামনের দিকে এসেছে। চড়াই বেয়ে আমরা গুম্ফার দিকে এগিয়ে চলেছি।

একেবারে গুম্ফার পাদদেশে এসে গাড়ি থামল। বিভাসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। স্বভাবতই ওরা এতক্ষণ একটু উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে। আমরা এসে পড়ায় নিশ্চিন্ত হয়। সব শুনে বিভাস বলে, "চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।"

পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আঙ্গিনায় আসি। গুম্ফায় প্রবেশ করি।

লামায়ুরু লাদাখের প্রাচীনতম গুম্ফা, তারপরে আল্‌চি গুম্ফা। দুর্ভাগ্য সেই দুটি পুরোনো গুম্ফার একটিও আমরা এযাত্রায় দর্শন করতে পারলাম না। এটিও পুরোনো গুম্ফা, তবে পরবর্তী যুগে নির্মিত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে লাদাখে অনেকগুলি গুম্ফা নির্মিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখনও দর্শনীয় হল—'শে', বাসগো, স্পিতুক, তিক্‌সে, রিজং ও ফিয়াং গুম্ফা। বাসগো এবং রিজং আমরা দেখতে পারলাম না কিন্তু বাকি পাঁচটি গুম্ফা দর্শনের সৌভাগ্য হবে বলে আশা করছি। আর সে সৌভাগ্য শুরু হল এই ফিয়াং গুম্ফা থেকে।

কাঠ পাথর আর মাটির বাড়ি। জানলা দরজা খুবই কম, কারণ শীতের দেশ। ফলে আলো-হাওয়ার অভাবে ঘরগুলো যেমন স্যাঁতসেঁতে তেমনি একটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন মূল মন্দিরে উঠে আসি। প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর আগে নির্মিত হলেও গত শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর সত্তর দশকে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ফলে দর্শনীয় অংশগুলি বেশ ঝকঝকে।

আমরা দর্শন করি ভৈরোকন্যা ও শাক্যমুনি এবং বিভিন্ন লামাদের মূর্তি। রয়েছে মৈত্রেয় ও চণ্ডাশোকের মূর্তি আর দেওয়ালে বজ্রধর ও পঞ্চবুদ্ধের রঙীন চিত্র। শুনেছি এই চিত্রগুলির সঙ্গে বাসগো গুম্ফার দেওয়ালচিত্রের বিশেষ মিল আছে। কিন্তু এগুলো যেমন পরবর্তীকালে চিত্রিত, তেমনি মাঝে মাঝে সংস্কার সাধন হয়েছে। ফলে বাসগোর মতো অনুজ্জ্বল এবং ক্ষীয়মান নয়।

নূতন মন্দিরে এলাম। লাদাখীরা এই মন্দিরকে বলে দু-খাং (Du-Khang)। এটি শুধু মন্দির নয়, সেই সঙ্গে নাটমন্দির এবং গ্রন্থাগারও বটে। বহু পুঁথি রয়েছে এখানে। আর রয়েছে ভারী সুন্দর কয়েকটি ব্রোঞ্জমূর্তি।

প্রথমেই এই গুম্ফার প্রতিষ্ঠাতা লামাকে দর্শন করি। নাম 'কুন-গা গ্রাগ্‌স-পা' (Kun-dga Grags-pa)। বেশ বড় মূর্তি। তিনি পদ্মাসনা। তাঁর এক হাতে ভিক্ষাপাত্র, অপর হাতে অভয়মুদ্রা—জগতের যাবতীয় পাপী ও তাপীকে অভয় দান করছেন। তাঁর গায়ে উত্তরীয়, মাথায় বিরাট টুপি। শান্ত সমাহিত সুন্দর মূর্তি।

তাঁকে প্রণাম করি। তারপরে দর্শন করি বুদ্ধদেবের একত্রিংশত্তম অবতারের মূর্তিটিকে। লাদাখীরা বলেন—দাম-চোস গায়ুর-মেদ (Dam-chos Gyur-Med)।

তবে এই মন্দিরে এসে যা দেখে দু চোখ জুড়িয়ে গেল, তা হল কয়েকটি কাশ্মীরী ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি। দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট দু ধরণেরই মূর্তি রয়েছে। যেমন মুখশ্রী ও গড়ন, তেমনি কারুকার্য। আর এখানে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি ভারী সুন্দর কতগুলি পূজার উপকরণ।

কিন্তু উপকরণ নয়, আমরা বার বার বুদ্ধমূর্তিগুলোকে দেখি। সত্যি বলতে কি, দেখে আর আশ মিটছে না। মূর্তিগুলো দেখে মনে হচ্ছে সদ্য নির্মিত। অথচ জানি এগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর পরে কিছুতেই নির্মিত হতে পারে না। শুনেছি বাসগো এবং হেমিস গুম্ফা ছাড়া এমন সুন্দর ও ঝক্‌ঝকে মূর্তি লাদাখে আর কোথাও নেই।

মন্দিরটি ভারী সুন্দর করে সাজানো। কোথাও কোনো অযত্নের আভাস পাচ্ছি না। তবু ইদানীং অনেকেই এই গুম্ফার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ বর্তমান প্রধান লামা প্রাচীন সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে কয়েক বছর হল বিয়ে করেছেন। শীতকালসহ বছরের অধিকাংশ সময় এখন তিনি শ্রীনগর এবং দিল্লীতে বসবাস করেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি এখন ধর্মচর্চার চেয়ে রাজনীতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন।

তাঁকে দোষ দেবার কিছু নেই। তিনি যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন মাত্র। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতে এখন রাজনীতির প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা সর্বোত্তম। সুতরাং সাহিত্যিক থেকে সাধু পর্যন্ত সবাই এখন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করতে চান। কিন্তু আমরা যারা মঠ ও মন্দিরকে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে বিবেচনা করি, এ সংবাদে তারা বিচলিত বোধ না করে পারি না।

যাক্ গে সে কথা, প্রধান লামার কথা না ভেবে তাঁর গুম্ফাটিকে দেখা যাক। ব্রোঞ্জমূর্তির মতো এখানকার দেওয়াল-চিত্রগুলিও অবশ্য দর্শনীয়। বজ্রধর তিল্লোপা নরোপা ও মারপা প্রভৃতির চিত্রগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

জনৈক লামা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব দেখাচ্ছেন। এবারে আমরা তাঁর সঙ্গে গুম্ফার পেছনদিকে আসি। কথায় কথায় তিনি আমাদের বলেন—পঞ্চাশজন লামা ও সাতজন শিক্ষার্থী লামা এখন এই গুম্ফায় স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এটি লাদাখী বৌদ্ধদের লালটুপি সম্প্রদায়ের গুম্ফা। এখানে পাঁচটি মন্দির আছে। আমরা তাঁর প্রধান মন্দির দুটি দর্শন করেছি। এবারে তৃতীয়টি দেখতে চলেছি।

লামাজীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। গুম্ফার পেছনদিকে ছোট মন্দির, ভেতরে কালভৈরবের মূর্তি। আমরা দর্শন করি।

দর্শন-শেষে একটি ছোট প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াই। এখানে একটি পতাকাদণ্ড রয়েছে আর এখান থেকে চারিদিক বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শ্রীনগর-লে রোড, ছবির মতো সুন্দর। শুধু পথ নয়, চারিপাশের সবকিছু। আমাদের পেছনে পাহাড়, পাহাড়ের পাদদেশে অপরূপ সরোবর আর তার তীরে কয়েকটি চোর্তেন।

আমাদের সামনে সিন্ধু উপত্যকা। তারই বুক চিরে পথ। ঐ পথে দাঁড়িয়ে গতকাল আমি এই গুম্ফাটি দেখেছি আব আজ গুম্ফা থেকে পথটিকে দেখছি। গত কাল যে মধুর মুহূর্তটির কথা ভেবেছি, আজ সেই সুসময় সমাগত। তবে শ্রীনগর থেকে আসা কোনো বাস চোখে পড়ছে না। পড়বে কেমন করে? বাস আসার যে সময় হয় নি এখনও।

লামাজীর কথায় আমার ভাবনা হারিয়ে যায়। গুম্ফার পেছনে একটি দোতলা বাড়ি দেখিয়ে লামাজী বলেন, "ওটাও একটা মন্দির। আমরা বলি সংস্কা। আরেকটা কথা....."

লামাজী থেমে যান সহসা। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার বলেন, "পুজোর সময় ছাড়া এখানে সব মন্দিরের দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে। কারণ বুঝতেই পারছেন, প্রতি মন্দিরে কিছু না কিছু মূল্যবান বস্তু আছে। তবে দর্শনার্থী এলে আমাদের মতো কাউকে সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা সব ঘুবিয়ে দেখাই।"

তার মানে পাহারাদার ছাড়া কাউকে গুম্ফা দর্শন করতে দেওয়া হয় না। এবং সেই সঙ্গে দর্শনার্থীকে দশ টাকা করে দর্শনী দিতে হয়। আমরাও দিয়েছি।

তবে দর্শন ক'রে যে আনন্দ লাভ করলাম, তার তুলনায় দশ টাকা কিছুই নয়। যেমন অপরূপ অবস্থান, তেমনি রমণীয় চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুতরাং আরও কতক্ষণ আমরা এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম বলতে পারি না। খেয়াল হয় শ্রীমান মানার তাগিদে। খুদে ম্যানেজাব মনে করিয়ে দেয়—এরপরে আমাদেব স্পিতুক যেতে হবে এবং সন্ধ্যে হবার আগে সেখানে দর্শনের পাট চুকিয়ে ফেলা দরকার।

অতএব লামাজীর সঙ্গে নেমে চলি নিচে। গুম্ফার দেশ লাদাখে এসে মধ্যযুগে একটি বিখ্যাত গুম্ফা দর্শন করা গেল।

কথায় কথায় লামাজীকে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা হেমিস গুম্ফার মতো এখানে কোনো উৎসব হয় না, নাচের আসর বসে না?"

"হয় বৈকি!" লামাজী বলেন, "লাদাখের সমস্ত গুম্ফায় বছরে অন্তত একবার করে উৎসব হয়, মুখোশ-নৃত্যের আসর বসে। তবে হেমিস ছাড়া অন্য প্রায় সব গুম্ফাতেই শীতকালে উৎসব হয়। সুতরাং পর্যটকরা কেউ বড় একটা সে উৎসব দেখতে পান না, আর আপনারাও তার কথা জানতে পারেন না।"

"আপনাদেব এই গুম্ফায কখন বাৎসরিক উৎসব হয়?" লামাজী থামতেই বরুণ প্রশ্ন করে।

"মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। আর লে গুম্ফার উৎসব হয় ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে।'

"ওরে বাবা, তখন তো ভীষণ শীত আপনাদের দেশে।" মীরাদি আঁতকে ওঠেন।

"হ্যাঁ।" লামাজী উত্তর দেন, "ধরুন মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।"

"ওরে বাবা, অত ঠাণ্ডায় উৎসব!" করুণ প্রায় চীৎকার করে ওঠে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" লামাজী সবিনয়ে বলেন, "ঠাণ্ডায় আমাদের কোনো অসুবিধে

হয় না।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "দেখুন, শীতকালে পর্যটকেরা কেউ বড় একটা আমাদের দেশে আসেন না। কিন্তু শীতের কষ্টটুকু সইতে পারলে তখুনি আপনাদের এদেশে আসা উচিত। কারণ গ্রীষ্মকালে লাদাখীরা রুজিরোজগারে ব্যস্ত থাকে বলে ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবে মনোনিবেশ করতে পারে না। অথচ শীতকালে তাদের অফুরন্ত অবসর। তাই গুম্ফার নাচ থেকে বিয়ে পর্যন্ত আমাদের সব উৎসবই হয় শীতকালে। এমন কি আমাদের নববর্ষ উৎসবও শীতের সময়।"

"কখন?" স্বপন জিজ্ঞেস করে।

তিব্বতী পঞ্জিকার একাদশ মাসের প্রথম দিনটি হল আমাদের নববর্ষ। সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের ১৪/১৫ তারিখে এই দিনটি পড়ে থাকে।

আমরা নিচে নেমে এসেছি। এখন লামাজীর বিদায় নেবার কথা। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। চলতে চলতে বলে চলেন, "আমাদের সমাজে সাধারণতঃ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হয়। গুম্ফার উৎসব ছাড়া বাড়িতে পূজাপাট প্রভৃতিও আমরা এই সময়ে করে থাকি। কাজেই লাদাখের সামাজিক জীবনকে জানতে হলে পর্যটকদের শীতকালে লাদাখে আসতেই হবে।"

"আসব কেমন করে, জোজি লা বন্ধ থাকবে যে।" করুণ জিজ্ঞেস করে।

লামাজী উত্তর দেন, "বিমানে আসবেন। শ্রীনগর আসারও দরকার নেই, দিল্লী কিম্বা চণ্ডীগড় থেকে সোজা লে চলে আসবেন।"

"কিন্তু তখন তো লাদাখেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত অসম্ভব।" বরুণ মন্তব্য করে।

লামাজী একটু হাসেন। বলেন, "অসম্ভব নয়, তবে কিছুটা কষ্টকর। তাহলেও আপনারা অনায়াসে জীপে করে তখনও দৈনিক শ'খানেক কিলোমিটার করে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন।"

আমরা জীপের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। স্পিতুক যেতে হবে। হাতে সময় কম। সুতরাং হাতজোড় করে লামাজীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠি। গাড়ি নেমে চলে বড় রাস্তার দিকে।

বাঁদিকে ফিয়াং গ্রামের পথ নেমে গেছে, গ্রামের বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মানা বলে ওঠে, "এদেশের বাড়ি-ঘর বড় অদ্ভুত!"

"কি রকম?" প্রশ্ন করি।

মানা উত্তর দেয়, "দেখুন অধিকাংশ বাড়িগুলো তিনতলা। নিচের তলায় গৃহপালিত পশুনিবাস ও ভাঁড়ারঘর। দোতলায় শীতকালের রান্নাঘর ও বাসগৃহ। রান্নার আগুনের তাপে শোবার ঘরখানিও গরম হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, গৃহপালিত পশুদেরও শীত করে বলে ওরা আস্তাবলে আগুন জ্বালায়। সে আগুনেও শোবার ঘরখানি গরম হয়।"

"গ্রীষ্মকালেও কি লাদাখীরা দোতলায় রাত্রিবাস করেন?" মীরাদি জিজ্ঞেস করেন।

মানা উত্তর দেয়, "না। আপনারা তো দেখছেন, লাদাখে গ্রীষ্মকালে বেশ গরম।

তাই এসময় ওরা রান্নার সাজ-সরঞ্জাম ও বিছানাপত্র নিয়ে তেতলায় চলে গেছেন। দিনে ঘরে থাকেন ও রাতে ছাদে ঘুমান।"

"কিন্তু আমরা তো ডানলোপিলোর বিছানায় স্লীপিং-ব্যাগে ঘুমাচ্ছি!" করুণ মন্তব্য করে।

মানা মৃদু হাসে। বলে, "লাদাখীদের কিছুই লাগে না। খোলা ছাদে মাদুর কিম্বা প্ল্যাস্টিক শীট বিছিয়ে শয্যা নেন। নীল আকাশের নিচে শুয়ে তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়েন।" একবার থামে মানা। তারপরে আবার বলে, "সত্যি বলতে কি, লাদাখীরা শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই সমান সইতে পারেন। বরফ অথবা ফুটন্ত জল দুটোই ওঁদের কাছে সমান সহনীয়।"

"শুনেছি লাদাখীদের বাড়িতে বাসনপত্রের বড়ই বাহার!" মীরাদি প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ।" মানা মাথা নাড়ে। বলে, "অবস্থাপন্ন লাদাখীদের। তাঁরা এইসব বাসনপত্র পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করে চলেছেন।"

কথায় কথায় গাড়ি কখন বড় রাস্তায় এসেছে, কখন আমরা ফিয়াং গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি আর কখন আমাদের গাড়ি সেই মালভূমি-সদৃশ উঁচু সমতল থেকে নিচের উপত্যকায় নেমে এসেছে, কিছুই টের পাই নি। খেয়াল হয় বিভাসের কথায়, "ঐ যে ডানদিকে স্পিতুক দেখা যাচ্ছে!"

তাকিয়ে দেখি সত্যই তাই—সিন্ধুতীরে পাহাড়ের ওপর স্পিতুক গুম্ফা দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমাদের কাছে ডাকছে।

গাড়ি ডানদিকে মোড় নেয়, অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথে এগিয়ে চলে। বাঁদিকে খানিকটা দূরে সিন্ধু আর ডানদিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে গুম্ফা—স্পিতুক গুম্ফা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে গুম্ফার সিঁড়ির সামনে জীপ থামে। আমরা গাড়ি থেকে নামি। চারিদিকে তাকাই। এখান থেকে শ্রীনগর-লে রোডটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বিমানবন্দরটি যেন একখানি রঙীন ছবি, দূরের বাড়িগুলো যেন সারি সারি খেলাঘর আর সিন্ধু—অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্গীয় ধারা। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারাকে বহন করে নিয়ে আসছে—অনন্তকাল ধরে। আশৈশব শুনেছি তার কথা কিন্তু দেখা হল এই প্রৌঢ় বয়সে, লাদাখে এসে। আমি তাকে দেখি, বার বার দেখি।

"সাড়ে পাঁচটা বাজে। অনেক কিছু দেখার আছে এ গুম্ফায়। সন্ধ্যার আগেই দেখে নিতে হবে সব। তাড়াতাড়ি চলুন।" মানা তাগিদ দেয়।

তাগিদের বোধ করি কোনো প্রয়োজন ছিল না। এখানে এভাবে আমরা আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকতাম—বড় জোর দশ-পনেরো মিনিট! সন্ধ্যে হতে এখনও অনেক দেরি। আটটার আগে আঁধার আসে না লাদাখের মাটিতে।

তাহলেও মানার অবাধ্য হই না। গুম্ফা-তোরণের দিকে এগিয়ে চলি। তোরণের সামনে সাইনবোর্ড—

'CHOKCAN

CHOKANG
DOLMA LAGANG
GONKANG
CHEKHANG'

এগুলো মন্দিরের তিব্বতী নাম। অর্থাৎ এই পাঁচটি মন্দির আছে এই গুম্ফায়।

তোরণ পেরিয়ে প্রাঙ্গণে উঠে আসি। প্রাঙ্গণের পাশেই মন্দির। কিন্তু এদিক থেকে কোনো দরজা নেই। আমরা তাই প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি। প্রথমে সোজা, তারপরে ডাইনে মোড় ফিরে আবার বাঁয়ে। এক কথায়, মন্দির প্রদক্ষিণ করছি। তবে সম্পূর্ণ পরিক্রমা নয়, তিনদিক ঘুরে আমরা মন্দিরদ্বারে আসি। এটাই গুম্ফার সামনের দিক। এদিকেই মন্দিরের পতাকাদণ্ড ও মূল আঙ্গিনা। অঙ্গনকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে চলি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গর্ভমন্দিরে উঠে আসি।

ছোট মন্দির কিন্তু ভারী সুসজ্জিত। কাঠের মসৃণ মেঝে। দেওয়ালে রঙীন চিত্র। পাশে পুঁথির আলমারী—অসংখ্য পুঁথি। টাঙানো রয়েছে প্রচুর প্রার্থনাপতাকা।

সব দেখে আমরা মূল বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়াই। তিনি শাক্যমুনি। তাঁর বাঁয়ে পদ্মসম্ভব ও ডাইনে তারাদেবী।

এই তিনটি প্রধান বিগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট মূর্তি। রয়েছে রূপো দিয়ে তৈরি পূজার বাসনপত্র ও অন্যান্য উপকরণ আর মহামান্য লামাদের প্রতিকৃতি। আমরা দর্শন ও প্রণাম করি।

মূল মন্দিরের সঙ্গে পেছনদিকে আরেকটি মন্দির আছে। আমরা সেখানে আসি। খুবই ছোট মন্দির। এর নাম চেখাং। এখানে মহামান্য দালাই লামা ও কুশোক বাকুলার আসন আছে। শ্রীবাকুলা শঙ্কর গুম্ফায় বাস করেন বটে কিন্তু এই স্পিতুক হচ্ছে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। শঙ্করসহ লে শহর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সমস্ত গুম্ফাই স্পিতুক গুম্ফার অধীন।

পূজ্যপাদ দালাই লামা ও কুশোক বাকুলার আসন ছাড়া এখানে রয়েছে কয়েকটি ছোট ছোট মনোহর মূর্তি—আমরা দর্শন করি। তারপরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। এগিয়ে চলি তোরণের দিকে—-চোখাং মন্দিরে।

বাঁধানো উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। দু পাশে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। কিন্তু দর্শন করতে পারি না, দরজা বন্ধ। করুণ কারণ জিজ্ঞেস করে।

মানা উত্তর দেয়, "এগুলো সব প্রাচীন প্রার্থনাগৃহ। ঘরগুলো ছোট হলেও দেখবার মতো। যেমন চমৎকার দেওয়ালচিত্র, তেমনি রয়েছে রূপোর চোর্তেন, শত শত প্রাচীন পুঁথি আর অপরূপ মূর্তি।"

"কাদের মূর্তি?" বরুণ প্রশ্ন করে।

বিভাস জবাব দেয়, "বুদ্ধদেব ও অন্যান্য দেব-দেবীর।"

"কিন্তু এগুলো বন্ধ কেন?" এবারে স্বপন কথা বলে।

মানা উত্তর দেয়, "এই প্রার্থনাগৃহগুলি আগে পর্যটকদের দেখতে দেওয়া হত। কর্তৃপক্ষ একদিন আবিষ্কার করলেন—মাঝে মাঝেই মূর্তি চুরি যাচ্ছে। তাই তাঁরা এখন এগুলো বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।"

আমরা তোরণের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। এখানেই চোখাং মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরে। এটি নূতন মন্দির। বিভাস বলে, "স্থানীয় সমাজের কেউ দেহত্যাগ করলে এখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।"

আমরা ভেতরে আসি। ঘুরে ঘুরে সব কিছু দর্শন করি। সবচেয়ে ভাল লাগে কাচের আলমারীতে রাখা কয়েকটি ছোট মূর্তি—ভারী সুন্দর।

হাতে সময় কম। সুতরাং প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে হয়। আবার ফিরে চলি মূল মন্দিরের দিকে। একটু বাদে এসে পৌঁছই সেখানে। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করে পাশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। অনেক সিঁড়ি। উনিশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গুম্ফার প্রধান অঙ্গনে আসি। আঙ্গিনার মাঝখানে পতাকাদণ্ড। মানা জানায়—উৎসবের সময় এখানেই মুখোশ-নাচের আসর বসে।

মানা কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেয় না এখানে। একটু বাদে হঠাৎ বলে ওঠে, "চলুন, এবারে কালীবাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন।"

"কালীবাড়ি! এখানে?" মীরাদি রীতিমত বিস্মিত।

মানা বলে, "হ্যাঁ। লাদাখের প্রায় সব প্রাচীন গুম্ফায় কালীমাতার মন্দির আছে। কারণ বৌদ্ধদর্শন ও বাঙালীর তন্ত্রসাধনা মিলে হল লাদাখের ধর্ম। এই গুম্ফার কালীমন্দিরটি আবার বেশি বিখ্যাত। চলুন, দেখে আসা যাক।"

অতএব তার সঙ্গে নেমে আসি গুম্ফা থেকে। সে পাশের টিলার দিকে এগিয়ে চলে। ভাঙাচোরা পাথুরে পথ। তাড়াতাড়ি চলা অসম্ভব। তবু চেষ্টা করি।

করুণ কিন্তু বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, "ওদিকে কোথায় চললে?"

পাশের টিলার ওপরে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ইসারা করে বিভাস বলে, "ওটাই কালীমাতার মন্দির।"

আমরা এগিয়ে চলি। বিপজ্জনক না হলেও চড়াই পথ। সারা পথ জুড়ে বড় বড় পাথর। সুতরাং সাবধানে চলতে হচ্ছে।

একটু কষ্টকর হলেও দীর্ঘপথ নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে এলাম মন্দিরচত্বরে। কিন্তু বৃথাই বুঝিবা চড়াই ভাঙতে হল। মন্দির বন্ধ। মীরাদি মন্দিরচত্বরে বসে পড়েন। বসে পড়ার মতই ব্যাপার বটে। এত কষ্ট করে এসে দর্শন না করে ফিরে যেতে হবে?

"না।" বিভাস বলে, "সাধারণতঃ গুম্ফার মন্দিরগুলো বন্ধই থাকে। যাত্রী এলে খুলে দেওয়া হয়।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। কিন্তু কে খুলে দেবে? এখানে তো জনপ্রাণী নেই!

বিভাসের কথার জের টেনে নন্দা বলে, "এখানে একজন লামা থাকেন, যাত্রী এলে তিনিই মন্দির খুলে দেন।"

কিন্তু কোথায় তিনি?

দু-হাত দিয়ে মুখের দু-পাশে চোঙা বানিয়ে তরুণ চীৎকার করে ওঠে, "লামাজী, লা...মা...জী, লা...মা..."

কেউ সাড়া দেয় না। তরুণ আবার ডাকে। হরেন আর কালীও গলা মেলায়। কিন্তু কোথায় লামাজী? কেউ সাড়া দেয় না।

মানা বলে, "বোধ হয় কোনো কাজে গুম্ফায় গিয়েছেন। আপনারা এখানে একটু বসুন। আমি একদৌড়ে গুম্ফা থেকে ঘুরে আসছি।"

অতএব মীরাদির মতো আমাদেরও বসে পড়তে হয়। বসে বসে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি।

এ এক আশ্চর্য-সুন্দর অপরূপ দেশ। বাঁয়ে ধূসর পাহাড়, ডাইনে নীল মহাসিন্ধু আর সামনে সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা আঁকা-বাঁকা কালো পথটি ঘুমন্ত সরীসৃপের মতো শুয়ে আছে সারা উপত্যকা জুড়ে। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্পিতুক গ্রাম। গ্রামের উপকণ্ঠে এই গুম্ফা আর পাদদেশে প্রবাহিত মহাসিন্ধু। সবুজ উপত্যকা আর সিন্ধু দুই-ই রঙীন আলপনার মতো মনে হচ্ছে এখান থেকে। তবে রঙের পার্থক্য আছে। উপত্যকা সবুজ, কিন্তু বহুধারায় বিভক্ত সিন্ধু নীল—মহাকাশের নীলিমা বুঝিবা মহাসিন্ধুর বুকে এসে বাসা বেঁধেছে। সিন্ধুর পরপারে পাহাড়ের সারি—তাদের কারও মাথায় তুষারের প্রলেপ। ঐ গিরিশ্রেণী সিন্ধু ও জাঁস্‌কার উপত্যকা দুটিকে বিভক্ত করেছে। সবকিছু মিলে এক অভূতপূর্ব আশ্চর্যসুন্দর দৃশ্য। এই অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্যসুধা পান করে আমার হৃদয়-মন পূর্ণ হয়ে উঠল।

মানা ফিরে আসে। তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। আমরা তাঁকে নমস্কার করি। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

লামাজী মন্দিরের দরজা খুললেন। আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসি। প্রথমেই একফালি উঠান। তারপরে বারান্দা পেরিয়ে নাটমন্দির, সর্বত্র দড়ির গালিচা পাতা।

অবশেষে গর্ভমন্দিরে আসি। বেশ বড় মন্দির। কিন্তু তার অর্ধেকটা জুড়ে পর্দা টাঙানো। পর্দার সামনে পূজার উপকরণ। বুঝতে পারছি প্রতিমা রয়েছে পর্দার অন্তরালে।

লামাজী হাত দিয়ে পর্দা তুলে ধরেন। আমরা অপর পাশে আসি। এমনিতেই মন্দিরে আলোর অভাব। এদিকে আলো আরও কম—প্রায় অন্ধকার। তারই মধ্যে দর্শন করি। মূল বিগ্রহ মহাকালী ও মহাকাল। বেশ বড় মূর্তি। কিন্তু মুখ ঢাকা। মায়ের মুখ দেখতে পাই না। তাই চোখ বুজে তাঁর শ্রীমুখ স্মরণ করি, তাঁকে স্মরণ করি, বরণ করি আমার অন্তরের অন্তস্তলে, তাঁকে প্রণাম করি।

মায়ের পায়ের কাছে রাখা একটি পাত্র থেকে খানিকটা আশীর্বাদী সিঁদুর নিয়ে আমাদের ললাটে টিপ পরিয়ে দিলেন লামাজী। কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পুজো দিলেও পাণ্ডারা একই ভাবে সিঁদুরের টিপ পরান। কোথায় কালীঘাট আর কোথায় স্পিতুক! সেখানে হিন্দু ব্রাহ্মণ আর এখানে বৌদ্ধ লামা। অথচ একই আশীর্বাদী সিঁদুরের টিপ। ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ধর্ম কিন্তু একই আরাধ্যা—অভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি।

আমরা মহাকালীর মুখশ্রী দর্শন করতে পারি নি, কারণ তাঁর মুখখানি ঢাকা। তবু

কেন যেন মনে হচ্ছে, তিনি ভীষণ-দর্শনা। আর সেই ভয়ঙ্কর ভাবটি সারা মন্দিরে মূর্ত হয়ে আছে। একে অন্ধকার তার ওপরে জানলা-দরজা কম বলে কেমন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। একপাশে আবার কতগুলো ভয়ঙ্কর মুখোশ পড়ে আছে। সত্যি বলতে কি, গা ছমছম করছে। আর এ অবস্থা বোধ করি আমার একার নয়। কারণ কেউ কোনো কথা বলছে না। চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। তারই মধ্যে আমরা গুটিকয়েক প্রাণী লামাজীর সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো মন্দির দর্শন করে চলেছি।

সহসা লামাজী কথা বলে ওঠেন। অস্বস্তিকর নীরবতাটা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। সেই ভয়ঙ্কর মুখোশগুলো দেখিয়ে লামাজী বলেন, "উৎসবের সময় গুম্ফায় নাচের আসর বসে। তখন আমরা এই মুখোশগুলো পরে নিই। এ গুম্ফায় আরও অনেক মুখোশ আছে। আমরা এগুলোকে বলি 'জেলবাঘ'।"

কথা বলার সুযোগ পেয়ে বর্তে যাই। তাড়াতাড়ি লামাজীকে জিজ্ঞেস করি, "আপনাদের এ গুম্ফায় কখন উৎসব হয়?"

"জানুয়ারী মাসে।" লামাজী উত্তর দেন, "তখন এই পর্দা এবং প্রতিমার মুখের ঢাকা খুলে দেওয়া হয়। সবাই দেবীকে দর্শন করতে পারেন।"

কথা বলতে বলতে লামাজীর সঙ্গে নেমে আসি নিচে, বেরিয়ে আসি কালীবাড়ি থেকে, ফিরে চলি গুম্ফার দিকে। চলতে চলতে লামাজী বলে চলেন, "প্রায় ন'শ বছর আগে লাদাখের জনৈক রাজা নির্মাণ করেছেন এই মহাকালী মন্দির। এ মন্দিরের লাদাখী নাম পালদান লামো (Paldan Lamo)। ন'শ বছর আগে নির্মিত হলেও এটি এই গুম্ফার প্রচীনতম মন্দির নয়।"

"কোনটি সবচেয়ে পুরনো?" স্বপন জিজ্ঞেস করে।

লামাজী হাত-ইসারা করে বলেন, "ঐ গনখাং মন্দির, প্রায় এক হাজার বছর আগে তৈরি।"

উৎরাই বেয়ে নেমে আসি পথে, লামাজীর কাছ থেকে বিদায় নিই। গাড়িতে উঠি। জীপ চলতে শুরু করে।

এখনও রাতের আঁধার নেমে আসতে কিছু দেরি আছে। তবে গোধূলি ঘনিয়ে আসছে এই চাঁদের দেশে। দিনের ম্লান আলোয় নিচের জনপদ আর ওপরের দেবালয় দুই-ই স্বপ্নমধুর হয়ে উঠেছে। আমার চারিদিকে এক মোহময় পরিবেশ। আশ্চর্য-সুন্দর লাদাখের বিচিত্র-সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে আমরা মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছি।

॥ তেরো ॥

আজ আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হবে। আমি আজ হেমিস গুম্ফা দর্শন করত পারব।

হেমিসের কথা প্রথম পড়েছি স্বামী অভেদানন্দজীর বইতে। তারপরে শুনেছি প্রবোধদার কাছ থেকে। ঈশ্বরপুত্র যীশু যেখানে বসে পড়াশুনা করেছেন, আমি এখন সরস্বতীর সেই সাধনপীঠ দর্শন করতে চলেছি। লে থেকে হেমিস ৪৫ কিলোমিটার।

গতকাল সন্ধ্যায় স্পিতুক থেকে ফিরে আসার পথে ড্রাইভার বলেছিল—সকাল সকাল ব্রেক-ফাস্ট্ সেরে তৈরি হয়ে থাকবেন। ঠিক আটটায় বেরিয়ে পড়তে হবে, নইলে দেরি হয়ে যাবে।

সহযাত্রীদের সহযোগিতায় সেই সময়সীমা রক্ষা করতে পেরেছি। ঠিক আটটায় হিমালয়ান হোটেল থেকে গাড়ি ছেড়েছে। এখন আমরা সেই 'লে' রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে পথ চলেছি। এখনও যাওয়া হয় নি ওখানে, তবে একবার অবশ্যই যেতে হবে। কারণ পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত ঐ প্রাসাদ থেকেই এই শহর। সেকালে ওটি শুধু প্রাসাদ ছিল না, সেই সঙ্গে দুর্গ। আগেই বলেছি প্রাসাদটি লাসায় অবস্থিত পোতালা প্রাসাদের মতো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পোতালা দেখে এই প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। কারণ স্বেন হেডিন বলেছেন—ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে এই প্রাসাদ ও বর্তমান লে শহর নির্মাণ করেছেন লাদাখের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সেঙ্গে নামগিয়াল (১৫৬৯-১৫৯৪ খ্রীঃ)। আর পোতালা প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন পঞ্চম দালাই লামা, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে। সুতরাং পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এই প্রাসাদের অনুকরণেই পোতালা প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে।

প্রাসাদটি চিরকাল পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে। স্বেন হেডিন পর্যন্ত বলেছেন—'The old Palace of Leh stands on its rock like a gigantic monument of vanished greatness.' তিনি এই প্রাসাদ থেকে লে শহরের অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন, দেখেছেন সিন্ধুনদ ও তার পরপারের পর্বতশ্রেণীকে। হেডিন এই ধূসর সিন্ধু উপত্যকায় সবুজ উইলো আর পপ্‌লার গাছে ঘেরা সুপ্রশস্ত গম ও যবের ক্ষেত দেখে পুলকিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে লে শহরকে দেখেও তিনি মোহিত হয়েছেন। বলেছেন—'Immediately below us lies a chaos of quadrangular houses of stone or mud, with wooden balconies and varandahs, interrupted only by the main street and the lanes branching out of it.'

পঁচাত্তর বছর আগের সেই অলি-গলি এখন সব নেই। তার বদলে নির্মিত হয়েছে মসৃণ ও প্রশস্ত পথ, তৈরি হয়েছে বহু আধুনিক অট্টালিকা। কিন্তু রাজপ্রাসাদ আজও সেই একই রয়ে গিয়েছে। তাই কাল-পরশু একবার আমাকে যেতেই হবে ওখানে।

কিন্তু থাক, আর প্রাচীন প্রাসাদের কথা নয়, তার চেয়ে আধুনিক রাজপথের কথা হোক। গতকাল সিন্ধুতীরের পথ ধরে আমরা উত্তর-পশ্চিমে গিয়েছি, আর আজ চলেছি দক্ষিণ-পুবে। একটু আগে আমরা 'বেকন হাইওয়ে' ছাড়িয়ে এসেছি।

বেকন হাইওয়ে-কে বাঁয়ে রেখে আমাদের গাড়ি এসেছে এগিয়ে। আমরা শহরতলির পথে চলেছি। কিন্তু পথ কিম্বা শহরতলি নয়, বার বার আমার কেবল সেই সুমহান পর্যটকের কথাই মনে পড়ছে।

তিনি ডঃ স্বেন হেডিন। পঁচাত্তর বছর আগে একদিন তিনিও তাঁর দলবল নিয়ে লে থেকে এই পথে রওনা হয়েছিলেন। তারিখটা ছিল ১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট। যাত্রার আয়োজন করবার জন্য হেডিন সেবারে বারোদিন লে শহরে ছিলেন। তাঁর ভাষায়—Leh is the last place of any importance on the way to Tibet.'

আটান্নটি ঘোড়া, উত্রিশটি খচ্চর এবং পঁচিশজন চালক পরিচারক ও মালবাহক নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর যাত্রীদল।

সে আমলে বোধ করি লে শহরে সিংহদ্বার ছিল। কারণ হেডিন লিখেছেন—'We passed through the gate of the town into the lanes of the suburbs.'

তার মানে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তখন শহর আর শহরতলির মাঝখানে তোরণ ছিল। এখন দুয়ের মাঝে নেই কোনো বিভেদের প্রাচীর, শহর আর শহরতলি মিলে-মিশে একাকার। তাই আমাদের আর কোনো সিংহদ্বার অতিক্রম করতে হল না। তবে আমরাও হেডিনের মতই সিন্ধুতীরের পথ ধরে দক্ষিণ-পূবে চলেছি।

এই পথ চলতে গিয়ে আমার বার বার স্বেন হেডিনের কথা মনে পড়ছে, কারণ সেই সুমহান অভিযাত্রীর যাত্রাবিবরণ সর্বদা আমাকে পথ চলার প্রেরণা যোগায়। নইলে এ পথ তো অনন্তকালের যাত্রাপথ। এই পথে যীশুখ্রীষ্ট হেমিসে এসেছেন। এই পথ ধরে সুদূর অতীত থেকে সংখ্যাতীত বণিকের দল তাঁদের পণ্যসম্ভার নিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায়, যাওয়া-আসা করেছেন। আগেই বলেছি, এই পথ সেই মধ্য এশিয়ার ঐতিহাসিক বাণিজ্যপথ। আমরা সেই সুপ্রাচীন পথ ধরেই শ্রীনগর থেকে লে এসেছি, আজ লে থেকে হেমিস চলেছি।

সেকালের সেই বাণিজ্যপথ লে থেকে কার্গিল পৌঁছে দুদিকে প্রসারিত হত—একটি স্কার্দু ও গিলগিট হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় আরেকটি জোজিলা পেরিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায়। আমরা এই পথ দিয়েই লে এসেছি।

লে থেকে ইয়ারখন্দ যাবারও মূলপথ ছিল দুটি। একটি শীতকালের, অপরটি গ্রীষ্মকালের। শীতকালের [illegible] বলা হত জামিস্তান (Zamistan)। মীর ইজ্জেৎ উল্লাহ ১৮১২ সালে এই [illegible] করেন। তিনিই প্রথম পথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮২১-১৮২[illegible] উইলিয়াম মূরক্রফ্‌ট এই পথ পরিক্রমা করেন। কিন্তু তিনি কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম [illegible]রতে পারেন নি, নুব্রা উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছেন। এই পথে কয়েক[illegible]আছে যেগুলো গ্রীষ্মকালে অতিশয় খরস্রোতা কিন্তু শীতকালে জমে যায়। গ্রীষ্মকা[illegible] সব স্রোতস্বিনী অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কিন্তু শীতকালে জমে যাওয়া বরফের ওপর দিয়ে পথ চলা সম্ভব।

লে থেকে [illegible] হয়ে এই পথের প্রথম বড় বাধা ছিল কৈলাস পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত ১৭,[illegible] ফুট উঁচু দুর্গম দিগার গিরিবর্ত্ম (Digar La)। তারপরে তুষারাবৃত শিয়োক উপত্যকার আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ পেরিয়ে যাত্রীরা কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের পাদদেশে পৌঁছতেন। কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তাঁরা কুগিয়ার (Kugiar) ও কার্ঘালিক (Karghalik) পেরিয়ে অবশেষে ইয়ারখন্দে পৌঁছতেন। এই পথে লে থেকে ইয়ারখন্দের দূরত্ব ৫৩০ মাইল।

দ্বিতীয় পথটির নাম তাবিস্তান (Tabistan) অথবা গ্রীষ্মকালীন পথ। এই পথের প্রথম বিবরণ দান করেন পারস্যদেশীয় পর্যটক আহমদ শাহ নকশাবন্দী। তিনি ১৮৪৬ সালে এই পথ অতিক্রম করেছিলেন। এই পথ ধরেই বেকন [illegible] তৈরি করা হয়েছে। তবে সেকালে তো শিয়োক নদীর ওপরে কোনো পুল [illegible] না। তাই যাত্রীরা

শিয়োকের তীরে সাত্তি গ্রামে যেতেন। সেখান থেকে নৌকোয় নদী পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকায় উপস্থিত হতেন। তারপরে ১৭,৮২০ ফুট উঁচু দুর্গম গিরিবর্ত্ম সাসের লা অতিক্রম করে কারাকোরাম গিরিবর্ত্মে পৌঁছতেন। সাসের লা অতিক্রম করার সময় তাঁদের হিমবাহের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হত।

কারাকোরামের পরে যাত্রীরা সুগেত গিরিবর্ত্ম (১৮,২৩৭) দিয়ে আকতাখ পর্বতশ্রেণী পার হতেন। তারপরে সুগেত নদীর তীরে তীরে পথ চলে শাহিদুল্লাহ হয়ে ইয়ারখন্দে পৌঁছতেন। এই পথে লে থেকে ইয়ারখন্দের দূরত্ব ৪৮০ মাইল।

মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ বলতে প্রধানতঃ এই দুটি পথকেই বোঝায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আকসাই চিনের ভেতর দিয়ে লে থেকে ইয়ারখন্দের আরেকটি পথ প্রচলিত হয়েছিল। এই পথের চ্যাং চেন্‌মো (Chang Chenmo) উপত্যকা এবং চ্যাং লা (Chang La) গিরিবর্ত্ম (১৭,৬৭৯) অতিক্রম করে লিংজি তাঙের (Lingzi Tang) উঁচু সমতলে উপস্থিত হতেন। তারপরে কারাকাশ নদীর উপত্যকা পেরিয়ে শাহিদুল্লাহে পৌঁছে তাবিস্তানি পথে উপনীত হতেন। এই পথে লে থেকে ইয়ারখন্দের দূরত্ব ৫০৭ মাইল।

এবারে আবার প্রধান পথ দুটির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। শীত ও গ্রীষ্মের সেই দুটি পথই ছিল কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে। কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ১৮,২৯০ ফুট উঁচু এই গিরিবর্ত্মটির ভৌগোলিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ এই গিরিবর্ত্ম চীন তিব্বত ও ভারত (লাদাখ), এই তিনটি দেশের মিলনবিন্দু। গিরিবর্ত্মটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এত উঁচু এবং এমন একটি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত হলেও শীতকালে সেখানে কোনো হিমবাহ সৃষ্ট হয় না এবং গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ তুষারমুক্ত থাকে। দুদিকেই আরোহণ মৃদু এবং ক্রমান্বয়ী (gentle)। ইংরেজ অভিযাত্রী ডঃ টমসন্ ১৮৪৭ সালে কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তাঁর কাছ থেকে য়ুরোপের মানুষ প্রথম এই গিরিবর্ত্মের কথা জানতে পারেন। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ সম্পর্কে য়ুরোপের কোনো সম্যক ধারণা ছিল না।

লাদাখের চারিদিকে দুর্ভেদ্য পর্বতপ্রাচীর। কিন্তু মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ লাদাখের ভেতর দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় লাদাখ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছে।

সেকালের সেই বাণিজ্যপথ একালের লাদাখের প্রতিরক্ষায় প্রভূত সাহায্য করেছে। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় ভারতীয় জওয়ানরা এই পথ ধরেই লে থেকে চুসুলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চুসুল-যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা আগেই বলেছি। আবার চীনের কথায় একটু বাদে আসছি। তার আগে এই পথের প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের কথা একটু ভেবে নেওয়া যাক।

সেবারে পাকিস্তানী হানাদাররা বাসগো পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। সুতরাং ভারতীয় সেনাবাহিনী হাঁটাপথে শ্রীনগর থেকে লে আসতে পারেন নি। তখন লাদাখে বিমানবন্দর বলতে লে শহরের উপকণ্ঠে একফালি বিমান-অবতরণক্ষেত্র (Air-strip)। ভারতীয়

বিমানবাহিনীর তখন সবে শৈশব, তার ওপরে অগণিত পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত লাদাখের বিমানপথ সম্পর্কে বৈমানিকদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবু তাঁরা অসাধ্যসাধন করলেন। বিমানপথে জওয়ানদের পৌঁছে দিতে থাকলেন লে শহরে। আর বীর জওয়ানরা হালকা অস্ত্র হাতে নিয়েই ভারী অস্ত্রসহ সমৃদ্ধ পাকিস্তানী হানাদারদের দিকে এগিয়ে গেলেন এই পথ ধরে। তাঁরাও অসাধ্য সাধন করলেন। পাকিস্তানীদের হটিয়ে দিলেন লাদাখ থেকে। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথ পাক-কবলমুক্ত হল।

এবারে আবার চীনের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ। আমরা শুধু জানি, চীন ১৯৬২ সালে প্রথম ভারত আক্রমণ করে এবং আকসাই চিন আত্মসাৎ করে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাম্যবাদী ও আদর্শ সরকার তার অনেক আগের থেকেই ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সেকথা বলার আগে একটু তিব্বতের কথা ভেবে নিতে হবে।

চীনের আদর্শপরায়ণ সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ যতই চিৎকার করুন, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে তিব্বত কোন দিন চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক দিক থেকে একদেশ বা সাম্রাজ্য বলতে এখন যা বোঝায়, চীন কিম্বা ভারতবর্ষ সেকালে তা ছিল না। ভারতবর্ষ ও চীনের হিমালয় ও কারাকোরাম সীমান্তে সেকালে তিব্বতসহ বেশ কিছু ছোট-বড় রাজ্য ছিল। সেই সব রাজ্যের রাজারা কখনও একে অপরের অধীনতা স্বীকার করেছেন, কখনও বা কুষাণ কিম্বা মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা ভারতবর্ষ কিম্বা চীন দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তিব্বত সম্পর্কেও এই একই কথা। বরং ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির বিচারে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর ছিল। শুধু তাই নয়, বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক দিক থেকেও তিব্বত ভারতবর্ষের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। কারণ তিব্বতের ডাক, অর্থ এবং পুলিশ দপ্তর ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এই প্রসঙ্গে আমি জনৈক নিরপেক্ষ লেখকের মন্তব্য উল্লেখ করছি। ভদ্রলোকের নাম ডেভিড এল. স্নেলগ্রোভ। তিনি তাঁর 'কালচারাল হেরিটেজ অব্ লাদাখ' বইতে লিখেছেন—'They (Chinese) base their claims to this country (Tibet) on the argument that since Tibet had acknowledged Chinese imperial overlordship in the past, especially during the Manchu period, it was by that fact alone part of China. This is a strange argument, which if universally applied, would deprive many present-day independent countries of their rightful independence.'

দুর্বল তিব্বতের ওপর লালচীনের এই অন্যায় সাম্রাজ্যবিস্তারে বাধা দেবার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারতের। কিন্তু ১৯৫০ সালে চীন যখন তিব্বত দখল করে, তখন 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'-য়ের জমানা চলেছে। অতএব আমরা সেই অন্যায় অনুপ্রবেশ অনুমোদন করেছি। ভেবেছি তিব্বত অধিকারের পরে চীনের সাম্রাজ্য-লিপ্সা শান্ত হবে। ফলে আমরা তখনও আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রয়োজন অনুভব করি নি। বলা বাহুল্য পররাজ্যলোলুপ চীন ভারতের এই উদাসীনতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে।

তিব্বতের ওপরে নিজেদের দখলদারী শক্ত করার জন্য চীন চুপি চুপি ইয়ারখন্দ থেকে পশ্চিম-তিব্বত পর্যন্ত একটি মোটরপথ নির্মাণ করে ফেলল। পথটি কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের পূর্বদিক অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব লাদাখের জনহীন ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে নির্মিত হল। ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণে এই পথটি চীনকে সবিশেষ সাহায্য করেছে। সুতরাং তিব্বত দখলের পরেই চীন ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা আরম্ভ করে দিয়েছিল। দালাই লামার ভারতে আগমন কোনোমতেই চীনা আক্রমণের কারণ নয়, কেবল একটা অছিলা মাত্র।

দুর্ভাগ্যের কথা লাদাখের ওপর দিয়ে চীনের এই পথ তৈরির কথা জানতে আমাদের প্রায় আট বছর সময় লেগেছে। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার চীনের কাছে প্রথম প্রতিবাদ পাঠান। কিন্তু সেই পর্যন্তই। তখনও আমরা সজাগ হই নি। হলে ১৯৬২ সালে আমাদের আকসাই চিন হারাতে হত না। এবং মার্কসীয়-চীন ধর্মরাষ্ট্র-পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি সড়ক সংযোগ স্থাপন করতে পারত না।

বাষট্টি সালে আমরা শুধু আকসাই চিন হারাই নি, সেই সঙ্গে হারিয়েছি হেমিস গুম্ফার মহামান্য প্রধান লামাকে। তিনি তখন তিব্বতে পড়াশুনা ও তপস্যা করছিলেন। সাম্যবাদীরা সেই ধর্মগুরুকে আর ফিরে আসতে দেয়নি। অতএব হেমিস গুম্ফায় গিয়ে আমাদের তাঁর আসনটি শূন্য দেখতে হবে।

"শঙ্কুদা, সামনে দেখুন চোগ্লামসার—তিব্বতী উদ্বাস্তু উপনিবেশ।"

মানার ডাকে আমার ভাবনা থেমে যায়। মনে পড়ে আমি লে থেকে জীপে করে হেমিস যাচ্ছি। বসে বসে এতক্ষণ মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যপথের কথা ভাবছিলাম। মানার ডাকে সেই ভাবনায় ছেদ পড়েছে।

তাড়াতাড়ি পথের পাশে তাকাই। মানা ঠিকই বলেছে—বেশ বড একটা উপনিবেশের পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে।

মানা যোগ করে, "এই উপনিবেশের নাম সোনাম লিঙ্ উদ্বাস্তু শিবির। ষাট দশকের গোড়ার দিক থেকেই চীনা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলে শত শত ছিন্নমূল তিব্বতী পরিবার প্রাণ বাঁচাতে এদেশে পালিয়ে আসতে থাকেন। তাঁদেরই হাজার দু'য়েক নারী পুরুষ ও শিশু এখানে বসবাস করছেন।"

"এঁদের ভরণপোষণ কিভাবে চলছে?" করুণ জিজ্ঞেস করে।

"এঁরা এখানে জমি তৈরি করে কিছু শাক-সবজীর চাষাবাদ করছেন, কয়েকটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েছেন আর কিছু আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন।"

বরুণ প্রশ্ন করে, "কারা আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন, ভারত সরকার?"

"হ্যাঁ।" মানা উত্তর দেয়, "কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান থেকেও সাহায্য আসে শুনেছি।"

"কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কি তৈরি করছেন?" স্বপন জিজ্ঞেস করে।

"প্রধানত তিব্বতী গালিচা।" মানা বলে, "তা ছাড়া পাথর পশম ও সূতার তৈরি জিনিসপত্র তো রয়েছেই।"

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে আমার। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "উদ্বাস্তু উপনিবেশটির

নাম বললে সোনাম লিঙ আর জায়গাটার নাম চোগলামসার, তাই না?"
মানা মাথা নাড়ে।
আমি আবার বলি, "এখানে তো তাহলে একটা লামাদের শিক্ষাকেন্দ্র আছে?"
"ঠিক বলেছেন, বেশ বড় শিক্ষাকেন্দ্র। শুধু লামাশিক্ষা নয়, সেই সঙ্গে তিব্বতী সাহিত্য ইতিহাস এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধদর্শন পড়ানো হয়। যাঁরা তিব্বতী ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে চান তাঁরা অনেকেই এখানে এসে পড়াশুনা করেন। বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এখানে অধ্যয়ন করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে একটি মূল্যবান বৌদ্ধ-গ্রন্থাগার রয়েছে।"
কিন্তু খুদে ম্যানেজার গ্রন্থাগার দর্শনের কোনো সুযোগ দেয় না আমাদের। গাড়ি এগিয়ে চলে, চোগলামসার পড়ে থাকে পেছনে।
সহসা মীরাদি প্রশ্ন করেন, "আমরা লে থেকে কতদূর এলাম?"
"৯ কিলোমিটার।"
"মোটে?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"
মীরাদি আর কিছু বলেন না। আমি আবার পথের পাশে তাকাই। ডান দিকে একটা পথ প্রসারিত হল। পথটা পুল পেরিয়ে সিন্ধুর ওপারে চলে গেছে। গাড়ি যেতে পারে।
মানার দিকে তাকাই। সে আমার নীরব প্রশ্ন বুঝতে পারে। বলে, "ঐ পুলের নামও সোনাম লিঙ ব্রিজ। ১৯৭৭ সালে তৈরি করা হয়েছে। বাস যেতে পাবে।"
"কোথায় যায়?" করুণ জানতে চায়।
মানা জানায়, "এপারের মতো, সিন্ধুর ওপার অর্থাৎ দক্ষিণতীর দিয়েও একটি পথ আছে—পালাম-হেমিস মোটর রোড।" একবার থামে মানা। তারপরে আবার বলে, "পালাম এখান থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার। একটি বৌদ্ধপ্রধান গ্রাম, তবে কযেক ঘর মুসলমান আছেন।"
"ওপারে একটা উঁচু বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওটা কি?" হঠাৎ বরুণ বলে ওঠে।
মানা উত্তর দেয়, "স্তোক রাজপ্রাসাদ।"
তাড়াতাড়ি ওপারে তাকাই। একটু বাদে স্বপন প্রশ্ন করে, "প্রাসাদটা এখান থেকে কতদূর হবে?"
মানা উত্তর দেয়, "সোজাসুজি সিন্ধুর ওপর দিয়ে দূরত্ব আর কত হবে, চার কিলোমিটার। তবে মোটরপথে চোগলামসার থেকে সাত ও পালাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত।"
"আমরা এখন কোন্ দিকে যাচ্ছি?" মীরাদি হঠাৎ জিজ্ঞেস কবেন।
উত্তর দিই, "আমরাও মোটামুটি দক্ষিণ-পুবে চলেছি।"
"আচ্ছা, জরোয়ার সিং-য়ের লাদাখ বিজয়ের পরে লাদাখের রাজপরিবার তো লে থেকে ঐ স্তোক প্রাসাদেই নির্বাসিত হয়েছিলেন?" বরুণ প্রশ্ন করে।
"হ্যাঁ। কিছু মাসোহারা দিয়ে তাঁদের ওখানে নজরবন্দী করে রাখা হয়।"
"এখনও মাসোহারা পান?"

"হয়তো পান। কিন্তু হেডিনের সময় অর্থাৎ ১৯০৬ সালেই শেষ রাজার তৃতীয় পুরুষ পরিবারের প্রধান ছিলেন। ইতিমধ্যে বোধ করি সপ্তম/অষ্টম পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং পরিবার বড় হয়ে গেছে। সেই মাসোহারায় সংসার চলে না। রাজপরিবার এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছেন।"

বরুণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "আচ্ছা, হেমিস থেকে ফেরার সময় তো আমরা ওপারের পথ দিয়ে ফিরে আসতে পারি। তাহলে স্তোক দেখে আসা যায়।"

"শুধু স্তোক কেন, স্তাগ্না গুম্ফাও দেখে আসতে পারি।" বলতে বলতে মানার দিকে তাকাই।

মানা মৃদু হাসে। বলে, "না, ওপথে ফেরা যাবে না।"

"কেন?"

"রাস্তা সারানো হচ্ছে। ড্রাইভারদের বলেছিলাম কথাটা, ওরা রাজী হয় নি।"

মানার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে করুণ বলে ওঠে, "শে এসে গেল বোধ হয়।"

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। পথের বাঁদিকে একটা পাহাড়, তারই ওপরে পুবদিক জুড়ে বহু বাড়ি-ঘর।

"হ্যাঁ। 'শে' প্রাসাদ ও গুম্ফা।" মানা করুণের অনুমান অনুমোদন করে।

তার মানে আমরা লে থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম। ঘড়ি দেখি—সকাল সাড়ে আটটা। অর্থাৎ এই পথটুকু আসতে ঠিক আধঘন্টা লেগেছে।

মানা বলে, "শে গুম্ফা দর্শনের সবচেয়ে ভাল সময় সকাল সাতটা থেকে ন'টা অথবা বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা। কারণ তখন এখানে লামাজীদের সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।"

"তাহলে তো আমরা আজ সকালের প্রার্থনায় অংশ নিতে পারব।"

"না।" মানা উত্তর দেয়, "হেমিস গুম্ফায় উৎসব শুরু হয়ে গেছে। লামাজীরা সবাই চলে গেছেন সেখানে। যদি তাঁদের দু-একজন এখানে থেকে থাকেন, তাহলে সহজে গুম্ফা দর্শন করা যাবে। নইলে কাউকে নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে পাশের গ্রামে যেতে হবে। সেখানে তাসি নামে একজন লামা থাকেন। তাঁকে নিয়ে এসে গুম্ফা দেখতে হবে।"

পাহাড়টার পাদদেশে এসে গাড়ি থামে। আমরা নেমে আসি পথে। বিভাসদের গাড়ি এসে যায়। ওরাও নেমে আসে পথে। তোতা আর মহুয়া ছুটে আসে আমাদের পাশে। দুজনে আমার দুখানি হাত ধরে সমস্বরে অভিযোগ করে, "জেঠু, তুমি আমাদের গাড়িতে আসো নি কেন?"

তাড়াতাড়ি সন্ধি করি। বলি, "বেশ, ফেরার পথে আমি তোমাদের গাড়িতে আসব। আমার বদলে হরেন এ গাড়িতে চলে আসবে।"

"খুব ভাল হবে।" মহুয়া সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে।

তোতা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে হাততালি দেয় আর বলতে থাকে, "কি মজা! কি মজা! জেঠু আমাদের গাড়িতে আসবে ....."

পথের বাঁদিকে পাহাড়ের ওপরে প্রাসাদ ও গুম্ফা আর নিচে পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। পথের পাশে বেশ কয়েকটি চোর্তেন।

পথের ডানদিকে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি। শুনেছি আগে এখানে একটি রমণীয় হ্রদ ছিল। এখন মজে গিয়ে এই অগভীর জলাভূমি। তাহলেও এমন ঘন সবুজ বনভূমি লাদাখে এসে খুব কমই দেখেছি।

বিভাস বলে, "চলুন এবারে ওপরে যাওয়া যাক।" সে চড়াইপথ বেয়ে হাঁটতে শুরু করে।

আমরা সারি বেঁধে তাকে অনুসরণ করি। আমরা 'শে' প্রাসাদে আরোহণ করছি। এটি লাদাখের রাজাদের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ ছিল। কিন্তু এখানে কি লে থেকে গরম কম ?

আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হচ্ছে না। সবে সকাল সাড়ে আটটা। এরই মধ্যে বেশ গরম লাগতে আরম্ভ করেছে। তবে ওপরের অবস্থাটা বলতে পারছি না। হয়তো হাওয়ার জন্য সেখানে গরম কিছু কম হতে পারে।

শুনেছি সাড়ে পাঁচশ' বছর আগে এই প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। তবে জনপদটি প্রাচীনতর। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। এবং সে দুর্গ লাদাখের নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে। ফলে 'শে' এবং 'লে' চিরকাল নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। 'শে' শব্দের অর্থ স্ফটিক।

খাড়া চড়াই পথ, তার ওপরে আবার মাঝে মাঝে সিঁড়ি। হাঁফ ধরে আসতে চায়। তাহলেও কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে উঠে আসি ওপরে।

নিচের সেই জলাভূমি আর সুনীল সিন্ধুকে এখান থেকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পথ আর তার পাশের ধূসর উপত্যকাকে আরও বেশি রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। উত্তরে কারাকোরাম, পুবে কৈলাস আর দক্ষিণে জাঁস্‌কার পর্বতশ্রেণীকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছি তিক্‌সে গুম্ফা—উত্তর-পুবে। আমরা এর পরে ওখানে যাবো।

কিন্তু তার আগে 'শে' গুম্ফা দেখতে হবে। হাতে সময় কম, ন'টা বাজে। অতএব বিভাসের পেছনে এগিয়ে চলি। গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়াই। ডান দিকে প্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আর বাঁদিকে একটি সোনালী চোর্তেন। মাঝখানে কাঠ আর মাটির তৈরি সুবিশাল গুম্ফা।

আমাদের ভাগ্য ভাল। দুজম লামা এখানে আছেন। বোধ করি পাহারা দেবার জন্য। লাদাখের প্রতিটি গুম্ফায় প্রচুর ধন-রত্ন এবং অমূল্য পৌরাণিক সম্পদ রয়েছে। সুতরাং একেবারে অরক্ষিত রাখা উচিত হবে না বিবেচনা করেই এঁরা দুজন রয়ে গেছেন এখানে। ভাগ্যিস আজকাল চোরের উপদ্রব হয়েছে! চোর আছে বলেই লামারা আছেন। অতএব চোরদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গুম্ফার একতলায় প্রবেশ করি। এটাই মন্দির। প্রথমে নাটমন্দির তারপরে গর্ভ-মন্দির। নাটমন্দিরের বাঁদিকে গ্রন্থাগার। গর্ভ-মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি।

দর্শন ও প্রণাম করে আমরা লামাজীর সঙ্গে মন্দিরের ডানদিকে আসি। সিঁড়ি বেয়ে

ওপরে উঠি। এখানেও মন্দির। একতলার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু বেশি সুসজ্জিত।

গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করার দুটি দরজা। ডানদিকের দরজার বাইরে পাশাপাশি তিনটি মূর্তি এবং দুটি বড় বড় বাঁশি রাখা রয়েছে। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি পদ্মসম্ভবের—সত্যি দেখবার মতো।

দরজা পেরিয়ে গর্ভ-মন্দিরের ভেতরে আসি। সামনে বুদ্ধমূর্তি—মূলবিগ্রহ। বিগ্রহের সামনে প্রদীপ জ্বলছে কিন্তু তাতে অন্ধকার দূর হয় নি। আধো-আলো আধো-আঁধারের মধ্যে দেখতে হবে সবকিছু। তাই দেখি।

বিগ্রহের বাঁদিকে একটা নীল ঘোড়ার পিঠে পূজনীয় পালদেন লামার মূর্তি। তাঁর বাঁদিকে কালীমাতা ও চারটি বুদ্ধিমূর্তি। তাঁদের পেছনে এবং মন্দিরের চারিদিকে এখানে-ওখানে কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে।

আলোর স্বল্পতার কথা আগেই বলেছি। তার ওপরে দেওয়ালে কালো রং। আর সেই কালো দেওয়ালে ঝুলানো রয়েছে কতগুলো সাদা খুলি—মানুষের মাথার খুলি। সব মিলে একটা মধ্যযুগীয় ভয়াবহ পরিবেশ। গা ছমছম করে।

মহুয়া আর তোতা দুজনেই আমাকে প্রায় আঁকড়ে ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। ওরা বোধ করি ভয় পেয়েছে। পাবারই কথা। কিন্তু কেন? এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত মন্দিরে কেন এই ভয়াবহ পরিবেশ?

আমরা দেবালয় দর্শনে আসি অনন্ত-সুন্দরের সান্নিধ্যলাভ করতে, স্বর্গের সীমাহীন সৌন্দর্যসুধা দিয়ে আমাদের হৃদয়-মনকে আনন্দিত করে তুলতে, আনন্দময় হয়ে উঠতে। আর এখানকার এই নিরানন্দ পরিবেশ আমার মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। গতকাল স্পিতুক গুম্ফায় গিয়েও এই একই অনুভূতি হয়েছে। এই ভয়াবহ পরিবেশে দেবতা বিরাজ করেন, একথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রবোধদার মতো বিদগ্ধ এবং অভিজ্ঞ পর্যটক পর্যন্ত এই পরিবেশে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন—'এই সংবাদটি নিয়েই আমাকে ফিরতে হবে যে, সমস্ত মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে গেছে চরম অপমান, উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে।'

কিন্তু আমি এসব ভাবছি কেন? আমি তো গবেষক নই। আমি যে একজন সাধারণ পর্যটক। আমি শুধু বেড়াতে এসেছি, কেবলই দেখতে এসেছি। লাদাখবাসীরা কেন আজও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মকে সস্নেহে লালন-পালন করে চলেছেন এবং এর পরিণাম কি, তা জানার জন্য তো আমি লাদাখ আসি নি। আমি শুধু জেনে গেলাম সেই সুপ্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি আজও বেঁচে আছে সিন্ধুতীরে, এই চাঁদের দেশে।

অতএব এগিয়ে আসি মূল বিগ্রহের কাছে—বুদ্ধমূর্তির সামনে। শে গুম্ফার এই মূর্তি শুনেছি লাদাখের বৃহত্তম সোনালী বুদ্ধমূর্তি। তামার পাত দিয়ে তৈরি, ওপরে সোনার জল দিয়ে রং করা। মূর্তিটি বারো মিটার উঁচু—দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মাথাভর্তি নীল রঙের চুল।

এটি কিন্তু মোটেই প্রাচীন মূর্তি নয়। মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা দেলদান নামগিয়াল (১৫৯৪-১৬৬০ খ্রীঃ) নির্মাণ করছিলেন। মূর্তির গায়ে মন্ত্র খোদিত। কয়েকটি মূল্যবান

পাথরের নৈবেদ্য তাঁর পায়ের কাছে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে মূর্তির দুটো চোখ—যেমন সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল। অথচ শুনেছি লাদাখের শিল্পীরা দেবতাদের চোখ আঁকার সময় পেছন ফিরে নেন। কারণ লাদাখীরা বিশ্বাস করেন, চোখের মণি আঁকা শেষ হওয়া মাত্র দেবতা দৃষ্টিলাভ করেন এবং তখন সে চোখের দিকে তাকানো মহাপাপ। তাই শিল্পীরা মূর্তির দিকে পেছন ফিরে কাঁধের ওপর হাত তুলে দেবতাদের চোখ আঁকেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে বুদ্ধের করুণাঘন আঁখি দুটির দিকে তাকাই আর তাঁকে প্রণাম করি।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। নন্দার তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয় মন্দির থেকে।

দ্বার বন্ধ করে লামাজীও সঙ্গী হন আমাদের। কথায় কথায় তিনি বলেন—জুলাই মাসে মেতুক্‌বা (Metukba) তথা বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই শে গুম্ফায়। তখন এখানে মুখোশ-নৃত্যের আসর বসে এবং একদিন জগতের যাবতীয় প্রাণীকুলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

নেমে আসি নিচে। মূল মন্দিরের পেছনে আরেকটি ছোট মন্দির নাকি রয়েছে। তখন দেখা হয় নি। তাই লামাজী আমাদের নিয়ে আসেন সেখানে।

দর্শন করি। এখানেও বেশ বড় বুদ্ধমূর্তি—ভূমি-মুদ্রায় উপবিষ্ট। বিগ্রহের সামনে পূজার উপকরণ আর ডানদিকে পদ্মসম্ভবের দুটি এবং বুদ্ধদেবের আরেকটি মূর্তি।

প্রণাম করি। তারপরে লামাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উৎরাই পথ বেয়ে নেমে আসি নিচে। গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি এগিয়ে চলে তিক্‌সে গুম্ফার দিকে।

।। চোদ্দ ।।

দূরত্ব মোটে ৫ কিলোমিটার। সুতরাং মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যে তিক্‌সে গুম্ফার পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। আমরা লে থেকে ২০ কিলোমিটার এসেছি। হেডিন লে থেকে তিব্বতের পথে রওনা হয়ে প্রথম রাত এখানে অতিবাহিত করেন। তাঁর ভাষায়—'We found ourselves in front of the monastery of Tikze on a commanding rock, with the village Tikze and its fields and gardens at the foot.'

একটা সুবিশাল প্রস্তরাকৃত প্রান্তর ছাড়িয়ে পথের বাঁদিকে পাহাড়। বেশ উঁচু এবং বড় পাহাড়। তারই নিচে গ্রাম আর ওপরে গুম্ফা।

পথের ডানদিকে বিস্তৃত সবুজ-সজল উপত্যকা, তারপরে সুনীল সিন্ধু। সিন্ধুর ওপারে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা।

বাসরাস্তা থেকে বাঁদিকে একটা পিচের পথ উঠে গেছে। উঠেছে ঐ পাহাড়ে—তিক্‌সে গুম্ফায়। দুটি পথের সংযোগস্থলে একখানি ইংরেজী সাইনবোর্ড। লেখা রয়েছে—'Link Road, 1·60 km.'

তার মানে আরও ১·৬০ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে গুম্ফায় পৌঁছতে হবে। আমাদের

গাড়ি সেই পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে।

শুনেছি এই পথটুকু পায়ে হেঁটে না উঠলে নাকি দর্শনের ফল লাভ হয় না। তাই ভক্তরা গাড়ি নিয়ে এলেও এপথে গাড়ি চড়েন না। বড়রাস্তায় গাড়ি রেখে পায়ে-চলা-পথে পাহাড়ে ওঠেন। সেই সংক্ষিপ্ত পথে তাঁদের এক কিলোমিটার চড়াই ভাঙতে হয়। আমরা ভক্তিহীন দর্শক, কোনো ফললাভের আশায় এখানে আসি নি। আমরা তাই গাড়িতে চড়ে পাহাড়ে উঠছি।

বাড়ি-ঘরের পাশে পাশে পথ। পাহাড়ের এই অংশটির প্রায় সবটা জুড়েই বাড়ি-ঘর—পাদদেশ থেকে শিখর পর্যন্ত। নিচের দিকে মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা, কিন্তু ওপরের দিকে একেবারে গায়ে-গা-লাগিযে বাড়ি আর বাড়ি। ওপরের বাড়িগুলো আকারেও বড়। সবচেয়ে বড় বাড়িটি শিখরের ওপরে এবং ওটাই গুম্ফা—তিক্‌সে গুম্ফা। অবস্থানের বিচারে লাদাখের সবচেয়ে সুন্দর গুম্ফা আর আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম। তার ওপরে সাধারণ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ইদানীং বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

শুনেছি তুগেন্দ (Tugend) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সুঙ্‌-খাপাস (Tsung-Khapas) এই গুম্ফার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এটি হলুদ-টুপি সম্প্রদায়ের (Yellow-cap) গুম্ফা। এখানে শতাধিক লামা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। জানি না তাঁদের ক'জনের সঙ্গে দেখা হবে। হেমিসে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে।

"সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসতে পারলে এখানকার প্রভাতী প্রার্থনায় যোগ দিতে পারতেন।" মানা হঠাৎ বলে ওঠে।

করুণ জিজ্ঞেস করে, "সারাদিনে কি একবারই প্রার্থনা হয় নাকি?

"না।" মানা উত্তর দেয়। বলে, "দুপুর এবং সন্ধ্যায়ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।"

গাড়ি থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি আমরা গুম্ফার সামনে পৌঁছে গেছি। এখানে গাড়ি রাখার জন্য পাহাড় কেটে একফালি জায়গা তৈরি করা হয়েছে। আর মোটরপথ থেকে একটা পাথর-বাঁধানো পায়ে-চলা চড়াই পথ উঠে গিয়েছে গুম্ফার তোরণে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি। যথারীতি তোতা আর মহুয়া এসে আমাকে পাকড়াও করে। বলে, "জেঠু, চলো।"

"হ্যাঁ, যাবো।" একবার থামি। তারপরে আবার বলি, "তার আগে এসো, চারিদিকটা একবার ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।"

"তাই ভাল।" আমার ক্ষুদে সঙ্গীরা সম্মত হয়। ওদের হাত ধরে পথের পাশে এসে দাঁড়াই।

চারিদিকে সুবিস্তৃত পাহাড়ী প্রান্ত, প্রায় সমতল। মাঝে একটা গাছপালাহীন বেশ উঁচু পাহাড়। আমরা তারই ওপরে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দূরে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, একদিকে নয় তিনদিকে—উত্তরে কারাকোরাম, দক্ষিণে জাঁস্‌কার আর পুবে কৈলাস। শিবালয় কৈলাস, কিন্তু সেখানে যাবার অধিকার নেই আমার।

পশ্চিমে স্পিতুক আর পুবে হেমিস গুম্ফা, সিন্ধু উপত্যকার এই অংশটাই লাদাখের

অন্তরলোক। আমি এরই আকর্ষণে গঙ্গাতীর থেকে সিন্ধুতীরে ছুটে এসেছি—কালীঘাট থেকে হেমিসে।

ভাই-বোন আমাকে আর দাঁড়াতে দেয় না। প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলে। সেই আঁকাবাঁকা চড়াই পায়ে-চলা-পথ পেরিয়ে আমরা উঠে আসি গুম্ফার তোরণে। সামনে সাইনবোর্ড—

'Get Your Entry Ticket From Here.
If any problem regarding entry into the Prayer and
Assembly Halls etc., please contact Ticket-seller.'

এখানে দশ টাকা করে দর্শনী দিতে হবে। বিভাস এগিয়ে যায় টিকেট-বিক্রেতার কাছে। আমরা অপেক্ষা করি। একটু বাদে বিভাস টিকেট নিয়ে ফিরে আসে।

তোরণ পেরিয়ে আসি। এটি কিন্তু মোটেই 'শে' গুম্ফার মতো জনশূন্য নয়। এখানে মানুষ দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা সকলেই কর্মরত। কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন, কেউ রং করছেন, কেউবা পুজো-পাটে ব্যস্ত রয়েছেন। শেষের দলে সবাই সর্বত্যাগী লামা।

এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গুম্ফা এর আগে আর দেখি নি। গুম্ফার দেওয়ালে তিব্বতী পঞ্জিকা (ক্যালেণ্ডার) খোদাই করা রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

পাথর-বাঁধানো চড়াই পথের ডানদিকে গুম্ফা—সারিবদ্ধ বাড়ি। তোরণ থেকে অর্ধেকটা পথ এসে একটি সুসজ্জিত মন্দির। মানা বলে, "এই মন্দিরটির নাম দু-খাং কোর-পো। ইংরেজীতে লেখে 'Du-Khang dkor-po'—বিদেশী পর্যটকরা এই মন্দিরকে বলেন—"White Assembly Hall."

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাই। বিভাস বাধা দেয়। বলে, "আগে চলুন, দু-খাং বা মূল মন্দির দেখে আসি, তারপরে এখানে আসব।"

"কিন্তু দু-খাং মানে তো নাটমন্দির।" আমি সবিস্ময়ে বলি।

বিভাস মৃদু হাসে। বলে, "কোনো কোনো গুম্ফায় তাই বলে বটে। কিন্তু এখানে মূল মন্দিরকেই দু-খাং বলা হয়।"

অতএব আবার এগিয়ে চলি। একটু বাদে চড়াই শেষ হয়। এখানেই ডানদিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি আর তার সামনে একফালি উঠান। উঠানে দুটি পতাকাদণ্ড।

পাথর মাটি আর কাঠ দিয়ে তৈরি সুবিরাট বাড়ি—তিক্‌সে গুম্ফা। তারই নিচের তলায় মন্দির। কালো রং করা সিঁড়ি বেয়ে আমরা দরজা দিয়ে ভেতরে আসি।

প্রথমে বারান্দা—দেওয়ালে রঙীন চিত্র। ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপরে এসে দাঁড়াই মন্দিরদ্বারে।

জনৈক লামা স্মিতহাস্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। হিন্দীতে ভেতরে ঢুকতে বলেন। দু-ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি।

সুপ্রাচীন কিন্তু সুসজ্জিত মন্দির। লামাজী বলেন—সাড়ে পাঁচশ' বছর আগে নির্মিত।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে এসেই পেছন ফিরতে হয়। দরজার ওপরে এবং দু-পাশের দেওয়ালে চমৎকার রঙীন চিত্র। আমরা দেখি।

বেশ বড় মন্দির। সবই কাঠের তৈরি—কাঠের মেঝে, কাঠের থাম, কাঠের 'সিলিং'। সর্বত্র রঙীন চিত্র অঙ্কিত, কেবল দু-পাশের দেওয়াল বাদে। দু-পাশে দেওয়ালের সঙ্গে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সারি সারি কাঠের তাক। তাতে কাপড় দিয়ে বাঁধা পুঁথির পুঁটুলি। মেঝেতে সারি সারি বসবার জায়গা ও কাঠের ডেস্ক। বুঝতে পারছি—শিক্ষানবীশ লামাদের ক্লাস নেওয়া হয় এখানে।

গ্রন্থাগারের অংশ ছাড়িয়ে আমরা দেবালয়ের অংশে আসি। প্রথমেই কয়েকটি ডুংডুং বা প্রার্থনা-ঢোলের দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রতিবার প্রার্থনার সময় এগুলির প্রয়োজন হয়।

সামনে কাঠের বেদির ওপরে বুদ্ধাবতারের উপবিষ্ট মূর্তি। শাক্যমুনির কাছে বোধিসত্ত্বের দুটি ছোট ছোট মূর্তি। তাঁর ডানদিকে একাদশ মস্তকবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর। আরেক পাশে একটা বেদিতে পরমপূজনীয় দালাই লামার একখানি ছবি। পেছনের দেওয়ালে রঙীন চিত্র আর বিগ্রহের সামনে কিছু পূজার উপকরণ।

সবচেয়ে ভাল লাগছে, এ মন্দিরে ভয়ের চেয়ে ভক্তির পরিবেশ বেশি। এখানে বেশ আলো, আর সে আলোয় আনন্দের আমেজ। আমরা প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করি।

মূল মন্দিরের সঙ্গে আরও দুটি মন্দির রয়েছে। লামাজীর সঙ্গে একে একে দর্শন করি। এই মন্দিরদুটিকে ওঁরা বলেন গণ-খাং (mGon-Khang) বা ক্ষেত্রপালের মন্দির। শিবক্ষেত্রে যেমন ভৈরবমন্দির, তেমনি আর কি। একটিতে বজ্রভৈরবের মূর্তি রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আছেন ধর্মরাজ ও মহাকাল। অপরটিতে কয়েকজন অপরিচিত দেব-দেবীর মূর্তি। তাঁদের মধ্যে দুজন নাকি ভাই-বোন, আর একজন দেবীর নাম পাল-দান লা-মো (dpal-ldan Lha-mo)। কিন্তু তিনি কে বুঝতে পারছি না। পারা সম্ভবও নয়। সুতরাং শুধু সবাইকে সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি বাইরে।

তারপর ডানদিকে একটা ছোট টিলার দিকে এগিয়ে চলি। টিলার ওপরে ভারী সুন্দর একটা মন্দির। মানা বলে, "মৈত্রেয় মন্দির"।

সুন্দর সাজানো-গোছানো ছোট্ট মন্দির। অবস্থানটিও মনে রাখার মতো। আমরা ভেতরে আসি। বিগ্রহকে প্রণাম করি।

তারপরে মন্দির দেখি। দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকটি কাঠের তাক—খোপ খোপ করা। প্রতি খোপে এক-একজন পূজনীয় লামার মূর্তি। সবাই বসে আছেন। সবারই মাথায় টুপি, গায়ে উত্তরীয়। প্রত্যেকে একখানি হাত উঁচু করে আছেন, যেন আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

শুধু তাই নয়, প্রতিটি মূর্তি সুদৃশ্য পতাকা দিয়ে সজ্জিত। এইসব ধর্মীয় পতাকাকে এঁরা বলেন টঙ্কা বা থঙ্-কা। সিকিম, ভুটান, লাহুল-স্পিতি ও লাদাক প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চলে ধর্মীয় উৎসবে টঙ্কার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। টঙ্কা ছাড়া কোনো ধর্মস্থান হতে পারে না, কোনো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। কারও বাড়িতে

কোনো উৎসব করতে হলে প্রথমেই টঙ্কা টাঙিয়ে দিতে হয়। ছোট ছোট নিশান থেকে দু-তলা বাড়ির সমান উঁচু পর্যন্ত টঙ্কা হয়ে থাকে।

টঙ্কায় যেসব লেখা বা ছবি থাকে, সাধারণতঃ তা হাতে লেখা কিম্বা আঁকা হয়। ছবি বলতে ধর্মীয় চিত্র। বুদ্ধাবতারের মহাজীবনের কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর চিত্ররূপ কিম্বা অন্য কোনো দেব-দেবীর ছবি। প্রাকৃতিক পদার্থেরও ছবি আঁকা হয়, যেমন—নদ-নদী বন-জঙ্গল মেঘ ও আকাশ ইত্যাদি। এইসব ছবি এবং দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রতি গুম্ফায় অন্তত একজন করে স্থায়ী শিল্পী আছেন। উৎসবের সময় তাঁরই তত্ত্বাবধানে গুম্ফা সাজানো হয়।

দর্শন-শেষে বেরিয়ে আসি মৈত্রেয় মন্দির থেকে, ফিরে আসি মূল মন্দিরের সামনে। সেই লামাজী দাঁড়িয়ে আছেন। মানা তাঁকে বলে, "আমাদের একবার লামুখাং দেখিয়ে দিন না!"

লামাজী রাজী হয়ে যান, ইসারায় আমাদের একটু দাঁড়াতে বলে মন্দিরদ্বারে তালা লাগান। তারপরে কাছে এসে বলেন, "চলিয়ে!"

নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি মন্দিরের পাশ থেকে উঠে যাওয়া খাড়া সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেন।

চলতে চলতে মানাকে জিজ্ঞেস করি, "লামুখাং কি, কোনো মন্দির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে ওপরতলায়। দুটি মন্দির আছে—লামুখাং এবং চামাখাং।"

আমরা আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙছি। কিছুক্ষণ বাদে একটা বারান্দা দেখিয়ে লামাজী বলেন, "এটা পরম পূজনীয় প্রধান লামাজীর বাসগৃহে যাবার পথ।"

করুণ জিজ্ঞেস করে, "আমরা কি একবার যেতে পারি সেখানে?"

"না।" লামাজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন।

তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলেন, "পূজনীয় প্রধান লামা এখন এখানে নেই, তাঁর ঘর বন্ধ রয়েছে।"

"কোথায় গিয়েছেন, হেমিস?" বরুণ প্রশ্ন করে।

লামাজী মাথা নেড়ে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেন।

একটু বাদে মানা বলে, "গত বছর আমি পূজনীয় লামা প্রধানের 'কোয়ার্টার্স' দেখেছি।"

"কেমন দেখতে?" স্বপন কৌতূহলী।

"চমৎকার।" মানা বলতে থাকে, "একেবারে তিব্বতী ঢঙে তৈরি, সদ্য সাজানো। নিচে যেমন দেওয়ালচিত্র দেখে এলেন, সর্বত্র তেমনি রঙীন ছবি আঁকা।"

"আচ্ছা, নিচের বারান্দায় কাদের ছবি আঁকা রয়েছে?" মানা থামতেই বরুণ প্রশ্ন করে।

বিভাস উত্তর দেয়, "বৌদ্ধদের চুরাশীজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষদের।"

মানা যোগ করে, "নিচের ঐ বারান্দার শেষে একটি পুরনো মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি অবহেলিত কিন্তু সেখানে ষোড়শ অর্হৎ-এর ছবি এবং একখানি মূল্যবান টঙ্কা রয়েছে।"

আমরা ওপরের তলায় উঠে এসেছি। এটাকে গুম্ফার ছাদ বলা যেতে পারে। ছাদের ওপরেই লামুখাং ও চামাখাং মন্দির। এ মন্দিরে মেয়েরা প্রবেশ করতে পারে না। তাই লামাজীর নির্দেশে মীরাদি, নন্দা ও মহুয়াকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মীরাদি ও নন্দার জন্য ভাবছি না, কিন্তু মেয়েটার হাত থেকে হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে সত্যি বড় কষ্ট হল।

এখানেও কাঠ—কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের সিলিং। যত দেখছি, তত অবাক হচ্ছি। লাদাখের প্রায় প্রত্যেকটি গুম্ফায় দেখছি প্রচুর কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। এত কাঠ এঁরা পেলেন কোথায়? লাদাখ তো বৃক্ষহীন প্রদেশ। এখন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে কিছু বড় বড় গাছ লাগানো হয়েছে, আধুনিক যানবাহনের সাহায্যে কাশ্মীর থেকে কাঠ নিয়ে আসাও সম্ভব। কিন্তু সেকালে?

তাহলে কি সিন্ধুর সমতল উপত্যকার মতো সেকালে লাদাখের সিন্ধু উপত্যকায়ও প্রচুর বৃষ্টি হোত, গাছপালা জন্মাতো? কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালে লাদাখ এমন বৃষ্টিশূন্য বৃক্ষহীন প্রদেশে পরিণত হয়েছে?

কিন্তু আমি এসব প্রশ্নের উত্তর দেব কেমন করে? আমি তো ভূতাত্ত্বিক নই। অতএব আমি শুধু চাম্বা মূর্তিটিকে প্রণাম করি।

আর তারপরেই চমকে উঠতে হয়। আমার পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন একটা দৌড়ে চলে গেল! কি?

মানা উত্তর দেয়, "আপনি ভাগ্যবান, তাই মহাপুণ্য অর্জন করলেন।"

"ওরা হল সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন মূষিক, লাদাখের এই মন্দিরে এসে চাম্বাজীর বাহন হয়েছে। ভক্তরা তাই ওদের জন্য ভুট্টা যব গম প্রভৃতি নিয়ে আসেন, খেতে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের সামনেই ওরা এসে নির্ভয়ে খাবার খেয়ে যায়।" বিভাস যোগ করে।

আমি তাহলে সত্যই ভাগ্যবান। খাবার না এনেও দেব-বাহনের পুণ্যস্পর্শ লাভ করতে পারলাম। কিন্তু মহুয়া বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাড়াতাড়ি দর্শন করি। চাম্বা মূর্তির দু-পাশে দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকজন পূজনীয় লামার মূর্তি রয়েছে। আর আছে কিছু পুঁথি।

দর্শন-শেষে বাইরে বেরিয়ে আসি। বেচারী মহুয়া এগিয়ে এসে আবার আমার হাতখানি ধরে। ওকে কাছে টেনে নিই। আর তখুনি তোতা আমার হাত ছেড়ে দেয়। হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "দিদি দেখতে পারে নি, কি মজা, দিদি দেখতে পারে নি! কি....."

না, এ ছেলেটা সত্যি বড্ড দুষ্টু! দিদি ওকে এত ভালবাসে। সে যেতে পারে নি বলে কোথায় দুটো ভাল কথা বলবে, তা নয়, উল্টে খেপাতে আরম্ভ করে দিলে!

ওর বাবা-মা এবং মানা মৃদু হাসছে। অতএব আমাকেই বোঝাতে হয় মেয়েটাকে। বলি, "এ মন্দিরে যেতে পারো নি, তাতে কি হয়েছে? কি এমন দেখার আছে ভেতরে? ভারী তো কয়েকটা মূর্তি! এই তো এখুনি আমরা পাশের কালীমন্দিরে

যাবো। ওখানে কত কি দেখব!"

"সত্যি জেঠু, সত্যি! এই মন্দিরে দেখার কিছু নেই?" মহুয়া আমার মুখের দিয়ে তাকায়।

"সত্যি বলছি মা। এখানে তেমন কিছুই দেখার নেই। থাকলে কি আর তোমাকে যেতে দিত না!"

"তাই বলো।" মহুয়া মাথা নাড়ে।

আমরা লামাজীর সঙ্গে পাশের মন্দিরের সামনে আসি। লামাজী কিন্তু দরজা খোলেন না। বলেন, "উৎসবের সময় ছাড়া এ মন্দির খোলা হয় না। পাশের ঐ জানলাটা দিয়ে দর্শন করতে পারেন।"

না, স্বয়ং শাক্যমুনি দেখছি আজ তোতার দলে। সুতরাং সে আবাব হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "কি মজা, কি মজা, দিদি এখানেও ভেতবে ঢুকতে পারবে না, পারবে না..."

বেচারী মহুয়া করুণচোখে আমার দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি একখানি হাত ধরে ওকে নিয়ে আসি জানালার সামনে। ভেতরে তাকাই। ছোট মন্দির—প্রায় অন্ধকার। তারই মধ্যে একপ্রান্তে একখানি মূর্তি। কিন্তু কার মূর্তি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারণ মূর্তির মুখখানি কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিছুক্ষণ আগে 'শে' গুম্ফায় যে ভয়াবহ পরিবেশটি প্রত্যক্ষ কবে এসেছি, সেটি এখানে বিশেষভাবে বিদ্যমান।

মহুযা মনখারাপ করলেও আমাকে মনে মনে লামাজীকে ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে। ভাগ্যিস তিনি দরজাটা খুলে দেন নি! তবে মুখে মহুয়াকে বলি, "দেখতেই তো পেলে, এ মন্দিবেও দেখার কিছু নেই। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে চলো। সবচেযে ভাল আর সুন্দর মন্দিরটাই যে আমাদের দেখা হয় নি এখনও।"

"তাই চলো।" আমাব প্রস্তাব মহুয়া মেনে নেয়।

কিন্তু তোতা বলে ওঠে, "দিদি, The grapes are sour!"

ওর মন্তব্য শুনে সবাই হেসে উঠি। হাসতে হাসতে করুণ বলে, "বিভাসবাবু, আপনার এই ছেলে বড় হলে মন্ত্রী হবে।"

আবার হাস্যরোল।

লামাজীর সঙ্গে নেমে চলি নিচে। চলতে চলতে লামাজী বলেন, "লাদাখের অন্যান্য গুম্ফার মতো এ গুম্ফাটিও সারাবছর ঘুমিয়ে থাকে, শুধু উৎসবের সময় জেগে ওঠে। তখন কেবল এখানে নয়, চারিপাশের সর্বত্র আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।"

"কখন উৎসব হয় এখানে?" বরুণ জিজ্ঞেস করে।

লামাজী উত্তর দেন, "নভেম্বর মাসে—স্পিতুক উৎসবের মাস তিনেক বাদে। মুখোশ-নৃত্যের আসরে তখন এখানে যেসব দেব-দেবী দর্শন দান করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই স্পিতুক উৎসবের দেব-দেবী। অর্থাৎ একই মুখোশের সাহায্যে একই কাহিনী অবলম্বনে নাচের আসর অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য গুম্ফার মতো আমাদের এখানেও হরিণ, চমরীগাই, সিংহমুখী দেবী এবং কুমীরমুখী দেবতারা নৃত্যের আসরে

অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসরা তো আছেই। নৃত্যশিল্পীরা মুখোশের সঙ্গে কালো টুপি মাথায় পরেন।"

নেমে আসি নিচে। সেই পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে ধীরে ধীরে তোরণের দিকে এগোতে থাকি। লামাজী আবার শুরু করেন, "উৎসবের সময় এই গ্রাম আর গুম্ফার কি চেহারা হয়, তা এখন আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না। নিচের বড় রাস্তা থেকে গুম্ফার তোরণ পর্যন্ত পথের পাশে সারি সারি দোকান বসে। হাজার হাজার মানুষ আসেন।"

"কদিন ধরে উৎসব হয়?" মীরাদি জিজ্ঞেস করেন।

লামাজী উত্তর দেন, "মেলা চলে বেশ কয়েকদিন ধরে, তবে গুম্ফায় উৎসব হয় দু-দিন—আমাদের তিব্বতী পঞ্জিকার দ্বাদশ মাসের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ দিবসে।" একবার থামেন লামাজী, তারপরে আবার বলেন, "বেশিদিন বসে তো গুম্ফায় উৎসব করার উপায় নেই।"

"কেন?" স্বপন প্রশ্ন করে।

"এই উৎসবের পরেই লে গুম্ফার উৎসব, তারপরে আবার অন্য গুম্ফায়। সবাইকে যে সব উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সারা শীতকাল জুড়েই আমাদের গুম্ফায় গুম্ফায় উৎসব হয়। কেবল হেমিসের উৎসব হয় এই গ্রীষ্মকালে, আপনারা আজ যাচ্ছেন সেখানে। আমি যেতে পারলাম না।"

লামাজীর কণ্ঠস্বরে বেদনা ঝরে পড়ে। উৎসবে না যোগ দিয়ে তাঁকে এখানে পড়ে থাকতে হয়েছে। সত্যি খারাপ লাগছে ওঁর জন্য। তাই চুপ করে থাকি।

কিন্তু নীরব থাকে না শ্রীমান করুণকৃষ্ণ। সে কথা বলে, "আচ্ছা লামাজী, আপনাদের দ্বাদশ মাস হল নভেম্বর? আপনাদেরও কি বারো মাসে বছর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে সব বছরের সব মাস সমান নয়।"

"তার মানে গুম্ফার উৎসব সব বছর একদিনে হয় না?"

"না না, তা ঠিক নয়।" লামাজী বলেন, "গুম্ফায় [illegible] উৎসবটা আমরা [illegible] সব বছর একই সময়ে করে থাকি।"

"আপনাদেরও কি চীনাদের [illegible] পশু-পাখির নাম থেকে বছরের নাম হয়?"

"[illegible]" লামাজী মাথা নাড়েন, বলেন, "এই ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে হচ্ছে চড়ুইপাখির বছর। এর পরে একে একে কুকুর, শুয়োর, ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ (অথবা বিড়াল), খরগোস, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া এবং বানরের বছর হয়ে আবার বারো বছর বাদে চড়ুইপাখির বছর ফিরে আসবে।"

কথা বলতে বলতে আমরা নূতন মন্দির অর্থাৎ 'দু-খাং কোর-পো' মন্দিরের সামনে এসে গেছি। শুনেছি এটি এই গুম্ফার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। তবু ভেতরে না প্রবেশ করে লামাজীর সঙ্গে কথা বলতে থাকি। তাঁর কাছ থেকে যে আরও কিছু জানার আছে আমার।

তাঁকে বলি, "যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"মনে করার কি আছে? আপনি জিজ্ঞেস করুন।"

"আপনার নাম কি?"

"লোবসাং নামগিয়াল।"

"আচ্ছা, আপনি লামা হলেন কেন?"

লামাজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। চট করে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। তবে একটু বাদেই মৃদু হেসে বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমি গুম্ফায় গুম্ফায় যেতাম, আমার ভাল লাগত। লামাজীদের দেখে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বড় শান্তি পেতাম। তারপরে একদিন বাবা যখন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। আপনারা তো জানেন, আমাদের সমাজে একাধিক ছেলে হলে একজনকে অন্তত লামা হতেই হয়।"

"আপনি কি সবার বড়?"

"না, আমি সেজো। আমার বড়দা চাষী, ছোড়দা শিক্ষক। তারা বিয়ে করেছে। আমি এবং আমার ছোট ভাই দুজনেই লামা হয়েছি। আমার ভাই হেমিসে আছে। এবারে আর তার সঙ্গে আমার দেখা হল না।" আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন লামাজী।

একটুকাল কেটে যায়। তারপরে মীরাদি বলেন, "আচ্ছা শুনেছি, আপনাদের এখানে নাকি দৈবজ্ঞ আছেন?"

"দৈবজ্ঞ মানে?" স্বপন মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

মীরাদি উত্তর দেন, "দৈবজ্ঞ মানে যাঁরা দৈববাণী করে থাকেন। ইংরেজীতে যাঁদের 'Oracle' বলা হয়। মূলবেক, স্তোক, লে, শে—প্রভৃতি লাদাখের অনেক জায়গাতেই দৈবজ্ঞ আছেন। বর্তমানে লে শহরে যিনি সবচেয়ে বড় দৈবজ্ঞ, তিনি একজন ছুতোরের যুবতী স্ত্রী। মাত্র ১৯৭৫ সাল থেকে তাঁর মধ্যে দৈবশক্তি ভর করেছে। তবে শৈশব থেকেই নাকি তাঁর ভেতরে দৈবজ্ঞ হবার লক্ষণগুলো স্পষ্ট ছিল।"

"একদিন তো যেতে হবে তাঁর কাছে।" স্বপন বাংলায় বলে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে করুণ প্রশ্ন ছাড়ে, "কি জিজ্ঞেস করবেন?"

স্বপন লজ্জা পায়, আমরা হেসে উঠি। সে অবিবাহিত।

হাসি থামলে মীরাদি লামাজীকে অনুরোধ করেন, "আপনি একটু এখানকার দৈবজ্ঞের কথা বলুন।"

"তিক্‌সের দৈবজ্ঞ লাদাখের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন।" লামাজী বলতে থাকেন, "অথচ তিনি একজন সাধারণ লাদাখী বৃদ্ধ। লেখাপড়া সামান্যই জানেন। তিনি তিব্বতী শেখেন নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যখন দৈবশক্তি ভর করে অর্থাৎ তিনি যখন দৈববাণী করেন, তখন অনর্গল তিব্বতী বলে যেতে থাকেন। তিনি বহু মানুষ ও পশুকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছেন। একটা নল মুখে লাগিয়ে তিনি রোগীর শরীর থেকে রোগের জীবাণু শুষে নেন। তিনি সুস্থ জীবনলাভের উপায় নির্দেশ করেন, ভবিষ্যৎ বলে দেন।"

"দিদি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" ক্ষুদে ম্যানেজার বোধ করি আর এ আলোচনা বরদাস্ত করতে পারে না। বলে, "এবারে চলুন, মন্দিরটা দেখে নেওয়া যাক।"

মানা মোটেই অন্যায় বলে নি। এর পরে হেমিস যেতে হবে, আর দেরি করা উচিত নয়।

অতএব লামাজীর কাছ থেকে বিদায় নিই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি নূতন মন্দিরে—পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের ভাষায় 'White Assembly Hall.' মন্দিরের রংটি সত্যই সাদা।

এমন ঝক্ঝকে সুসজ্জিত মন্দির লাদাখে এসে আর দেখি নি। মানা বলে, "মাত্র গত বছর মেলার সময় খোলা হয়েছে। ছ'লাখ টাকা খরচ করে তিন বছর ধরে সংস্কার সাধন করা হয়েছে।"

এটিও তেমনি কাঠের তৈরি, তবে খুবই দামী কাঠ। এযুগে তৈরি। সুতরাং সুন্দরবন থেকে গীরজঙ্গল পর্যন্ত যে কোন জায়গার কাঠ এখন লাদাখে নিয়ে আসা সম্ভব। অতএব কাঠ নয়, আমি দেখছি কাঠের দেওয়ালে অঙ্কিত অপরূপ ফ্রেসকো চিত্র। দেখছি আর দেখছি—চোখের পলক ফেলতে পারছি না।

বারোটি চৌকো থামের ওপর মন্দিরের ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। থামগুলি সুচিত্রিত। আর সিলিঙে অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য। যেদিকেই চোখ পড়ছে, আর চোখ ফেরাতে পারছি না।

মন্দিরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনের ওপরে শাক্যমুনি উপবিষ্ট। তার বাঁদিকে একটু উঁচুতে একটি ভারী সুন্দর চোর্তেন। তেমনি চৌকো ধাপের পর ধাপ, তার ওপরে মঠের মতো উঁচু শিখর। কিন্তু চোর্তেন তো তৈরি হয় চিতাভস্মের ওপরে। এখানে কার চিতাভস্ম রয়েছে? বোধ করি কোনো পুণ্যবান পূজনীয় লামা মহারাজের।

অতএব প্রণাম করি। তারপরে এসে দাঁড়াই মূল বিগ্রহের সামনে—শাক্যমুনির পায়ের কাছে। এ তো মূর্তি নয়, জীবন্ত বিগ্রহ। এমন সৌম্য শান্ত এবং প্রাণময় বুদ্ধমূর্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি। যেমন প্রশান্ত, তেমনি সুন্দর। শুধু শাশ্বত নয়, সুসজ্জিতও বটে। আকারেও বিশাল। মৈত্রেয় মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মুখখানি হাসিমাখা। গায়ের রং সোনালী, মাথায় উজ্জ্বল মুকুট—মুকুটে পঞ্চবুদ্ধের মূর্তি। কপালে প্রবালের টিপ, বুকের ওপরে বেশ বড় একখানি মূল্যবান পাথর খোদিত। গায়ে উত্তরীয়, হাতের কয়েকটি আঙুল শুধু দেখা যাচ্ছে।

আমরা তাঁকে প্রণাম করি। সশ্রদ্ধ অন্তরে পরমকরুণাময় বুদ্ধাবতারের করুণা প্রার্থনা করি। বলি—হে প্রেমময় পরমেশ্বর, তুমি আমাদের জীবন ও জগৎকে তোমার প্রেমের পুণ্যস্পর্শে সুন্দর আর আনন্দময় করে তোলো।

অবশেষে দর্শন শেষ হয়। আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। তোতা ও মহুয়ার হাত ধরে সবার সঙ্গে নেমে চলি উৎরাই পথে।

।। পনেরো ।।

বেলা সাড়ে এগারোটায় আবার গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠল। তিক্সে থেকে রওনা হলাম। এবারে সোজা হেমিস। এখান থেকে ২৫ কিলোমিটার। ঘণ্টাখানেক তো

লাগবেই। তার মানে দুপুরের পরে পৌঁছব। একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু কি করব? 'শে' এবং তিক্‌সে দুটি গুম্ফাই যে দেখার মতো।

সেই পিচঢালা পথ—সিন্ধুতীরের সুন্দরী পথ। পথের পাশে গাছপালাহীন ধূলিময় ধূসর প্রান্তর। প্রবল বেগে বাতাস বইছে। গাড়ির ছাউনির ওপর অবিরত আছড়ে পড়ছে—গর্জন করছে। মনে হচ্ছে গাড়িখানাকে যেন কাত করে পথের ওপরে ফেলে দেবে।

ধূলির ঝড় বইছে। চোখ বন্ধ করে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে আছি। সুযোগ পেলেই চোখ মেলে দেখে নিচ্ছি চারিদিক, দেখছি লাদাখের বিচিত্র-সুন্দর প্রকৃতি, দেখছি কাছের নেড়া পাহাড় আর দূরের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। বাঁয়ে কারাকোরাম, ডাইনে জাঁস্‌কার আর সামনে কৈলাস।

সিন্ধু সরে গেছে দূরে। তাহলেও এটি সিন্ধু উপত্যকা। আমরা সিন্ধু উপত্যকায় বিচরণ করছি।

পথের পাশে মাঝে-মাঝেই চোর্তেন। একটি দুটি নয়, একটির পর একটি। অধিকাংশই বেশ বড় বড়। এখানে লোকালয় নেই, তবু মানুষ এসে মঠ তৈরি করেছে। সামনে সুবিস্তৃত ধূলিময় সমতল। দূরে বহুদূরে আকাশ নেমে এসেছে। মাটির বুকে।

আমরাও চলেছি ওখানে। আর চলতে চলতে লাদাখের কথা ভাবছি। বিচিত্র দেশ এই লাদাখ। এখানে গরম আছে কিন্তু লাদাখ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ নয়, এখানে শীত আছে কিন্তু লাদাখে তেমন তুষারপাত হয় না। সিন্ধুর দেশ লাদাখ কিন্তু লাদাখে হিন্দু প্রায় নেই বললেই চলে। তবে লাদাখের মানুষ সনাতন ধর্মকে পর বলে মনে করে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা সব দেশের সব ধর্মের মানুষের প্রতি সমান অতিথিপরায়ণ। তাই কয়েকজন জাপানী পর্যটক মন্তব্য করেছেন—'You will find in Ladakh the cold of Finland, the heat of Africa, the hospitality of Japan, the mysticism of Iran, the magic of Tibet...*'

পথের ডানদিকে নজর পড়তেই ভাবনা থেমে যায়। সিন্ধু চুপিচুপি কখন যে একেবারে আমার পাশটিতে হাজির হয়েছে, টের পাই নি। তবে এ-সিন্ধু সে-সিন্ধু নয়। পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে তার দু-তীর বাঁধিয়ে ফেলা হচ্ছে, জলাধার নির্মাণের কাজ চলেছে। এখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করে চাষাবাদের উন্নতি ও জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হবে। ভাবীকালের উন্নত লাদাখে এই তাখ্‌না জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের একটা বিশেষ অবদান থাকবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলাধারের পাশে পাশে পথ। একটু বাদে পথটি প্রশস্ত উপত্যকায় প্রবেশ করল। এখানেই তাখ্‌না গ্রাম, একটি গুম্ফা আছে। গ্রাম দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

হঠাৎ বরুণ কথা বলে। আমার দিকে ফিরে বলে, "আমরা বিশ্ববিখ্যাত হেমিস গুম্ফায় চলেছি।"

আমি মাথা নাড়ি।

*Ladakh: The Moonland.

বরুণ আবার বলে, "অনেক নাম শুনেছি, কিন্তু সত্যি বলতে কি তেমন কিছুই জানি না। চুপচাপ বসে না থেকে, একটু বলুন না হেমিসের কথা।"

"খুব ভাল প্রস্তাব।" মীরাদি মন্তব্য করেন। করুণ আর স্বপন মাথা নাড়ে।

মানা বলে ওঠে, "তাই ভাল। এতক্ষণ আমি বলেছি, এবারে শুধু শুনব।"

অতএব আরম্ভ করতে হয়, "হেমিস গুম্ফা লাদাখের নিভৃততম স্থানে অবস্থিত হয়েও বিশ্ববিখ্যাত, কারণ ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্ট সেখানে এসে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, প্রেম ও ক্ষমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।"

"কথাটা কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতসমাজ স্বীকার করেন না।" বরুণ আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

"কিন্তু কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সংবাদটি যিনি প্রথম পরিবেশন করেছেন, তিনি একজন য়ুরোপবাসী।..."

"হ্যাঁ, রাশিয়ার মানুষ, নাম ডঃ নটোভিচ।..."

"তখন রাশিয়ানরা ধর্মের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁরা যীশুখ্রীষ্টকে ভক্তি করতেন।" করুণ অর্ধপথে বরুণের প্রতিবাদ খারিজ করে দেয়। তারপরে আমাকে বলে, "আপনি বলুন শঙ্কুদা।"

"তাই ভাল।" বরুণ সন্ধি করে।

আমি আবার আরম্ভ করি, "ডঃ নটোভিচ লাদাখ ভ্রমণের সময় বার বার হেমিস গুম্ফার কথা শোনেন। তাই তিনি দুর্গম পথ পেরিয়ে এখানে এলেন, কিন্তু সুস্থ শরীরে হেমিস পৌঁছতে পারলেন না। গুম্ফার অনতিদূরে একটা পাহাড় পেরোবার সময় নিচে পড়ে গেলেন, তাঁর পা ভেঙে গেল। তাঁর পথপ্রদর্শক গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাঁকে হেমিস গুম্ফায় নিয়ে যায়। সেবাপরায়ণ মঠাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ অতিথিশালা খুলে দেন। নটোভিচের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেটি সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সাল।

যে লামাজী নটোভিচের শুশ্রূষা করতেন, কথায় কথায় তিনি একদিন বললেন—এই গুম্ফার গ্রন্থাগারে যীশুখ্রীষ্টের ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কে একখানি পুঁথি আছে।

নটোভিচ পুঁথিখানি দেখতে চান। লামাজী তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। নটোভিচ পুঁথিখানি দেখে বুঝতে পারেন, সেখানি বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তাঁর দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানির অনুবাদ শুরু করে দিলেন। এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই কাজটা শেষ হয়ে যায়। নটোভিচ প্রায় দেড়মাস হেমিসে ছিলেন।

আরোগ্যলাভ করে নটোভিচ হেমিস গুম্ফা দর্শন করেন। অবশেষে তিব্বতী পুঁথির অনুবাদ নিয়ে দেশে ফিরে যান এবং ফরাসী ভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে আলেক্সিনা লোরেঞ্জোর নামে জনৈক মহিলা বইখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৯৪ সালে 'The Unknown Life of Jesus Christ' নামে বইখানি আমেরিকায় প্রকাশিত হয়।

নটোভিচ তাঁর বইতে লিখেছেন—যেসব লাদাখবাসীদের সঙ্গে হেমিস গুম্ফায় যীশুর পরিচয় হয়েছিল এবং মধ্য এশিয়ার যেসব বণিক যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে

দেখেছিলেন, তাঁদের মুখ থেকে সব কথা শুনে হেমিস গুম্ফার লামারা পালিভাষায় পুঁথিখানি প্রণয়ন করেন। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার তিন-চার বছর পরে পুঁথিখানি প্রণীত হয়।

নিকোলাস নটোভিচ পালিভাষায় লেখা পুঁথিখানি দেখেন নি। তিনি বলেছেন—পরবর্তীকালে পালি থেকে তিব্বতী ভাষায় পুঁথিখানির অনুবাদ করা হয়। তারপরে মূল পুঁথিখানি পোতালা প্রাসাদের কাছে 'মার্বুর' মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নটোভিচ সেই তিব্বতী পুঁথির অনুবাদ নিয়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, সেই তিব্বতী পুঁথিখানি কি এখনও হেমিসে আছে, আমরা দেখতে পাবো?" মাঝখান থেকে মীরাদি হঠাৎ বলে ওঠেন।

উত্তর দিই, "না। প্রবোধদা লিখেছেন—কাশ্মীর সরকার হেমিস গুম্ফার অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সেই পুঁথিখানিও এখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি দেখতে পান নি। তবে ১৯২২ সালে স্বামী অভেদানন্দজী তিব্বতী পুঁথিখানি দেখেছেন। কিন্তু অভেদানন্দজীর কথায় পরে আসছি। আগে ডঃ নটোভিচের কথা বলে নিই।"

"তাই ভাল।" স্বপন সমর্থন করে আমাকে।

আমি বলতে থাকি, "নটোভিচ সেই তিব্বতী পুঁথি সম্পর্কে লিখেছেন—*'In reading the life of Issa (Jesus), we are at first struck by the similarity between some of its principal passages and the Biblical narrative....'

নটোভিচ বলেছেন—যীশু জানতে পেরেছিলেন যে তৎকালীন পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ ভারতবর্ষ, তাই যীশু ভারতে এসেছিলেন। যীশুর ভারতভ্রমণ সম্পর্কে নটোভিচ লিখেছেন, *'St. Luke says: "He (Jesus) was in the desert till the day of his shewing into Isreal," which conclusively proves that no one knew where the young man had gone, to so suddenly reappear sixteen years later.'

আমি থামতেই বরুণ প্রশ্ন করে, "The Unknown Life of Jesus Christ বইখানি আপনি পড়েছেন শঙ্কুদা?"

"না।" উত্তর দিই। বলি, "পড়ব কেমন করে, বইখানি যে ইংরেজ সরকার ভারতে আসতে দেন নি। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বইতে তার অংশবিশেষ পাঠ করেছি।"

"ইংরেজরা কেন বইখানি এদেশে আসতে দেয় নি?"

"বইখানি তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে বোধ করি আঘাত করেছিল। করারই কথা, তাঁদের যীশুখ্রীষ্ট কিনা শেষে 'নেটিভ'-দের কাছ থেকে প্রেমধর্মের পাঠ নিয়েছে! অথচ খ্রীষ্টান পণ্ডিতরা যীশুর জীবনের তেরো থেকে আটাশ পর্যন্ত এই হারিয়ে যাওয়া ষোলো বছরের কোনো হিসেব দিতে পারেন না। নটোভিচ তাঁর বইতে যীশুর সেই অজ্ঞাতবাসের সন্ধান দিয়েছেন।"

"তাছাড়া", আমি থামতেই করুণ বলে ওঠে, "খ্রীষ্টান পণ্ডিতরা যদি আজও একটু তলিয়ে দেখেন, তাহলেই নটোভিচের বক্তব্য মেনে নেবেন।"

"কি রকম?" মীরাদি জিজ্ঞেস করেন।

করুণ উত্তর দেয়, "তাঁরা যদি তাঁদের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এবং 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর পার্থক্য নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে যেখানে বলা হয়েছে—'Eye for eye, tooth for tooth...' সেখানে যীশু বলেছেন—'whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also.' একই সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে এ দুটি মতবাদের জন্মলাভ সম্ভব নয়। ঊনত্রিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে গিয়ে যীশু দেশবাসীকে যে সহনশীলতা ও ক্ষমার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের কাছে যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন, ভূমধ্যসাগর-সৈকতে কিম্বা পশ্চিম এশিয়ার কোথাও তার জন্ম হতে পারে না। যীশুখ্রীষ্টের প্রেমধর্মের জন্ম অবশ্যই ভারতে—বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর দেশে। সুতরাং যীশুর ভারতে আগমন কোনমতেই কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক সত্য।

করুণ থামতেই বরুণ আমাকে বলে, "এবারে স্বামী অভেদানন্দের কথা বলুন।"

"হ্যাঁ।" আমি শুরু করি, "স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকায় বসে 'The Unknown Life of Jesus Christ' বইখানি হাতে পান। বইখানি পড়ার পরে স্বভাবতই তিনি হেমিস গুম্ফার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই ১৯২১ সালের শেষদিকে ভারতে এসে পরের বছর জুলাই মাসেই হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েন। তিনি কাশ্মীরে আসেন, অমরতীর্থ-অমরনাথ দর্শন করেন। তারপরেই লাদাখের পথে পাড়ি দেন। শ্রীনগর থেকে কার্গিল এবং লে হয়ে হেমিস গুম্ফায় আসেন। 'পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' বইতে স্বামীজীর সহযাত্রী তাঁর লাদাখ ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হেমিস গুম্ফার সেই তিব্বতী পুঁথির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন...."

আমি পকেট থেকে নোটবুক বের করে পড়তে শুরু করি—'যে লামা স্বামীজীকে (অভেদানন্দজী) সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি পুঁথি তাক হইতে পাড়িয়া স্বামীজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, এইখানি নকল পুঁথি। আসলখানি লাসার নিকটবর্তী "মারবুর" নামক স্থানের মঠে আছে। উহা পালি ভাষায় লিখিত কিন্তু এইখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। ইহা ১৪টা পরিচ্ছেদ এবং ২৪৪টা শ্লোকযুক্ত। স্বামীজী তাহার সাহায্যে ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া লইলেন।

যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া কি কি করিয়াছিলেন, মাত্র তাহাই উক্ত পুঁথি হইতে এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

১০। ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্রাইলেরা জাতীয় প্রথানুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁহার পিতামাতা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় দিনযাপন করিতেন।

১১। তাঁহাদের সেই দরিদ্র কুটীর ক্রমে ধনী ও কুলীনগণের দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই ঈশাকে নিজ নিজ জামাতৃ-পদে বরণ করিতে উৎসুক হইলেন।

১২। ঈশা বিবাহ করিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই বিধাতৃ-পুরুষের স্বরূপ

ব্যাখ্যায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

১৩। তখন তাঁহার মনের মধ্যে এই বাসনা প্রবল ছিল যে, তিনি ভগবৎ-সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম শিক্ষা করিবেন।

১৪। তিনি জেরুজালাম পরিত্যাগ করিয়া একদল সওদাগরের সঙ্গে সিন্ধুদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। উহারা তথা হইতে মাল লইয়া যাইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিত।

(৫)

১। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে উত্তর সিন্ধুদেশ অতিক্রম করতঃ পবিত্র আর্যভূমিতে আগমন করিলেন।....

২। পঞ্চনদ প্রদেশ দিয়া যখন তিনি একাকী যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সৌম্য মূর্তি, প্রশান্ত বদন ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভক্ত জৈনরা তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপা-প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

৩। এবং তাঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ সেইকালে কাহারও যত্ন তিনি পছন্দ করিতেন না।

৪। তিনি ক্রমে ব্যাস-কৃষ্ণের লীলাভূমি জগন্নাথধামে উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন। তিনি সকলের প্রিয় হইলেন এবং তথায় বেদ পাঠ করিতে, বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

* * *

—অতঃপর তিনি রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ৬ বৎসবকাল অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু যাত্রা করিলেন।

—তথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত ৬ বৎসর থাকিয়া পালি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরতঃ তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

—তথা হইতে তিনি নেপাল এবং হিমালয় পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিলেন।....

—ক্রমে তিনি জরথুষ্ট্র-পূজক পারস্য দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন।...

—...শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।...

এইরূপে তিনি ২৯ বৎসর বয়সে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অত্যাচারপ্রপীড়িত স্বজনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।'

আমার পড়া হয়ে যায়, নোটবইখানি পকেটে রেখে দিই। কেউ কোনো কথা বলছে না। হয়তো অভেদানন্দজী ও হেমিসের কথা ভাবছে। ভাবুক, যেখানে বেড়াতে

যাচ্ছে, আগের থেকে সেখানকার কথা একটু ভেবে নেওয়া ভাল।

আমি বাইরে তাকাই। একটি গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। আবার নোটবই খুলি। বোধ হয় রণবীরপুর। নটোভিচের আমলের কথা বলতে পারি না, তবে অভেদানন্দজীর আমলে নিশ্চয়ই ছিল। কারণ স্বেন হেডিন এই গ্রামের উল্লেখ করেছেন। তিনি এখান থেকে স্তাগ্না গুম্ফা দেখতে পেয়েছিলেন।

আমরাও দেখতে পাচ্ছি—সিন্ধুর ওপারে। শুনেছি গুম্ফাটি তেমন বড় নয়, কিন্তু বেশ উঁচু একটা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। তাই এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

স্তাগ্না শব্দের অর্থ নাকি বাঘের নাক। ঐ পাহাড়টাকে বাঘ কল্পনা করলে গুম্ফাটিকে নাক কল্পনা করা যেতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে কষ্টকল্পনা। তা হোক্ গে, তবু ঐ গুম্ফার নাম স্তাগ্না। আমরা এটি দেখতে পারব না। ভাগ্য মন্দ বলতে হবে। কারণ ঐ গুম্ফার ওপর থেকে চারিদিকের বিশেষ করে জাঁস্কার পর্বতশ্রেণীর তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা এবং ধূসর সিন্ধু-উপত্যকার দৃশ্য অবর্ণনীয়।

শুনেছি গুম্ফাটি ভারী সুসজ্জিত এবং ঝক্‌ঝকে। সুন্দর সুন্দর মূর্তি ছাড়াও মন্দিরে একটি দর্শনীয় চোর্তেন আছে। চোর্তেনটি সাত ফুট উঁচু, রুপোর তৈরি।

কিন্তু মূর্তি কিম্বা চোর্তেন নয়, স্তাগ্না গুম্ফায় যেতে চেয়েছিলাম অন্য কারণে। বড় ইচ্ছা ছিল, গুম্ফার প্রধান লামাজীর সঙ্গে আলাপ করব এবং গ্রন্থাগারটি দেখব। লাদাখে সব গুম্ফাতেই পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অধিকাংশ গুম্ফার পরিচালকরা সেসব পুঁথি সম্পর্কে কোনো খবরাখবর রাখেন না। কারণ তাঁরা তিব্বতী জানেন না এবং পড়াশুনা পছন্দ করেন না। ফলে পুঁথিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্তাগ্না গুম্ফার বর্তমান প্রধান লামা পণ্ডিত মানুষ। তিনি সযত্নে পুঁথিগুলি রক্ষা করছেন। এবং কেউ গ্রন্থাগার দেখতে চাইলে তিনি উৎসাহসহকারে তাঁদের সাহায্য করেন। অথচ আমাদের স্তাগ্না যাওয়া হল না।

বরুণের কথায় স্তাগ্নার ভাবনা হারিয়ে যায়। সে আবার পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, "আচ্ছা, যীশু জেরুজালেম থেকে কোন্ পথে হেমিসে এসেছিলেন?"

কঠিন প্রশ্ন। আমি ঐতিহাসিক কিম্বা ভৌগোলিক নই। তবু উত্তর দিতে হবে। তাই একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "প্রকৃতি পরিবর্তনশীলা। যীশুখ্রীষ্টের যুগে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষের যে গঠন ছিল, তার সঙ্গে আজকের মানচিত্রের মিল সামান্যই। সেকালের অধিকাংশ দেশ ও নগরের নাম এখন পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের আয়তন এবং অবস্থানও পালটে গিয়েছে। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যীশুর ভারতে আগমন স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেন নি। কাজেই সেই পথ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে তখন যে স্থলপথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে আসা যেত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহাবীর আলেকজাণ্ডার। তিনি তো খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীস থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।"

সহযাত্রীরা মাথা নাড়ে, আমি বলতে থাকি, "যীশু ঠিক কোন্ পথে জেরুজালেম থেকে হেমিস এসেছিলেন, তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়, তবে একটা সম্ভাব্য

পথ নির্ণয় করা যেতে পারে।"

"বেশ তাই করুন।" বরুণ বলে, "আপনি দেশ ও জায়গাগুলোর বর্তমান নামই ব্যবহার করুন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে।"

"আমার ধারণা, প্রথমবার অর্থাৎ তেরো বছর বয়সে যীশু যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি কোনো বণিকদলের সঙ্গী হয়েছিলেন।"

"তাঁরা কোন্ পথে আসতে পারেন?"

"আমার অনুমান, যীশু জেরুজালেম থেকে বর্তমান ইরাকের বাগদাদে আসেন। সেখান থেকে ইরানের হামাদান, তেহেরান ও মাশাহাদ হয়ে আফগানিস্তানের হেরাত পৌঁছান। তিনি হেরাত থেকে সোজাপথে কিম্বা কান্দাহার হয়ে কাবুল আসেন। তার পরে খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে কাবুল নদী ধরে আটক পৌঁছান। সেখান থেকে সিন্ধুর তীরে তীরে পথ চলে গিলগিট স্কার্দু এবং লে হয়ে হেমিসে আসেন।"

আমি থামতেই স্বপন প্রশ্ন করে, "তিনি কি একই পথে দেশে ফিরে গিয়েছেন?"

"মোটামুটি তাই, তবে দেশে রওনা হবার আগে তিনি ভারতের আরও কয়েকটি জায়গায় পড়াশুনা করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, অভেদানন্দজী তো তাই বলেছেন।" মীরাদি আমাকে সমর্থন করেন।

"আমার ধারণা হেমিসে অধ্যয়ন শেষ করার পরে যীশু কাশ্মীর হয়ে কাশী যান। সেখান থেকে রাজগীর হয়ে কপিলাবস্তু দর্শন করেন। তিনি নাকি পুরীতেও গিয়েছিলেন, এবং এক বছর সেখানে পড়াশুনা করেছেন। সে যাই হোক, ভারত দর্শনের পরে যীশু সম্ভবতঃ অমৃতসর ও লাহোরের পথে পেশোয়ার হয়ে কাবুল পৌঁছান। তারপরে তিন বছর ইরানে কাটিয়ে একই পথে দেশে ফিরে যান।"

"দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হবার পরে আরোগ্যলাভ করে যীশু কোন্ পথে শ্রীনগরে আসেন?" আমি থামতেই মীরাদি প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "একই পথে তিনি কাবুল আসেন। কিন্তু তারপরে হয়তো পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে উরি-বারমূলা-পাটনের পথ দিয়ে শ্রীনগরে পৌঁচেছেন।"

বরুণ প্রতিবাদ করে, "কিন্তু সেদিন আপনি বলেছিলেন, যীশু দ্বিতীয়বারে আর লাদাখে আসেন নি। অথচ লাদাখে তাঁর প্রচুর পরিচিত মানুষ ছিলেন। তাঁরা হয়তো তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করতেন। কিন্তু শত্রুদের শক্তির কথা ভেবে যীশু মধ্যএশিয়ার এই প্রান্ত-ভূখণ্ডকে নিরাপদ বলে বিবেচনা করেন নি। তাই তিনি হিমালয় অতিক্রম করে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন।"

মাথা নেড়ে উত্তর দিই, "হ্যাঁ। তাঁর তো সব পথই জানা ছিল এবং তিনি নিশ্চয়ই শ্রীনগরে আশ্রয় নেবার কথা ভেবেই-দেশ ছেড়েছিলেন। তাহলে কেন তিনি আবার অযথা লাদাখ আসবেন। তাছাড়া লাদাখ এলে মধ্যএশিয়ার বণিকদের মারফত খবরটা জানাজানি হবারও আশঙ্কা ছিল। সুতরাং লাদাখ না এসে তাঁর সেবারে সোজা শ্রীনগরে চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।"

"কারু এসে গেল। চা খাবেন নাকি?" আমি থামতেই মানা বলে ওঠে।

আমাদের আলোচনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। মানা ঠিকই

বলেছে—অনেকখানি সমতল জায়গা, কয়েকখানি ঘর আর গুটিদুয়েক চায়ের দোকান। কিছু লোকজনও রয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে খানকয়েক গাড়ি। এখানে একটি ট্র্যাফিক চেক্-পোস্ট্ রয়েছে, সংক্ষেপে বলে T.C.P.—বিদেশীদের পাসপোর্ট এবং ভারতীয়দের সংরক্ষিত অঞ্চলে যাবার অনুমতিপত্র পরীক্ষা করা হয়।

"এ জায়গাটা অনেকটা জংশন স্টেশনের মতো।" মানা আবার কথা বলে।

করুণ জিজ্ঞেস করে, "কি রকম?"

"লাদাখের পূর্ব ও উত্তর সীমান্তের প্রায় সবদিকে যাওয়া যায় এখান থেকে। তাছাড়া কেলং-মানালীর মোটরপথটিও এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে। দেখছেন না, ওখানে সাইনবোর্ড রয়েছে।"

গাড়ি থামে। বিভাসদের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ওরা চায়ের দোকানে ঢুকেছে। তোতা ও মহুয়ার চিৎকার কানে আসে, "জেঠু, আমরা এখানে। চা খাচ্ছি। তোমরাও এসো।"

হাত নেড়ে ওদের আশ্বস্ত করি। তারপরে এসে দাঁড়াই সেই সাইনবোর্ডের সামনে। লেখা রয়েছে—

'LUNKUNG—111 Kms./DARBUK—72 Kms;
SHAKTI—10 Kms./LOMA—170 Kms./
CHAMATANG—102 Kms./KIARI—73 Kms./
SARCHU—216 Kms./PANG—140 Kms./
RAMTSE—44 Kms./UPSHI—14 Kms.'

শক্তি এবং উপ্‌শি ছাড়া অন্য সব নামগুলোই আমার অপরিচিত। তবে আমাদের পথটি এখানে পৌঁছে তিনদিকে প্রসারিত হয়েছে। বাঁদিকের পথটি পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠেছে, ওটাই শক্তির পথ এবং মনে হচ্ছে ঐ পথ দিয়েই চুসুল যেতে হবে। সামনের দিকে প্রসারিত হওয়া পথটি সিন্ধুর উত্তরতীর ধরে উপ্‌শি চলে গিয়েছে। আর ডানদিকের পথটি একটা পুলের ওপর দিয়ে সিন্ধু পেরিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত। এটাই হেমিসের পথ—আমাদের পথ।

শক্তি তথা চুসুলের পথটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে উত্তর-পূবে গিয়েছে। এই পথটাই জিংরাল (Zingral) হয়ে ১৭,৫৭৯ ফুট উঁচু দুর্গম গিরিবর্ত্ম চাং লা (Chang La) অতিক্রম করে গার্তোকের (তিব্বত) দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এটাই ছিল গত শতাব্দীর সেই আকসাই চিনের ভেতর দিয়ে লে থেকে ইয়ারখন্দের তৃতীয় পথ—মধ্যএশিয়ার বাণিজ্যপথ। তবে লে থেকে চুসুল যাবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হল দিগার লা এবং আঘাম হয়ে অর্থাৎ জামিস্তানী পথে।

পথের প্রসঙ্গে আবার স্বেন হেডিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন শ্রীনগর থেকে রওনা হবার পর থেকে এতদিন আমরা তাঁরই পথ পরিক্রমা করেছি। এবারে ভিন্নপথ ধরতে হবে। হেডিন এখানে এসে ঐ বাঁদিকের পাহাড়ী পথ ধরেছেন। কারণ সিন্ধুতীরের সহজ পথটি দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না তাঁর।

তিনি শক্তি গ্রামের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। প্রথমদিন চ্যাং লা গিরিবর্ত্মের পাদদেশে জিংরাল পর্যন্ত অগ্রসর হন। পরদিন চ্যাং লা অতিক্রম করে ট্যাঙ্গিয়ার পৌঁছান। সেখান থেকে গার্তোকের পথ ধরেন।

১৯০৬ সালের ১৫ই আগস্ট হেডিন এখান থেকে শক্তি গ্রামের পথ ধরেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একচল্লিশ বছর। তারই মধ্যে তিনি সেদিন তাঁর মধ্যএশিয়া পর্যটনের একুশ বছর পূর্ণ করেন। সত্যই বিস্ময়কর।

এর পরে আর হয়তো এই সুমহান পর্যটকের বিস্ময়কর মহাজীবনকে স্মরণ করার সুযোগ পাবো না। অতএব এযাত্রায় শেষবারের মতো স্বেন হেডিনকে স্মরণ করে নেওয়া যাক—

আগেই বলেছি হেডিন জাতিতে সুইডিশ। তাঁর পুরো নাম—Sven Anders Hedin. তিনি ১৮৬৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্টক্‌হোমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লুডইগ (Ludwig) হেডিন। তিনি একজন স্থপতি (Architect) ছিলেন। স্বেন হেডিন জার্মানিতে লেখাপড়া করেন। বিশ বছর বয়সেই তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন এবং ককেসাস, পারস্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি পর্যটন করেন। ১৮৯০ সালে তিনি পারস্যেব সাহের দরবারে সুইডেন এবং নরওয়ে মিশনের দোভাষী নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য তখন তাঁব বয়স পঁচিশ বছর মাত্র। ১৮৯১ সালে তিনি খুরাসান, রাশিয়ার তুর্কিস্তান ও কাশগড় ভ্রমণ করেন। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে তিনি পামীর অতিক্রম করে পিকিং যান। পরবর্তী তিন বছরে গোবি মরুভূমি অঞ্চলে বিস্তারিত গবেষণা করেন। ১৯০৫-১৯০৮ সালে তাঁর এই আলোচ্য পরিক্রমা—'Trans Himalayan Expedition.'

হেডিন সারাজীবন দুঃসাহসী যাযাবরের মতো বিশ্বের দুর্গমতম অঞ্চলে পাগলের মতো বেড়িয়েছেন। তিনি কখনো নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেন নি। কিন্তু দুর্গম প্রকৃতি তাঁকে সুস্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ জীবন দান করেছেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালে অর্থাৎ ৬৩ থেকে ৬৭ বছব বয়সে তিনি চীনের ইনার মঙ্গোলিয়া, পশ্চিম কান্‌সু এবং সিনকিয়াং অঞ্চলে এক ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অভিযান পরিচালনা করেছেন। ৬৯ বছর বয়সে তিনি মধ্যএশিয়ার সুপ্রাচীন রেশম-বাণিজ্য পথের (Silk route) আংশিক জরিপ করেন। ১৯৫২ সালের ২৬শে নভেম্বর স্টক্‌হোমে এই সুমহান পর্যটকের জীবনাবসান হয়।

হেডিনের কিছু আবিষ্কার নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য থাকলেও তাঁর জীবদ্দশাতেই বিশ্ববাসী তাঁকে মহান আবিষ্কর্তার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ১৯০২ সালে তিনি একজন সুইডিশ নোব্‌ল (Noble) নির্বাচিত হন। ১৯০৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক ভৌগোলিক সংস্থা (Geographical Societies) তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আজ তাঁর পর্যটন পথ থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

সেই সঙ্গে স্মরণ করি তাঁর বিদায়বাণী। হেডিন সেদিন এখানে এসে মহাসিন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। বিদায়বেলায় বলেছিলেন—"Farewell, thou proud

stream, rich in historical memories. Though it costs my life I will find some day the source over yonder in the forbidden land.'

।। ষোলো ।।

এবারে আমাদেরও সিন্ধুর কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিতে হবে। সেদিন খালসির পুল পেরোবার পর থেকে এ পর্যন্ত সিন্ধুর উত্তর তীরেই বিচরণ করেছি। এবারে আবার যেতে হবে দক্ষিণ তীরে। শুধু তাই নয়, তাকে পেরিয়ে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে চলে যাবো। কিন্তু আমি তো হেডিনের মতো বলতে পারব না—জীবনের বিনিময়ে আমি তোমার উৎস আবিষ্কার করব। আমি শুধু বলতে পারি—তুমি আমাকে সাময়িক বিদায় দাও। হে মহাসিন্ধু, সন্ধ্যাবেলায় আবার আমার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

কারুতে চা খেয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠেছি। গাড়ি দক্ষিণ দিকে চলা শুরু করেছে। বাঁদিকে সিন্ধুর উত্তর তীরে তিব্বতের পথ ছাড়িয়ে গাড়ি এসে সিন্ধুর সেতুতে উঠেছে।

ঐ পথে গার্তোক হয়ে লাসা যাওয়া যায়, যাওয়া যায় কৈলাস-মানস, হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। কিন্তু সে পথ আজ অবরুদ্ধ।

তাহলেও ঐ পথে গাড়ি যায়। যায় উপ্‌শি পর্যন্ত। উপ্‌শি থেকেই মানালীর পথ। সেই পথটির কথা একটু ভেবে নেওয়া যাক।

শুধু এখানে নয়, এরপরে ভারতীয় ভূখণ্ডে সিন্ধুর ওপরে আরও দুটি পুল আছে। প্রথমটি ইগু নামে একটা জায়গায় আর দ্বিতীয়টি লিক্‌চে ছাড়িয়ে। উত্তর তীরের পথ দিয়ে উপ্‌শি যেতে হলে সেই ইগুর পুল পেরিয়ে সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে যেতে হয়।

নবনির্মিত লে-মানালী মোটরপথ এখন অনেকটা সুস্থিত হয়েছে। সেপ্টেম্বার-অক্টোবর মাসে নিয়মিত যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। জুলাই-অগাস্টে ভাল জীপ ভাড়া করেও লে থেকে কেলং যাওয়া যেতে পারে, দূরত্ব ৪৫৮ কিলোমিটার। কেলং থেকে মানালী ১১৭ কিলোমিটার। নিয়মিত বাস চলে।

উপ্‌শি থেকে পথটি দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে। এটি সুপ্রাচীন পথ। লাহুল যখন লাদাখের অংশ ছিল, তখন এই পথেই লাহুলের সঙ্গে লে যোগাযোগ রক্ষা করত। কারণ এই পথে লে থেকে লাহুলের জেলাসদর কেলং পৌঁছতে মাত্র একটি দুর্গম গিরিবর্ত্ম পেরোতে হয়। সেই গিরিবর্ত্মটির নাম বাড়ালাচা, উচ্চতা ১৬,০৪৭ ফুট।

পথটি উপ্‌শি থেকে প্রায় সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে রঙ নামে একটা জায়গায় পৌঁচেছে। সেখান থেকে দক্ষিণ-পুবমুখী হয়ে ডেবরিং, তারপরে আবার দক্ষিণমুখী হয়ে লুংতুর্ণা। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয়ে সারচু ও কিলাং হয়ে বাড়ালাচার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ১৭৫৩১ ফুট উঁচু ফিরত্‌সে লা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে

জাঁস্‌কার সদর পাদাম যাওয়া পথটির সঙ্গে মিলিত হয়ে বাড়ালাচায় আরোহণ করেছে। শুনেছি বাড়ালাচা গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে লাদাখ ও লাহুলসহ সমগ্র হিমালয়ের দৃশ্য অপরূপ। লাহুলে গিয়েছি, লাদাখে এলাম, কিন্তু সে দৃশ্য দর্শনের সুযোগ হল না। জানি না কবে হবে?

বাড়ালাচা পেরিয়ে পথটি পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে জিংজিংবার পৌঁচেছে। সেখান থেকে দারচা পাতসেও হয়ে সোজা দক্ষিণে কেলং। কেলং থেকে বাসে রোতাং গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে মানালী।* দারচা থেকে শিঙ্গো লা (১৬,৭২৮´) পার হয়ে পাদামের আরেকটি হাঁটাপথ আছে।**

সিন্ধু পেরিয়ে সিন্ধুর পরপারে আসা গেল। এপারেও সিন্ধুর তীরে তীরে একটি মোটরপথ পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত—সেই পালাম থেকে উপ্‌শি পর্যন্ত। কিন্তু এপারের পথ ভালো নয় বলে আমরা ওপারের পথে এলাম। সবাই এখন এই পথ দিয়েই উপ্‌শি যান।

ডানদিকে এই পথের ওপরই স্তাগ্‌না গুম্ফা। সেখান থেকে যাওয়া যায় মাথো গুম্ফায়, দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। কিন্তু মাথোর কথা থাক। হেমিসের কথা ভাবা যাক। আমরা হেমিস চলেছি—বিশ্ববিশ্রুত হেমিস গুম্ফা।

সিন্ধুর সেতু এবং স্তাগ্‌নার পথ ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে। বন্ধ্যা পাথুরে উপত্যকার ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, সামান্য চড়াই।

হেলে-দুলে গাড়ি চলেছে। দু-দিকেই বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। সেই একই দৃশ্য—প্রায় সমতল পাথুরে প্রান্তর, পাথরে পাথরে রঙের বাহার। ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকেই দূরে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। রোদে জ্বলছে, ওখানেও রঙের বাহার। সামনে একই দৃশ্য, তবে দূরে। আর কাছে কালো একটা পাহাড়।

সেই পাহাড়টা দেখিয়ে মানা বলে, "ওটাই হেমিসের পাহাড়।"

"কিন্তু ওপরে কোনো গুম্ফা দেখছি না তো!" মীরাদি বলেন।

"দেখতে পাবেন না।" মানা উত্তর দেয়। "হেমিস গুম্ফা পাহাড়ের ওপর নয়, পাহাড়ের কোলে—ওপাশে। এদিক থেকে দেখা যায় না।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। প্রবোধদা লিখেছেন—"তিনদিকের উঁচু পাহাড় অনেকটা 'ইউ' অক্ষরের মতো। হেমিস তার ক্রোড়বর্তী। সমগ্র লাদাখের মধ্যে একমাত্র হেমিস—যেটি পর্বতচূড়ায় অবস্থিত নয়, যেটি সহজ নাগালের মধ্যে। এর ওপর দিয়ে চলে গেছে দুই হাজার দু'শ' বছর। এই হেমিস তিব্বতের মন্ত্রগুরু।"

করুণ কথা বলে, অন্য কথা, "আচ্ছা আমরা না হয় বড় দল, ছ'শ' টাকা দিয়ে দুখানি জীপ ভাড়া করে এসেছি। কিন্তু যাঁরা দু-একজন লাদাখে আসেন, তাঁরা কিভাবে হেমিস দেখেন?"

মানা উত্তর দেয়, "উৎসবের সময় তো বটেই, পর্যটন ঋতুতে অর্থাৎ জুন-জুলাই

মাসে আসে এবং ফিরে যায়। তবে যাত্রীরা সেদিন 'শে', 'তিক্‌সে' কিম্বা 'স্তাগ্‌না' দেখতে পারেন না। অন্যদিন আসতে হয়।"

"শুধু তাই নয়", আমি বলি, "বাসখানি মাত্র ঘণ্টাদেড়েক হেমিসে দাঁড়ায়, তার আধঘণ্টা লেগে যায় যাতায়াতে। একঘণ্টার মধ্যে হেমিস গুম্ফা দেখা অসম্ভব। তাই অনেকেই ফিরে আসার বাস ফেল করে।"

"কেউ করেছিল নাকি?" স্বপন জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, আমাদের বিনীত।"

"পর্বতারোহী বিনীত দাশগুপ্ত?" বরুণ জিজ্ঞেস করে।*

আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ। দুজন সঙ্গীর সঙ্গে বিনীত বাসে করে হেমিস দেখতে এসেছিল। তারা খুবই তাড়াতাড়ি করেছে। তবু বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরে এসে দেখে বাস তাদের ফেলে রেখেই চলে গেছে।"

"তাঁরা বুঝি সেদিন গুম্ফার অতিথিশালায় থেকে গেলেন?"

"না। সেই রোদের মধ্যেই বিনীত সঙ্গীদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।"

"লে পর্যন্ত!" করুণ আঁতকে ওঠে।

একটু হেসে বলি, "না, কারু পর্যন্ত।"

"সেও তো সাড়ে সাত কিলোমিটার!"

"হ্যাঁ। সেখানে পৌঁছে ভাগ্যগুণে ওরা একখানি প্রাইভেট ট্রাক পেয়ে যায়। তাতে করেই লে ফিরে গিয়েছে।"

"মিলিটারি ট্রাক পায় নি?"

"পেয়েছে। কিন্তু মিলিটারি ট্রাক কখনও অসামরিক যাত্রী নেয় না।"

আমি থামতেই মানা আবার বলতে শুরু করে, "পর্যটন ঋতুতেও সবদিন বাস হেমিসে আসে না। হেমিসের বাস না পেলে দর্শনার্থীরা সাধারণতঃ শক্তির বাস ধরে কারু এসে সেখান থেকে হেঁটে হেমিসে আসেন। সেদিনটা গুম্ফার অতিথিশালায় রাত্রিবাস করে পরদিন দুপুর নাগাদ কারু ফিরে গিয়ে লে-গামী শক্তির বাস ধরেন। প্রায় সারা বছর লে থেকে দৈনিক শক্তির বাস যাতায়াত করে।"

"তার চেয়ে জীপ ভাড়া করে আসাই ভাল।" করুণ উপসংহার টানে।

মানা যোগ করে, "নিশ্চয়ই। এবং পর্যটন ঋতুতে ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে 'শেয়ার'-এ জীপে আসার সুযোগ জুটে যায়।"

কথায় কথায় কখন যে পাহাড়টার পরপারে চলে এসেছি খেয়াল করি নি। খেয়াল হতেই দেখি সামনের উপত্যকায় উৎসবের পরিবেশ—বহু লোকজন, ছোট বড় অনেক গাড়ি, দু-চারটি দোকান। আর সামনেই পাহাড়ের কোলে হেমিস—অপরূপ অবস্থান।

কিন্তু গুম্ফার কথা পরে হবে, আগে পাহাড়টার কথা বলে নিই। পাহাড়টার ওপারের চেহারার সঙ্গে এপারের চেহারার কোনো মিল নেই। ওপারে রুক্ষ ও

---

*লেখকের 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।

ধূসর এপারে সরস ও সবুজ, ওপারে মরুভূমি এপারে মরুদ্যান, ওপারে ভৈরবী এপারে অন্নপূর্ণা।

পাহাড়ের গায়ে, তার পায়ের কাছে এবং সামনের পাথুরে জমিতে প্রচুর বড় বড় গাছ এবং কিছু কাঁটাঝোপ। সেই পাথুরে জমিটা এই সমতল থেকে ধীরে ধীরে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে মিশেছে। ঐ ঢালু জায়গাটাই প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ের পাদদেশ। সেখান থেকেই গুম্ফা আরম্ভ হয়েছে। সেই ঢালের বুক বেয়ে পাহাড় থেকে একটি প্রশস্ত স্রোতস্বিনী নেমে এসেছে। তারই পাশ দিয়ে পাথুরে পথ। জীপ যেতে পারে। আমাদের গাড়ি উৎসবমুখর সমতলের ওপর দিয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলল।

বহু বাস ও ট্রাক এসেছে, সেগুলো সব এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু তাঁবু টাঙানো হয়েছে। সামনে একটা গাছের সঙ্গে সাইন বোর্ড—

'Hemis Restaurant and Camping site'

তার মানে তাঁবু নিয়ে এলে আমরাও এখানে ঘাঁটি পাততে পারতাম। শুধু তাই নয়, পর্যটন দপ্তর নাকি এসময় তাঁবু ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করে থাকেন।

আমাদের গাড়ি সমতলটুকু পেরিয়ে এলো। এবারে সেই পাথুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছি। পথের পাশে এবং সারা জায়গাটা জুড়ে ওক গাছের বন। এ গাছ লাদাখে আর কোথাও দেখি নি। এই উচ্চতায় বন্ধ্যা প্রকৃতির মাঝে এমন সবুজ জগৎ সত্যই বিস্ময়কর। যাঁরা এখানে গুম্ফা নির্মাণের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, তাঁদের নির্বাচন ক্ষমতাও বিস্ময়কর।

ভেবে অবাক হচ্ছি, এমন একটা নিভৃত স্থানে অবস্থিত হয়েও হেমিস হাজার হাজার বছর ধরে তিব্বত ও ভারতের মানুষকে 'এক ধর্মরাজ্যপাশে' বেঁধে রেখেছে। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে সরস্বতীর তপস্যা করেছে। তার গ্রন্থভাণ্ডারের খ্যাতি সুদূর জেরুজালেম পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে।

"জীপ নিয়ে এসেছি বলে এই পথটুকু আমরা গাড়ি করে উঠতে পারছি।" মানা হঠাৎ বলে ওঠে।

মীরাদি মাথা নাড়েন। বলেন, "হ্যাঁ, বাসে এলে নিচের মাঠে নামতে হত।"

"তারপরে এই চড়াই ভাঙতে হত, অনেকটা পথ।" মানা যোগ করে।

বনের ভেতরে এসে গাড়ি থামল। আর গাড়ি যাবার পথ নেই—পায়ে-চলা-পথ। আমাদের সামনে খানিকটা পাথুরে বনভূমি, তারপরে সেই স্রোতস্বিনী। তার ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘর আর গুম্ফা—হেমিস গুম্ফা।

আমরা গাড়ি থেকে নামি। বিভাস বলে, "নন্দা ও মানা দুজনেই সব জানে। আপনারা ওদের সঙ্গে গুম্ফায় চলে যান, গিয়ে নাচ দেখুন। আমি হরেন ও কালীকে একটু সাহায্য করছি। প্রেসার কুকারে খিচুড়ি রাঁধব, বেশি সময় লাগবে না। এখন একটা বাজে, আপনারা আড়াইটে নাগাদ চলে আসবেন। খেয়ে নিয়ে আবার যাবেন, তখন আমরাও সঙ্গে থাকব।"

"তাই ভাল।" আমরা কেউ কিছু বলার আগে তোতা বলে ওঠে। আমার একখানি হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "বাবা পরে যাবে। চলো আমরা যাই।"

অতএব চলতে শুরু করি। ইতিমধ্যে মহুয়া এসে আমার অপর হাতখানি কজা করেছে।

বিভাস আবার বলে, "জায়গাটা ভাল করে দেখে যান, ফিরে এসে চিনতে অসুবিধে না হয়।"

চারিদিক আরেকবার দেখে নিই। তারপরে এগিয়ে চলি। বনের ভেতর দিয়ে উঁচু-নিচু পাথুরে পথ। যেখানেই একটু সমতল পেয়েছে, যাত্রীরা সংসার পেতেছে। কেউ তাঁবু টাঙিয়েছে, কেউ ত্রিপল কিম্বা এ্যালকাথিন শীট, আবার কেউবা শুধুই কাপড়। কেউ স্টোভ নিয়ে এসেছে, কেউবা কাঠ যোগাড় করে পাথরের উনোন জ্বালিয়েছে—একবারে বনভোজন।

এখানে দেখছি অনেকখানি সমতল, তাই গুটিকয়েক তাঁবু। সামনে সাইনবোর্ড—

'Sea & Sky Travel welcomes You'

কোনো পর্যটন প্রতিষ্ঠান। ভালই হল এদের শিবিরটি আমাদের ভোজনস্থলীর নিশানা হয়ে রইল।

পায়ে-চলা-পথের দু-পাশেই বন। সারা অঞ্চলটা ছায়াশীতল। নইলে যা রোদ, গরম লাগত। নেই সেই লাদাখী ঝোড়ো হাওয়া, থাকলে এমন আরামে ঘুরে বেড়ানো যেত না। বারো হাজার ফুট উঁচুতে এমন বাসন্তী আবহাওয়া—ভাবা যায় না। হেমিস গুম্ফার উচ্চতা ৩৬৫৭ মিটার অর্থাৎ ১১,৮৮৫ ফুট।

বনপথ ছাড়িয়ে সমতলে পৌঁছলাম—সামনেই গুম্ফা। কিন্তু পৌঁছতে সময় লাগবে। এখানে মেলা মিলেছে—হেমিস গুম্ফার বাৎসরিক উৎসবের মেলা। সারা লাদাখ থেকে লোক এসেছে। এসেছে অসংখ্য দেশী-বিদেশী পর্যটক। অতএব প্রচুর ভিড়। দোকানোর সংখ্যাও অনেক—মনোহারী, খেলনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, জামাকাপড়, শয্যাদ্রব্য, চা, খাবার ও ভাজীর দোকান। পাথরসহ নানা স্থানীয় জিনিসের বিপণি। কেনাকাটাও চলেছে জোর কদমে।

কিন্তু খদ্দেরদের কথাবার্তা ছাপিয়ে মাইকের শব্দ এসে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...' নয়, 'মেহবুবা, মেহবুবা...'।

দুঃখ পাওয়া অর্থহীন। কেঁদুলি থেকে কুম্ভমেলা, কামাখ্যা থেকে বেট-দ্বারকা—ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কত বিচিত্র মেলা দেখলাম, কিন্তু কোনো মেলাতেই এই একটি বস্তুর অভাব দেখতে পেলাম না। বরং দিন দিন মাইকের প্রভাব বাড়ছে। তাই আজ হেমিস গুম্ফায় এসেও 'শোলে' ছবির গান শুনতে হচ্ছে।

মেলার মধ্য দিয়ে চলেছি কিন্তু দোকানপাট দেখছি না, দেখছি মেলার মানুষ—বিশেষ করে লাদাখী মেয়েদের। দেখছি তাদের পোশাকের বাহার। যেমন রঙীন পোশাক, তেমনি চোখ-ঝলসানো অলঙ্কার। গলায় কত রকমের মালা, হাতে পায়ে কোমরে কানে নাকে কি বিচিত্র সব গয়নাগাঁটি। আর মাথায়? সাপের ফণার আকারে

সুবিশাল টুপি। সারা টুপিতে অসংখ্য পাথর বসানো।

নন্দা বলে, "ওর মধ্যে বহু আসল ফিরোজা পাথর আছে। এর এক-একটি টুপির দাম দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়।"

প্রায় সব সুন্দরীর কোমরেই সেই ভেড়া কিম্বা হরিণের চামড়াখানি বাঁধা রয়েছে, পেছনে ঝুলছে।

মেলা পেরিয়ে গুম্ফার সামনে এলাম। অবস্থানের দিক থেকে শঙ্কর গুম্ফার সঙ্গে হেমিসের কিছু মিল আছে। আমরা নিচের সমতল থেকে অনেকটা উঠে এসেছি, কিন্তু যে পাহাড়টা বহির্জগৎ থেকে হেমিসকে আড়াল করে রেখেছে, এখনও তার ওপরে আরোহণ করি নি। শঙ্কর গুম্ফার মতো হেমিসও পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ের গায়ে নির্মিত। তবে এখানকার গুম্ফা এবং পাহাড় দুই-ই অনেক বড়। আর পাহাড়টা অনেকটা ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতো, সেই খাঁজের মাঝখানে গুম্ফা, তাই সোজাসুজি সামনে না এলে হেমিসের বিশালত্ব বোঝা যায় না।

গুম্ফার সামনে মণি-দেওয়াল এবং কয়েকটি চোর্তেন, পাশে পাহাড়ের গায়ে কিছু বাড়ি-ঘর আর পাদদেশে কিছু চাষের ক্ষেত। সেই স্রোতস্বিনী আর বনভূমি। আবার বালি—অপরূপ অবস্থান।

সিংহদরজার সামনে আসি। এটি গুম্ফার উত্তর-পূর্ব দ্বার। কাঠের সুবিশাল দ্বার। এর বয়স নাকি সহস্রাধিক বৎসর।

গুম্ফার গড়ন অনেকটা সেকালের রাজবাড়ির মতো। দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। একটা অভূতপূর্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আমি প্রবেশ করেছি হেমিস গুম্ফায়—লাদাখের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়ে, মানবত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের পাঠমন্দিরে। আমি ভাগ্যবান, ধন্য আমার জীবন।

তেমনি কাঠ পাথর আর মাটির বাড়ি। ছোট ছোট ঘর, নিচু ছাদ, জানলা নেই। আলোর অভাব এবং সেঁতসেঁতে। আমরা গুম্ফার আঙ্গিনায় এসে পৌঁছলাম। পাথর বাঁধানো সুবিরাট অঙ্গন। বোধ করি হাজারখানেক বর্গমিটার জুড়ে।

আঙ্গিনার তিন দিকে দোতলা বাড়ি—সামনে খোলা বারান্দা। অতিথিশালা, রন্ধনশালা ও লামাজীদের বাসগৃহ। আঙ্গিনার অপরদিক জুড়ে মূল গুম্ফা—সুবিশাল তিনতলা বাড়ি। আবার বলছি—রাজবাড়ির মতো। এদিকটায় কাশ্মীরী ঢঙে তৈবি কাঠের খোলা বারান্দা, ওপরের দুটি তলা 'ব্যালকনী'র মতো একটুখানি সামনে প্রসারিত।

প্রাঙ্গণ থেকে গুম্ফায় উঠবার দু'সারি সিঁড়ি। ওপাশের সিঁড়ির সামনে পাশাপাশি দুটি পতাকাদণ্ড। শুনেছি হেমিস পতাকা সম্পদে বিশেষ সম্পদশালী। এই গুম্ফায় প্রচুর প্রাচীন এবং মূল্যবান পতাকা আছে। একটি পতাকা আছে, যেটি বিশ্বের বৃহত্তম পতাকাগুলির অন্যতম। কিন্তু সেটি এগারো বছর বাদে বাদে উৎসবেব সময় টাঙানো হয়। দুর্ভাগ্যের কথা, গত বছর টাঙানো হয়ে গেছে। অতএব আবার টাঙানো হবে দশ বছর বাদে।

কিন্তু গুম্ফা পরে দেখা যাবে, এখন নাচ দেখে নিই। হেমিস উৎসবের মুখোশনৃত্য,

যা দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ সমবেত হয়েছে এই প্রাঙ্গণে। সেই অভিনব নৃত্যলীলা চলেছে। প্রাঙ্গণের সর্বত্র মানুষ, বারান্দায় মানুষ, ছাদে মানুষ—শুধু মানুষ আর মানুষ।

দর্শনার্থীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিদেশী। তাঁরাই দামী টিকেট কিনে বেছে বেছে ভাল জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছেন। আমাদের পয়সা নেই, আমরা সম্মানিত অতিথিও নই, তার ওপরে দেরিতে এসেছি। কে আমাদের জায়গা দেবে?

নন্দা বলে, "গতবার আমরা ঐ অতিথিশালার বারান্দায় বেশ ভালো জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?"

"ঐ দোতলায়?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ওখানে তো দেখছি সবাই বিদেশী। বোধ হয় বিশেষ অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত।" আমি আপত্তি করি।

কিন্তু নন্দা বলে, "তাই তো যেতে চাইছি। ওখানে কেউ যেতে সাহস করে না, কিন্তু গিয়ে পড়লে ওঁরা পেছনে দাঁড়াতে দেন—গত বছর দিয়েছিলেন।"

"বৌদি যখন বলছেন, চলুন না চেষ্টা করে দেখা যাক।" বরুণ বলে, "এত আশা করে ছুটে এলাম, আর ছবি নিতে পারব না? তাছাড়া সুশান্তদা* বলেছেন, ঐ বারান্দা থেকেই নাকি সবচেয়ে ভাল ছবি আসে।"

হাসি পায় আমার, ওর শুধুই ছবি। ছবি তোলার জন্য বরুণ বোধ করি নরক ঘুরে আসতেও আপত্তি করবে না।

সুতরাং নন্দার সঙ্গে এগিয়ে চলি। অতিথিশালার ভেতরে আসি। একটা কাঠের মই বেয়ে দোতলায় উঠি। কেউ বাধা দেয় না। বারান্দায় আসি। দু-চারজন সাহেব-মেম বিরক্ত হন। কিন্তু তাড়িয়ে দেন না। আমরা সারি বেঁধে তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে যাই। ওখান থেকে নাচের আসর সত্যি চমৎকার দেখা যাচ্ছে।

আসর বসেছে নিচের অঙ্গনে, মাঝখানে নয় একপ্রান্তে, ঠিক আমাদের সামনে। আসরের একদিকে একখানি রেশমের বিরাট পর্দা টাঙানো। পর্দায় পদ্মসম্ভবের ছবি আঁকা। তাঁরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই নৃত্যনাট্য। পর্দার সামনে আঙ্গিনায় একখানি কার্পেট পাতা। তার ওপরে কয়েকজন লামাজী দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ করি এই উৎসবের পরিচালকবৃন্দ এবং লাদাখের বিভিন্ন গুম্ফার মহামান্য প্রধান লামাগণ। তাঁদের পাশে বাজনদারের দল। বিরাট বিরাট বাঁশি ঢাক ঢোল ঘণ্টা ও কাঁসর বাজছে।

আসরের একপাশে মুখোশ পরিহিত শিল্পীরা বসে রয়েছেন। মুখোশগুলো সবই ভয়ঙ্কর, কোনটি বেশি কোনটি কম। কোনটি দেবতার মুখোশ, কোনটি দৈত্যের,

*প্রখ্যাত আলোকচিত্রকর বন্ধুবর সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি কয়েক বছর আগে এই উৎসবের ওপরে একখানি 'তথ্যচিত্র' তুলে নিয়ে গিয়েছেন। সুশান্তবাবু আমাদের তমসা উপত্যকা ও 'সিনিয়লচু' অভিযানের সদস্য ছিলেন ('তমসার তীরে তীরে' ও 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।)

কোনটি বা জীবজন্তুর। সবারই রঙীন পোশাক।

তাঁদেরই কয়েকজন আসরে নাচছেন। মাথা দুলিয়ে, হাত নেড়ে, ঘুরে-ফিরে বাজনার তালে তালে নাচ চলেছে। কখনও দেবতারা নাচছেন, কখনও দৈত্যরা, কখনও বা দু-দল একত্রে অর্থাৎ যুদ্ধ চলেছে। দেবতাদের পায়ে জুতো, দৈত্যদের খালি পা। মাঝে মাঝে আবার রঙীন পোশাক পরা মুখোশহীন শিল্পীরাও আসরে এসে নেচে যাচ্ছেন। সবারই মাথায় সাদা-কালো টুপি।

দু-দিন ধরে হেমিসে এই নাচের উৎসব হয়। গতকাল উৎসব শুরু হয়েছে, আজ শেষ। উৎসবের কয়েকদিন আগের থেকেই বিভিন্ন গুম্ফা থেকে শিল্পীরা এখানে আসতে শুরু করেন। কয়েকদিন ধরে মহড়া চলে—একেবারে স্টেজ রিহার্সেল। তখনও অনেক পর্যটক এসে দেখে যান। বিদেশীরা কেউ কেউ এসে ঘাঁটি গাড়েন। তাঁদের সঙ্গে থাকে ক্যামেরা এবং টেপরেকর্ডার। বরুণকে ঠাট্টা করা অনুচিত। এখানেও আমার সামনে সবাই ক্রমাগত ছবি তুলে যাচ্ছেন। কত বিচিত্র ধরনের ছোট-বড় ক্যামেরা। মহিলারাও পেছিয়ে নেই। বরুণ তাঁদের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

আগেই বলেছি এই নৃত্যনাট্য যুগাবতার পদ্মসম্ভবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, সংক্ষেপে বলা হয় পদ্মসম্ভব-নৃত্য। নাচের বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে দুষ্কৃতের সঙ্গে সুকৃতের যুদ্ধ—দেবাসুরের সংগ্রাম। পদ্মসম্ভবের বিভিন্ন অবতারগণ ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ পরে রাক্ষস, অপদেবতা, দৈত্য এবং পিশাচদের সঙ্গে পৃথক পৃথক যুদ্ধ করছেন। পদ্মসম্ভবের কাছে রুতা নামক দৈত্যের পরাজয় এই নৃত্যনাট্যের একটি প্রধান বিষয়বস্তু। গুরু ত্রাক্‌পো এবং যমরাজের নৃত্যনাট্যে বিশেষ ভূমিকা আছে। গুরু ত্রাক্‌পো একাই নাকি সব অপদেবতাদের সাবাড় করে দিতে পারেন।

আবার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু নাচের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সকাল দশটা নাগাদ নাচ শুরু হয়েছে, চলবে গোধূলি পর্যন্ত। মাঝখানে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ঘণ্টাখানেক বন্ধ ছিল।

বাজনার তালে তালে নাচ চলেছে। শিল্পীরা হেলে-দুলে হাত পা ও মাথা নেড়ে ঘুরে-ফিরে নাচছেন। কখনও লাফালাফি করছেন—দেবাসুরের সংগ্রাম চলেছে। আমরা দেখছি। মাঝে মাঝে মাইকে ইংরেজীতে নাচের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হচ্ছে, আমরা শুনছি।

মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আর অপলক নয়নে দেখছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠি। কেউ কাঁধে হাত রেখেছে। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি—টৌলি! বাসের সহযাত্রী বেলজিয়ামবাসী টৌলি বাইগুার।

শুধু টৌলি নন্‌, তাঁর সঙ্গে রোণাল্ড এবং কারিণও রয়েছেন। ওঁদের চোখেমুখে আনন্দ, আমরাও আনন্দিত। আবার দেখা হয়ে গেল।

কারিণ পকেট থেকে চকোলেট বের করে আমাদের দেয়। আস্তে আস্তে কথা বলি। আমাদের খবর দিয়ে ওঁদের খবর নিই। ওঁরা গতকাল সকালেই লে থেকে সোজা এখানে চলে এসেছেন। আগামীকাল স্তাগ্‌না, মাথো, তিক্‌সে ও 'শে' দেখে

লে ফিরে যাবেন। তারপরে শুরু হবে লাদাখের অন্যান্য দর্শন।

টোলি বলেন, "আমাদের শিবির কাছেই, এই গুম্ফার পাশে। চলুন না, একবার ঘুরে আসবেন।"

ভাই-বোন এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায়নি। এবারে মহুয়া বলে, "জেঠু, মজারসাহেব কোথায়, সে এখানে আসে নি?"

টোলি বুঝতে পারেন না ওর প্রশ্ন। বরুণ বুঝিয়ে দেয়। তিনি উৎসাহিত হন। ইংরেজীতে মহুয়াকে বলেন, "শিবিরে আছে। কাছে, খুবই কাছে। তোমরা যাবে তার সঙ্গে দেখা করতে?"

তোতা ও মহুয়া মাথা নাড়ে। আমরা হেসে উঠি। নন্দা ঘড়ি দেখে। বলে, "চলুন তাহলে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই রান্না হয়ে গেছে। আমরা না গেলে ওরা আসতে পারবে না।"

মই বেয়ে নিচে নেমে আসি। টোলি আর রোণাল্ড কোলে করে মহুয়া ও তোতাকে নামান। জনারণ্য ভেদ করে এগিয়ে চলি। অবশেষে সিংহদ্বারে এসে পৌঁছই।

নন্দা বলে, "আপনারা ওনাদের শিবির দেখে তাড়াতাড়ি খাবার জায়গায় চলে আসুন, তোতা আর মহুয়াকে নিয়ে যান। আমরা চলে যাচ্ছি।" মীরাদি, মানা ও তরুণকে নিয়ে সে চলে যায়। আমরা টোলিদের অনুসরণ করি।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না। গেটের বাইরে এসেই দেখা হয়ে যায় ওঁদের সঙ্গে—জন পিটার ও মেরী টম্‌সনের সঙ্গে। দেখা হবেই, আজ যে লাদাখের সব রাস্তা এসে মিলিত হয়েছে এখানে—এই হেমিসে।

সুতরাং ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অবাক হবার কিছু নেই। অবাক হলাম অন্য কারণে। সমাজবিজ্ঞানের জার্মান ছাত্রী স্বল্পবাক রোজালিন স্মিট ওদের সঙ্গে। একে ওরা ইংরেজ আর রোজালিন জার্মান, তার ওপরে ওদের সঙ্গে রোজালিনের প্রকৃতিগত কোনো মিল নেই। ওরা বাসে বসে হয় ঘুমিয়েছে, নয় খেয়েছে, না হয় ঢলাঢলি করেছে। আর রোজালিন হয় বই পড়েছে, নাহয় লাদাখকে দেখেছে। সে অধ্যয়নশীলা আত্মসচেতন ও অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। ওদের সঙ্গে তো রোজালিনের বন্ধুত্ব হবার কথা নয়!

কথা না হলেও হয়েছে। এবং ওরা তিনজনেই আমাদের দেখে খুশি হয়। কুশল বিনিময়ের পরে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় উঠেছো?"

পিটার উত্তর দেয়, "নিচে, মোটরস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা থ্রি-মেন ট্যুরিস্ট্‌ টেন্ট নিয়েছি।"

তার মানে রোজালিন তার সঙ্গে এক তাঁবুতে বাস করছে। কিন্তু তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। তাই রোজালিনকে অন্য প্রশ্ন করি। বলি, "তোমার 'সোস্যাল-স্টাডি' কেমন চলছে?"

"ওয়াণ্ডারফুল!" আনন্দে সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "সত্যি, যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি সুন্দর তোমাদের দেশ ও সমাজ। আর এই হেমিস গুম্ফা, এর তুলনা

নেই।"

যাক গে, মেয়েটার ভারত-ভ্রমণ তাহলে সার্থক হল। তাকে আবার কুলুর দশেরা উৎসবে যাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিই ওদের তিন বন্ধুর কাছ থেকে।

চলতে চলতে ভাবি—জন পিটারের বান্ধবী সংগ্রহের শক্তি সত্যই তারিফ করবার মতো। কিন্তু তার সিনিয়ার গার্লফ্রেণ্ড মিস্ টম্‌সনের মুখে যে গ্রীষ্মের সিঁদুরে মেঘের ছায়া দেখে এলাম। ভয় হচ্ছে কালবৈশাখীর ঝড়ে থ্রি-মেন টেন্ট্ উড়ে না যায়!

মেলার ভেতর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে টোলি ডানদিকের পায়ে-চলা-পথ ধরল—একটু চড়াই পথ। মিনিট দুয়েক বাদে আমরা পৌঁছে গেলাম ওদের শিবিরে।

চমৎকার একফালি পাথুরে সমতলে আটটি ঝক্‌ঝকে রঙীন তাঁবু। সাতটি 'টু-মেন' এবং একটি 'মেস্' টেন্ট্। মেস্-টেন্টের গায়ে ফেস্টুন—

'EXPLOTRA

Trans Himalayan Agency, Leh, Ladakh.'

মেস্-টেন্টে রান্না হচ্ছে। জাঁ ও আনা সেখানে দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছিল। আমাদের বিশেষ করে তোতা ও মহুয়াকে দেখতে পেয়েই জাঁ ছুটে আসে। দু ভাইবোনও দৌড়ে গিয়ে তার দুখানি হাত ধরে ফেলে। আনাও কাছে আসে। জাঁ তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি করমর্দন করবার জন্য হাত বাড়াই।

কিন্তু আনা তার দু-হাত জোড় করে মুখের সামনে তুলে ধরে বলে, "নমস্তে।"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কোনরকমে সামলে নিয়ে প্রতিনমস্কার করি।

আনা খিল খিল করে হেসে ওঠে। ভাবখানা—কেমন জব্দ!

ওঁর হাসি সবার মধ্যে হাসির হাওয়া বইয়ে দেয়।

হাসি থামলে সে সহসা বলে ওঠে, "থুগিশি (Thugishi)!"

তার বক্তব্য বুঝতে পারি না, তাই বরুণের দিকে তাকাই। না, তারও দেখছি একই অবস্থা। তাহলে তো আনা ফরাসী বলছে না!

সে আবার হাসতে শুরু করে। টোলিরাও হাসছে। কারণ বুঝতে পারছি না।

একটু বাদে আনা হাসি থামিয়ে আমাদের বলে, "You are Indians?"

"Yes." আমরা মাথা নাড়ি।

"But you don't know Ladakhi!"

চুপ করে থাকি, কি বলব?

সে বলে, "But I know. Thugishi means—Thank you."

আবার হাস্যরোল। এবারে আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিই।

কিন্তু আনার দুষ্টুমি থামে না। সে আবার বলে ওঠে, "Solja don!"

আমাদের অবস্থা পূর্ববৎ। কিন্তু এবারে সে আর বেশিক্ষণ বিব্রত করে না। বলে, "Solja don means, please take tea."

আমরা আবার হেসে উঠি। এবং সম্মতি জানাবার আগেই জনৈক লাদাখী পরিচারক

চা নিয়ে আসে। আনা বোধ করি আগেই নির্দেশ দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, চায়ের সঙ্গে আমাদের জন্য বিস্কুট এবং তোতা ও মহুয়ার জন্য চকোলেট।

কিন্তু তাদের সেদিকে নজর নেই। তারা তাদের মজার সাহেবের সঙ্গে মজার খেলায় মেতে উঠেছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আনাকে ধন্যবাদ দিই। বলি, "তোমার অভিনব প্রচেষ্টা ভারত ও বেলজিয়ামের সম্পর্ক মধুরতর করে তুলবে, য়ুরোপে হিমালয় এবং কারাকোরাম আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

প্রত্যুত্তরে আনা আবার বলে ওঠে, "থুগিশি।"

ইতিমধ্যে বাসের অন্যান্য সহযাত্রীরাও তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় হয়। এঁরা সবাই খুশি হয়েছেন আমাদের দেখে।

করুণ তাগিদ দেয়, "শঙ্কুদা, খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই বরুণ বলে ওঠে, "ব্রহ্মচারীদার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে!"

আমি ও স্বপন হেসে উঠি। বরুণ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত।

অপ্রস্তুত এরাও। বরুণের বাংলা কথা ওদের বোঝার কথা নয়। তাই তাড়াতাড়ি বরুণ ফরাসীতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আনা ইংরেজীতে করুণকে বলে, "আপনারা এখানেই লাঞ্চ করে নিন না। আমাদের খাবার বোধ হয় আপনাদের খুব খারাপ লাগবে না—চাপাতি, ভেজিটেব্‌ল স্যুপ, ডিমের কারী আর পুডিং।"

ওর কথা শুনে করুণের দিকে তাকিয়ে আমরা আবার হেসে উঠি।

আনা অপ্রস্তুত। বরুণ করুণকে দেখিয়ে বলে, "He is Bramhachary. He is bachelor and vegetarian. He does'nt take egg-curry and pudding."

"Let him take Chapati and Soup."

আনার আন্তরিকতা তুলনাহীন। কিন্তু আমরা কেমন করে ওকে বলি যে করুণকৃষ্ণের কাছে তোমাদের স্যুপ তো নিরামিষ নয়ই, এমন কি হয়তো বা চাপাতিও নয়।

অতএব আনাকে বোঝাতে হয়, আমরা এখানে লাঞ্চ করে নিলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, কারণ বিভাসরা আমাদের খাবার নিয়ে বসে আছে। আমরা না গেলে ওরা গুম্ফায় আসতে পারবে না।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। টৌলি এবং রোণাল্ড সঙ্গী হয় আমাদের। বাকি সবাই সমস্বরে বলতে থাকেন, "কাল বিকেলে আমরা লে ফিরে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে—থুগিশি।"

আমরাও বলি, "আবার দেখা হবে...থুগিশি।"

হাত নেড়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলি।

হঠাৎ টৌলি বলেন, "আমি আসছি।" তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর তাঁবুতে ঢোকেন।

আমরা এগিয়ে চলি। চলতে চলতে আনার ভাবনাটাই পেয়ে বসে আমাকে।

আশ্চর্য মেয়ে! কিই বা বয়স? কিন্তু কি বিস্ময়কর সাহস এবং অধ্যবসায়! বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতি কি অসীম মমত্ব! স্বামীকে চাকরি ছাড়িয়ে ব্যবসায় নেমে পড়েছে। সুদূর বেলজিয়াম থেকে লাদাখে এসে লাদাখী শিখতে শুরু করেছে। এমন মেয়ে আমার দেশেও হয়তো হতে পারে কিন্তু য়ুরোপে হামেশাই হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাবার পরেও য়ুরোপ বিশ্বের নেতৃত্ব করছে। আর তার কারণ এই আনার মতো মেয়েরা—যে হাত শিশুর দোলনা দোলায়, সেই হাত জাতিকে শাসন করে।

টোলি ছুটে এসে আমাদের ধরে ফেলেন। তাঁর হাতে লাদাখের ওপর লেখা সেই ফরাসী গাইডবুকখানি। সেদিন বরুণ বইখানির নাম-ধাম লিখে নিয়েছিল। বোধ করি ভেবে রেখেছে, আগামী বছর সে যখন প্যারী যাবে, তখন কিনে আনবে।

কিন্তু টোলি বইখানি বরুণের হাতে দিয়ে বলেন, "My humble presentation to an Indian friend."

বরুণ লজ্জা পায়। বলে, "না, না, আপনি বেড়াতে এসেছেন, এই বই ছাড়া আপনার চলবে কেমন করে!"

"আমার এক সহযাত্রীর কাছে বইখানি আছে, আমার অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আমি এতে আপনার নাম লিখে দিয়েছি।"

বরুণের হাত থেকে বইখানি নিয়ে খুলে দেখি লেখা রয়েছে—

'To

Monsieur Barun Ray
Indian Artist, Calcutta,
With best compliments from:
Toly Binder,
me des Massennerees 7,
1477 Maransart, (Tel: 02/633 2185)
Belgium.'

ফিরে আসি গাড়ির কাছে। বিভাস বিরক্ত। বলে, "সেই কখন থেকে বসে আছি পথ চেয়ে!"

"আমরা সেজন্য সত্যই দুঃখিত।" আমি বলি, "কিন্তু খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি তে ?"

"হয়ে যেত, তবে হতে দিই নি। ঐ দেখছেন না স্টোভ জ্বলছে!"

"থুগিশি।"

করুণ, বরুণ ও স্বপন হেসে ওঠে।

বিভাস বিভ্রান্ত। বলে, "মানে?"

"Thank you." টোলি উত্তর দেন।

বিভাস ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু এরা কোথায় লাদাখী শিখে এলো?"

"মিসেস আনা লুই আমাদের টীচার।"

"যাক্ গে, এবারে খেতে বসুন।"

আর কথা না বাড়িয়ে হাত ধুয়ে বসে পড়ি।

টোলি আর রোণাল্ডকে বিভাস বলে, "আপনারাও বসুন!"

"কিন্তু আমাদের তো লাঞ্চ হয়ে গেছে।"

"তা হোক্ গে, তবু একবার বসুন। একটু চেখে দেখুন।"

ওঁরা আর আপত্তি করেন না।

কিই বা খাবার! খিচুড়ি আলুর পাকোড়া ওমলেট আর আচার। তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল রোণাল্ড এবং টোলি। খেতে খেতে কেবলি বলেন, "তোমাদের রান্না সত্যিই সুস্বাদু, তোমরা ভারতীয়েরা প্রকৃতই ভোজন-বিলাসী।"

মনে মনে ভাবি, কথাটা সব ভারতীয়দের সম্পর্কে সত্যি কিনা জানি না, তবে বাঙালীদের বেলায় মিথ্যে নয়। আর তাই আমাদের এই দুর্দশা।

কথায় কথায় কালী বলে, "রান্নার জায়গাটা বড় ভাল—ছায়া আছে, জল আছে, এখানে ভিড় কম। কেবল একটা ঝামেলা হয়েছে।"

"কি?"

"মাঝে মাঝেই মেলার মানুষ টাকা নিয়ে খিচুড়ি কিনতে এসেছে।"

"অনেক কষ্টে বোঝাতে হয়েছে, এটা হোটেল নয়।" বিভাস যোগ করে।

"তা খুলে ফেললেই তো পারতিস!"

"এ জানলে কিছু বেশি চাল-ডাল ও চা চিনি দুধ নিয়ে আসতাম। লাভ থেকে ট্যাক্সি ভাড়াটা উঠে আসত।"

"তার মানে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুই-ই হত। সামনের বছর তাহলে তাই করিস।"

জানি না পরামর্শটা বিভাসের পছন্দ হল কিনা। তবে তারপরেই সে বলে উঠল, "তোতা আর মহুয়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমরা এগোচ্ছি। আপনারাও আসুন। হরেন ও কালী, ড্রাইভারদের খাবার দিয়ে নিজেরা খেয়ে নাও। তারপরে বাসনপত্র ধুয়ে গাড়িতে রেখে তোমরাও চলে এসো গুম্ফায়। মানা থাকছে এখানে, সে তোমাদের নিয়ে যাবে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে, চা বানাবে। ঠিক ছটায় গাড়ি ছাড়বে।"

হরেন ও কালী কথামতো কাজে লেগে যায়।

আমরা খেয়ে নিয়ে ফিরে চলি গুম্ফায়। একটু বাদে পেছনে একটা শব্দ শুনে সচকিত হই। গাড়ির শব্দ। এখানে গাড়ি! এ তো পায়ে-চলা-পথ!

পেছন ফিরি। সত্যিই গাড়ি, তবে মোটর নয়, মোটর-সাইকেল। গাড়ি বলা যায় বৈকি। অনেকে তো শুধু সাইকেলকেই গাড়ি বলেন, এ তো মোটরযুক্ত সাইকেল।

তাড়াতাড়ি পাশে সরে দাঁড়াই। একখানি নয়, দুখানি মোটর-সাইকেল। প্রথমখানিতে একজন বিদেশী, দ্বিতীয়টিতে দুজন ভারতীয়।

আমাদের ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ঝরণার তীরে গাড়ি থামায় ওরা। ওখানে একটুকরো

সমতল রয়েছে। তিনজন মানুষ হলে কি হবে, সঙ্গে কিন্তু সব আছে—তাঁবু, এয়ার-ম্যাট্রেস, স্লীপিং ব্যাগ, বাসনপত্র, তেলের টিন এবং কয়েকটা কিট্‌। প্রথম গাড়িখানির নাম্বারপ্লেটে 'G.B.' লেখা দেখে বুঝতে পারছি আরোহী ইংরেজ, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িখানি কি পশ্চিমবঙ্গের? নম্বর দেখে তো তাই মনে হচ্ছে!

ওরা কি বাঙালী? চেহারা এবং পোশাক দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই।

বরুণ বলে, "আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি জেনে আসছি।" সে এগিয়ে যায় ওদের কাছে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

একটু বাদে বরুণ ফিরে আসে। আমরা আবার চলা শুরু করি। চলতে চলতে বরুণ বলে, "আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়, ওরা দুজনেই বাঙালী, কলকাতা থেকে এসেছে।"

"ঐ ইংরেজ যুবকের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, ইংরেজটি মোটর-সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে। কলকাতায় তার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়। তারপরে ওরাও ঘর ছেড়েছে। গয়া, রাজগীর, নালন্দা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, জম্মু দেখে পরশু সন্ধ্যায় শ্রীনগর পৌঁচেছে। হেমিস উৎসবের কথা শুনে গতকাল সকালে শ্রীনগর থেকে আবার বেরিয়ে পড়েছে। এইমাত্র এখানে পৌঁছল। আজ এখানেই থাকবে, আগামীকাল লে ফিরবে। যাবার পথে বলতাল হয়ে অমরনাথ দর্শন করবে। তারপরে কাশ্মীর থেকে অমৃতসর যাবে। সেখান থেকে ইংরেজটি পাকিস্তানে চলে যাবে, আর ওরা দুজন ফিরে যাবে কলকাতায়।"

বঙ্গ-সন্তানদের জন্য গৌরব বোধ পরি। গর্বে আমার বুকখানি ভরে ওঠে।

গুম্ফার তোরণে পৌঁছে যাই। টৌলি ও রোণাল্ড বিদায় নেন। বলেন, "আমরাও ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আপনাদের গাড়ির কাছে আসব। আনা ও কারিণকে নিয়ে আপনাদের বিদায় জানাতে আসব। আমরাও চা খাবো, বেশি করে চা বানাতে বলবেন।"

সানন্দে সম্মত হই। করমর্দন করে ওঁরা শিবিরের দিকে চলে যান, আমরা গুম্ফায় প্রবেশ করি।

এ তো গুম্ফা নয়, গোলকধাঁধা। পথ খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিলের। পরিচিত পথ হারিয়ে ফেলেছি। কেবল ঘরের পরে ঘর। আমরা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেছি। এখানে এখনও নৃত্যলীলা চলেছে। ভিড় কিছুমাত্র কমে নি।

কোনরকমে ভিড় ঠেলে সিঁড়ির কাছে আসি। বারো ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় দুটি পতাকাদণ্ড—দুটিতেই বৃহৎ প্রার্থনা-পতাকা বা টঙ্কা (অনেকে 'থঙ-কা' উচ্চারণ করে থাকেন) বাতাসে উড়ছে। সিঁড়ির ওপরে দরজার সঙ্গে রঙীন ছবি আঁকা রেশমের পর্দা ঝুলছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে মূল গুম্ফায় উঠে আসি। প্রাসাদের মতো সুবিশাল বাড়ি, কিন্তু বড়ই জরাজীর্ণ।

তাহলেও আবার আমার সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। এই সেই সরস্বতীর সাধনপীঠ, যেখানে সুদূর জেরুজালেম থেকে স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র এসে অধ্যয়ন করেছেন।

তখন হয়তো এ বাড়িটা এমন ছিল না। কারণ ঐতিহাসিকরা বলেন—স্যালওয়া গোটসাঙপা (Syalwa Gotsangpa) নামে জনৈক ভক্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বাড়ি তৈরি আরম্ভ করেন, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা সেঙে নামগিয়াল এর নির্মাণকার্য শেষ করেন। কিন্তু এখানে এই গুম্ফা ছিল, ছিল খ্রীষ্টপূর্ব যুগে, এই একই জায়গায়। সুতরাং সেই মহামানবের পদশব্দে প্রতিদিন মুখরিত হয়েছে এই সাধনপীঠ। আজও তাঁর পদধূলি মিশে আছে এই পুণ্যতীর্থের মাটিতে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে হেমিসের বাতাসে। আর আমরা এখানে এসে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। কিন্তু সংস্কার সামান্যই হয়েছে। যতদূর শুনেছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজা প্রতাপ সিংহের আমলে এবং ১৯২২ সালে অভেদানন্দজী যখন এখানে আসেন, তখন কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। কিন্তু তার পরেও তো বহু বছর কেটে গেল। এভাবে অবহেলা করলে যে এই ঐতিহাসিক ও পবিত্র তীর্থের ধ্বংস অনিবার্য। কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবার সাধ এবং সাধ্য আছে বলে মনে হয় না। অতএব সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এসেছি। দু-পাশের দেওয়ালে রঙীনচিত্র, তবে ক্ষীয়মাণ। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

নিজেদেরই দেখে নিতে হচ্ছে। কারণ দেখাবার জনের বিশেষ অভাব। শুনেছি শিক্ষানবীশদের নিয়ে মোটে জন-পঞ্চাশেক ছোট-বড় লামা এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বালক। বয়স্করা অধিকাংশই উৎসবে ব্যস্ত।

মনে হচ্ছে উৎসবের সময়টা গুম্ফা দর্শনের উপযুক্ত সময় নয়। পর্যটকরা অবশ্যই উৎসব দেখতে আসবেন। কিন্তু যাঁরা সেই সঙ্গে গুম্ফাটি ভাল করে দেখতে চান, এখানকার গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে চান, তাঁদের উৎসবের আগে কিম্বা পরে অন্তত গোটাদুয়েক দিন কাটাতে হবে এখানে।

আমাদের সে সুযোগ নেই। শুধু তাই নয়, ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে গুম্ফা দর্শন শেষ করতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি বাঁদিকের মন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরকে কেউ বলেন ল্যাখাং (Lakhang), কেউবা বলেন শোগ্‌স-খাং (Tshogs-Khang), আবার জনৈক বিদেশী পর্যটক বলেছেন 'Assembly Hall' এবং তাঁর মতে এটাই এ গুম্ফার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্দির।*

প্রাঙ্গণ থেকে গুম্ফায় উঠে বারান্দা পেরিয়ে এটাই প্রথম মন্দির। চারটি কাঠের থামের ওপরে ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে রঙীন ফ্রেস্‌কো। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে আংশিক বিনষ্ট। দেখে দুঃখ হয়, অযত্নের জন্য কি অমূল্য সব সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

নষ্ট না হলেও ভালভাবে দেখা যেত না, কারণ আলোর খুবই অভাব। কেবল কয়েকটি চর্বির প্রদীপ জ্বলছে। তাতে আঁধার দূর হয় নি, কিন্তু উৎকট গন্ধে ভরে উঠেছে চারিদিক। সৃষ্ট হয়েছে একটা ভয়াবহ পরিবেশ।

---

* David L. Snell grove

অথচ এই মন্দিরেই রয়েছে শাক্যমুনির অপরূপ বিগ্রহ—শান্ত-সুন্দর-সৌম্য সুবিরাট মূর্তি। তিনি রয়েছেন মন্দিরের মাঝখানে। আমরা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াই। স্বল্পালোকে দর্শন করছি, তবু বুঝতে পারছি তাঁর চুলগুলি নীল আর কান দুটি বড় বড়। শম্ভুনাথ নামে এই গুম্ফার জনৈক লামা নাকি নির্মাণ করিয়েছেন এই অপরূপ মূর্তি।

শাক্যমুনির সামনে একদিকে একখানি কাঠের সিংহাসন। আখরোট কাঠে তৈরি, চমৎকার খোদাই কাজ। কাশ্মীরের মহারাজা উপহার দিয়েছেন। প্রার্থনার সময় প্রধান লামা ঐ সিংহাসনে বসেন। অপরদিকে তারামায়ের মানুষ-সমান মূর্তি। সামনে পূজ্যপাদ ব্রুগ্-পা লামার মূর্তি। তিনি মা-তারাকে পুজো করছেন।

মূর্তির পেছনে সোনা দিয়ে কাজ করা কয়েকটি রূপোর চোর্তেন। স্পিতুক গুম্ফার চোর্তেনগুলির মতো এগুলির ওপরেও মূল্যবান পাথর খোদিত।

সিংহাসনের ডানদিকে দেওয়ালে মহাকালী মূর্তি খোদিত। অনেকটা মাকালীর মূর্তির মতো। তবু এঁরা বলেন মহাকাল।

মন্দিরের মেঝেতে বিগ্রহের সামনে প্রচুর পূজার উপকরণ। আমরা দর্শন করি, প্রার্থনা করি, প্রণাম করি। তারপরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

একটা কাঠের বড় দরজা পেরিয়ে দু-খাং মন্দিরে আসি। এটাই হেমিস গুম্ফার প্রধান মন্দির। এখানেই সেই সোনার বুদ্ধমূর্তি। বেশ বড় উপবিষ্ট মূর্তি। সোনার পাত দিয়ে তৈরি অপরূপ ও প্রাণময় সুবিশাল মূর্তি। অনেকটা উঁচুতে কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনে খোদাই কাজ। মূর্তির গায়ে নানা মূল্যবান পাথর বসানো। মাথায় পরচুলো ঢঙের মুকুট, কানদুটি বিরাট। সারা শরীরেই অলঙ্কার। মূর্তির দু'পাশে দেওয়ালের সঙ্গে সুন্দর চিত্রযুক্ত কয়েকখানি টঙ্কা।

এ মন্দিরেও বাইরের আলো বড় একটা আসতে পারছে না কিন্তু এখানে আলোর অভাব নেই, স্বর্ণমূর্তির সামনে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে। সেই শিখা মূর্তির গায়ে প্রতিফলিত হয়ে সারা মন্দিরখানিকে আলোকিত করে তুলেছে।

দেবদেহ থেকে বিচ্ছুরিত সেই সোনালী ও স্নিগ্ধ আলোকে আমরা উদ্বোধিত গৌতমকে দর্শন করি, বিষ্ণুর নবম অবতার সিদ্ধার্থকে স্মরণ করি, বুদ্ধাবতারকে বরণ করি আর কুমার শাক্যসিংহকে প্রণাম করি। প্রার্থনা করি—হে প্রেম মৈত্রী ও করুণার সিদ্ধপুরুষ, তুমি তোমার দেবদেহের উজ্জ্বল আলোয় যেমন এই মন্দিরের আঁধার দূর করেছো, তেমনি তোমার জ্ঞানের আলোকে সকল অজ্ঞানতার অবসান করো। তোমার প্রেমে বিশ্বের বিদ্বেষ দূর হোক, তোমার মৈত্রীতে হিংসা দূর হোক, তোমার করুণায় অশান্তির অন্ধকার দূর হোক। তুমি তোমার অপরূপ রূপের আভায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলো।

বুদ্ধমূর্তির পাশে আরও কিছু মূর্তি রয়েছে, আছে রঙীন পাথর বসানো কয়েকটি রূপোর চোর্তেন। শুনেছি স্বর্ণমূর্তি ছাড়াও এ গুম্ফায় প্রচুর ধনরত্ন আছে। কারণ সেঙ্গে নামগিয়াল থেকে শুরু করে লাদাখ এবং কাশ্মীরের সব রাজারাই এই গুম্ফার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফলে দিন দিন এই গুম্ফার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়েছে।

বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু ক্ষতি প্রায় হয় নি বলা চলে। কারণ মূল সিন্ধু উপত্যকা থেকে অনেকটা দূরে এবং পাহাড়ের আড়ালে অবস্থিত হওয়ায় এই গুম্ফার দিকে আক্রমণকারীদের নজর পড়ে নি। জরোয়ার সিংহের সৈন্যরা অবশ্য এখানে এসেছিল, কিন্তু গুম্ফার তৎকালীন কর্তৃপক্ষ খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করায় তারা গুম্ফা লুঠ করে নি।

অথচ সেই সব সম্পদ দেবতা ও মানুষের কোনো কাজে আসছে না। দেবালয়ের সংস্কার কিম্বা আর্তজনের সেবায় না লাগিয়ে সেই কুবেরের ঐশ্বর্যকে এঁরা শুধু যক্ষের মতো আগলে রেখে চলেছেন।

যাক্‌গে সেসব কথা, এবারে ভাল করে মন্দিরটি দর্শন করা যাক। এখানেও প্রধান লামাজীর একখানি সিংহাসন রয়েছে। বাঁদিকে অন্যান্য লামা এবং ভক্তদের বসবার জন্যও দু-সারি আসন আছে। দুপাশের দেওয়ালে ঝুলানো নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র। এটি আর কোথাও দেখি নি। অন্যান্য গুম্ফায় দেখেছি গণ-থাং বা ক্ষেত্রপালের মন্দিরে এসব থাকে। যথারীতি বিগ্রহের সামনে রয়েছে প্রচুর পূজার উপকরণ।

এখানে এসে মনে হচ্ছে, এ গুম্ফায় একজন অন্তত শিল্পী আছেন এবং তিনি মাঝে মাঝে তুলি হাতে নেন। কারণ এখানকার দেওয়ালচিত্রগুলো বেশ নতুন। দেওয়ালে শাক্যমুনি এবং অন্যান্য বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত। আঁকা রয়েছে নানা তান্ত্রিক দেব-দেবীর ছবি এবং তিব্বতী ভাষায় লেখা রয়েছে বুদ্ধের বাণী।

দর্শন করে বেরিয়ে আসি বড় মন্দির থেকে। আবার ছোট মন্দিরের পাশে আসি। এখান থেকেই সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ওপরে—পাথরের সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় আসি।

আগেই বলেছি গুম্ফার তিনতলাতেই সামনের দিকে কাঠের খোলা বারান্দা। এখান থেকে নিচের চত্বরটি চমৎকার দেখা যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার উপায় নেই। শত শত দর্শনার্থী বসে বা দাঁড়িয়ে নাচ দেখছেন। তাঁদের অধিকাংশই বিদেশী। বোধ করি ভাল দাম দিয়ে জায়গা কিনতে হয়েছে।

অতএব ওদিকে না গিয়ে এদিকের মন্দিরগুলো দেখা যাক। ছোট ছোট মন্দির, বেশ কয়েকটি মন্দির, সবই পাশাপাশি। আলো-বাতাস আসে না, ফলে অন্ধকার ও সেঁতসেঁতে। পূজাপাঠ হয় কি?

হলে এমন অযত্ন কেন? কেবল আলো-বাতাসের অভাব নয়, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং আন্তরিকতার। নইলে দেবালয় কখনো এমন অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারে?

অথচ প্রতি মন্দিরে রয়েছে বিগ্রহ ও অন্যান্য মূর্তি, রয়েছে চোর্তেন ও পূজার উপকরণ, রয়েছে অমূল্য পুঁথিসম্ভার।

ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, একদা এই দেবালয় একটি বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল। কাশ্মীর সরকার এখান থেকে মূল্যবান পুঁথিসমূহ নিয়ে গিয়ে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সেগুলি এখন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হচ্ছে, অমূল্য গ্রন্থরত্ন অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

নিচের ছোটমন্দিরের ঠিক ওপরে এই তলাতেই প্রধান লামাজী বা গুরু রিম্‌পোচের

বাসগৃহ। আগেই বলেছি হেমিসের রিম্‌পোচে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ষাট দশকের গোড়ার দিকে লাসা যান। স্বর্গীয় সুলক্ষণ সংযুক্ত সেই মহামান্য লামাজীর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। তারপর থেকে প্রায় পনেরো বছর কোনো উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নি। কয়েক বছর আগে দার্জিলিঙে সেইসব সুলক্ষণযুক্ত একটি বারো বছরের বালক পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭৫ সালে এখানে তাঁর অভিষেক হয়েছে। যথারীতি নাম হয়েছে দ্রুগ্‌পা রিম্‌পোচে।

তবে এখনও এখানে তাঁর আসন শূন্য। কারণ তিনি দার্জিলিঙে শিক্ষাগ্রহণ করছেন। আর তাই তাঁর ঘরখানি বন্ধ। বিগত বিশ বছর ধরে চ্যাক্‌জোত নামে লাদাখের প্রাক্তন মহারাজার জনৈক ভাই ম্যানেজাররূপে এই মন্দির পরিচালনা করছেন। কাজটা কোনমতেই সহজ নয়। কারণ কেবল গুম্ফার ধনরত্ন রক্ষা করা এবং উৎসব পরিচালনা নয়, লাদাখের বিভিন্ন স্থানে এই গুম্ফার প্রচুর ভূ-সম্পত্তি রয়েছে। জমিদারী রক্ষা করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ।

দ্রুগ্‌পা রিম্‌পোচে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের লালটুপি সম্প্রদায়ের প্রধান। লাদাখ ও ভূটানের অধিকাংশ বৌদ্ধগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে সবাই নন। কারণ স্পিতুক এবং লে প্রভৃতি গুম্ফা হলুদটুপি সম্প্রদায়ের। আগেই বলেছি তাঁদের প্রধান হলেন পূজ্যপাদ কুশোক বাকুলা।

লাদাখে লালটুপি সম্প্রদায়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র এই হেমিস গুম্ফা। স্তাগ্‌না, মাথো ও চিম্‌রে প্রভৃতি গুম্ফা এই গুম্ফার অধীনে। সবচেয়ে বড় কথা ধর্মস্থান হিসেবে বর্তমান তান্ত্রিক বৌদ্ধজগতে হেমিসের স্থান সবার ওপরে। আমরা ভাগ্যবান সেই পুণ্যতীর্থ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করলাম।

দোতলা দেখে তিনতলায় এলাম। এখানে একটি মন্দিরে কয়েকটি কাশ্মীরী কাজ-করা ব্রোঞ্জের তৈরি চমৎকার বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। রয়েছে বজ্রধর ও অন্যান্য লামাদের মূর্তি—আমরা দর্শন করি।

তারপরে আসি দশটি স্তম্ভযুক্ত একখানি নিচু ঘরে। এটাকে মন্দির না বলে গুদাম বলাই উচিত হবে। অথচ এখানে তিব্বতে তৈরি প্রচুর বুদ্ধমূর্তি রয়েছে রয়েছে কিছু পুঁথি। সেই অযত্ন এবং অবহেলা।

আর ভাল লাগছে না। তাই তাড়াতাড়ি নেমে আসি নিচে—দেবতাদের প্রতি অভক্তিতে নয়, দেবালয়ের রক্ষকদের প্রতি বিরক্তিতে। এঁরা নিজেরাও লেখাপড়া শেখেন নি, লেখাপড়া জানা কোনো মানুষকেও ডেকে আনেন নি। আর তাই প্রবোধদা বলতে বাধ্য হয়েছেন—'হেমিস মরে গেছে—এ খবর জানতুম না!'

কিন্তু হেমিসের এই মরে যাওয়া বোধ করি বাহ্যিক ব্যাপার। অন্তরের দিক থেকে সে বেঁচে রইবে চিরকাল।

হেমিস আজও হেমিস। হেসিসের কোনো তুলনা নেই। তাই মরে গেছে শুনেও আমি তাকে দেখতে এসেছি। আর সত্যি বলতে কি, প্রবোধদার কাছে হেমিসের কথা শুনেই আমি প্রথম লাদাখের পথে পদচারণা করার বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

বহু বছর বাদে আমার সেই বাসনা পূর্ণ হল। আজ আবার সেই কথা মনে

পড়ছে—সংসারে সব কাজের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। যিনি অলক্ষ্যে বসে আজকের দিনটিকে আমার হেমিস দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার প্রতি কৃপা করেছেন। চমৎকার আবহাওয়া এবং অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে আমার হেমিস দর্শন সম্পূর্ণ হল।

কিন্তু আমার মন এমন নিরানন্দ কেন? আমি হেমিস গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এসেছি বলে? হেমিসের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি বলে? নইলে আমি এমন অস্থির ও অবসন্ন হয়ে পড়ব কেন?

আবার পেছনে তাকাই। হেমিসকে আরেকবার ভাল করে দেখি। অনন্ত প্রকৃতির কোলে আশ্রিত দেবালয়। এমন নিভৃত ও অভিনব অবস্থানের মন্দির বড় বেশি নেই। আমাকে এখন তার কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়।

আবার চলা শুরু করি। মেলায় আসি—মেলার মাঝে মিশে যাই। কেনাকাটা খাওয়াদাওয়া গান-গল্প সমানে চলেছে। হেমিসের মেলা—আনন্দের মহামেলা।

অথচ এরা সবাই জানে—এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, এ মেলার জীবনও ফুরিয়ে এলো বলে। ওদেরও নিতে হবে বিদায়। কিন্তু ওরা তো কেউ আমার মতো নিরানন্দ নয়!

মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলতে চাই। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলি। মেলা ছাড়িয়ে উঠে আসি সেই বনভূমিতে—বনভূমি নয়, বনবীথি। সত্যই সুন্দর। আর তার সামনে অনিন্দ্যসুন্দর হেমিস।

সেই মোটর-সাইকেল-আরোহীরা তাঁবু টাঙিয়ে রীতিমত সংসার পেতে বসেছে। তবে তাদের তিনজনের শুধু একজনকে দেখতে পাচ্ছি, বাকি দু'জন নিশ্চয়ই নাচ দেখতে গুম্ফায় গিয়েছে।

আমার নাচ দেখা হয়েছে, মেলা দেখা হয়েছে। আমরা ফিরে চলেছি। বিদায় নিচ্ছি হেমিসের কাছ থেকে—ঈশ্বরপুত্রের পাঠতীর্থ থেকে।

ফিরে আসি গাড়ির কাছে। অবাক হই। হরেন ও কালী চা বানাচ্ছে আর তাদের ঘিরে বসে আছেন টোলি, রোণাল্ড, কারিণ এবং আনা।

আমরা কাছে আসতেই আনা বলে ওঠে, "সোল্‌জা ডন।"

মনে হচ্ছে আমরাই ওর অতিথি। সে আমাদের চা নিতে অনুরোধ করছে।

নন্দা ও মানা তাড়াতাড়ি তদারকিতে লেগে যায়। মানা গাড়ি থেকে চিঁড়ে ভাজার টিন আর চানাচুরের কৌটা নিয়ে আসে।

চিঁড়ে-চানাচুর মুখে দিয়ে ওঁরা সবাই বেজায় খুশি। বার বার ভারতীয় খাদ্যের প্রশংসা করতে থাকে। আর আনা কেবলি বলতে থাকে—থুগিশি, থুগিশি। ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ।

একসময় চায়ের পালা শেষ হয়। সমাগত হয় বিদায় নেবার পালা—বেলজিয়ামের বন্ধুদের কাছ থেকে, হেমিসের কাছ থেকে।

লাদাখ, তুমি সত্যই বৈচিত্র্যময়। তোমার হেমিসে আজ আমাকে বিদায় দেবার জন্য কোনো ভারতীয় এখানে আসে নি। উপস্থিত হয়েছেন কয়েকজন বিদেশী বন্ধু, যাঁরা সুদূর বেলজিয়াম থেকে ভারতকে দেখতে এসেছেন। জানি না জীবনে আমি

কখনও বেলজিয়াম যেতে পারব কিনা?*

আমরা গাড়িতে উঠি। গাড়ি গর্জে ওঠে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। ওঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, আমরা চলা শুরু করি।

আমরা হাত নাড়ি, ওঁরা হাত নাড়েন। ওঁরা বলেন—আবার দেখা হবে। আমরা বলি—আবার দেখা হবে।

মানুষ এই আশাতেই ঘরে ফিরে যায়। হয়তো বা এই আশাতেই বেঁচে থাকে।

গাড়ি নেমে আসে, বেলজিয়ামের বন্ধুরা অদৃশ্য হয়ে যান। আমরাও অদৃশ্য হয়েছি ওঁদের চোখের সামনে।

কিন্তু হেমিসকে দেখতে পাচ্ছি এখনো। তাকে দেখি, আবার দেখি।

অবশেষে হেমিসও হারিয়ে গেল। কিন্তু বিদায়বেলায় আমি তাকে বলতে পারলাম না—আবার দেখা হবে। শুধু বলি—বিদায়, হেমিস বিদায়!

হেমিস রয়ে গেল পাহাড়ের কোলে, আমরা পাহাড় ছেড়ে এগিয়ে চলি। চলেছি সিন্ধুর কাছে।

কিন্তু সেও তো সাময়িক। আর ক'দিনই বা থাকব মহাসিন্ধুর পাশে পাশে, এই চাঁদের দেশে! লাদাখের পথে পদচারণার সময়ও যে প্রায় ফুরিয়ে এলো। এই একই ভাবে তো একদিন আমাকে সিন্ধুর কাছ থেকেও নিতে হবে বিদায়, বিদায় নিতে হবে লাদাখের কাছ থেকে। সেদিনও বলতে পারব না—আবার দেখা হবে। শুধু বলতে হবে—বিদায়। এবং সেদিন আর দূরাগত নয়।

সংসারের এই নিয়ম। তবু আমরা বিদায়বেলায় ব্যথা পাই। ভবিতব্যকে কিছুতেই শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারি না। আর তা পারি না বলে জগতে অনেক দুঃখ, অসংখ্য বেদনা আর বহু বিরহ।

জানি এ বিরহ আমার নিজের সৃষ্টি। আমরা পথের টানে ঘর ছাড়ি, কিন্তু ঘরের মায়া ছাড়তে পারি না। তাই লাদাখের পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করে আবার ফিরে যেতে হবে ঘরে। আর আজ এই মুহূর্ত থেকে আমার সেই ঘরে ফেরার পালা হল শুরু।

আমি এখন হেমিস থেকে লে ফিরে চলেছি। এমনি করেই একদিন আবার লে থেকে শ্রীনগর রওনা হব। এবং অবশেষে শ্রীনগর থেকে কলকাতায় ফিরে যাবো।

তাই বলে লাদাখ হারিয়ে যাবে না। তার বিচিত্র-সুন্দর ছবি আমার মনের ক্যান্‌ভাসে বহুদিন আঁকা থাকবে। লাদাখের স্মৃতি আমার মানসলোকে চিরউজ্জ্বল হয়ে রইবে।

আমি আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে কার্গিলের কথা স্মরণ করব, সিন্ধুর সৌন্দর্য উপভোগ করব এবং হেমিসের স্মৃতি রোমন্থন করব।

সেই সুমধুর স্মৃতি দিয়ে মনের মণিকোঠা পূর্ণ করে নিয়ে আমি আজ বিদায় নিলাম হেমিসের কাছ থেকে, আমি বিদায় নেব লাদাখের কাছ থেকে।

বিদায়, হেমিস বিদায়! বিদায়, লাদাখ বিদায়!

---

*হেমিস লেখকের সে বাসনা পূর্ণ করেছেন। লেখকের 'বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া' দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণোদেবীর দরবারে

তীর্থের ডাক কেন আমাকে এমন আকুল করে তোলে?

তীর্থের দেবতাদের কাছে আমার তো কোনো কামনা নেই। আমি পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশী নই। আমার স্বর্গের মোহ নেই, নরকের ভয় নেই। তাহলে আমি কেন তীর্থের নামে এমন উতলা হয়ে উঠি?

আমি যে ভারতবাসী। তীর্থের আকর্ষণ রয়েছে রক্তে। এদেশে এ আকর্ষণ কোনো বিশেষ বয়সের নয়, সারা জীবনের। ভারতের ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র—সবাইকে তীর্থের ডাক এমনি আকুল করে তোলে। আমি খঞ্জকে অমরনাথ গুহায় চোখের জল ফেলতে দেখেছি, অন্ধকে কাশী বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালতে দেখেছি।

তীর্থের ডাকে আমার উতলা হয়ে ওঠার আরও একটি কারণ আছে। আমি শুধু তীর্থ-দর্শনে আসি না, তীর্থযাত্রীদেরও দেখতে আসি। এই মানুষগুলোর কোনো আলাদা জাত নেই, এঁরা শুধুই তীর্থযাত্রী। এঁরা শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা অবস্থার মুখাপেক্ষী নন। ভাষা পোশাক ও চেহারা ভিন্ন হলেও এঁদের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এঁরা দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সয়ে একই উদ্দেশ্যে পাশাপাশি পথ চলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তীর্থের পথে পথে আমি এই একই মানুষকে পদচারণা করতে দেখি।

এই মানুষগুলোকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। তাই বার বার এমন উতলা হয়ে ছুটে আসি তীর্থের পথে—এক তীর্থের পরে আরেক তীর্থে। আমি যে ভাগ্যবান, আমি ভারতবাসী। ভারতে তীর্থের শেষ নেই।

।। এক ।।

সকাল আটটায় শ্রীনগর থেকে বাস ছাড়ল। আমরা লাদাখ দেখে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু আজ জম্মু যাচ্ছি না। চলেছি কাটরা—বৈষ্ণোদেবীর দরবারের প্রবেশ তোরণ। আগামীকাল আমরা বৈষ্ণোদেবী দর্শন করব। পরশু জম্মু গিয়ে হিমগিরি একস্‌প্রেস ধরব।

বৈষ্ণোদেবী বাঙালীর কাছে অপেক্ষাকৃত অপরিচিতা। কিন্তু উত্তরভারতে, বিশেষ করে দিল্লী পাঞ্জাব হরিয়ানা ও জম্মুতে তিনি অতিশয় জাগ্রতা দেবী—পরম করুণাময়ী ক্ষমাশীলা ও ঐশ্বর্যদায়িনী। এর আগে তিনবার কাশ্মীর এসেছি, কিন্তু বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করা হয় নি। এবারে তাই চলেছি বৈষ্ণোদেবীর দরবারে।

যাঁরা শুধু বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করতে আসেন, তাঁরা রেলে জম্মু-তাওয়াই এসে বাসযোগে কাটরা চলে যান। কিন্তু কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে যাঁরা বৈষ্ণোদেবী যান, তাঁদের আর জম্মু পর্যন্ত ফিরে যাবার দরকার পড়ে না। জম্মু পৌঁছবার আগে টিক্‌রি নামে একটা জায়গা থেকে কাটরার পথ ধরেন। এখন শ্রীনগর থেকে সরকারী বাস এই পথে সোজা কাটরা যায়, সারাদিন বাস যাতায়াত করে। ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। আমরাও তাই চলেছি।

টিক্‌রি থেকে কাটরা মাত্র ১৫ কিলোমিটার। কিন্তু কাটরার কথা এখন নয়, এখন বাস ছাড়াব কথা হোক্‌। শ্রীনগর সরকারী বাস ডিপো থেকে এইমাত্র আমাদের বাস ছাড়ল। বিভাস বরুণ স্বপন তরুণ ও কিরণ হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। আমরাও হাত নাড়ছি। একসঙ্গে কাশ্মীর এসেছি, একসঙ্গে লাদাখ দেখেছি। কিন্তু ওরা রয়ে গেল শ্রীনগরে আর আমরা চললাম বৈষ্ণোদেবীর দরবারে।

ওরা যে অমরতীর্থ অমরনাথ যাবে! তাই ওরা থেকে গেল এখানে আর আমরা ফিরে চললাম ঘরের পথে!

আমরা মানে আমি, আমার অনুজপ্রতিম করুণ—ডঃ করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, তরুণ অধ্যাপক এবং পর্বতারোহী বিভাস দাসের স্ত্রী নন্দা ও তার দুই ছেলে-মেয়ে—তোতন ও মহুয়া। তোতনের বয়স চার, মহুয়ার সাত। আর মীরাদি, শ্রীমতী মীরা ঘোষ! পুত্র কন্যা ও স্বামীকে কলকাতায় রেখে একা হিমালয়ে বেড়াতে এসেছেন। ভানুও আমাদের সঙ্গে চলেছে। সে এই দুদিন রান্না করে খাওয়াবে। তারপরে জম্মুতে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে শ্রীনগর ফিরে গিয়ে বিভাসদের সঙ্গে যোগ দেবে।

যাক্‌গে, যেকথা বলেছিলাম। ডিপো থেকে বেরিয়ে বাস বড় রাস্তায় এলো, বাঁয়ে বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলল। বিভাসরা পথের অগণিত মানুষের মাঝে মিশে গেল।

সেই চিনার পপ্‌লার আর উইলো গাছে ছাওয়া পথ। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা শ্রীনগর শহর ছাড়িয়ে এলাম। এখন পথের পাশে কোথাও ক্ষেত কোথাও আপেল বাগান। ক্ষেতে ফসল নেই, বাগানে আপেল নেই—সবে কুঁড়ি এসেছে।

ফল না থাকলেও ফুল রয়েছে। পথের ধারে ঝোপঝাড়ে নানা রঙের ছোট-বড় ফুল। তারা বাতাসে দোলা খাচ্ছে। কি জানি, হয়তো বা মাথা নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। কেবল ফুল নয়, পাখিরাও গান গেয়ে ঘুরে-ফিরে বিদায় জানাচ্ছে আমাদের।

মাঝে মাঝে ঝিলমের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বন কিংবা ক্ষেতের বুক বেয়ে বয়ে চলেছে কাশ্মীর উপত্যকার প্রাণধারা ঝিলম।

সেদিন বানিহাল পেরিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় উপনীত হয়েই ছুটে গিয়েছিলাম ওর কাছে—ভেরীনাগে, ঝিলমের উৎসে। তারপরে যে ক'দিন শ্রীনগরে ছিলাম, প্রতিদিন ঝিলমের তীরে তীরে পদচারণা করেছি। আজ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই ঝিলমের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে।

বিদায় নেব কাশ্মীর উপত্যকা থেকে—ভূস্বর্গের কাছ থেকে। কিন্তু তার আগে, যতক্ষণ পারা যায় দেখে নিই তাকে। ঝিলমের ওপারে বহুদূরে ধূসর পাহাড়ের সারি। তার দু-একটির মাথায় তুষারের হালকা প্রলেপ। আমি দেখি, দু-চোখ ভরে দেখি আর দেখি।

শুধু দূরের পাহাড় কিংবা কাছের উপত্যকা নয়, আমি ভাবছি এই পথের কথা। এ পথ প্রাচীন নয়, নিতান্তই আধুনিক। আচার্য শঙ্কর, সম্রাট জাহাঙ্গীর কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ—কেউ এপথ দিয়ে কাশ্মীরে আসেন নি। ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীরে আসার পথ ছিল রাওয়ালপিণ্ডি ও বারমূলা হয়ে। এটি একালের পথ।

আমি এই পথ দিয়ে তিনবার জম্মু থেকে শ্রীনগর এসেছি, আজ লাদাখ দেখে ফিরে চলেছি ঘরে। যাদের সঙ্গে সেদিন শ্রীনগরে এসেছিলাম, তাদের মধ্যে আজ একমাত্র করুণ রয়েছে আমার পাশে। নন্দা ও মীরাদি আমার আগে কাশ্মীরে এসেছেন। আমার সঙ্গে সেদিন ছিল বরুণ ও স্বপন—প্রখ্যাত চিত্রকর ও হিমালয় বিশারদ মণি সেন মহাশয়ের দৌহিত্র বরুণ রায় এবং তার বন্ধু স্বপন সাহা। ছিলেন কুণ্ডু ট্রাভেলস্-এর ম্যানেজার মলয় দাস ও কমল প্রামাণিক এবং জনা চল্লিশেক যাত্রী। দুখানি বাস রিজার্ভ করে আমরা সেদিন জম্মু থেকে শ্রীনগর এসেছি। বরুণ ও স্বপন ছাড়া তাঁরা সবাই কাশ্মীর দেখে ঘরে ফিরে গিয়েছেন, কেবল অমরনাথ দর্শনের জন্য ওরা দু'জন রয়ে গেছে বিভাসের সঙ্গে—পর্বতারোহী বিভাস দাস। তার স্ত্রী নন্দার 'ইনট্যুর' নামে একটি পর্যটন সংস্থা রয়েছে। আমরা তারই সঙ্গে লাদাখ গিয়েছিলাম। অনিবার্য কারণে নন্দা আজ ফিরে যাচ্ছে। বিভাস বাকি যাত্রীদের অমরনাথ দর্শন করিয়ে কলকাতায় ফিরবে।

আমরা 'ইনট্যুর'-এর সঙ্গে লাদাখ গেলেও 'কুণ্ডু ট্রাভেলস্'-এর সঙ্গে কাশ্মীরে এসেছি। কারণ এই সংস্থার সত্বাধিকারী ফকির কুণ্ডু আমার অকৃত্রিম সুহৃদ এবং হিতৈষী। তিনি শুধু পর্যটন বিশারদ নন, একজন উদার ব্যবসায়ী। আর তাই এই প্রতিযোগিতার যুগে অন্য সংস্থার যাত্রী জেনেও আমার সঙ্গে করুণ বরুণ এবং স্বপনকে পর্যন্ত শ্রীনগর নিয়ে এসেছেন!

এপথে শুধু সরকারী পরিবহনের বাস চলাচল করে। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের তিন রকমের বাস আছে—লাক্সারী, 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ। যাবার সময় আমরা 'এ' ক্লাশ বাসে শ্রীনগর গিয়েছি। আজ কিন্তু আমরা 'বি' ক্লাশ বাসে কাটরা চলেছি।

আমরা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছি। বৈষ্ণোদেবী উত্তর-ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় শক্তিতীর্থ। এর আগে তিন বার কাশ্মীর এসেও আমার যাওয়া হয় নি এই গুহাতীর্থে। তাই এবারে চলেছি সেই মহাশক্তির মন্দিরে। মনে মনে তাঁরই কথা ভাবতে থাকি—বৈষ্ণোদেবীর কথা। দেবী ভাগবতের মতে সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের জন্য দেবী দুর্গা যুগে যুগে শক্তিরূপে মর্ত্যে আবির্ভূতা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেছেন। যেমন—গৌরী, রৌদ্রী, বারাহী, বাসবী, শিবা, বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী এবং বৈষ্ণবী। সপ্তমাতৃকা ও অষ্টমাতৃকার নামের মধ্যেও দেবী বৈষ্ণবীর নাম রয়েছে।

এই বৈষ্ণবী প্রথম এ অঞ্চলে লোকমুখে বৈষ্ণীদেবী হন। তারপরে বৈষ্ণোদেবী হয়েছেন। বৈষ্ণোদেবী সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মহাশক্তিত্রয়ীর মিলিত শক্তি।

দেবী বৈষ্ণবীর মর্ত্যলীলা প্রসঙ্গে দুটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটি হলো—

দেবী বৈষ্ণবী রত্নাকর সাগরতীরে কুমারী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি যৌবনপ্রাপ্তা হলেন। কিন্তু এই পরমাসুন্দরী মহাদেবী কোনো স্বর্গের দেবতাকে পতিরূপে বরণ করলেন না। তিনি মর্ত্যের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ ও মনন করে তপস্যায় রত হলেন।

তপস্যায় তুষ্ট হয়ে একদিন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে দর্শন দান করলেন। বললেন—কলিযুগে তুমি কল্কি অবতারের শক্তি হবে। হিমালয়ে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে, সেখানে

স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী বি[illegible] এক বিচিত্রসুন্দর গুহা আছে। তুমি সেই গুহায় গিয়ে তোমার প্রাণপুরুষের [illegible] কর। কারণ এই পৃথিবীতে কেবল ঐ গুহাটি তোমার যোগ্য আশ্রয়। দেবী [illegible]ষ্ণবী তাঁর ইষ্টদেবতার পরামর্শমতো সাগর সৈকত থেকে চলে এলেন এই দেব[illegible] হিমালয়ে—ত্রিকূট পর্বতে। তিনি সেই পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় নিলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ ভৈঁরোর অত্যাচারে তখন আসমুদ্র হিমাচল থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ভৈঁরো কেবল নিষ্ঠুর ও রাজ্যলোলুপ ছিল না, সে ছিল অত্যন্ত কামুক। একদিন সে ত্রিকূটের পাদদেশে পরমাসুন্দরী দেবী বৈষ্ণবীকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কামনাবহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সে মহাদেবীর রূপ ও যৌবনকে ভোগ করতে চাইল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে দেবীকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল।

মর্ত্যের মানবী হয়ে বিচরণ করলেও জানতে তাঁর দেরি হলো না। তবু তিনি ভৈঁরোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাইলেন না। ভাবলেন—শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে যে স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী বিধৌত বিচিত্র-সুন্দর গিরিগুহার কথা বলেছেন, সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করলে ভৈঁরো আর তাঁকে খুঁজে পাবে না, সে ফিরে যাবে।

তাই দেবী বৈষ্ণবী গিরিশিরা ধরে ত্রিকূট পর্বতে আরোহণ করতে থাকলেন। ভৈঁরো তাঁকে দেখতে পেলো। দেবীর অনুমান মিথ্যে হলো। তাঁকে দেখতে পেয়ে ভৈঁরোর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, সে সসৈন্যে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে দিল।

কিছুক্ষণ চলার পরে দেবী বুঝতে পারলেন পাপাত্মা ভৈঁরোর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনি তাড়াতাড়ি পথ চলে সুবিধামত জায়গায় একটা গুহা পেয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এই জায়গাটির বর্তমান নাম আদি কুমারী, স্থানীয়রা বলেন—আদ কুঁয়ারী।

দেবী স্বর্গের দেবতাদের ডেকে বললেন—আমি অত্যাচারী ও চরিত্রহীন ভৈঁরোকে নিধন করব, তোমরা আমাকে অস্ত্র দাও।

দেবতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা ভৈঁরোর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ভৈঁরো মহাদেবের বরে পুরুষদের অবধ্য। তাই তাঁরা সানন্দে দেবীকে অস্ত্রদান করলেন। শিব তাঁর শূল থেকে শূলান্তর ও বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র থেকে চক্রান্তর উৎপাদন করে দেবীকে দান করলেন। বরুণদেব দিলেন শঙ্খ আর পব[illegible] ধনুর্বাণ। ইন্দ্র দিলেন তরবারি আর যমরাজ গদা। প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন একটি পদ্মফুল ও রুদ্রাক্ষের মালা। ক্ষীরোদ সমুদ্র দেবীকে দান করলেন উজ্জ্বল মুক্তাহার, আর বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ্য কবচ। অন্যান্য দেবতারা দেবীকে চিরনতুন বস্ত্র ও মুকুটসহ নানা অলঙ্কার দান করলেন। পর্বতরাজ হিমালয় দিলেন বাহন-ব্যাঘ্রদেব। আর অগ্নিদেব দেবীর দেহে শক্তি সঞ্চার করলেন। দেবী তখন অষ্টভুজা রূপ পরিগ্রহ করে সাত হাতে অ[illegible]রণ করলেন। জগতের জীবকুলকে অত্যাচার ও অবিচারের ভয়মুক্ত করে অভয় দানের জন্য দেবী তাঁর ডান দিকের তৃতীয় হাতখানিকে বরাভয় মুদ্রায় যুক্ত রাখলেন।

যুদ্ধের সাজে সজ্জিতা হয়ে দেবী বাঘের পিঠে চড়ে আদি কুমারীর সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এবং সেই মুহূর্তে তাঁকে ভৈঁরোর সেনাদলের সঙ্গে

সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হতে হলো।

পরমাসুন্দরী দেবী বৈষ্ণবীকে মহাশক্তিরূপে দর্শন করেও ভৈঁরোর মোহ ঘুচল না। সে তার সৈন্যদের আদেশ করল—বন্দী কর ঐ রূপসী মায়াবিনীকে। ওকে নিয়ে চল আমার প্রাসাদে। ওকে আমার চাই-ই।

ভৈঁরোর সৈন্যরা ছুটে এলো দেবীর দিকে। মা হয়েও দেবী বৈষ্ণবী তাঁর সন্তানদের ওপরে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন। মুহূর্তে ভৈঁরোর সৈন্যদল নিহত হলো।

মা ভাবলেন এবারে ভৈঁরোর জ্ঞান ফিরবে। সহায়সম্বলহীন ভৈঁরো এখন ফিরে যাবে ঘরে। তাই তিনি আর ভৈঁরোর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করলেন না। শেষবারের মতো তাকে বাঁচবার সুযোগ দিয়ে দেবী আপন পথে এগিয়ে চললেন! চললেন শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশিত সেই গুহামন্দিরের দিকে—সেখানে গিয়ে তাঁকে তাঁর প্রাণপুরুষ কল্কি অবতারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

দেবীর অনুমান কিন্তু মিথ্যে হলো। কামাতুর ভৈঁরোর জ্ঞান ফিরল না, দেবী বৈষ্ণবীর মাঝে মহাশক্তির পরিচয় পেয়েও কামনাবহ্নি নির্বাপিত হলো না। ক্ষমতামদে মত্ত ভৈঁরো একাই বৈষ্ণবীকে বন্দী করতে চাইল। সে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকল।

গুহামন্দিরে প্রবেশের ঠিক আগে ভৈঁরো দেবীর পথরোধ করে দাঁড়ালো। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। তবু শান্ত স্বরে ভৈঁরোকে বললেন—আমার পথ ছেড়ে দাও। আমি তপস্বিনী সতী। আমি এই গুহা-মন্দিরে আমার প্রাণপুরুষের আবির্ভাবের জন্য তপস্যায় রত হব।

ভৈঁরো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপরে হাসি থামিয়ে বলল—আমিই তোর সেই প্রাণপুরুষ। আমার জন্য তোর কোনো তপস্যার দরকার নেই। চল্ আমার সঙ্গে। অতর্কিতে ভৈঁরো দেবীর একখানি হাত ধরে তাঁকে সজোরে আকর্ষণ করল।

পরম করুণাময়ী মহাদেবী তবু ক্রুদ্ধা হলেন না। তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—দৈত্যরাজ, আপনি ভুল করছেন। কিছুক্ষণ আগে আপনি আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, ঘরে ফিরে যান।

—ফিরব, তবে তোকে সঙ্গে নিয়ে। ভৈঁরো গর্জে উঠল। সে সর্বশক্তি দিয়ে দেবীকে আকর্ষণ করে আবার বলল—তোকে আমার শয্যাসঙ্গিনী হতেই হবে।

দেবী বুঝতে পারলেন, আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজের কর্তব্য স্থির করে দিব্য-তরবারি দিয়ে ভৈঁরোর গলায় আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দেহ লুটিয়ে পড়ল গুহামন্দিরের দ্বারে আর মাথাটা গিয়ে পড়ল পাশের পাহাড়ের চূড়ায়।

এতক্ষণে ভৈঁরোর জ্ঞান ফিরে এলো। ছিন্নমস্তক চিনতে পারল মহাশক্তিকে। সে তার কৃতকর্মের জন্য দেবীর করুণা প্রার্থনা করে বলে উঠল—মা, তুমি ক্ষমা কর আমাকে। দয়া করে এই পাপিষ্ঠকে তোমার পায়ে একটু ঠাঁই দাও!

করুণাময়ী ক্ষমাশীলা দেবী বৈষ্ণবী ভৈঁরোর সকল অপরাধ মার্জনা করলেন। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বললেন—তথাস্তু। তুমিও আজ থেকে চিরস্থায়ী হলে এই পুণ্যতীর্থে। অনাগত যুগের অগণিত ভক্ত আমাকে দর্শন করে তোমার ঐ ভৈঁরোঘাঁটিতে গিয়ে তোমাকে দর্শন করবে। নইলে তাদের তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সেই থেকে পাহাড়ের উপরে ভৈঁরোঘাঁটিতে দৈত্যরাজ ভৈঁরো বিরাজ করছে।

আর তার দেহটি পাথর হয়ে গুহামন্দিরের প্রবেশপথে পড়ে আছে। সেই পাথর ডিঙিয়ে ভক্তদের আজও বৈষ্ণোদেবীর গুহায় প্রবেশ করতে হয়। আর দর্শন শেষে চড়াই ভেঙে ভৈঁরোঘাঁটিতে গিয়ে তাঁরা তীর্থযাত্রা শেষ করেন।

উধমপুর এসে গেল। বানিহাল টানেল পেরোবার পরে আর এতবড় বিস্তৃত সমতল পাই নি। তার মানে সমতল ভারত ও কাশ্মীর উপত্যকার মাঝে হিমালয়ের যে পীরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণী, সেটি মোটামুটি পেরিয়ে এসেছি।

এখন বিকেল চারটে। অর্থাৎ আমরা আট ঘণ্টা ধরে বাসে বসে আছি। এর মধ্যে অবিশ্যি বার তিনেক বাস থেমেছে খাওয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। এখন মনে হচ্ছে বাসযাত্রার যতি আসন্ন। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কাটরা পৌঁছে যাবো।

বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ বাস টিক্‌রি পৌঁছল। এখানেই আমাদের বাস শ্রীনগর-জম্মু রোড ছেড়ে দিয়ে কাটরার পথ ধরবে। পথের ডানদিকে সেই নূতন পথ। মোড়ে সাইনবোর্ড—Tikri Jungle Gate Road. এই পথটিই কাটরা পর্যন্ত প্রসারিত। দৈর্ঘ্য মাত্র ১৫ কিলোমিটার। তবে যাঁরা জম্মু থেকে কাটরা আসেন, তাঁদের কিন্তু টিক্‌রি আসার দরকার পড়ে না। তাঁরা ডোমেল থেকে কাটরার পথ ধরেন। ডোমেলও এই জম্মু-শ্রীনগর পথের ওপরে অবস্থিত। দূরত্ব জম্মু থেকে ৩৯ কিলোমিটার। আর সেখান থেকে কাটরা মাত্র ১১ কিলোমিটার।

বাস ডানদিকে মোড় ফিরে জঙ্গল রোডের ওপরে একবার থামল। দুজন যাত্রী নামলেন, কিন্তু উঠলেন জন-দশেক এবং তাঁদের মধ্যে শিশু ও মহিলা রয়েছেন। বসার জায়গা নেই। সুতরাং তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

শ্রীনগর থেকে এতক্ষণ কোনো যাত্রী নেওয়া হয় নি, সুতরাং কেউ দাঁড়িয়ে আসে নি। দাঁড়াবার নিয়মও নেই। কিন্তু এবারে দেখছি নিয়মভঙ্গ করা হচ্ছে। বোধকরি রাস্তা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং বাসের সংখ্যা কম বলেই এভাবে যাত্রী নেওয়া হলো। তারপরে বাস আবার চলতে শুরু করল।

যাঁরা এখান থেকে বাসে উঠলেন, তাঁদের মধ্যে দু-চারজন স্থানীয় লোক থাকতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই বৈষ্ণোদেবীর যাত্রী। তাঁরাও আমাদের মতো বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছেন।

পথ সামান্য চড়াই। বাঁ দিকে কিছু নিচে প্রায়-সমতল ক্ষেত আর ডাইনে পাহাড়। ছোট ছোট সবুজ পাহাড়। কোনোটিতে বড় বড় গাছ, কোনোটিতে ঝোপঝাড়, কোনোটিতে বা পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত-খামার। পথের পাশে ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন আর মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে বাণী। তবে শেষেরটিকে 'ক্লোরোকুইন'-এর বিজ্ঞাপনও বলা যেতে পারে।

আমার শৈশব কেটেছে উত্তরবঙ্গে—রংপুর ও বগুড়ায়। তখন মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছি। ফলে ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভয় করতাম। তারপরে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছি, সেখানে তেমন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখি নি। পশ্চিমবঙ্গে এসেছি দীর্ঘকাল, এখানেও এতদিন ম্যালেরিয়ার নাম শুনি নি। ফলে তার প্রতি ভয়টা কেটে গিয়েছিল। ইদানীং আবার তাঁর নাম শুনতে পাচ্ছি। বৈষ্ণোদেবীর দেশেও দেখছি তিনি রয়েছেন।

আমরা মশারী আনি নি। সুতরাং চিন্তিত না হয়ে পারছি না।

এখন একটা নেড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে বাস চলেছে। সংকীর্ণ এবং চড়াই পথ কিন্তু বিপজ্জনক নয়।

একটু বাদেই উতরাই শুরু হলো। খানিকটা নিচে এসে একটা পুল পার হওয়া গেল। পাহাড়ী নদীর ওপরে পুল কিন্তু নদীতে জল নেই। এখন গ্রীষ্মকাল, মনে হচ্ছে এটি বর্ষায় স্রোতস্বিনী।

পুল পেরিয়ে আবার চড়াই। মাটি ও পাথরের পাহাড় বেয়ে বাস ওপরে উঠছে। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে সাদা পাথর চোখে পড়ছে।

একটা প্রশস্ত সমতলে এসে বাস থামল। পথের পাশে ক্ষেতখামার ও বাড়ি-ঘর। দু-একটি দোতলা বাড়িও রয়েছে। তবে বাড়িগুলো পাথর মাটি আর কাঠ দিয়ে তৈরি।

জনৈক যাত্রী জানালেন—এ গ্রামের নাম পেন্‌থাল। আমরা টিক্‌রি মোড় থেকে ৮ কিলোমিটার এসেছি। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। এখনও প্রখর রোদ রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ থাকবে। এটা পশ্চিম হিমালয়। এখানে আটটায় সন্ধ্যে হয়।

শুধু সন্ধ্যে নয়, উঁচু জায়গা বলে এখানে সকালও হয় তাড়াতাড়ি। শ্রীনগরে দেখেছি সাড়ে চারটের মধ্যে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। সুতরাং এখানে দিন বড়, রাত ছোট।

কিন্তু দিন-রাতের কথা থাক, তার চেয়ে পথের কথা হোক—কাটরার পথ, বৈষ্ণোদেবী দরবারের প্রবেশ-তোরণ কাটরা।

বাস এগিয়ে চলেছে। এখন পথ সামান্য চড়াই-উতরাই। পথের পাশে কাঁটাগাছ ও ঝোপঝাড় কমেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে সমতল আর বড় বড় গাছ—আম বট অশ্বত্থ ও কলাগাছ। বেশ কয়েকদিন বাদে এসব গাছ দেখছি, বিশেষ করে কলাগাছ।

আবার একটা নেড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। আঁকাবাঁকা পথ। আরও একটা পাহাড়ী নদী পার হয়ে এলাম, তেমনি জলহীন নদী।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চড়াই-উতরাই শেষ হয়ে গেল। আমরা সুবিস্তৃত সমতলে উপস্থিত হয়েছি। এখন প্রায় সোজা পথে বাস এগিয়ে চলেছে। পথের দু-পাশেই সবুজ সমতল—ক্ষেত-খামার, বাড়ি-ঘর। পাহাড় সরে গেছে দূরে—অনেক দূরে। তবে তাকে দেখা যাচ্ছে। এখনও হিমালয় হারিয়ে যায় নি। কিন্তু আর মাত্র দেড়দিন আমি তার কোলে থাকতে পারব। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

ডানদিকে একখানি সাইনবোর্ড—'Fruit Plant Nursery.' দূরে কাটরা শহর দেখা যাচ্ছে। বাস এগিয়ে চলেছে।

বাঁদিকে আবার সাইনবোর্ড—'Welcome to Katra.' বাড়িঘর দোকানপাট শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা কাটরা এসে গেছি। সামনে বাসস্ট্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে—এখন বিকেল ছ'টা।

।। দুই ।।

দীর্ঘ দশঘণ্টা পরে বাস নিশ্চল হলো। কাটরা বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাসযাত্রার যতি পড়ল। এবারে শুরু হবে পায়ে-চলা পথ—বৈষ্ণোদেবী দরবারের পদযাত্রা।

শহরের তুলনায় বাস-স্ট্যাণ্ডটি বেশ বড়। অনেকগুলো ট্যাক্সি এবং কয়েকখানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। খানদুয়েক রিজার্ভড ট্যুরিস্ট্ বাসও দেখতে পাচ্ছি। চারিদিকে বহু মানুষের আনাগোনা। খুবই ব্যস্ত বাসস্ট্যাণ্ড।

বাস থেকে নেমে আসি। ভানু বাসের ছাদে ওঠে। আমি আর করুণ ওকে মাল নামাতে সাহায্য করি।

মাল নামানো শেষ হলে ওদের বলি, "তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি ট্যুরিস্ট্ রিসেপ্শন সেণ্টার থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে আসছি।"

"অনুমতিপত্র!" করুণ বিস্মিত, "বৈষ্ণোদেবীর যাত্রায় যেতে হলে আবার অনুমতি লাগে নাকি?"

"হ্যাঁ।" নন্দা উত্তর দেয়, "পূজারতির জন্য সকালে একঘণ্টা ও সন্ধ্যায় দু-ঘণ্টা ছাড়া সব সময়েই বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে দর্শন চলেছে। কিন্তু আপনি তো জানেন, একটা সংকীর্ণ গুহায় বৈষ্ণোদেবীর মন্দির। দশ-পনেরোজন যাত্রীর বেশি একসঙ্গে ভেতরে ঢুকতে পারে না। তাই সারাদিনে বড়জোর হাজার পাঁচেক যাত্রী দর্শন করতে পারে। অথচ দৈনিক যাত্রীসংখ্যা অনেক বেশি। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ তাই অনুমতি পত্রের প্রচলন করেছেন।"

করুণ আমাকে বলে, "আপনি তাহলে পাস নিয়ে আসুন। আমরা এখানে মালপত্র পাহারা দিচ্ছি।"

"তারও কোনো দরকার নেই করুণদা!" নন্দা আবার বলে, "এখানে কেউ কারও কিছু চুরি করে না।"

"বোধকরি বৈষ্ণোদেবীর প্রভাবে?"

নন্দা মাথা নাড়ে।

আমি হাঁটতে শুরু করি। বাসস্ট্যাণ্ডের দু-দিক জুড়ে দোকানপাট—বাজার আর একদিকে ট্যুরিস্ট্ রিসেপশন সেণ্টার।

ট্যুরিস্ট্ সেণ্টার হলেও ভেতরের চেহারাটি অবিকল ব্যাঙ্কের মতো। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বেশ বড় হলঘর, পাশে সারি সারি কাউণ্টার। তারই একটি কাউণ্টারে কয়েকজন মানুষ লাইন দিয়েছেন। আমিও এসে সেই লাইনে সামিল হই।

ভেতরে দু'জন লোক নাম-ধাম এবং সহযাত্রীদের সংখ্যা জেনে নিয়ে একখানি করে অনুমতিপত্র দিচ্ছেন। এই অনুমতিপত্র না নিয়ে গেলে আড়াই কিলোমিটার দূরের বাণগঙ্গা গেট থেকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে, যাওয়া হবে না বৈষ্ণোদেবীর দরবারে।

যথাসময়ে আমার পালা আসে। আমরা পাঁচজন বড়, দু-জন ছোট। কিন্তু ছ'জনের জন্য অনুমতিপত্র দিলেন আমাকে। কারণ তোতার বয়স মাত্র চার বছর, সে নাকি অনুমতি ছাড়াই বৈষ্ণোদেবীর দরবারে প্রবেশ করতে পারবে।

ফিরে আসি বাসস্ট্যাণ্ডে। করুণ জিজ্ঞেস করে, "যাত্রার পাশ পাওয়া গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।" আমি বলি. "এবারে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে বলুন?" করুণ বলে।

উত্তর দিই, "এখানে আশ্রয় অনেক। রয়েছে ট্যুরিস্ট্ লজ ও হোস্টেল। আছে ডাকবাংলো এবং ধর্মার্থ সরাই, চিন্তামণি সরাই ও শ্রীধরসভা সরাই নামে তিনটি আধুনিক ধর্মশালা। কেবল শ্রীধরসভা সরাইতেই একসঙ্গে এক হাজার যাত্রী রাত্রিবাস করতে পারেন।"

"ধর্মশালায় থাকব না শঙ্কুদা, আপনি ডাকবাংলো কিংবা ট্যুরিস্ট্ লজ দেখুন।" মীরাদি মাঝখান থেকে বলে ওঠেন।

"বেশ, আপনারা আরেকটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি কোনো ঘর পাওয়া যায় কিনা।"

"আমি সঙ্গে আসব?" করুণ জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "না। তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি।" রিসেপ্শন সেন্টারের পেছনেই ট্যুরিস্ট্-লজ। বেশ বড় বাড়ি, বহু ঘর। কিন্তু সবই তালা দেওয়া। যাত্রী আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

কাকে জিজ্ঞেস করব? জনৈক যাত্রী বললেন—একটু আগে ম্যানেজার বাইরে গিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। তিনি না এলে ঘর পাবেন না। তবে ডরমিট্রী খোলা রয়েছে, জায়গা পেলে অবশ্য সেখানে ঢুকে পড়তে পারেন।

কথাটা মিথ্যে বলেন নি ভদ্রলোক। পাশেই ডরমিট্রী এবং সত্যি জায়গা রয়েছে। আমরা অনায়াসে সেখানে বিছানা বিছিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে দুটি শিশু ও দু'জন মহিলা রয়েছে। একঘরে এত মানুষের সঙ্গে থাকতে তাদের অসুবিধে হবে। আর শুধু ওদের কথাই বা বলি কেন? আমারও হয়তো রাতে ঘুম হবে না। কারণ আমাদের প্রতিবেশীরা সারারাত ধরে তাস খেলতে কিংবা কীর্তন করতে পারেন। সারাদিন বাসযাত্রার ধকল গিয়েছে। শেষরাতে উঠতে হবে। তার ওপরে রান্না-খাওয়া আছে। অতএব এখানে আমাদের পোষাবে না। ফিরে আসি বাসস্ট্যাণ্ডে।

সব শুনে নন্দা বলে, "ডাকবাংলোয় চেষ্টা করা বৃথা। সেখানে ঘর পাওয়া যাবে না। আলাদা ঘর না হলে আমাদের অসুবিধে। আপনি বরং প্রাইভেট হাউস দেখুন শঙ্কুদা! এখানে শুনেছি অনেক বাড়িতেই কামরা ভাড়া পাওয়া যায়।"

"এই ছেলেটি বলছে, এর খোঁজে নাকি ঘর আছে।" করুণ সহসা বলে ওঠে, সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কিশোরকে দেখিয়ে দেয়।

হালে পানি পাই। ছেলেটিকে বলি, "তোমার খোঁজে ভালো ঘর আছে?"

"জী হাঁ।" সে মাথা নাড়ে।

"আমাদের একখানি বড় কিংবা পাশাপাশি ছোট দু'খানি ঘর চাই। আলাদা বাথরুম না হলে চলবে না।"

"জী, মিলেগী।" ছেলেটি জানায়।

"কতদূরে?"

"খুবই কাছে।"

"বেশ চলো, দেখে আসা যাক্।"

ছেলেটির সঙ্গে চলি। বাজারের ভেতর দিয়ে একটু এগিয়েই বাঁহাতে ছোট গলি।

গলিতে ঢুকে কয়েক পা পরে ডান হাতে বড় বাড়ি—কমলা ভবন। দোতলায় বেশ বড় একখানি ঘর। ঘরে দুটি করে লাইট ও ফ্যান রয়েছে। রয়েছে দুখানি দরজা ও তিনটি জানলা। আলো-হাওয়াযুক্ত ভালো ঘর। সামনে খোলা ছাদ। সেখানে রান্না করা যাবে। তিনতলায় পায়খানা ও একতলায় বাথরুম। জলের অভাব নেই।

সুতরাং ঘরখানি নেওয়া যেতে পারে। তবে ভাড়া একটু বেশি—দৈনিক চল্লিশ টাকা। কিন্তু কি করার? এই অবেলায় আবার কোথায় যাবো? অতএব রাজী হয়ে যাই।

ফিরে আসি বাসস্ট্যাণ্ডে। ওদের কোনো আপত্তি নেই। ছেলেটিই কুলি ডেকে আনে। আমরা ঘরে আসি।

বাড়িওয়ালা হয়তো বা আছেন, কিন্তু এখনও তাঁর দর্শন পাই নি। তখনও বাড়িওয়ালী কথা বলেছেন, এখনও তিনিই ঘর খুলে দিলেন। তাঁর মেয়েরা ঘর পরিষ্কার করে দেয়। আমরা গুছিয়ে বসি।

বাড়িওয়ালীর তিনটি মেয়ে—দুটি যুবতী ও একটি কিশোরী। নিচের তলায় একপাশে নিজেরা থাকে। বাকি ঘরগুলো এবং দোতলার সবটাই যাত্রীদের ভাড়া দেয়। এখানে সারাদিন যাত্রী আসে, তবে কেউ আমাদের মতো দু'দিনের জন্য ঘর ভাড়া নেয় না। সাধারণত যাত্রীরা যাতায়াতের সময় এখানে দু-চার ঘণ্টা বিশ্রাম করে মাত্র, কেউ বড় একটা রাত্রিবাস করে না। সুতরাং তাদের দিনরাতের জন্য ঘর নেবার দরকার হয় না।

আমাদের সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। তাছাড়া আমরা কাল সকালে রওনা হয়ে বৈষ্ণোদেবী দর্শন করে সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসতে চাই। পরশু জম্মু গিয়ে হিমগিরি এক্সপ্রেস ধরতে হবে—রিজার্ভেশান রয়েছে। সুতরাং আমাদের দুদিনের জন্যই ঘর নেওয়া দরকার। সকালে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে, সন্ধ্যায় ফিরে এসে মুশকিলে পড়ে যাবো।

ভানু স্টোভ ধরিয়ে চা বানিয়ে ফেলে। বাড়িওয়ালীর দুটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে চা নিয়ে বসে যায়। তারা কথায় কথায় বলে, "কেবল পূজার উপকরণ নয়, আমাদের দোকানে আপনি সোয়েটার মোজা জুতো লাঠি ছাতা টর্চ ক্যামেরা ওয়াটার-বট্‌ল বর্ষাতি—এক কথায় যাত্রীদলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস ভাড়া পাবেন।"

হেসে বলি, "আমাদের শুধু লাঠি দরকার।"

"বেশ তাই নেবেন। লাঠি প্রতি এক টাকা করে জমা দিতে হবে, ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা। ফিরে এসে লাঠি ফেরত দিলে ভাড়া কেটে নিয়ে জমার বাকি পয়সা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়।"

করুণ জিজ্ঞেস করে, "পুজোর প্রসাদ ও উপকরণ কি এখান থেকেই কিনে নিয়ে যেতে হবে?"

"জী, হাঁ।" মেয়েরা মাথা নাড়ে।

"কেন, বৈষ্ণোদেবীতে পাওয়া যাবে না?"

"না। ওখানে কিছু পাওয়া যাবে না।" মেয়েরা উত্তর দেয়।

বুঝতে পারছি না এরা সত্যি কথা বলছে কিনা? কারণ বৈষ্ণোদেবীতে এদের কোনো দোকান নেই। তাহলেও এখান থেকেই সব কিছু নিয়ে যেতে হবে। কারণ

আমাদের পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং বলি, "কিন্তু তোমাদের দোকান যে আমরা চিনি না।"

"এই তো গলির মোড়ে। আর আমরাই আপনাদের নিয়ে যাবো দোকানে।"

"তাহলে তো এখুনি যেতে হয়, নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

মীরাদি বাংলায় আমাকে বলেন। তবু মেয়েরা বুঝতে পারে তাঁর কথা। তারা হিন্দীতে বলে ওঠে, "না, না। সে ভয় করবেন না। এখানে সারারাত যাত্রীরা যাতায়াত করেন, দিনরাত দোকানপাট খোলা থাকে। আপনারা যখন ইচ্ছে দোকানে যাবেন। আমাদের বলবেন, আমরা একজন আপনাদের সঙ্গে যাবো।"

শ্রীনগরেও শীত ছিল না, কিন্তু এখানে রীতিমত গরম লাগছে। কেনই বা লাগবে না, জুন মাস। এখানকার উচ্চতা মাত্র ২৯১৮ ফুট। তাছাড়া পাহাড়ের পাদদেশে শীত এবং গরম দুই-ই বেশি হয়।

সুতরাং সবাই সাবান দিয়ে স্নান করে নিলাম। বাড়িওয়ালী ঠিক বলেছিলেন—অঢেল জল তাঁর বাড়িতে। তাছাড়া মেয়েগুলিও বড্ড ভালো। তারা সর্বদা সাহায্য করছে আমাদের।

স্নান করে ভারী আরাম লাগছে। ফ্যান খুলে বসে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে থাকি। হঠাৎ মেজো মেয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা ট্যুবিস্ট অফিস থেকে 'পাস' নিয়েছেন?"

উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"দেখি, কি টাইম দিয়েছে?"

টাইম! টাইম মানে সময়, ওতে সময় দেওয়া আছে নাকি? দেখি নি তো! কিন্তু যা দেখার ওরাই দেখুক। পকেট থেকে কাগজখানি বের করে মেয়েটির হাতে দিই।

সে কাগজখানিতে চোখ বুলায়। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "আপনাদের যে আজই যেতে হবে!"

"সেকি!"

"হ্যাঁ, এই দেখুন না লেখা রয়েছে '10 pm'—তার মানে আজ রাত দশটার মধ্যে আপনাদের বাণগঙ্গা গেট পেরিয়ে যেতে হবে।"

"এই 'পাস' দিয়ে আগামীকাল সকালে যাওয়া যাবে না?"

"যাবে, তবে তার আগে তারিখ ও সময় পালটে নিতে হবে। আপনি এখুনি একবার ট্যুরিস্ট্ সেণ্টার থেকে ঘুরে আসুন।"

অতএব জুতো পরে নেমে আসি নিচে। এগিয়ে চলি ট্যুরিস্ট্ সেণ্টারের দিকে।

এখনও অফিস বন্ধ হয় নি দেখছি। হবার কথাও নয়। বড় মেয়ে বলেছে, রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে এ অফিস।

ভেতরে আসি। এখনও কয়েকজন মানুষ লাইনে আছেন। তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়াই। প্রথম লোকটি সময় পেলেন—'2 am'. অর্থাৎ তাঁকে আজ রাত দুটোর মধ্যে বাণগঙ্গা গেট পার হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবী ১৪ কিলোমিটার, তার মধ্যে প্রায় ৯ কিলোমিটার কঠিন চড়াই। কেমন করে যাবেন?

কি জানি, এঁরা ভক্তজন। না ঘুমিয়ে সারারাত ধরে পাহাড়ী পথ ভাঙবেন।

কিন্তু আমি ভক্তিহীন অবৈষ্ণব, আমি পারব না। আমরা কাল সকালে রওনা হবো।

সেই কথাই বলি ভদ্রলোককে। তিনি শুনে বলেন, "কিন্তু রাতে যাওয়াই তো ভালো। চাঁদনী রাত, গরমের দিন, ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় চলে যেতে পারতেন। ওখানে গিয়েও বেশি সময় বসে থাকতে হতো না।"

"কিন্তু আমরা ভাই রাতে যেতে পারব না, আমাদের সঙ্গে দু'জন মহিলা ও দুটি শিশু রয়েছে!"

ভদ্রলোক একটু হাসেন। বলেন, "সবার সঙ্গেই থাকে। তবু তাঁরা রাতে পথচলা পছন্দ করেন। আপনারা প্রথম এসেছেন বলে বুঝতে পারছেন না। আমি বরং আপনাদের সময়টা বাড়িয়ে দিচ্ছি—'2 am' লিখে দিচ্ছি। আপনারা রাত একটা নাগাদ রওনা হয়ে যান। সকাল সাতটার মধ্যে দেবীজীর দরবারে পৌঁছে যাবেন। দর্শন করে কাল বিকেলে এখানে ফিরে আসতে পারবেন।"

বিচিত্র পরামর্শ। না ঘুমিয়ে সারারাত ধরে পাহাড়ী পথ ভাঙব। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না। সুতরাং সবিনয়ে বলি, "না, ভাই। আমরা আজ যেতে পারব না, কাল সকালেই রওনা হব। আপনি তাবিখ ও সময়টা পালটে দিন।"

"কাল সকালে আসবেন।"

ভদ্রলোক বোধকরি বিরক্ত হলেন। তবু তাঁকে আবার অনুরোধ করি, "আমরা কাল ভোর পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনি দয়া করে আজই তারিখটা পালটে দিন।"

"তা হয় না স্যার!" ভদ্রলোক বলেন, "কালকের তারিখ দিয়ে আজ 'স্লিপ ইস্যু' করতে পারব না, মানে করার নিয়ম নেই। সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমাদের অফিস খুলবে, তখন 'স্লিপ' নিয়ে আসবেন, তারিখ ও সময় পালটে দেব।"

আবার অনিশ্চয়তা আবার দুশ্চিন্তা! সাড়ে পাঁচটা বললেও বোধকরি ছ'টা-সাড়ে ছ'টার আগে অফিস খুলবে না। জানি না কতবড় 'লাইন' হবে, তারিখ ও সময় পালটাতে কতক্ষণ সময় লাগবে? মনে হচ্ছে সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে রওনা হতে পারব না।

ফিরে আসি কমলা ভবনে। সব শুনে মেজ মেয়ে বলে, "না, না, সাতটা-সাড়ে সাতটা বাজবে কেন? ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অফিস খুলবে। আপনারা তার আগেই তৈরি হয়ে নেবেন। ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারবেন।"

"কিন্তু আপনারা কি সত্যি ঘর বন্ধ করে রেখে যাবেন?" বড়মেয়ে বলে।

"হ্যাঁ!" আমি উত্তর দিই।

"তাহলে হয়তো আপনাদের অযথা একদিনের ভাড়া দিতে হবে।"

"কেন বল তো?"

"কাল সকালে রওনা হয়ে রাতে ফিরে আসতে পারবেন না।"

আমরা সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাই।

সে আবার বলে, "গতকাল রাত একটায় যারা গিয়েছে, তারা এখনও ফিরে আসে নি। তাই বলছিলাম, ঘরটা অযথা বন্ধ না করে আমাদের নিচের ঘরে মালপত্র রেখে যান, ফিরে আসতে পারলে ঘর পেয়ে যাবেন, না পারলে ভাড়াটা বেঁচে যাবে।"

"কিন্তু আমাদের যে পরশু জম্মু গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। কাল আমরা ফিরে আসবই। তাই আর ঘরটা ছাড়ব না। তোমাদের ভাড়া তোমরা পেয়ে যাবে।"

ওরা আর কোন প্রতিবাদ করে না। দু-বোন দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপরে মেজমেয়ে জিজ্ঞেস করে, "এখন কি পুজোর জিনিস কিনতে দোকানে যাবেন?"

ঘড়ি দেখি—রাত ন'টা। এবারে বাইরের কাজ সেরে ফেলা উচিত। ভানু রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে। কাজকর্ম সেরে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া দরকার। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।

বলি, "কে আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"আমি"। ছোটমেয়ে বলে!

"বেশ চলো।" উঠে দাঁড়াই।

করুণ ও মীরাদি আমার সহযাত্রী হয়। নন্দা বলে, "শঙ্কুদা, বাচ্চাদের জন্য যে মিল্ক পাউডার নিয়ে এসেছিলাম, তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পেলে একটা 'আমুল স্প্রে' নিয়ে আসবেন।

ছোটমেয়ের সঙ্গে আমি করুণ ও মীরাদি নেমে আসি নিচে। গলি দিয়ে বড় রাস্তায় আসি। রাস্তা পেরিয়েই ওদের দোকান।

কেবল বাসস্ট্যাণ্ড নয়, শহরের তুলনায় কাটরা বাজারটিও বেশ বড়। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে চিন্তামণি সরাই অর্থাৎ অন্তত এক কিলোমিটার বিস্তৃত বাজার। পথের দু-ধারে ঘন দোকানের সারি। আলোঝলমল ঝকঝকে দোকান। মুদি মনোহারী ও দশকর্মা ভাণ্ডার আর হোটেল-রেস্তোরাঁ। শুনেছি এখানে দরাদরি নেই, ন্যায্য দামে সব জিনিস পাওয়া যায়।

ছোটমেয়ের সঙ্গে দোকানে উঠে আসি। বেশ বড় দোকান। মুদি মনোহারী ও দশকর্মা ভাণ্ডার। ভেন্তাস (Bhentas) তথা পূজার ডালি বা ভেট থেকে যাত্রার যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায়। এমন কি পথের ভিক্ষুকদের জন্য খুচরো পয়সা পাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

বাড়িওয়ালার দোকানে এসেছি, কিন্তু এখানেও বাড়িওয়ালার দর্শন পেলাম না। তাঁর বড়ছেলে দোকান চালাচ্ছে। সে ভদ্রলোক কোথায় থাকেন, কি করেন—কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময় ঠেকছে।

মীরাদির প্রশ্নের উত্তরে তরুণ দোকানী জানায়, "সাড়ে বাইশ টাকার কমে কোনো ভেন্তাস হয় না, আর ওপরের দিকে আপনি হাজার টাকাও লাগাতে পারেন।"

"না ভাই!" মৃদু হেসে বলি, "আমরা মা-বৈষ্ণোদেবীর তেমন সুযোগ্য সুসন্তান নই। আপনি আমাদের সাড়ে বাইশ টাকার ভেন্তাস বানিয়ে দিন। আর আমরা পাঁচখানি লাঠি নেবো।"

"লাঠি সামনে রাখা হয়েছে, বেছে নিন। আমি ভেন্তাস বানিয়ে দিচ্ছি।" ছোটমেয়েকে নিয়ে করুণ লাঠি বাছতে শুরু করে, আমরা ভেন্তাস বানানো দেখতে থাকি। প্রথমেই জরির কাজকরা একফালি লম্বা লাল কাপড় বের করে। এই কাপড়টির নাম চুনারী। যাত্রাশেষে যাত্রীরা বৈষ্ণোদেবীকে পুজো দেবার পরে এই চুনারী মাথায় বেঁধে ফিরে আসেন। চুনারী ছাড়া ভেন্তাসে রয়েছে আরও দু-টুকরো লাল কাপড়,

খানিকটা লাল-সাদা সুতো, রুপোর মতো চক্‌চকে টিনের ছত্র, সিঁদুর এবং প্রসাদ প্রভৃতি। প্রসাদ মানে নকুলদানা, খোবানী ও একটি নারিকেল। নারিকেল ছাড়া নাকি মায়ের পুজো দেওয়া যায় না।

ভেস্তাস নিয়ে মীরাদি ও ছোটমেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আমরা বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। কাল সকালে চায়ের জন্য বিস্কুট, পথের জন্য টক লজেন্স এবং নন্দার জন্য আমুল স্প্রে কিনতে হবে।

রাত দশটা বাজে কিন্তু কাটরা বাজার সেই সন্ধ্যার মতোই ব্যস্তবহুল। খাবারের দোকানে তেমনি ভিড়, দশকর্মা ভাণ্ডারগুলো এখনও খদ্দেরে বোঝাই, অন্যান্য দোকানেও সমানে কেনা-কাটা চলেছে। দলে দলে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে যাত্রা করছে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। তাদের সবার মাথায় চুনারী বাঁধা আর হাতে লাঠি। সকলের মুখে সেই এক ধ্বনি—জয় মাতাদী! মাতাজী নয়, মাতাদী।

শুধু যাওয়া নয়, এটি বৈষ্ণোদেবীর দরবার থেকে ফিরে আসার পথও বটে। দলে দলে যাত্রী ফিরে আসছে। তাদের ক্লান্ত দেহ কিন্তু মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত। তারা যে মাতৃকরুণা লাভ করে ফিরে এসেছে। তাদের মুখেও তাই মাতৃবন্দনা—জয় মাতাদী। আমাদেরও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে হয়—জয় মাতাদী।

আমরা কিন্তু ওদের শরিক হবার সাহস পাই নি। কাটরা এসেও যাত্রা করতে পারি নি বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। ঘর ভাড়া করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি। লজ্জায় তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি কমলা ভবনে।

রাত দশটা বেজে গেছে। কাল সকালে উঠতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি গোছগাছ সেরে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি।

আগেই বলেছি কাটরায় বেশ গরম। দরজা বন্ধ করার পরে ঘরের গরম আরও বেড়ে যায়। ঘরে দুটি ফ্যান রয়েছে। একটা তবু মধ্যম গতিতে মোটামুটি ঘুরছে কিন্তু অপরটি প্রচণ্ড শব্দ করে অতি মৃদু পাক খাচ্ছে—একেবারেই হাওয়া হচ্ছে না।

নন্দা সান্ত্বনা দেয়, "মেয়েরা বলেছে, রাত বারোটায় দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাবার পরে নাকি দুটো ফ্যানই বন্‌বন্ করে ঘুরবে, বুড়োটার শব্দও কমে যাবে।"

"কিন্তু ওরা যে তখন বলল, এখানে দিন রাত দোকান খোলা থাকে।" করুণ সহাস্যে প্রশ্ন করে।

মীরাদি মেয়েদের হয়ে ওকালতি করেন, "সব দোকান কি আর সারারাত খোলা থাকতে পারে? দু-চারটি হয়তো থাকে, বাকি সব বন্ধ হয়।"

"তার মানে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পরে ফ্যান দুটি সত্যি সত্যি বন্‌বন্ করে ঘুরবে। অতএব গরম হজম করে এখন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যাক।" আমি যোগ করি।

ওরা হেসে দেয়। নন্দা বলে, "গরম হজম করে একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে, বাড়িওয়ালীর ফ্যান থেমে গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না।"

"না, না, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারো। ফ্যান বন্ধ হবে না।" আমি নন্দাকে আশ্বস্ত করতে চাই।

নন্দা প্রশ্ন করে, 'আপনার এই বিশ্বাসের কারণ?"

"কারণ এখানে লোডশেডিং নেই।"

আবার হাস্যরোল।

।। তিন ।।

ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম ভাঙে। আজ আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হবে। আজ আমি বৈষ্ণোদেবীর দরবার দর্শন করব।

উঠে বসি। ভানুকে ডেকে তুলে চা বানাতে বলি। তারপরে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। এখনও একেবারে ফর্সা হয় নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সকালের আলো ফুটে উঠবে।

বাথরুম সেরে ফিরে আসি। ভানু চা ভেজাচ্ছে। করুণ উঠে বসেছে। মীরাদি ও নন্দাকে ডাক দিই। ভানু চা নিয়ে আসে।

চা খেতে খেতে জামা-প্যাণ্ট্-জুতো পরে নিই। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে নন্দাকে বলি, "বাচ্চাদের উঠিয়ে সবাই তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নাও। আমি ট্যুরিস্ট সেণ্টার থেকে ঘুরে আসছি।"

ট্যুরিস্ট সেণ্টারের সামনে এসে বিচলিত হতে হয়। বিরাট লম্বা দুটি লাইন হয়েছে দু-দিকের দুই দরজার সামনে। বলা বাহুল্য দরজা বন্ধ। সবে পাঁচটা বেজেছে। সাড়ে পাঁচটায় অফিস খোলার কথা।

কথা তো বুঝলাম, কিন্তু খুলবে কি? গতকাল রাত এগারোটায় অফিস বন্ধ হয়েছে।

একটি লাইন নতুন আগন্তুকদের অর্থাৎ যাঁরা গতকাল রাত এগারোটার পরে কাটরা পৌঁছেছেন। আরেকটি আমার মতো যাত্রীদের অর্থাৎ যাঁরা গতকাল অনুমতিপত্র পেয়েও যাত্রা করতে পারেন নি। বাড়িওয়ালীর মেয়েরা এবং এই অফিসের সেই কর্মচারীটি যাই বলুক, আমিই কিন্তু দলে ভারী। আমাদের লাইনটাই বেশি লম্বা। তার মানে আমার মতো আরও অনেক আছেন, যাঁরা ঘুমের মায়া ত্যাগ করে রাতে চড়াই ভাঙতে রাজী হন নি।

কম করেও জন চল্লিশেক যাত্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁদের ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন বয়স—তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সবাই আছেন। তবে দু-একজন নেপালী ছাড়া কোনো অভারতীয় দেখছি না। ব্যাপারটা বিস্ময়কর! কারণ কাশ্মীরে বিদেশী ট্যুরিস্ট্দের সংখ্যা খুবই বেশি। লাদাকের বাসে উঠে দেখেছি অধিকাংশ বিদেশী। অবশ্য জানি না, অহিন্দুরা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে প্রবেশ করতে পারেন কিনা? না পারলেও এই বৈচিত্র্যময় যাত্রার কথা জানতে পারলে তাঁরা শুধু যাত্রার জন্যই যাত্রী হতেন। আমার মনে হয় ট্যুরিস্ট দপ্তর তাঁদের কাছে বৈষ্ণোদেবীর কথা বলেন না বলেই এমনটি হয়েছে।

বৈষ্ণোদেবী জম্মুর সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থ। শুনেছি এখানে বারোমাস যাত্রীদের ভিড় লেগেই আছে। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। তারকেশ্বরের মতো এখানেও অনেকে প্রতিবছর একবার করে যাত্রায় আসেন। পরীক্ষায় পাশ করলে, চাকরি পেলে, বিয়ে করে সন্তান লাভের পরে, মানত করতে কিংবা কোনো

মনোস্কামনা পূর্ণ হবার পরে এবং তীর্থদর্শনে দলে দলে মানুষ প্রতিদিন যাত্রায় আসছেন।

তাহলেও দেবী বৈষ্ণবীর এই জনপ্রিয়তা শুধু দিল্লী পাঞ্জাব হরিয়ানা ও জম্মুতেই সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণোদেবী এখনও অমরনাথের মতো সর্বভারতীয় তীর্থ হয়ে উঠতে পারে নি, যেমন তারকেশ্বর আজও গঙ্গাসাগর হয়ে ওঠে নি।

সত্যি সত্যি সাড়ে পাঁচটায় অফিসের একটা জানলা খুলল এবং সেখান থেকেই আমাদের অনুমতিপত্রে তারিখ ও সময় পালটে দেওয়া শুরু হলো। লাইন এগিয়ে চলল। আশাতীত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। খুবই কম সময় লাগছে। ছ'টার আগেই আমি পরিবর্তিত অনুমতিপত্র পেয়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসি ঘরে। ওরাও তৈরি হয়ে আছে। ঘরে তালা দিয়ে নেমে আসি নিচে। বাড়িওয়ালী ও তাঁর মেয়েরা আমাদের বিদায় জানায়। বাড়িওয়ালী বলেন, "বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যান। বাজার ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখবেন পথটা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। আপনারা বাঁদিকের পথ ধরবেন। কিছুদুর এগিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পাবেন। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে মূলপথ। দেখবেন ঘোড়া ও পিট্টু মানে কুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাচ্চাদের জন্য একটা ঘোড়া না নিয়ে দু-জন পিট্টু নিলে ভালো করবেন। কারণ ঘোড়া শুধু যাবার জন্য পাবেন, ফিরে আসার সময় বৈষ্ণোদেবী থেকে নতুন ঘোড়া নিতে হবে। কিন্তু পিট্টু যাওয়া-আসার জন্য। তারা সর্বদা সঙ্গে থাকবে। তবে তাদের খেতে দিতে হবে।"

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নেমে আসি পথে। বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি।

এখন সবে সকাল সওয়া ছ'টা। কিন্তু বাজারের দোকান-পাট প্রায় সবই খোলা। দলে দলে যাত্রী কেনা-কাটা করছেন, খাওয়া-দাওয়া সারছেন। পথেও বেশ ভিড়। অধিকাংশই যাত্রী।

তাঁদের কারও বা মাথায় চুনারী বাঁধা, হাতে লাঠি, পিঠে বোঝা। বেশ দেখাচ্ছে। ওঁদের দেখা-দেখি করুণও থলি থেকে চুনারীটি বের করে মাথায় বেঁধে নেয়। নন্দা নিষেধ করে । বলে, "যাঁদের মাথায় চুনারী বাঁধা দেখছেন, ওঁরা সবাই বৈষ্ণোদেবীর পুজো দিয়ে ফিরে চলেছেন। পুজো দেবার পরে ওটা মাথায় বাঁধার নিয়ম।"

কিন্তু করুণ নিরামিষভোজী সাত্ত্বিক পণ্ডিত। সে নন্দার কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে চলে। এবং তাকেও ভালই দেখাচ্ছে। তীর্থের পথেও 'শো-ম্যানশিপ' বা প্রদর্শন জাহির করার একটা মূল্য আছে বৈকি!

পথের যাত্রীরা কেউ আমাদের সঙ্গে বৈষ্ণদেবী চলেছেন, কেউ সেখান থেকে ফিরে এলেন। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা জোরে জোরে পা ফেলছেন। উচ্চকণ্ঠে বলছেন—জয় মাতদী। যাঁরা ফিরছেন তাঁরা ধীর পদক্ষেপে হাঁটছেন, ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিচ্ছেন—জয় মাতদী। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, যাঁরা ফিরছেন তাঁরা পথশ্রমে ক্লান্ত। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা উত্তেজিত, যাঁরা ফিরছেন তাঁরা অবসন্ন হলেও আনন্দে উদ্ভাসিত। সবার মুখে শুধু মায়ের জয়গান—জয় মাতদী।

গতকাল শুনেছি, আজ শুনছি, আগামীকালও শুনব জয় মাতদী। মাতাজী নয়,

মাতাদী। ‘জী’ কেন ‘দী’ হয়েছে জানি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি—যেভাবে বৈষ্ণবী দেবী বৈষ্ণোদেবী হয়েছেন, সেইভাবেই মাতাজী মাতাদী হয়ে গিয়েছেন।

আমরা বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। সিমেন্ট বাঁধানো পথ। পথের পাশে মাঝে মাঝে ভিক্ষুকরা বসে আছে। তারাও বলছে—জয় মাতাদী।

যাত্রীরা যথাসাধ্য দান করছেন, আমরাও কিছু কিছু করে দিই।

ডানদিকে বাংলো টাইপের একটা বেশ বড় বাড়ি। সামনে ফুল ও ফলের বাগান। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

এবারে নিচে নামতে হবে। বাড়িওয়ালী যে সিঁড়ির কথা বলেছিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। নিচে বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এ পথটাও কাটরা বাজার থেকে এখানে এসেছে। ঘুরে ঘুরে এসেছে বলে আমরা অন্যপথে এখানে এলাম। এতে অনেকখানি পথ-সংক্ষেপ হলো। তবে আমাদের পথটা পায়েচলা পথ, আর ওটি মোটর চলাচলের। যাঁরা নিজেদের গাড়ি কিংবা ট্যাক্সী নিয়ে এখানে আসেন, তাঁরা ইচ্ছে করলে গাড়ি চড়ে ঐ পথে দর্শনী দরজা পর্যন্ত যেতে পারেন। এতে তাঁদের দু-কিলোমিটারের মতো হাঁটা বেঁচে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে, পৌঁছই বড় রাস্তায়। পথটা বাঁদিক থেকে এসে ডানদিকে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু আমরা না এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। বাড়িওয়ালী বলেছিলেন, এখানে ঘোড়া ও পিট্টু পাওয়া যাবে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। চলমান যাত্রা ছাড়া কোনো লোকজনই যে নেই এখানে!

মুশকিলে পড়া গেল। নন্দা ও মীরাদির জন্য দুটি ঘোড়া এবং তোতা ও মহুয়ার জন্য দু’জন পিট্টু দরকার। নইলে পৌঁছতে অনেক অনেক দেরি হয়ে যাবে। দর্শন করে আমাদের যে আজই ফিরে আসতে হবে।

উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান রয়েছে। দোকানে খদ্দের নেই, কিন্তু দোকানী আছে। ওকে একবার জিজ্ঞেস করা যাক।

সব শুনে দোকানী বলেন, “ঠিকই শুনেছেন, এখানে ঘোড়া ও পিট্টু পাওয়া যায়। কিন্তু সবে সকাল হয়েছে, এখনও তারা এখানে আসে নি। এগিয়ে যান, দর্শনী দরওয়াজা কিংবা বাণগঙ্গায় পেয়ে যাবেন। সোজা রাস্তা।”

“বাণগঙ্গা এখান থেকে কতদূর?”

“কাটরা বাজার থেকে বাণগঙ্গা আড়াই কিলোমিটার। আপনারা এক কিলোমিটারের মতো এসেছেন।”

“আর দর্শনী দরজা?” করুণ জিজ্ঞেস করে।

দোকানী ইশারা করে বলে, “ঐ তো সামনে দেখা যাচ্ছে, বড়জোর পৌনে এক কিলোমিটার।”

অতএব দোকানীকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। দোকানী মোটেই মিথ্যে বলে নি—সত্যি সোজা রাস্তা। পাহাড়ী নয়, পাহাড়তলীর পথ। সুতরাং এখুনি ঘোড়া কিংবা কাঁধে চড়ার কথা ওঠে না।

ওরা তা চাইছেও না। বরং চলতে চলতে মীরাদি বলেন, “দৈত্যরাজ ভৈঁরোর সঙ্গে মা-বৈষ্ণোদেবীর সংগ্রামের কাহিনী জানি, কিন্তু ভৈরবনাথ নামে জনৈক যোগীকে নিয়ে নাকি প্রায় একই রকম একটি কাহিনী প্রচলিত আছে!”

আমি মাথা নাড়ি।

নন্দা বলে, "কাহিনীটা বলুন না!"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তীর্থ দর্শনে চলেছি, তীর্থের কাহিনী আলোচনা করে নিলে ভালই হবে। অতএব চলতে চলতে বলতে থাকি, "কাটরা থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে হন্‌শালী নামে একটি গ্রাম আছে। প্রায় সাত শ' বছর আগে সেই গ্রামে শ্রীধর নামে একজন ভক্ত-ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পেন্‌থাল রোডের ওপরে এখন যেখানে ভূমিকা মন্দির সেখানেই ছিল শ্রীধরের পর্ণকুটির। পরবর্তীকালে ভক্তরা সেই পুণ্যক্ষেত্রে ভূমিকা মন্দির নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ভূমিকা মন্দিরের কথা থাক, ভক্ত শ্রীধরের কথা হোক। তিনি ভক্তিসহকারে কুমারীপূজা করতেন। তাঁর নিজের কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। তিনি গাঁয়ের কিশোরীদের কন্যারূপে জ্ঞান করতেন।

"দেবী বৈষ্ণবী শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে তখন তাঁর প্রাণপুরুষের প্রতীক্ষা করতে রত্নাকর সাগর-সৈকত থেকে এখানে চলে এসেছেন। তিনি একদিন শ্রীধর পণ্ডিতের কুমারীপূজা দেখতে পেলেন।

পরদিন মা-বৈষ্ণবী কিশোরীর রূপ নিয়ে শ্রীধরের পূজামণ্ডপে চলে এলেন, য়ের মেয়েদের মাঝে মিশে গেলেন।

পূজাশেষে যথারীতি শ্রীধরজী কুমারীদের পাদোদক গ্রহণ করতে শুরু করলেন। একসময় তিনি কন্যারূপী মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভক্ত-ব্রাহ্মণ চমকে উঠলেন। ভক্ত-সন্তানের কাছে মা তাঁর দিব্যরূপ লুকোতে পারলেন না। অপরিচিতা কিশোরীর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর। মা ও সন্তানের চোখাচোখি হলো। ছেলে লুটিয়ে পড়লেন মায়ের পায়ে।

দক্ষিণা নিয়ে গাঁয়ের কুমারী কন্যারা বাড়ি ফিরে গেল। মা-বৈবৈষ্ণবী কিন্তু বসে রইলেন শ্রীধরের পর্ণকুটিরে। শ্রীধর এবারে করজোড়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—মা, তোমার অশেষ করুণা। বল, আমি কিভাবে তোমার সেবা করব?

মৃদু হেসে মা উত্তর দিলেন—আমি তোমার সেবা নিতে আসি নি, তোমাকে সেবা করতে এসেছি।

বিস্ময়ে ও পুলকে শ্রীধর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে আনন্দাশ্রু।

বৈষ্ণবী আবার বলেন—আমি তোমার মনোস্কামনা জানি। তুমি কুমারী পূজা উপলক্ষে ভাণ্ডারা দিতে চাও, কিন্তু দরিদ্র বলে দিতে পারছ না।

—হ্যাঁ মা, আমার বহুদিনের বাসনা। শ্রীধর চোখ মুছে কোনোমতে বলে ওঠেন।

মা বলেন—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তুমি কালই ভাণ্ডারা দেবে।

—কালই! শ্রীধর বিস্মিত।

—হ্যাঁ, মা বলেন—তুমি হন্‌শালী ও আশেপাশের সব গ্রামের সবাইকে নেমন্তন্ন কর।

—সব গ্রামের সবাইকে!

—হ্যাঁ। আমি কাল আসব।

কিশোরী অদৃশ্য হয়ে যায়। শ্রীধর আবার লুটিয়ে পড়ে সেখানে। ভক্তের চোখের জলে দেবীর দাঁড়িয়ে থাকা স্থানটি সিক্ত হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে শ্রীধরের সংবিত ফিরে আসে। তাঁর মনে পড়ে দেবীর আদেশ। নিজের দুরবস্থার কথা মনে রেখেও তিনি বেরিয়ে পড়েন গাঁয়ের পথে। ডেকে ডেকে সবাইকে ভাণ্ডারায় নেমন্তন্ন করেন।

নিমন্ত্রিতরা বিস্মিত হয়। অনেকে টিটকারী দেয়—কি হে, গুপ্তধনটন পেলে নাকি?

শ্রীধর সবিনয়ে বলেন—না ভাই। সবই মায়ের ইচ্ছে।

চলতে চলতে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয় শ্রীধরের। তিনি তাঁদের দলপতি গোরক্ষনাথকে বলেন—মহারাজ, কাল দুপুরে সবাইকে নিয়ে আমার কুটিরে আসবেন। চারটি অন্ন গ্রহণ করবেন।

গোরক্ষনাথের প্রধান শিষ্য তান্ত্রিক ভৈরবনাথ শ্রীধরের আর্থিক অবস্থার কথা জানত। সে সহাস্যে বলে—কুমারীপূজা করে তোমার বড্ড বাড় হয়েছে দেখছি। তুমি আমাদের নেমতন্ন করতে এসেছ! তুমি কি জানো না, রাজা মহারাজারাও আমাদের নেমন্তন্ন করতে ভয় পান!

—আজ্ঞে, আমি ভয় পাই না। কারণ আমি বৈষ্ণবী মায়ের আদেশে আপনাদের নেমন্তন্ন করছি।

—বৈষ্ণবী মা! গোরক্ষনাথ বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন।

—হ্যাঁ বাবা। তিনিই আমাকে ভাণ্ডারায় নেমন্তন্ন করার আদেশ দিয়েছেন। শ্রীধর জানান।

—ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি হে! কুটিল যোগী ভৈরবনাথ বলে।

সরল ভক্ত শ্রীধর সব কথা খুলে বলেন।

ভৈরবনাথের কৌতূহল হয়। বলে—কাল আসব তোমার বাড়িতে। দেখো বাপু, আবার অভুক্ত রেখো না যেন!

"শ্রীধর শুধু বলেন—সবই মায়ের কৃপা।...."

"শঙ্কুদা, সামনে দর্শনী দরজা।"

করুণের কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। শ্রীধরের কাহিনী থামিয়ে সামনে তাকাই। করুণ ঠিকই বলেছে—আমাদের সামনে পথের ওপরে একটি তোরণ। এরই নাম দর্শনী দরওয়াজা। অর্থাৎ বৈষ্ণোদেবী দরবার দর্শনের দরজা।

দরজা পেরিয়ে আসি। পথের পাশে যাত্রীনিবাস ও কয়েকটি দোকান। বাঁদিকে একসারি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচে—পাহাড়ী নদীতে । অনেকে সেখান থেকে জল নিয়ে আসছেন।

আমাদের সঙ্গে জল রয়েছে, সুতরাং জলের দরকার নেই। যা দরকার তা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ঘোড়া ও পিট্টু চাই। কিন্তু তাদের নামগন্ধ নেই কোথাও। অতএব এগিয়ে চলি।

মীরাদি বলেন, "ঘোড়া না পেয়ে ভালই হলো। ঘোড়া পেলে আর আপনার গল্প শোনা হতো না।"

"তার মানে আবার শুরু করুন শঙ্কুদা!" নন্দা যোগ করে।

অতএব আরম্ভ করি, "পরদিন সকাল থেকেই শ্রীধরের পর্ণকুটিরে নিমন্ত্রিতরা আসতে আরম্ভ করলেন। সবার শেষে ভৈরবনাথ ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথ এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীধরের বিশ্বাস তিনি ভুল করেন নি। মা-বৈষ্ণোদেবী কুমারীরূপে গতকাল তাঁকে দর্শন দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে যা করবার তিনিই করবেন। তবু তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁর ঘরে যে কিছু নেই। কোনো কারণে মা যদি না আসতে পারেন, তাহলে তাঁর কি হবে?

এ চিন্তা অবশ্য বেশিক্ষণ করতে হলো না। একটু বাদেই গতকালের সেই কুমারী কন্যা শ্রীধরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে খাবার-দাবার কিছুই নেই। কেবল হাতে ছোট একটি পাত্র।

তাহলেও শ্রীধর বিচলিত হলো না। তাঁর যে মায়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস। যা করার তিনিই করবেন।

কুমারী শ্রীধরকে বললেন—তুমি সবাইকে তোমার ঘরে এসে খেতে বসতে বল। আমি খাবার পরিবেশন করছি।

জায়গার অভাবে গোরক্ষনাথও শিষ্যদের নিয়ে বাইরে বসেছিলেন। শ্রীধর তাঁদের ঘরে এসে বসতে বললেন।

গোরক্ষনাথ হেসে বললেন—তোমার ঘরে আর জায়গা কোথায় হে! তার চেয়ে তুমি এখানেই খাবার দাও।

শ্রীধর সবিনয়ে জানালেন—আজ্ঞে মা বলেছেন, ভেতরে সবার জায়গা হয়ে যাবে।

হো হো করে হেসে উঠল ভৈরবনাথ। হাসি থামলে সে গোরক্ষনাথকে বলে—চলুন গুরুদেব! ভেতরে যাওয়া যাক্, শ্রীধরের মা বোধহয় আমাদের ভেল্কী দেখাবে!

সবাইকে নিয়ে গোরক্ষনাথ শ্রীধরের পর্ণকুটিরে প্রবেশ করলেন। সেখানে আরও বহু লোক বসেছিলেন। তবু তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, সত্যি সত্যি তাঁদের বসবার জায়গা রয়েছে। সুতরাং সন্ন্যাসীদের আসন গ্রহণ করতে হয়।

একটু বাদে কুমারী তাঁর সেই পাত্র হাতে নিয়ে নিমন্ত্রিতের আসরে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই সকলের মাথা নত হয়ে এলো। এমন শান্ত-সুন্দর স্বর্গীয় সৌন্দর্য এর আগে কেউ দেখে নি। সবার অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্যতিক্রম কেবল ভৈরবনাথ। কুমারীর অপরূপ রূপ তান্ত্রিক ভৈরবনাথের প্রাণে জ্বালা ধরিয়ে দিল। সে তাঁকে তার তন্ত্রসাধনার শক্তি করতে চাইল। মনে মনে স্থির করে ফেলল, যেমন করেই হোক যোগবলে এই যুবতীকে আমার পেতেই হবে।

কুমারী সর্বজ্ঞা। তিনি ভৈরবনাথের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন। তবু তিনি শান্তভাবে খাদ্য পরিবেশন শুরু করে দিলেন। সবার সামনে এসে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি খাবেন?

যে যা চাইলেন, তিনি তাঁর ছোট পাত্র থেকে তাই তাঁকে পরিবেশন করতে থাকলেন। নিমন্ত্রিতরা সকলেই কুমারীর পরিবেশন দেখে বিস্মিত হলেন।

খাবার দিতে দিতে কুমারী এসে দাঁড়ালেন ভৈরবনাথের সামনে। তাকেও তিনি ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। ভৈরবনাথ বলল—আমি যা চাইবো, তুমি তাই দিতে পারবে?

—আশা করছি। কুমারী মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

ভৈরব গম্ভীর স্বরে বলে—আমি মদ ও মাংস চাই।

তার কথা শুনে নিমন্ত্রিতরা অনেকেই বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ কিছু বলবার আগেই কুমারী মধুর স্বরে বললেন—এটা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ভাণ্ডারা। এখানে তো মদ-মাংস দেওয়া যাবে না!

—তাহলে আমাকে না খেয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

—দয়া করে সেকাজ করবেন না মহারাজ। আপনি অভুক্ত চলে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

—হবেই তো! ভৈরব গর্জে ওঠে—অকল্যাণ হবে না! বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে অপমান!

—আপনি ভুল করছেন। আপনাকে কেউ অপমান করে নি, বরং আপনিই অযৌক্তিক দাবী করে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে বিপদে ফেলতে চাইছেন।

—তবে রে কামিনী! ভৈরবনাথ উঠে দাঁড়িয়ে দেবীকে ধরতে চাইল; পারল না। অন্তর্যামী মা-বৈষ্ণবী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভৈরবনাথও ছাড়বার পাত্র নয়। সে যোগবলে দেখতে পেলো কুমারী পবনকন্যার রূপ ধারণ করে বায়ুবেগে সেই গুপ্তগুহার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

ভৈরব বুঝতে পারে কুমারী যদি একবার সেই দিব্য-গুহায় গিয়ে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে আর সে তাঁকে অধিকার করতে পারবে না। সুতরাং ভৈরবও যোগবলে দেহভার মুক্ত হয়ে বিদ্যুৎবেগে পেছনে ছুটতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ বাদেই দেবী বুঝতে পারলেন, ভৈরবের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য। তাছাড়া এই পাপাচারী সন্ন্যাসীকে বধ না করে তাঁর পক্ষে গুহামন্দিরে তপস্যারতা হওয়া নির্বিঘ্ন নয়। অতএব নিরস্ত্র বৈষ্ণবী অস্ত্রধারণ করলেন।

গুহামন্দিরের সামনে দু'জনের প্রবল যুদ্ধ হলো। কিন্তু যোগী ভৈরবের সকল যোগাস্ত্র একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশেষে দেবী বৈষ্ণবীর তরবারির আঘাতে ভৈরবের দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে—গুহামন্দিরের সামনে।"

॥ চার ॥

ঘোড়ার দেখা পেলাম না কিন্তু দেখতে দেখতে বাণগঙ্গা এসে গেল। পবিত্র ত্রিকূট পর্বতের সমতল পাদদেশ। তারই বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটি স্রোতস্বিনী—বাণগঙ্গা। নদীর নামেই জায়গার নাম।

কথিত আছে—শ্রীধরের কুঁড়েঘর থেকে অদৃশ্য হবার পরে দেবী বৈষ্ণবী লাঙ্গুরবীর অর্থাৎ শ্রীহনুমানকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলেছিলেন। এখানে এসে হনুমানজীর তেষ্টা পেয়ে গেল। অন্তর্যামী মা জানতে পারলেন সে-কথা। তাই স্নেহময়ী জননী সন্তানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পাথরের বুকে বাণ মেরে এই স্রোতস্বিনী সৃষ্টি করলেন। আর তাই এর নাম বাণগঙ্গা।

এখানে অবশ্য লেখা রয়েছে—'Bal Ganga'. লেখা রয়েছে কারণ সত্যই বাণগঙ্গার অপর নাম 'বালগঙ্গা'। এই নামেরও একটা ছোট ইতিহাস আছে।

অনেকে বলেন—লাঙ্গুরবীরের তৃষ্ণা নিবারণের পরে দেবী নিজেও ঐ পুণ্যধারায়

স্নান করে নেন। তিনি তাঁর চুল ভিজিয়ে স্নান করেছিলেন বলে এই নদীর নাম বালগঙ্গা।

তাঁরা আরও বলেন—স্নানের পরে দেবী দেখতে পেলেন, ভৈঁরোর সৈন্যরা এসে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ত্রিকূট পর্বতে আরোহণ করতে শুরু করলেন।

আমাদের ঐ ত্রিকূট পর্বতে আরোহণ করতে হবে। আমরা যে মায়ের কাছে চলেছি! কিন্তু তার আগে বাণগঙ্গাকে একটু দেখে নিই।

আমরা বাণগঙ্গা পৌঁছে গিয়েছি। তার মানে কাটরা থেকে আড়াই কিলোমিটার হেঁটেছি। এই পথটুকু আসতে কিন্তু কোনো কষ্ট হয় নি। কারণ এটি প্রায় সমতল পথ। এখন সবে সকাল সাতটা।

কিছু বাড়ি-ঘর দোকান-পাট মন্দির ধর্মশালা আর নদী নিয়ে বাণগঙ্গা জনপদ। নদীর ওপরে পুল। পুলের এপারে মন্দির। মন্দির থেকে মাইকে তুলসীদাসের রামায়ণ গান ভেসে আসছে।

বাজারের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। বাজার বড় না হলেও পথে প্রচুর ভিড়। যাত্রীরা যাওয়া-আসার পথে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান এখানে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলি।

বাজার ছাড়িয়ে পুলের গোড়ায় পৌঁছে যাই। ছোট নদী, ছোট পুল—ঝুলা পুল। পুলের গোড়ায় পুলিশ চৌকি—গুমটি ঘরের মতো। ভেতরে একজন পুলিশ কর্মচারী বসে আছেন। অনুমতি-পত্রখানি তাঁর হাতে দিই। খাতায় নাম ও নম্বর লিখে তিনি কাগজখানিতে রাবার-স্ট্যাম্প মারেন। তারপরে সই করে সেখানি আমাকে দিয়ে বলেন, "এটা যত্ন করে রেখে দিন। বৈষ্ণোদেবী পৌঁছে আমাদের অফিসে এটা জমা দিলে দর্শনের স্লিপ পাবেন।"

কাগজখানি তাঁর হাত থেকে নিয়ে সযত্নে পকেটে রেখে দিই। তিনি আবার বলেন, "ঘোড়া কিংবা পিট্টুর দরকার হলে পুলের ওপারে ডানদিকে পেয়ে যাবেন। সরকার দাম বেঁধে দিয়েছেন—ঘোড়া যাবার জন্য সাড়ে বাইশ টাকা আর পিট্টু যাওয়া-আসা দশ টাকা ও খাওয়া।"

ভদ্রলোককে নমস্কার করে এগিয়ে চলি—পুলের ওপরে আসি। বাণগঙ্গার ঝুলা-পুল, তলা দিয়ে বয়ে চলেছে নাতি-প্রশস্ত কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বিনী বাণগঙ্গা। এই পুল না পেরিয়ে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে যাবার পথ নেই। তাই পুলটি সরকারী খাতায় 'বাণগঙ্গা গেট' বলে বর্ণিত। অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই 'গেট' পেরিয়ে যেতে হবে। কারও সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, তাকে আবার কাটরা গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

আমার পক্ষে এসব চিন্তা অর্থহীন। আমাদের সময়সীমা বেলা দশটা আর এখন সবে সকাল সাতটা।

নদীর জল কিন্তু অনেকটা নিচে। তবু বেশ কিছু লোক জলের ধারে নেমে গিয়েছেন। তাঁরা স্নান করছেন—দেবী বৈষ্ণবীর করুণাবারি বাণগঙ্গার পূতসলিলে পুণ্যস্নান। বাণগঙ্গা শুধু পুণ্যসলিলা নয়, সে স্বর্গ ও মর্ত্যের সীমারেখা। বাণগঙ্গার এপারে দানবরাজ ভৈঁরোর জগৎ আর ওপারে বৈষ্ণোদেবীর আনন্দলোক। তাই পুণ্যার্থীরা পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে পুণ্যস্নান করে নিজেদের পাপমুক্ত করে নেবার চেষ্টা

করছেন। ওঁরা কি জানেন, সংসারের সব পাপ ধুয়ে ফেলা যায় না? ওঁরা কি ভুলে গিয়েছেন, বৈষ্ণোদেবী অন্তর্যামী—তাঁর কাছে কারও পাপ চাপা থাকবে না? পুল পেরিয়ে একফালি সমতল, তারপরেই পাহাড়—শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশিত ত্রিকূট পর্বত। পাহাড়ের পাদদেশে মন্দির—বাণগঙ্গা মন্দির। সাদা রঙের সুদৃশ্য একতলা মন্দির। গড়ন অনেকটা মঠের মতো, চূড়ায় দেবীর পতাকা। দরজার একপাশে লাঙ্গুরবীরের মূর্তি, সামনে ঘণ্টা ঝুলছে। আর দরজার ঠিক ওপরে মা বৈষ্ণোদেবীর একখানি ছবি টাঙানো।

তোতা ও মহুয়া বলে উঠল, "জেঠু, আমরা ঘণ্টা বাজাবো।"

অতএব ওদের উঁচু করে ধরতে হলো—ওরা প্রাণভরে ঘণ্টা বাজালো। ঘণ্টা বাজিয়ে লাঙ্গুরবীরকে নমস্কার করে মন্দিরে আসি।

ছোট মন্দির। ভেতরে মা-দুর্গার মূর্তি—লাল শাড়ী পরা ঘোমটা দেওয়া মূর্তি। প্রণাম করি। তারপরে প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। পথে এসে দাঁড়াই।

এবারে শুরু হবে পাহাড়ী পথ। একটি নয়, দুটি পথ—একটি মানুষের, আরেকটি ঘোড়ার। একটি পদযাত্রীদের, আরেকটি অশ্বারোহীদের। দুটি পথই গিয়েছে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে।

পদযাত্রীদের পথটি শুধুই সিঁড়ি—সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। আর অশ্বারোহীদের পথটি ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। সিঁড়ি কষ্টকর বলে অধিকাংশ মানুষ ঘোড়ার পথ বেছে নিয়েছেন।

আমরাও মানুষের পথ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পথে আসি। কারণ আমাদেরও ঘোড়া দরকার। একটি নয়, তিনটি ঘোড়া—মীরাদি, নন্দা এবং তোতা ও মহুয়ার জন্য। ওরা পিটুর কাঁধে উঠতে রাজী নয়।

এখানে সত্যই ঘোড়া রয়েছে, অনেক ঘোড়া। সরকার ভাড়াও বেঁধে দিয়েছেন—বাণগঙ্গা থেকে বৈষ্ণোদেবী প্রতি ঘোড়া সাড়ে বাইশ টাকা। অতএব ঘোড়া ভাড়া করতে কোনো অসুবিধে হলো না।

মীরাদি ও নন্দার ঘোড়াওয়ালাদের বলার কিছু নেই। কেবল তোতা ও মহুয়ার ঘোড়াওয়ালাকে বলি, "ভাই একটু হুঁশিয়ার থেকো। দেখো যাতে পড়ে-টড়ে না যায়।"

"আপনি ঘাবড়াবেন না মহারাজ। আমি সব সময় বাচ্চাদের দিকে নজর রাখব।" ঘোড়াওয়ালা আমাকে আশ্বাস দেয়।

ওদের রওনা করে দিয়ে আমি ও করুণ ফিরে আসি মানুষের পথে—সিঁড়ির সামনে। যেমন তেমন সিঁড়ি নয়, একেবারে স্বর্গের সিঁড়ি—শত শত সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। পথটি খুবই সংক্ষিপ্ত। উঠতে পারলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো। কিন্তু এত সিঁড়ি ভাঙতে পারব কি?

চেষ্টা করতে দোষ কি? না পারলে তো ঘোড়ার পথ রয়েছেই। অতএব সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি।

আমাদের ডানদিকে অনেক নিচে নদী—বাণগঙ্গা। তার তীরে মন্দির ও ধর্মশালা। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—অবিকল একখানি রঙীন ছবির মতো। আমরা দেখতে দেখতে সিঁড়ি ভাঙছি।

সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ উঁচু। একসঙ্গে কয়েকখানি ভাঙলে হাঁফ ধরে যায়, দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিতে হয়।

প্রায় প্রত্যেকখানি সিঁড়ির গায়ে নাম লেখা। মনে হচ্ছে যাঁদের দানে এইসব সিঁড়ি তৈরি, সিঁড়ির বুকে তাঁদের নাম উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে।

অগণিত তীর্থযাত্রীর পদধূলিতে ভক্তের নাম অক্ষয় হয়ে থাকছে।

মাঝে মাঝেই সিঁড়ির ধারে বসে আছে ভিক্ষুকের দল। তাদের কেউ গান গাইছে, কেউবা ঢোল বাজাচ্ছে। পয়সা দিলে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠছে—জয় মাতাদী।

সিঁড়ির ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে গাছপালা। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। ছোট ছোট পাখি গান গাইছে।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠছি—ত্রিকূট পর্বতে। বহুযুগ ধরে এটি বৈষ্ণোদেবীর পুণ্যপর্বত রূপে সমাদৃত। আমি সেই পুণ্যপর্বতে আরোহণ করছি। জানি না কখন এই ঊর্ধ্বারোহণের পালা সাঙ্গ হবে। শুধু জানি কাটরা থেকে দেবীর দরবার ১৪ কিলোমিটার। আমি তার মাত্র আড়াই কিলোমিটার সমতল পথ পেরিয়ে সবে চড়াই ভাঙ্গা শুরু করেছি।

মিনিট পনেরো পরে প্রথম দফা সিঁড়ি শেষ হলো। এখানে ঘোড়া ও মানুষের পথ মিলিত হয়েছে। রয়েছে জলসত্র। যাত্রীরা জল খাচ্ছেন, বিশ্রাম করছেন। কেউ ওপরে উঠছেন, কেউ নিচে নামছেন। সবারই মাথায় চুনারী বাঁধা, হাতে লাঠি। ছেলেদের প্রায় সকলেই প্যান্ট-শার্ট করা। কিন্তু মেয়েদের কারো সালোয়ার-কামিজ, কারো স্কার্ট, কারো স্ল্যাক্‌স আবার কারও বা শাড়ী। তবে সবারই মুখে সেই এক ধ্বনি—জয় মাতাদী।

না, মানুষের পথটা সত্যই সংক্ষিপ্ত। এইমাত্র নন্দারা এখানে এসে পৌঁছল। মহুয়া হাত নাড়ে। ওরা এগিয়ে চলে। তোতা বলে, "টা টা।"

ওরা পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরাও সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। তেমনি খাড়া ও সোজা সিঁড়ি। ধাপে ধাপে ওপরে উঠছি।

পথে যাত্রীর অভাব নেই। তবে অধিকাংশই নিচে নামছেন। খুব কম যাত্রী সিঁড়ির পথে ওপরে উঠছেন। নেমে যাওয়া যাত্রীদের কয়েকজন মাঝে মাঝে পরামর্শ দিচ্ছেন—এপথে ওপরে যাবেন না মহারাজ, ঘোড়ার পথে যান। নামার সময় এপথে নামবেন।

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলি এবং আবার মিনিট পনেরো বাদে দ্বিতীয় দফা সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছই। এখানেও তেমনি দুটি পথ এসে মিলিত হয়েছে। এখানেও রয়েছে জলসত্র। তবে শুধু মানুষের নয়, ঘোড়াদের জলপানের ব্যবস্থাও রয়েছে। এবং আমাদের ঘোড়ারা তৃষ্ণা নিবারণ করছে। সুতরাং দেখা হয় ওদের সঙ্গে। তোতা ও মহুয়া আমাদের দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

নন্দারা ঘোড়া থেকে নামে। জিজ্ঞেস করি, "ব্যাপার কি?"

"বারে, চরণপাদুকা দেখব না?"

"চরণপাদুকা! কোথায়?"

"এই তো সামনে!" মীরাদি ইশারা করেন।

তাকিয়ে দেখি, সত্যই তাই। দুটি পথের সঙ্গমে জলসত্রের পাশে কয়েক ধাপ

সিঁড়ি। তারপরে এক টুকরো বাঁধানো উঠান ও ছোট একটি মঠাকৃতি সাদা রঙের মন্দির।

বাচ্চারাও ঘোড়া থেকে নামে। সবাইকে নিয়ে উঠে আসি মন্দিরচত্বরে। ছোট মন্দির। একটি মাত্র নিচু দরজা। ভেতরে আলোর অভাব। আমরা দরজার সামনে বসে পড়ি। একপাশে পূজারী বসে রয়েছেন। তিনি মন্দিরের মেঝেতে পাথরের ওপর দু'খানি পায়ের ছাপ দেখিয়ে বলেন, "মা বৈষ্ণোদেবীর চরণ-পাদুকা।"

ছাপ দুটি ফুল দিয়ে সাজানো। আমরা প্রণাম করি।

পূজারী বলেন, "ভৈঁরোর আগে ছুটতে ছুটতে মা এখানে এসে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পেছন ফিরে ভৈঁরোকে একবার দেখে নিয়েছিলেন। সেই সময় এই পবিত্র শিলাখণ্ডের ওপরে মায়ের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। তাই এই পুণ্যতীর্থের নাম চরণ-পাদুকা।"

প্রণামী দিয়ে আবার প্রণাম করি। তারপরে এসে দাঁড়াই উঠানের মাঝখানে। সিঁড়ির পথ মন্দিরের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। আর ঘোড়ার পথ নিচে। এখানে শুধু জলসত্র নয়, চা ও ফলের দোকানও রয়েছে। অনেক যাত্রী দোকানে খাওয়া-দাওয়া করছেন।

আমাদের সে প্রয়োজন নেই। তাই নিচে নেমে ওদের ঘোড়ায় তুলে দিই। ওরা এগিয়ে চলে নিজেদের পথে। চরণ-পাদুকা বাণগঙ্গা থেকে দেড় অর্থাৎ কাটরা থেকে ৪ কিলোমিটার। জায়গাটার উচ্চতা ৩৩৭৮ ফুট। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। আমরাও সিঁড়ি ভাঙা শুরু করি।

কিন্তু পারি না। কেউ ডাকছে আমাকে। পেছন ফিরে দেখি ওদের একজন ঘোড়াওয়ালা। কি ব্যাপার?

আবার নেমে আসি পথে। ঘোড়াওয়ালা সেলাম করে বলে, "মহারাজ, সামনে চুঙ্গি দিতে হবে। প্রতি ঘোড়ার জন্য আড়াই টাকা। আমাদের টাকা থেকে সাড়ে সাতটা টাকা অগ্রিম দিন।"

চুঙ্গি মানে ট্যাক্স। বৈষ্ণোদেবীর দেশে এসেও ট্যাক্স থেকে রেহাই নেই। আর তাই ঘোড়া ভাড়া সাড়ে বাইশ টাকা। ঘোড়াওয়ালার বিশ আর ট্যাক্স আড়াই টাকা।

ট্যাক্স দিয়ে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। কেউ ওপরে চলেছেন, কেউ নিচে নামছেন। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে বেশির ভাগ নিচে নামছেন। আগেই বলেছি এপথে ঊর্ধ্বগামীদের সংখ্যা কম। নিম্নগামীরা প্রায় সকলেই সকরুণ দৃষ্টিতে করুণকৃষ্ণ এবং আমাকে দেখছেন, কেউ বা পরামর্শ দিচ্ছেন—এপথে উঠবেন না, শ্রান্ত হয়ে পড়বেন। এখনও অনেক পথ বাকি।

কথাটা আমার অজানা নয়। তবু সবিনয়ে বলি, "এখনও দম আছে, তাই খানিকটা এগিয়ে নিচ্ছি সংক্ষিপ্ত পথে। দম ফুরিয়ে এলে ঘোড়ার পথেই পথ চলব।"

আমাদের দল ভারী না হলেও আমরা নির্দল নই। কিছু যাত্রী আমাদেরই মতো ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন। এরা তিনজনও কিছুক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙছে—প্যান্ট-শার্ট পরা জনৈক সুদর্শন যুবক, তার স্কার্ট পরিহিতা সুন্দরী স্ত্রী ও ফুলের মতো ফুটফুটে একটি কোলের বাচ্চা। বাচ্চার বয়স বড় জোর মাস দুয়েক। সে একজন পিট্টুর কোলে চেপে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছে।

দেবলোকে এসে দেবশিশু কি ভাবছে কে জানে? তবে মাঝে মাঝেই সে কেঁদে উঠছে। মা তৎক্ষণাৎ পথশ্রম বিস্মৃত হয়ে ছুটে গিয়ে পিটুর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্ছে। রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। তার পরে পথের ধারে পাথরের আড়ালে বসে ছেলেকে স্তন্যদান করছে।

ছেলে শান্ত হলে তাকে আবার পিটুর কোলে দিয়ে মা পথচলা শুরু করছে। চলতে চলতে আলাপ হয় যুবকটির সঙ্গে। নাম সুরিন্দর শর্মা, পাঞ্জাবী হিন্দু। আদি বাড়ি ছিল লাহোরে। ভারত ভাগের পরে সুরিন্দরের বাবা দিল্লীতে পালিয়ে আসেন, সেখানেই স্থায়ী হন। সুরিন্দরের জন্ম দিল্লীতেই। এখন সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করছে।

সুরিন্দরের স্ত্রীর নাম ডলি। সেও পাঞ্জাবী এবং দিল্লীর মেয়ে। দু'জনে একই সঙ্গে কলেজে পড়ত। বছর পাঁচেক আগে ভালবেসে বিয়ে করেছে ওরা।

বিয়ে করে ওরা সুখী হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সুখের সংসারে দুঃখের যবনিকা নেমে এলো। এক-এক করে তিনটি বছর কেটে গেল, কিন্তু ডলির কোনো ছেলে-পুলে হলো না। ডাক্তার দেখিয়ে, তাবিজ নিয়ে কোনো ফল পেল না। অবশেষে জনৈক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে বছর দেড়েক আগে ওরা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে এলো। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কায়মনোবাক্যে মায়ের কাছে সন্তান কামনা করল। ডলি গুহামন্দিরে দাঁড়িয়ে মানত করল—মা, তুমি আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করলে আমি তোমাকে আমার সন্তান দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

দিল্লী ফিরে যাবার কয়েক মাস পরেই ডলি সন্তানসম্ভবা হলো। সুরিন্দর বৈষ্ণোদেবীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত ও পুলকিত হলো।

মাস দুয়েক আগে ডলির এই ছেলেটি হয়েছে। ভারী সুন্দর ছেলে—দেবশিশুর মতো উজ্জ্বল ও চঞ্চল। বাপ-মায়ের মিলিত সৌন্দর্য দিয়ে মা-বৈষ্ণোদেবী সৃষ্টি করেছে তাকে।

সে-ও তার মা-বাবার সঙ্গে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছে। অবুঝ শিশু সেখানে গিয়ে মাকে কি বলবে, জানা নেই আমার। তবে ডলি ও সুরিন্দর যে মা-বৈষ্ণোদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের ভক্তি উজাড় করে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুরিন্দর আর ডলির সরল স্বীকারোক্তি অবিশ্বাস করতে পারি না। আর ওদের মতো শিক্ষিত ও আধুনিক যুবক-যুবতী যদি সর্বান্তকরণে বৈষ্ণোদেবীর এই অলৌকিক কৃপার কথা বিশ্বাস করে, তাহলে আমি অবিশ্বাস করব কেমন করে? তাছাড়া ডলির শিশুপুত্রের মতো আমারও জন্ম যে এমনি এক বিশ্বাসের পটভূমিতে। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলি।

আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা ৺গঙ্গাধর ঘোষদস্তিদারও বিয়ের পরে দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। বহু পূজা-পার্বণ কোবরেজ-তাবিজ করেও তাঁর স্ত্রীর কোনো সন্তান না হওয়ায় তিনি যখন একেবারে ভেঙে পড়লেন, তখন তাঁর এক জ্ঞাতিভাই তাঁকে কাশী যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন—কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের কাছে সন্তান কামনা করলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন।

কাজটা কিন্তু সহজ নয়। সে প্রায় দেড়শ' বছর আগের কথা। তখনকার দিনে বরিশালের গাভা গ্রাম থেকে কাশী যাওয়া যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি কষ্টকর ও বিপজ্জনক।

তবু গঙ্গাধর পরামর্শটা মেনে নিলেন। খাবার-দাবার টাকা-পয়সা ও লোকজন নিয়ে দিন-ক্ষণ দেখে তিনি একদিন গাভার খালে নৌকো ভাসালেন।

কালিজিরা কীর্তনখোলা পদ্মা ও গঙ্গা হয়ে কয়েক মাস বাদে সে নৌকো কাশীর ঘাটে নোঙর করল। গঙ্গাধর সস্ত্রীক বিশ্বনাথ মন্দিরে গেলেন, পুজো দিলেন। তারপরে বাবা বিশ্বনাথের কাছে তাঁদের প্রার্থনা পেশ করলেন। বললেন—তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ না হলে তাঁরা আর ঘরে ফিরবেন না, বাবা বিশ্বনাথের চরণে দেহ রাখবেন।

গঙ্গাধর সস্ত্রীক কাশীবাস করতে থাকলেন। প্রতিদিন সকালে তাঁরা গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করতেন আর তাঁর কাছে সেই একই প্রার্থনা পেশ করতেন।

তাঁদের কিন্তু খুব বেশিদিন কাশীবাস করতে হলো না। কিছুদিন বাদেই বাবা বিশ্বনাথ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুমা সন্তানসম্ভবা হলেন।

পুলকিত অন্তরে ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে গঙ্গাধর কাশী থেকে দেশে ফিরে এলেন। যথাসময়ে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। তিনিই আমার ঠাকুরদাদার পিতৃদেব, গঙ্গাধরের একমাত্র সন্তান। বিশ্বনাথের বরপুত্র বলে গঙ্গাধর তাঁর নাম রাখেন বিশ্বেশ্বর।

আমরা সেই বিশ্বেশ্বরেরই বংশধর। সেদিন বাবা বিশ্বনাথ গঙ্গাধরের মনোস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন বলেই আমি এই সুন্দর ভুবনে চোখ মেলতে পেরেছি। সুতরাং সুরিন্দরের কথা অবিশ্বাস করার সাধ্য নেই আমার।

।। পাঁচ ।।

আগে বোলো—জয় মাতাদী
পিছে বোলো—জয় মাতাদী
গুম্ফাওয়ালী—জয় মাতাদী
শের সওয়ারী—জয় মাতাদী
মহাশক্তি—জয় মাতাদী

মাতৃবন্দনায় মুখরিত পথ। যাত্রীদল পথ চলেছে—তীর্থের পথ। অনন্তকালের মুক্তিপথ।

এক তীর্থের সঙ্গে আরেক তীর্থের অমিল থাকতে পারে, এক পথের সঙ্গে আরেক পথের প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু যাত্রীদের মাঝে নেই কোনো অমিল, পথচলার নেই কোনো বৈষম্য। কথা ভিন্ন হলেও সেই একই সুর। আমি এই একই সুর শুনেছি, অমরনাথ ও কেদারনাথে, শুনেছি মণিমহেশে আবার গঙ্গাসাগর ও তারকেশ্বরের পথে পথে। এই একই বন্দনার সুর—

ত্রিশূলধারী—পার করেগা
জটাধারী—পার করেগা
উঁচা নিচা—পার করেগা
ভুঁড়িবাবা—পার করেগা
ভোলাবাবা—পার করেগা

সেপথে যাত্রীদের কাঁধে থাকে সুসজ্জিত বাঁক, পরনে সাদা কিংবা রঙীন পোশাক।

এখানে বাঁক নেই, নেই সেই পোশাকের বাহার। কেউ কেউ কেবল মাথায় লাল চুনারী বেঁধে নিয়েছে। তবু মন্দ লাগছে না দেখতে।

সেপথে সবাই খালিপায়ে পথ চলেন। কাজটা সহজ নয় তবু জুতো পরার রেওয়াজ নেই তারকেশ্বরের তীর্থপথে। এখানে তা একেবারেই অসম্ভব। এটি চড়াই-উতরাই পাথুরে পথ। এখানে কেউ খালি পায়ে পথ চলছেন না।

সেপথে সবাই বাবার জয়গান গায়, এপথে মায়ের। কিন্তু পোশাক ভিন্ন হলেও সেই একই যাত্রী, সেই একই সুর, একই মানসিকতা। সন্তান চলেছে মা কিংবা বাবার কাছে—বাপ-মায়ের আশীর্বাদ পেতে। বিবিধের মাঝে এই মহান মিলনই ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা আর সে আত্মা অক্ষয় এবং অব্যয়, অজর এবং অমর।

ডলি ও সুরিন্দর পেছিয়ে পড়েছে। ডলিকে যে মাঝে মাঝেই পিন্টুর কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে পরিচর্যা করতে হচ্ছে। ওরা তাই পড়েছে পেছিয়ে, আমি এসেছি এগিয়ে। যাত্রীদের মাতৃবন্দনা শুনতে শুনতে পথ চলেছি।

পথের বাঁদিকে খাদ, ডাইনে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি গুহা। সামনে একজন গেরুয়াধারী বৃদ্ধ বসে আছেন। ভিক্ষে চাইছেন।

আমাদের বাংলায় কথা বলতে শুনেই তিনি বাংলায় বলে উঠলেন, "তোমরা বাঙালী!"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আমিও বাঙালী।" একবার থামেন তিনি। তারপরে সহসা কান্না-জড়ানো স্বরে বলে ওঠেন, "আমি ভিখিরি নই বাবা। সাধুও নই।"

"তাহলে গেরুয়া পরেছেন কেন?" করুণ অকরুণ স্বরে প্রশ্ন করে।

তেমনি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দেন, "গেরুয়া না পরলে যে কেউ ভিক্ষে দেবে না।" আবার থামেন তিনি। চোখ মুছে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বলতে থাকেন, "জানো, আমিও একদিন চাকরি করতাম, ভালো চাকরি। কলকাতায় একটা বেশ বড় ফার্মে অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ ছিলাম। তারপরে সব কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। নানা ঘাটে জল খেয়ে এখানে এসেছি কয়েক বছর। যাত্রীদের ভিক্ষায় পেট চলে। আমাকে কিছু দিয়ে যাও ভাই!"

সংসারের কি বিচিত্র বিধান! বাংলার মানুষের প্রায় অপরিচিত তীর্থপথে একজন শিক্ষিত বাঙালী ভিক্ষামাত্র সম্বল করে বেঁচে আছেন! আর ভাবতে পারি না। তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে এগিয়ে চলি। বৃদ্ধের আশীর্বাদ কানে আসে, "মা-বৈষ্ণোদেবী তোমার মঙ্গল করবেন, তোমাদের ভালো হবে।"

খানিকটা এগিয়ে আবার দুটি পথ মিলিত হলো কিন্তু এবারে আর দেখা হলো না দলের ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে। ওরা বোধকরি এগিয়ে গিয়েছে। ভালই হয়েছে। বাণগঙ্গায় ঘোড়া নেবার সময় নন্দাকে অনুমতিপত্রখানি দিয়ে দিয়েছি। ওরা আগে পৌঁছলে তাড়াতাড়ি দর্শনের টিকেট পেয়ে যাবে। আমাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

অতএব ওদের জন্য অপেক্ষা না করে জলসত্র থেকে তেষ্টা মিটিয়ে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। সত্যই সিঁড়ির শেষ নেই।

না, আছে। এক জায়গায় পৌঁছে দেখতে পাবো যে আর সিঁড়ি নেই, চড়াই নেই। আছে মন্দির—বৈষ্ণোদেবী গুহামন্দির। সেই মন্দিরই আমার গন্তব্যস্থল। আমি

এগিয়ে চলি।

আগেই বলেছি, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে কম, নামছে বেশি। তারা ভাগ্যবান। মা-বৈষ্ণবীর কৃপালাভ করে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছে। ওরা যথারীতি উপদেশ দেয়—এপথ ওপরে উঠবার নয়, নিচে নামার। ঘোড়ার পথ দিয়ে ওপরে যাও, দেখবে পরিশ্রম অনেক কম হবে। যেটুকু বেশি হাঁটতে হবে, তা এই সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমের কাছে কিছুই নয়।

কথাটা মিথ্যে বলে নি ওরা। তাই করুণকে জিজ্ঞেস করি, "কি করবে? পরের জংশন থেকে ঘোড়ার পথ ধরবে?"

"অন্তত আদিকুমারী পর্যন্ত চলুন। তারপরে ভেবে-চিন্তে পথ ঠিক করা যাবে।"

অর্থাৎ, আমার সহযাত্রী ঘোড়ার পথ ধরতে রাজী নয়, মানুষের পথেই যেতে চায়। অতএব এগিয়ে চলি।

মানুষের পথে আরোহণকারীর সংখ্যা কম, তাই বলে আমরাই শুধুমাত্র আরোহী নই। কিছু কিছু যাত্রী ওপরে উঠছেন এবং তাঁদের মধ্যে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবাই আছেন।

সালোয়ার-কামিজ পরে জনৈকা বৃদ্ধা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন। তাঁর পিঠে একটি বেশ বড় কাপড়ের পুঁটুলি ও কাঁধে একটি বছর তিনেকের মেয়ে। বাঁহাতে মেয়েটিকে ধরে ডানহাতে লাঠি নিয়ে তিনি পথ চলেছেন। তাঁর পেছনে পায়ে পায়ে পথ চলেছে একটি বছর ছয়েকের ছেলে।

বৃদ্ধা মাঝে মাঝেই পথের পাশে পাহাড়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছেন। কিন্তু কখনই শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামাচ্ছেন না। কেবল বিড়বিড় করে বলছেন—জয় মাতাদী।

ছেলে-মেয়ে দুটি বৃদ্ধার সন্তান নয়, বোধকরি নাতি-নাতনী হবে। কিন্তু তাঁদের মা-বাবা কোথায় গেলেন? তাঁদের তো দেখতে পাচ্ছি না!

ধীরে ধীরে বৃদ্ধার সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি। একটু বাদে পকেট থেকে লজেন্স বের করে তিনজনকেই দিই। ছেলে-মেয়ে খুশি হয়, বৃদ্ধা মৃদু হাসেন।

চলতে চলতে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কোথা থেকে এসেছো?"

"কলকাতা।" আমি উত্তর দিই।

বৃদ্ধা বলে ওঠেন, "কলকাত্তা! বঙ্গালী?"

"হ্যাঁ।" করুণ মাথা নাড়ে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, "তা তোমরা বৈষ্ণোদেবী যাচ্ছ কেন?"

"দর্শন করতে।" উত্তর দিই।

"স্রেফ্ দর্শন!" বৃদ্ধার কণ্ঠে বিস্ময়।

আমি আবার মাথা নাড়ি।

বৃদ্ধা বলেন, "তোমাদের কোনো কামনা নেই, কোনো মানত নেই?"

"না।" শান্তস্বরে উত্তর দিই। "আমরা মায়ের কাছে কিছু চাইতে আসি নি, শুধু তাঁকে দর্শন করতে এসেছি।"

সহসা বৃদ্ধার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে, কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়। তিনি বলেন, "তোমরা সুখী লোক, তোমাদের কোনো কামনা নেই। আমার আছে।

আমি মায়ের কাছে মানত করতে চলেছি।”

বৃদ্ধা থেমে যান। আমরাও আর কোনো কথা বলি না। নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে পথ চলতে থাকি—গুহাতীর্থ বৈষ্ণোদেবীর দুর্গমপথ।

কিন্তু বৃদ্ধা বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারেন না। একটু বাদে আবার বলে ওঠেন, “আমার মানত আছে, কামনা আছে—সন্তানের আরোগ্য কামনা।”

“এদের কারও কোনো অসুখ হয়েছে নাকি?” করুণ জিজ্ঞাসা করে।

বৃদ্ধা যেন বিরক্ত হন। বলে ওঠেন, “না, না, ষাট ষাট, এদের অসুখ হতে যাবে কেন? এদের নয়, এদের মার, মানে আমার একমাত্র মেয়ের অসুখ।”

“কি হয়েছে?” প্রশ্ন করি।

বৃদ্ধা উত্তর দেন, “বাতের অসুখে মেয়ে আমার দু-বছর শয্যাশায়ী। জামাই যথেষ্ট চিকিৎসা করিয়েছে, আমিও তাবিজ-টাবিজ যোগাড় করে বহু চেষ্টা করেছি। সবই বৃথা হয়েছে।”

বৃদ্ধা থামেন। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে যাবার আগেই তিনি আবার বলে ওঠেন, “জামাই ভালো রোজগার করে, অল্প বয়স—সে এখন আবার বিয়ে করতে চাইছে। তাহলে আমার মেয়ের কি হবে! এই ছেলে-মেয়ে দুটোরই বা কি হবে?”

“একজন স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে চাইছে?” করুণ বিস্মিত।

বৃদ্ধা চোখ মোছেন। শান্তস্বরে উত্তর দেন, “হ্যাঁ বাবা, আমাদের সমাজে এতে কোনো দোষ নেই। তাছাড়া আমি তো জামাইকে না করতেও পারছি না। জওয়ান ছেলে, সে কি অমন অসুস্থ বউকে নিয়ে সুখী হতে পারে? তাই ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে মা বৈষ্ণোদেবীর কাছে চলেছি। এরা তাঁর কাছে এদের মায়ের রোগমুক্তি কামনা করবে আর আমি ভিক্ষে চাইব আমার মেয়ের সুখ শান্তি ও সংসার।”

“আপনি বিশ্বাস করেন বৈষ্ণোদেবী আপনার মেয়েকে ভালো করে দেবেন?”

“নিশ্চয়ই!” বৃদ্ধা প্রায় চীৎকার করে ওঠেন। তাঁর কাঁধের শিশুটি চমকে ওঠে। তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বৃদ্ধা বলতে থাকেন, “আমাদের বৈষ্ণবী মা যে বড়ই করুণাময়ী। তিনি এই অসহায় ও অবুঝ শিশুদুটির প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। এদের মা ভালো হয়ে উঠবে, আমার মেয়ের সংসার সুখের হবে। বৈষ্ণোদেবী তো কারও কামনা অপূর্ণ রাখেন না।” বৃদ্ধা লাঠিসুদ্ধ হাতখানি একবার কপালে ছোঁয়ান।

আমিও মনে মনে বৈষ্ণোদেবীর কাছে বৃদ্ধার মেয়ের রোগমুক্তি কামনা করি। বলি—মা, তুমি এই বৃদ্ধার আন্তরিক বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রো না। তুমি মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলো, তার সংসার রক্ষা করো।

আবার দুটি পথ মিলিত হলো কিন্তু এখানেও দেখা হলো না নন্দাদের সঙ্গে। ওরা নিশ্চয়ই এগিয়ে গিয়েছে, ভালোই করেছে।

বৃদ্ধা এবারে নাতনীকে কাঁধ থেকে নামালেন। ভদ্রমহিলা খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, হবারই কথা। আমাদের খালি হাত-পায়ে সিঁড়ি ভাঙতেই কষ্ট হচ্ছে আর এই বয়সে তিনি পিঠে বোঝা ও মেয়েকে কাঁধে নিয়ে পথ চলেছেন। তাঁকে বিশ্রাম করতে বলে এগিয়ে চলি।

এখান থেকে আবার তেমনি একসারি সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির

শেষে মনে হচ্ছে সমতল। কিন্তু ওখানে পৌঁছলে দেখতে পাবো আরেকটা পাহাড়, আরেক সারি সিঁড়ি।

আমরা কাটরা থেকে মোটে ৫ কিলোমিটার এসেছি, সবে সকাল আটটা। অতএব এখুনি সিঁড়ি শেষ হবার প্রশ্ন ওঠে না। আরও অন্তত ৬/৭ কিলোমিটার চড়াই ভাঙতে হবে। কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবী ১৪ কিলোমিটার। তার মধ্যে শেষের ২/৩ কিলোমিটার সমতল অথবা উতরাই।

"শঙ্কুদা, দেখুন দেখুন। নিচের দিকটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!"

করুণের কথায় পথচলা থামাতে হয়। নিচের দিকে তাকাই।

করুণ ঠিকই বলেছে। নিচের সমতলে খানিকটা দূরে কাটরা শহরকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। সেখানকার পথ-প্রান্তর বাড়ি-ঘর, সব কিছু মিলেমিশে যেন হিমালয়-শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক কিংবা মণি সেনের আঁকা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমন্বিত একখানি ত্রৈমানিক (three dimensions) রঙীন চিত্রে রূপান্তরিত।

একখানি নয়, দু'খানি চিত্র কাটরা ও বাণগঙ্গা। কাটরা বড়, বাণগঙ্গা ছোট। কাটরা দূরে, বাণগঙ্গা কাছে। কিন্তু সৌন্দর্যে কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। আমি দেখি, দু-চোখ ভরে শুধু দেখি আর দেখি।

কিন্তু না, আর নয়। সামনে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। অতএব এগিয়ে চলি। আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি।

আবার দু'টি পথ মিলিত হলো—মানুষ আর ঘোড়ার পথ। এখানেও একফালি সমতল রয়েছে। কিন্তু নেই কোনো চা-জলখাবারের দোকান, এমন কি জলসত্র।

তবে যা আছে, তাতে তেষ্টা না মিটলেও শান্তি লাভ করলাম। পথের ধারে লেখা রয়েছে—

"Please do not loose heart, Adikunwari is only 1/2 k.m. away.'

তার মানে চরণপাদুকা থেকে আড়াই কিলোমিটার এসে গেছি। চরণপাদুকা থেকে আদিকুমারী ৩ কিলোমিটার। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে আমরা অন্তত বারো-তেরো শ' ফুট চড়াই ভেঙেছি। চরণপাদুকা ৩৩৭৮ ফুট আর আদিকুমারীর উচ্চতা ৪৭৮৪ ফুট। তার সামান্যই বাকি।

এখানেও দেখা হলো না নন্দাদের সঙ্গে। হবার কথাও নয়। আদিকুমারী আর মাত্র আধ কিলোমিটার। দেখে সবাই ছুটেছে পড়িমরি করে। আদিকুমারী বড় জায়গা। সেখানে দর্শন আছে, বিশ্রামের জায়গা আছে, খাবারের দোকান আছে।

ওরাও তাই এগিয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আদিকুমারীতে অপেক্ষা করছে। আমরাও এগিয়ে চলি।

এখন সামনের পাহাড়টির ওপরে বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। এবারে আর হেঁয়ালী নয়। ওখানে পৌঁছতে পারলে অনেকখানি সমতল পাওয়া যাবে, বিশ্রাম করা যাবে, খাবার পাওয়া যাবে।

তবু চলতে পারি না, থামতে হয়। এ জায়গাটির অবস্থান যে অতিশয় অভিনব। নিচে কাটরা, ওপরে আদিকুমারী—দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুয়ের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করছি আর ভাবছি—আমি ধন্য, আমি মায়ের কাছে চলেছি—মাতৃবন্দনা কানে আসে—

আগে বোলো—জয় মাতাদী
মহাশক্তি—জয় মাতাদী
জোরসে বোলো—জয় মাতাদী
প্রেমসে বোলো—জয় মাতাদী
পিছে বোলো—জয় মাতাদী

আমরা আগে কিংবা পেছনে নই, আমরা রয়েছি মাঝখানে। তবু ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠি—জয় মাতাদী।

মায়ের জগৎকে মাতৃবন্দনায় মুখরিত করে তুলে আমরাও এগিয়ে চলি আদিকুমারীর দিকে—বৈষ্ণোদেবীর পথে।

॥ ছয় ॥

সিঁড়ি শেষ হলো অথবা এসে মিশে গেল পথে। আমরা একটা পাহাড়ের প্রায় সমতল শিখরে উঠে এসেছি। জায়গাটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে সামনে বৃহত্তর সমতলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখানেই মন্দির, ধর্মশালা ও দোকান-পাট।

এ জায়গাটাকে পথই বলা উচিত—প্রশস্ততর প্রায় সমতল পথ। একপাশ জুড়ে ঘোড়ার পাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়সওয়াররা এখানে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে মন্দির দর্শন করতে গিয়েছেন।

আমাদের ঘোড়াওয়ালারা সেলাম করে। বলে, "মাইজীরা ওপরে। আপনাদের জন্য বসে আছেন। তাড়াতাড়ি যান।"

ওরা আমাদের ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত। আমরা সঙ্গে থাকায় ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কি করব? আমরা যে মানুষ। ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়াই কি মানুষের সাধ্য?

উঠে আসি ওপরে—আদিকুমারীর মন্দির-প্রাঙ্গণে। বাঁ দিকে মন্দির, ডান দিকে সারি সারি হালুইকরের দোকান—ব্যস্ত দোকান। মাঝখানে সংকীর্ণ পাথর বাঁধানো পথ। পথপ্রাঙ্গণ ও দোকানে লোক গিসগিস করছে।

"জেঠু! আমরা এখানে, তাড়াতাড়ি এসো।"

তাকিয়ে দেখি হালুইকরের দোকানে দাঁড়িয়ে মহুয়া আমাকে ডাকছে। দোকানে খুবই ভিড়। সামনে থরে থরে মিঠাই সাজানো, পুরী ও জিলিপি ভাজা হচ্ছে। লোকজনের খাওয়া আসা খাওয়া-দাওয়া, ডাকাডাকি, কথাবার্তা এবং রেডিওর গান। সব মিলে দোকানটি বাজারে পরিণত। তারই একপাশে চেয়ার দখল করে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে নন্দা, মীরাদি ও ভানু।

করুণ আর আমিও উঠে আসি দোকানে।- ভানু দু'খানি চেয়ার 'ম্যানেজ' করে। তোতা এসে আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। নন্দা বলে, "গরম গরম পুরী ও জিলিপি পাওয়া যাচ্ছে। পেট ভরে খেয়ে নিন।"

ভানু অর্ডার দেয়। আমি চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখি। নানা বয়সের নানা পোশাকের নারী-পুরুষ। নানা ভাষায় কথা বলছে তারা। কেউ বৈষ্ণোদেবী চলেছে, কেউ দরবার দর্শন করে ফিরছে। সবারই চোখে-মুখে আত্ম-তৃপ্তির পরশ। অথচ এখানে এমনিতেই

গরম। তার ওপরে দোকানের দাওয়ায় প্রকাণ্ড দুটি উনোন জ্বলছে। শুধু তাপ নয়, সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া। দোকানে অবশ্য দুটি ফ্যান ঘুরছে কিন্তু তাতে গরম কিংবা ধোঁয়া কিছুই কমছে না।

তাহলেও ফ্যান দুটি দেখে খুশি হই। এখানে 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' রয়েছে। অবশ্য এযুগে এটি কোনো বিস্ময়কর সংবাদ নয়। বদ্রীনাথে বৈদ্যুতিক আলো থাকলে এখানে থাকবে না কেন? তাছাড়া বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরেও তো শুনেছি 'ইলেক্‌ট্রিক লাইট' আছে এবং সেখানে নাকি কখনই 'লোডশেডিং' হয় না।

পেটভরে পুরী জিলিপি খেয়ে সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। দোকানের উল্টোদিকেই মন্দির—আদিকুমারীর মন্দির। পথ থেকে একটু উঁচুতে, মঠাকৃতি ছোট মন্দির। একদিকে একটিমাত্র দরজা। ভেতরে ঢোকা যায় না। বাইরে থেকে পুজো দিতে হয়, আমরা প্রণাম করি।

মন্দিরের চারিদিকে একচিলতে চাতাল। বহু যাত্রী শুয়ে বসে বিশ্রাম করছেন সেখানে। এখানে অবশ্য খুব ভালো ধর্মশালা রয়েছে—প্রতাপ ভবন।

আদিকুমারী কাটরা-বৈষ্ণোদেবী পথের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। তাই যাত্রীরা সবাই এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, খাওয়া-দাওয়া করে নেন। যাঁরা সন্ধ্যে নাগাদ কাটরা কিংবা বৈষ্ণোদেবী থেকে রওনা হন তাঁরা অনেকে এখানে এসে রাত কাটান। ধর্মশালায় টাকা জমা দিলে সতরঞ্চি ও কম্বল পাওয়া যায়। পরদিন সকালে নূতন উদ্যমে তাঁরা আপন পথে এগিয়ে চলেন।

মন্দিরের অনতিদূরে একটি রেলিং ঘেরা বাঁধানো কুণ্ড দেখতে পাচ্ছি। ছোট হলেও স্বচ্ছ কুণ্ড, ঝক্‌ঝকে ঘাট। অনেকে ঘাটে নেমে পথের জল সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। আমাদের আর জলের দরকার নেই। নন্দারা দোকান থেকেই ওয়াটার বট্‌ল ভরে নিয়েছে।

মন্দির থেকে নেমে আসি নিচে—আদিকুমারী গুহার সামনে। হ্যাঁ, এখানেও একটি গুহা আছে। দেবী বৈষ্ণবী তাঁর গুহামন্দিরে যাবার পথে এই গুহায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেই অবস্থান সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। একদল বলেন—দেবী যখন বুঝতে পারলেন, দানবরাজ ভৈঁরোর সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য, তখন তিনি এই গুহায় শিবির স্থাপন করে দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করেন। তারপরে আপন রূপ পরিগ্রহ করে এখানেই ভৈঁরোর সৈন্যদলকে নিধন করেন। তাই আদিকুমারী মাতৃভক্তদের কাছে পরম পবিত্র স্থান।

আরেকদল বলেন—তান্ত্রিক ভৈরবনাথের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বালিকাবেশী বৈষ্ণবী ছুটতে ছুটতে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেবী তখন খুবই ক্লান্ত। তাঁর এই গুহাটি দেখে বড় পছন্দ হলো। ভাবলেন ভৈরবনাথ এখনও অনেক পেছনে। এই অবসরে এখানে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

গুহামুখে এসে দেবী দেখেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। দেবী তাঁর দিব্যজ্যোতি দিয়ে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙালেন। সন্ন্যাসী চমকে উঠলেন, চোখ মেললেন। দেবী তাঁকে বললেন—আমি একটু বিশ্রাম করব এখানে। কেউ আমার খোঁজ করতে এলে আমাকে একটু জানাবেন।

সন্ন্যাসী দেবীকে চিনতে পারলেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না তাঁকে। কেবল

অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন দেবীর দিকে।

দেবী গুহায় প্রবেশ করলেন। শিশু জন্মগ্রহণের আগে যেমন নিশ্চিন্তে মাতৃজঠরে বিশ্রাম করে, তিনিও তেমনিভাবে এই গুহার মধ্যে বিশ্রাম করতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভৈরবনাথ এসে হাজির হলো এখানে। সে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলো—এখানে কোনো সুন্দরীকে আসতে দেখেছো?

সন্ন্যাসী করজোড়ে বললেন—বাবা, তিনি সাধারণ রমণী নন, স্বয়ং দেবী বৈষ্ণবী—মহাশক্তি। জন্মলাভের পর থেকেই কুমারী ব্রত পালন করে আসছেন—ইনি আদিকুমারী, পরম ব্রহ্মচারিণী। আপনি তাঁকে অধিকার করার অন্যায় লোভ সংবরণ করুন, এই পাপকার্য থেকে বিরত হোন—আপনি ঘরে ফিরে যান।

—তুমি কে হে বুড়ো! বড্ড যে উপদেশ দিচ্ছ! ভৈরবনাথ বলে উঠল—তুমি দেখছি নিজেকে খুব বাহাদুর মনে ক'রো। তা ক'রো গে, এখন বল দেখি মেয়েটা এই গুহায় ঢুকেছে নাকি?

সন্ন্যাসী কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে আবার বললেন—বাবা, আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি চলে যান, চলে যান এখান থেকে।

গর্জে উঠল ভৈরবনাথ—তোমার তো দেখছি বড্ড সাহস! তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ। তুমি কি জানো, আমি যোগবলে দৈবশক্তি অর্জন করেছি। তোমার আদিকুমারী দেবী অথবা মানবী যাই হোক, তাকে আমার চাই। সে মহাশক্তি বলেই আমার শক্তি হবে।

ভৈরবনাথ সন্ন্যাসীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গুহায় প্রবেশ করল।

দেবী গুহার ভেতরে বসে সবই শুনতে পেয়েছেন। তবু তিনি তখুনি ভৈরবনাথের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে চাইলেন না। তিনি ত্রিশূল দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে বিপরীত দিক দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ভৈরবনাথ তাঁকে ধরতে না পেরে আবার তাঁর পেছনে ছুটল। মাতৃভক্ত সন্ন্যাসী মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন। আর সেই থেকে এই গুহাটি ভক্তদের কাছে মাতৃজঠরের মতোই মুক্তিতীর্থে পরিণত।

আমরা সেই মুক্তিতীর্থ দর্শন করব। তাই গুহামুখের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্ধকার ও সংকীর্ণ গুহা। বড় জোর ফুট তিনেক প্রশস্ত। তাও সোজা নয়, আঁকাবাঁকা।

এক সময় আমাদের পালা এলো। আমরা মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলাম। টর্চের আলোয় পথ দেখে এঁকেবেঁকে এগোতে থাকলাম।

দশ-বারো ফুট ভেতরে ঢুকে একখানি প্রশস্ত অঙ্গন। দেবী নাকি এখানেই বিশ্রাম করেছিলেন। কিংবা এখানে বসে দেবতাদের অস্ত্র গ্রহণ করে আপন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এই পবিত্র স্থানকেই মাতৃজঠর বলা হয়। সত্যই মাতৃজঠরের মতো নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয়।

আমরা পুজো দিই। মাতৃজঠরে বসে মাতৃপ্রণাম করি। তারপরে মায়ের তৈরি সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে আসি বাইরে। মাতৃজঠর থেকে মুক্ত পৃথিবীতে। গর্ভমুক্তির আনন্দে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মুক্তির নিশ্বাস ফেলি।

বেলা ন'টা বেজে গিয়েছে। আর দেরি করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি এসে

ওদের ঘোড়ায় তুলে দিই। তোতা ও মহুয়া যথারীতি 'টা টা' করে বিদায় নেয়।

করুণ বলে, "এবারে আর মানুষের পথ নয়, চলুন ঘোড়ার পথ দিয়েই যাওয়া যাক।"

"হঠাৎ এই মত পরিবর্তন?" চলতে চলতে প্রশ্ন করি।

করুণ উত্তর দেয়, "দেখছেন না সিঁড়িগুলো কি রকম সোজা উঠে গিয়েছে। মনে হচ্ছে আরও বেশি খাড়া।"

কথাটা মিথ্যে বলে নি। এখন পথ সত্যিই আগের চেয়ে বেশি চড়াই। কিন্তু এই পথ পরিবর্তন করে কি ভালো হলো?

বুঝতে পারছি না। আগের পথে সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু নিশ্চিন্তে চলতে পারছিলাম। এ পথে যে প্রতিপদে বাধা পাচ্ছি। ক্রমাগত ডাণ্ডিওয়ালা আর ঘোড়াওয়ালাদের হুঁশিয়ারী। কেবলই পেছনে তাকাতে হচ্ছে, পাশে সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কি করব, এ পথে যে 'Horses first.'

তবে পথের ঢাল কঠিন নয় বলে ধীরে ধীরে চলতে পারছি। এবং আগের মতো শ্রান্ত হয়ে পড়ছি না।

আগেই বলেছি, ঘোড়ার পথে পদাতিকদের সংখ্যা বেশি। বলা বাহুল্য তাঁদের অধিকাংশই যাবার যাত্রী। কারণ ফেরার যাত্রীরা বেশির ভাগ সিঁড়িপথে নামছেন। তেমনি একজন যাবার যাত্রীর দিকে নজর পড়ে আমার। লোকটি অশক্ত, অসুস্থও হতে পারে। বয়স বেশি নয়। যুবকই বলা চলে। বাঁহাত দিয়ে জনৈকা যুবতীর গলা ধরে ডান হাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে অতি কষ্টে পথ চলেছে। এমন যাত্রীর ডাণ্ডিতে যাওয়াই উচিত। বোধ করি পয়সার অভাবে পেরে ওঠে নি। আচ্ছা লোকটি কি ঘোড়ায় বসে থাকতে পারবে? ঘোড়া ভাড়া তো তেমন বেশি নয়!

সেই কথাই জিজ্ঞেস করি তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "না না। ঘোড়া নয়, ডাণ্ডি নয়...। আমাকে পায়ে হেঁটে মায়ের কাছে পৌঁছতেই হবে। নইলে যে মা আমাকে ক্ষমা করবেন না, আমি মাতৃহত্যার পাপমুক্ত হব না।"

"মাতৃহত্যা!" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি মাতৃহন্তা। আমি আমার মাকে, আমার জন্মদাত্রী মাকে খুন করেছি। আর সেই পাপে করোনারী থ্রম্বৌসিস হয়ে আমি এমন অচল হয়ে গিয়েছি।" যুবকটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

খুবই খারাপ লাগছে আমার। কথাটা না বললেই হতো। কিন্তু এখন আর চাপা দেওয়া সম্ভব নয়, পালিয়ে যাবারও পথ নেই। তার কথা শুনতেই হবে আমাকে। কিন্তু সে যে বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। আর যুবতীটি অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে সে নীরবে আমাকে কিছু বলছে। কিন্তু আমি তার নীরবতার ভাষা বুঝতে পারছি না। তাই তাড়াতাড়ি যুবকটিকে বলি, "আপনি একটু বসবেন? বসুন না ঐ পাথরখানার ওপরে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে নিন।"

সে আপত্তি করে না। মেয়েটি তাকে বসিয়ে দেয়, তারপরে নিজেও তার পাশে বসে পড়ে। সেও শ্রান্ত—এই চড়াই পথে একটা মানুষকে টেনে-টেনে ওপরে

তোলা! তার ওপরে মেয়েটির পিঠে বেশ বড় একটা হ্যাভারস্যাক। বোধ করি দু'জনের জামাকাপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে।

আমরা যুবকটির সামনে এসে দাঁড়াই। সে বিনা প্রস্তাবনায় বলতে থাকে তার পাপের কথা, নিজের মাকে মেরে ফেলার কাহিনী—

যুবকটির নাম ভরত তেওয়ারী। তাদের আদিনিবাস অযোধ্যা হলেও তারা তিন পুরুষ ধরে পাতিয়ালায় বাস করছে। ভরতের ঠাকুরদাদা মহারাজের চাকরি নিয়ে পাতিয়ালায় এসেছিলেন। সেই থেকে ওরা পাতিয়ালাতে বসবাস করছে।

ভরতের বাবা ছিলেন এক ছেলে আর ভরতও তাঁর একমাত্র সন্তান। বাবাও মহারাজের এস্টেটে চাকরি করতেন। কিন্তু তিনি মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ভরতের বয়স তখন এক বছর। কিন্তু বুদ্ধিমতী ও স্নেহপ্রাণা মা ভরতকে বাবার অভাব বুঝতে দেন নি। বহু কষ্ট করে তিনি ভরতকে মানুষ করেছেন। এবং ভরত মানুষ হয়েছে। যথাসময়ে বি. কম্. পাশ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ পাতিয়ালায় ভালো চাকরি পেয়েছে।

মায়ের বড় আশা ছিল নিজের পছন্দ মতো সদ্বংশের একটি মেয়েকে ভরতের বউ করে আনবেন। ছেলে বউ-এর সেবা-যত্ন এবং নাতি-নাতনীর সঙ্গে হেসে-খেলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। অনেক দেখাশোনার পরে তিনি একটি মেয়েকে পছন্দ করে ফেললেন।

কিন্তু ভরত বাদ সাধল। মায়ের পছন্দ করা বামুনের মেয়েকে বিয়ে না করে সে তার এক তফসিলী বন্ধুর বোন এই বাসন্তীকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো।

বিয়ের আগে মা খুবই আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু বাসন্তী ঘরে আসার পরে কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন না। ছেলে ভাবল স্নেহপ্রাণা মা আস্তে আস্তে ছেলে-বউকে মেনে নেবেন। তা কিন্তু হলো না। দিন দিন তাঁর মনোভাব আরও কঠোর হতে থাকল। তিনি কিছুতেই বাসন্তীকে রান্নাঘরে ঢুকতে কিংবা জল স্পর্শ করতে দিলেন না। এমন কি ছেলের হাতের ছোঁয়া কোনো জিনিস খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। ছেলে মাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বিধবা তাঁর সংস্কার বিসর্জন দিলেন না।

বাসন্তী লেখাপড়া জানা মেয়ে। শাশুড়ীর ব্যবহারে মনে মনে যত কষ্টই পাক, মুখে সে কোনো প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু ভরত তার ভালবেসে বিয়ে করা সুন্দরী স্ত্রীর অপমান সব সময় সইতে পারত না। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করত। মা রেগে গিয়ে দু'জনকেই য়া তা বলতেন, বাসন্তীর বাপ-ঠাকুর্দারাও রেহাই পেতেন না। বাসন্তী আড়ালে চোখের জল ফেলত কিন্তু মুখে স্বামীকে শান্ত থাকার অনুরোধ করত। স্বামী বেরিয়ে গেলে ছেলের হয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইত। তবু শাশুড়ীর মন গলত না।

এইভাবে তবু যাহোক সংসারটা চলে যাচ্ছিল কোনোমতে। এই সময় একান্ত আকস্মিক ভাবেই ঘটল সেই দুর্ঘটনা, যার জন্য ভরত আজ মাতৃহন্তা।

সেদিন সকাল সকাল ভরতের অফিস ছুটি হয়ে গেল। ভরত ভাবল বহুদিন বউকে নিয়ে সিনেমা দেখে না, তাই দু'খানি টিকেট কেটে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো, এসে দেখে বাসন্তী বাড়ি নেই। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

মাকে জিজ্ঞেস করল—বাসন্তী কোথায়?

মা নিজের ঘরে বসে গীতাপাঠ করছিলেন। তিনি মুখ না তুলেই জবাব দিলেন—জানি না।

ভরতের রাগ বেড়ে গেল। সে আবার বলে—তুমি জানো, নিশ্চয় জানো! বলো, বাসন্তী কোথায় গেছে?

এবারে মা রেগে গেলেন। বললেন—ইস, বাড়ি এসে বউকে না দেখতে পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিস! ছোটলোকের বেটি, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যাবে কোথায়? তাড়িয়ে দিলেও ঠিক ফিরে আসবে।

—তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছো? ভরতের মাথায় খুন চেপে যায়। সে এগিয়ে আসে মায়ের দিকে।

মা-ও চেঁচিয়ে ওঠেন—দিয়েছি তো বেশ করেছি। আপদ বিদেয় হয়েছে। ফিরে না এলেই আমার হাড় জুড়োয়। মা আবার গীতাপাঠে মন দিতে চান।

ভরত আর সহ্য করতে পারে না। সে মায়ের হাত থেকে গীতাখানি কেড়ে নিতে চায়। মা বাধা দেন। ভরত ধাক্কা দেয়। মা খাট থেকে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর কপাল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। ভরত হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

মা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠেন—তুই আমাকে মারলি! মার, আরও মার। একেবারে মেরে ফেল আমাকে।

ভরত কোনো কথা বলতে পারে না।

মা অভিসম্পাত দেন—এই পাপের শাস্তি তোকে ভোগ করতেই হবে। তুই আজ যে হাত আমার গায়ে তুলেছিস, তোর সেই হাতে পক্ষাঘাত হবে। তিনি আঁচলে কপাল চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

বিভ্রান্ত ভরত মাকে বাধা দিতে পারে না। সে শুধু মেঝের ওপর মায়ের রক্ত দেখে বার বার শিউরে উঠতে থাকে। কি করবে, কোথায় যাবে—কিছুই ঠিক করতে পারে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে এভাবে একা থাকতে হলো না! কিছুক্ষণ পরেই বাসন্তী বাড়ি ফিরে এলো। রক্ত দেখে সে চিৎকার করে উঠল—কার রক্ত?

—আমার মায়ের। ভরত উত্তর দিল। তারপরে সে কাঁদতে কাঁদতে বাসন্তীকে সব কথা বলল।

—এ তুমি কি করলে? বাসন্তীও কেঁদে ফেলে।—যত খারাপ ব্যবহারই করুন, মা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন! এ তুমি ভাবলে কেমন করে? আমার বান্ধবী চামেলীর অসুখ। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। মা-ই বা সে কথা কেন বললেন না তোমাকে? আমি তো তাঁকে বলে গিয়েছি।

ভরত ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সেদিন সে আর মাকে খুঁজে পেল না। বাধ্য হয়ে পুলিশে ডায়েরি করল।

মাকে পাওয়া গেল পরদিন—রেল লাইনের ওপরে।

খবর পেয়ে ভরত ও বাসন্তী ছুটে গেল সেখানে। মায়ের খণ্ডিত ও রক্তাক্ত দেহ দেখে ভরত অজ্ঞান হয়ে গেল।

একমাত্র সন্তান। সুতরাং সবই করতে হয় ভরতকে। আত্মীয়স্বজন তাকে মাতৃদায়

থেকে মুক্ত হতে কোনো সাহায্যই করল না। বরং সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে থাকল। খুবই স্বাভাবিক। সংসারে মাতৃহন্তাকে কে ক্ষমা করে?

মায়ের মৃত্যুশোক ও সমাজের শাস্তি ভরতকে অস্থির করে তোলে। সে ক্রমে ক্রমে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তার শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। দিনে কাজ করতে পারে না, রাতে ঘুম আসে না চোখে। এই অবস্থায় একদিন অফিসে যাবার পথে ভরত সাইকেল থেকে পড়ে যায়। পথচারীরা অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাসন্তীকে খবর দেয়। বাসন্তী ছুটে যায় হাসপাতালে। যমে মানুষে লড়াই চলে। এবং শেষ পর্যন্ত মানুষই জয়লাভ করে। তবে ভরতের বাম-অঙ্গ অসাড় হয়ে যায়।

মাসখানেক হাসপাতালে থেকে ভরত বাড়ি ফিরে আসে। কিছুদিন পরে সে অফিসে যেতে শুরু করে। তবে আর সাইকেল-রিকশা করে নয়, লাঠির সাহায্যে। এখনও তার বাঁ হাত ও বাঁ পা স্বাভাবিক হয় নি। এই বাঁ হাত দিয়েই সেদিন সে মাকে ধাক্কা মেরেছিল।

গত একবছর ধরে ভরত অনেক চিকিৎসা করিয়েছে, কয়েকজন সাধুর কাছে ধর্ণা দিয়েছে, কিন্তু সে ভালো হয় নি। হবে কেমন করে? মায়ের অভিসম্পাত কি মিথ্যে হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর পরামর্শে সে আজ চলেছে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। চলেছে মায়ের কাছে মাতৃহত্যার পাপমুক্ত হতে। এই অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে কেমন করে ঘোড়ায় চড়ে বিজয়ী বীরের মতো মাতৃসদনে পৌঁছাবে? যেভাবেই হোক তাকে যে পায়ে হেঁটে পৌঁছতেই হবে মায়ের কাছে।

বুঝতে পারছি না তার মায়ের মৃত্যুর জন্য ভরত কতখানি দায়ী? জানি না সত্যি সত্যি মাতৃহন্তারক বলা যায় কিনা? বলতে পারব না এই দুর্ঘটনায় বাসন্তীর কি দায়িত্ব রয়েছে।

কিন্তু বুঝতে পারছি যে ভরতের মা কিছুতেই জাতবিচারের কুসংস্কার ছাড়তে পারেন নি। সেই কুসংস্কারের কাছে তাঁর মাতৃস্নেহ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। তিনি বামুন বলে তফসিলী বাসন্তীকে পুত্রবধূরূপে মেনে নিতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর আত্মহত্যার জন্য কতখানি ভরত দায়ী আর কতখানি তিনি নিজে দায়ী, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

তবু মাতৃহীন ভরত এই দুর্ঘটনার জন্য নিজেকেই সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আর তাই সে করোনারী থ্রম্বৌসিস-এর শিকার হয়েছে। এখনও ভাবছে সে মাতৃহন্তা, মায়ের অভিশাপে তার পক্ষাঘাত হয়েছে। বাসন্তী বহু বুঝিয়েছে ভরতকে। কোনো ফল হয় নি। অবশেষে শেষ চেষ্টা করতে সে স্বামীকে নিয়ে চলেছে বৈষ্ণোদেবীর কাছে। তার বিশ্বাস বৈষ্ণবী মায়ের কৃপায় ভরত ভালো হয়ে যাবে। না হলে যে বাসন্তীর জীবনে আর বসন্ত আসবে না।

তাই ভরতের জন্য নয়, বাসন্তীর জন্যই বৈষ্ণোদেবীর করুণা প্রার্থনা করি। তাঁকে বলি—মা, তুমি তো জন্মান্তর ধরে তোমার প্রাণপুরুষের প্রতীক্ষায় রয়েছো, তাহলে বাসন্তী কেন তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরে পাবে না! দেবী হয়ে তুমি কেমন করে একজন নিরপরাধ মানবীর জীবনকে নষ্ট হতে দেবে? ডাক্তার-বদ্যি, সাধু-সন্ন্যেসী,

সবার প্রতি সব বিশ্বাস হারিয়ে সংসারে সে শুধু আজ তোমাকে বিশ্বাস করে। তাই সে রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে তোমার কাছে চলেছে। তুমি তার এই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিও না।

তুমি ভরতকে ভালো করে দাও। তুমি বাসন্তীকে সুখী ক'রো।

।। সাত ।।

সবে সকাল সাড়ে ন'টা। কিন্তু রোদের তেজ দেখে মনে হচ্ছে বেলা বারোটা। একে চড়াই ভাঙার পরিশ্রম, তার ওপরে রোদ। পাহাড়গুলো একেবারে তেতে উঠেছে। ভীষণ গরম লাগছে। কে বলবে আমরা ছ'হাজার ফুট উঁচুতে পদচারণা করছি? তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। আমাদের সঙ্গে ওয়াটার বট্‌ল নেই। নন্দারা নিয়ে গিয়েছে।

আবার দু'টি পথ মিলিত হলো। এখানে একফালি প্রশস্ত সমতল। চীরগাছের ছায়া আছে। আর আছে জল। আগে তেষ্টা মেটাই। প্রাণভরে ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিই। তারপরে পথের পাশে চীরের ছায়ায় বসে পড়ি। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে—ঠাণ্ডা বাতাস। শরীর শান্ত হয়, প্রাণ জুড়িয়ে আসে। হিমালয়ের হাওয়ায় এই প্রাণশক্তি রয়েছে বলেই হিমালয় দেবালয়। তাঁকে দু-হাত তুলে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াই। করুণকে জিজ্ঞেস করি, "কি করবে? ঘোড়ার পথেই যাবে, না সিঁড়ি ধরবে?"

একটু ভেবে নিয়ে করুণ উত্তর দেয়, "চলুন, সিঁড়ি দিয়েই যাওয়া যাক। পরিশ্রম একটু বেশি হলেও পদে পদে পাশে সরে দাঁড়াবার ঝামেলা নেই। সময় একই লাগে। পথ কম এবং নিশ্চিন্তে চলা যায়।"

কথাটা মন্দ বলে নি সে। অতএব আবার সিঁড়ি ভাঙা শুরু করি। তবে সিঁড়িগুলো যেমন খাড়া, তেমনি সোজা উঠে গিয়েছে। দুদিকেই গভীর খাদ। তাই রেলিং দেওয়া। পাশে পড়ে যাবার ভয় নেই কিন্তু তাকালে ভয় করে।

ভয় করে নিচের দিকে তাকাতেও। এবং কোনো কারণে পা পিছলে গেলে সমূহ বিপদ—এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে গড়িয়ে কম করেও শ' পাঁচেক ফুট নিচে গিয়ে থামব। তখন থামা না থামা সমান হবে, কারণ আমি আর আমাতে থাকব না।

তবু তাকাতে হয়। আদিকুমারীকে যে ভারী সুন্দর লাগছে এখান থেকে। আমরা তাই বারে বারে নিচের দিকে তাকাই, তাকিয়ে তাকিয়ে আদিকুমারীকে দেখি, তারপরে আবার এগিয়ে চলি।

ওপরের দিকেও পাহাড়ের ওপর বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। দশটা বাজে। তার মানে আদিকুমারী থেকে এক ঘণ্টাও হাঁটি নি। এরই মধ্যে বৈষ্ণোদেবী দেখতে পাবো কেমন করে? না না, ওটা বৈষ্ণোদেবী নয়, অন্য কোনো জায়গা।

পাশের যাত্রী আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। একটু হেসে বলেন, "না না, বৈষ্ণোদেবী নয়। ও জায়গাটার নাম হাতীমাথা—৬২০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের প্রায় সমতল

শিখর। শ্রান্ত যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য ওখানে একটা ঘর আর কয়েকটা দোকান রয়েছে।"

"হাতীমাথা কি এ পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা?" করুণ জিজ্ঞেস করে।

সহযাত্রী উত্তর দেন, "না। ওর পরেও চড়াই আছে। প্রায় শ' ফুট চড়াই ভেঙে আমাদের পৌঁছতে হবে সাঁজীছত—৬৫৮৩ ফুট উঁচুতে। তারপরে আর চড়াই নেই—সমতল এবং উতরাই।" একবার থামেন ভদ্রলোক। সহসা সুর করে বলে ওঠেন, "প্রেমসে বোলো—জয় মাতাদী।"

আমরাও সাড়া দিই, "মহাশক্তি—জয় মাতাদী।"

ক্লান্ত দেহ নিয়ে কোনোমতে হাতীমাথায় পৌঁছনো গেল। পাহাড়ের প্রায় সমতল শিখর হলেও জায়গাটার গড়ন অনেকটা হাতীর পিঠের মতো। যাঁরা নাম রেখেছেন, তাঁদের কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবার অবকাশ নেই এখন। শরীর আর দেহের ভার বইতে পারছে না। যেমন গরম লাগছে, তেমনি আকণ্ঠ পিপাসা পেয়েছে। তাড়াতাড়ি এসে বিশ্রাম ঘরের ছায়ায় বসে পড়ি।

শুধু চা নয়, দোকানে জলও পাওয়া যাচ্ছে। জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে চায়ের অর্ডার দিই। তারপরে চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি।

এখান থেকেও আদিকুমারী দেখা যাচ্ছে। বরং তাকে আরও ভালো লাগছে। দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর অসংখ্য গিরিশিরা।

কোনোটি সবুজ, কোনোটি কালো, কোনোটি বা ধূসর। পীরপাঞ্জালের পরে সমতল ভারত। ধূসর সমতলের বুকে একটি রুপোলী রেখা—হিমাচলের প্রাণধারা চন্দ্রভাগা। ভাবতে ভালো লাগছে আমি ঐ চন্দ্রভাগার জন্মস্থান লাহুলের পথে পথে পদচারণা করেছি।

না, চন্দ্রভাগাকে দেখে ভালো লাগছে না আমার। সে যে বড়ই নিষ্ঠুর। সে সুজয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। কমলা চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে তারই দুর্বার স্রোতে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই।*

কেবল সমতল ভারত নয়, তুষারাবৃত হিমালয়ের দু-একটি শিখরও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আমি ওদের দিকে তাকাই। আমি যে বার বার ওদের জন্যই হিমালয়ে আসি। এবারেও গিয়েছিলাম ওদের কাছে। এখন ফিরে যাচ্ছি ঘরে। আবার কবে ওদের কাছে যেতে পারব, জানি না। কিন্তু ওরা সর্বদা আমার মানসলোকে বিচরণ করে—আমার পথিক-হৃদয়কে আনন্দময় করে রাখে।

দেবতাত্মা হিমালয়কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াই। কিন্তু পথচলা শুরু করতে পারি

---

*বাংলার কুলবধূ শ্রীমতী সুজয়া গুহের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে লাহুল-হিমালয়ে এক মহিলা পর্বতাভিযান আয়োজিত হয়েছিল। ২১শে অগাস্ট সুজয়া দুই তরুণী সদস্যা সুদীপ্তা সেনগুপ্তা ও কমলা সাহাকে নিয়ে ২০,১৩০ ফুট উঁচু ললনা শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা মূল-শিবির থেকে ফিরে আসার পথে ২৬শে অগাস্ট চন্দ্রভাগার উপনদী করচা নালা পেরোবার সময় সুজয়া ও কমলা ভেসে যায়। প্রাণহীনা সুজয়াকে তবু পাওয়া যায় কিন্তু কমলা আজও চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে আছে। লেখকের 'লীলাভূমি-লাহুল' বইখানি দ্রষ্টব্য।

না। পথের পাশে একখানি ডাণ্ডি। না, ডাণ্ডি দেখে থমকে দাঁড়াই নি, থেমেছি ডাণ্ডির আরোহিণীকে দেখে!

মোটা মানুষ জীবনে অনেক দেখেছি। দুর্গম তীর্থে সাধারণতঃ মোটা মানুষরাই ডাণ্ডি চেপে আসেন। কিন্তু সেই রাজস্থান ভ্রমণের পরে এমন মোটা আর দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।* ভদ্রমহিলার বয়স ঠিক অনুমান করতে পারছি না। তাহলেও বোধকরি বছর পঞ্চাশের বেশি হবে না। অর্থাৎ আমার সমবয়সী। অথচ একেবারেই অচল হয়ে পড়েছেন। সাধারণত চারজন করে ডাণ্ডিবাহক থাকে। এঁর বেলায় দেখছি ছ'জন! তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ডাণ্ডির পাশে বসে বিশ্রাম করছে। করারই কথা—এমন একটা জীবন্ত পাহাড়কে তাদের পাহাড়ে চড়াতে হচ্ছে।

কিন্তু ভদ্রমহিলা বৈষ্ণোদেবী যাচ্ছেন কেন? মায়ের কাছে মেদ কমাবার আর্জি পেশ করতে? সম্ভবত তাই। কিন্তু এই বিশাল বপু নিয়ে তিনি মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করবেন কেমন করে? ছবি দেখে ও বই পড়ে আমার সেই গুহামন্দির সম্পর্কে যে ধারণা, তাতে মনে হচ্ছে ইনি গুহায় ঢুকতে পারবেন না। গুহার বাইরে দাঁড়িয়েই মা বৈষ্ণোদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে। —মা, তুমি ভদ্রমহিলার প্রার্থনা অপূর্ণ রেখো না। স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে এঁকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো।

"কি দেখছেন? আমাকে?"

ভদ্রমহিলা আমাদেরই প্রশ্ন করছেন। লজ্জা পাই। সেই সঙ্গে বিস্মিত হই। এতবড় দেহ কিন্তু গলার স্বরটি ছোট মেয়ের মতো মিহি।

"ভাইসাব, আমাকে দেখছেন? দেখুন, সবাই দেখে।" ভদ্রমহিলা আবার বলেন।

কিছু বলা দরকার। তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলি, "আজ্ঞে! আপনি তো বৈষ্ণোদেবী যাচ্ছেন?"

"জী হাঁ। আপনারা?"

"আমরাও যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আমি কি মায়ের কাছে যেতে পারব? মানে গুহাটি খুবই সরু।"

কি বলব? আমিও যে একটু আগে নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি।

ভদ্রমহিলার সন্দেহ হয়। তিনি আবার বলেন, "আমি ভেতরে ঢুকতে পারব না, তাই না?"

"না, না, পারবেন না কেন?" তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "নিশ্চয়ই পারবেন। এত কষ্ট করে চলেছেন, আর করুণাময়ী মা আপনাকে কৃপা করবেন না! তা কি হয়?"

"আমিও তো তাই বলেছি ভাইসাব! যিনি ভৈঁরোর মতো পাপীকে পরিত্রাণ করেছেন, তিনি আমাকে কৃপা করবেন না কেন?" একবার থামেন তিনি। কিন্তু আমি কোনো উত্তর দেবার আগে নিজেই আবার বলেন, "আর তা না করলে তিনি আমাকে স্বপ্নাদেশ দেবেন কেন?"

"স্বপ্নাদেশ! মা আপনাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন?" করুণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বলতে থাকেন, "আমাদের বাড়ি জয়পুরে কিন্তু আমরা

---

*লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

দিল্লীতে থাকি। আমার স্বামী ব্যবসা করেন—ভালো ব্যবসা। আমাদের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই...”

সহসা থেমে যান ভদ্রমহিলা। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। আমরাও চুপ করে থাকি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি আবার শুরু করেন, “সন্তানহীনার শোক তবু সয়ে নিয়েছি, কিন্তু ভাইসাব, এই শরীরের জ্বালা আর সইতে পারছি না, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠছে। বেঁচে থেকেও মরার মতো হয়ে আছি। বহু চিকিৎসা করেছি, খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু মোটা হবার কমতি নেই। স্বামীকে কোনো সুখ দিতে পারি না, তাঁর একটু সেবা-যত্ন পর্যন্ত করতে পারি না। তাই ভেবেছিলাম আত্মঘাতী হব।...”

চমকে উঠি। কিন্তু কিছু বলতে হয় না আমাকে। ভদ্রমহিলা নিজেই বলেন, “তাও পারলাম না শেষ পর্যন্ত—। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, স্বয়ং মা বৈষ্ণোদেবী বলছেন—তুই আমার কাছে চলে আয়, আমি তোর সব কষ্ট দূর করে দেব।

“স্বামীর কাছে কথাটা গোপন করে গেলাম। কারণ এর আগে দু-একবার বৈষ্ণোদেবী আসার কথা বলায় তিনি আপত্তি করেছেন। বলেছেন, তুমি গুহায় ঢুকতে পারবে না।

“কিন্তু বৈষ্ণোদেবী যাকে ডাক দেন, তিনিই তার আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। হঠাৎ ব্যবসার কাজে স্বামীকে সাতদিনের জন্য বম্বে চলে যেতে হলো। আমিও একজন চাকরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পরদিন। উনি ফিরে আসার আগেই বাড়ি ফিরে যেতে পারব।” থামলেন তিনি।

আমি আবার সান্ত্বনা দিই, “মা যখন ডেকেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আপনার সব কষ্ট দূর করে দেবেন। আপনি আস্তে আস্তে আসুন, আমরা একটু এগিয়ে যাই।”

“আসুন।” তিনি দু'হাত তুলে নমস্কার করেন। তারপরে বলে ওঠেন, “জয় মাতাদী।”

“জয় মাতাদী।” আমরা এগিয়ে চলি।

কিন্তু ভদ্রমহিলার ভাবনা ছাড়তে পারি না। সংসারে কত বিচিত্র সমস্যা, সুখ-দুঃখের সংজ্ঞা কতখানি ব্যাপক, তা কেবল তীর্থের পথে উপলব্ধি করা যায়। আর তা যায় বলেই বোধকরি তীর্থের ডাক আমাকে এমন আকুল করে তোলে।

আকুল হয়েই পথ চলেছি এখন। কারণ সামনের পাহাড়টার ওপরে সাঁজীছত দেখা যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছতে পারলে এযাত্রার মতো চড়াই শেষ হবে।

তবু থামতে হয়। এ জায়গাটি বড় সুন্দর—এই সিঁড়ি আর সড়কের সঙ্গমটুকু। এখানে জলসত্র নেই, আছে একফালি সমতল আর তার একপাশে একখানি লাল রং দেওয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো বেঞ্চি। রয়েছেন স্বয়ং বৈষ্ণোদেবী। একটা ঝুপড়ির ভেতরে মায়ের অষ্টভুজা মাটির মূর্তি—তিনি বাঘের ওপরে বসে আছেন।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিই। তারপরে মাকে প্রণাম করে আবার এগিয়ে চলি চড়াই পথে—শেষ চড়াই।

পেরিয়ে এলাম—আমরা শেষ চড়াই পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম সাঁজীছত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। লাঠিটা ফেলে দিয়ে বসে পড়ি পথের পাশে। এখন সকাল সাড়ে

দশটা।

বসে পড়লেও বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে পারি না। আর যে তর সইছে না। মাত্র তিন কিলোমিটার সমতল ও উতরাই পথ। কষ্টকর পথ গিয়েছে ফুরিয়ে। তাহলে আর এখানে বিশ্রাম করা কেন? একেবারে বৈষ্ণোদেবী গিয়ে যাত্রার যতি টানা যাক।

অতএব 'জয় মাতাদী' বলে উঠে দাঁড়াই। জল খেয়ে লাঠিটা কুড়িয়ে নিই। এগিয়ে চলি মায়ের কাছে—যিনি আমার সকল সহযাত্রীর সকল দুঃখ দূর করবেন, সকল কামনা পূর্ণ করবেন।

এখন আর দুটি নয়, একটি পথ। ঘোড়া ও মানুষের পথ মিলেমিশে এক হয়ে গেল এখানে। তবে পথটি প্রশস্ততর। তাই ঘোড়াদের পথ দেবার জন্য সরে দাঁড়াবার বড় একটা দরকার পড়ছে না। ঘোড়সওয়ারদের যাওয়া-আসার কিন্তু বিরাম নেই। তবে যাবার চেয়ে আসার যাত্রীর সংখ্যা কম। আসার পথ উতরাই বলে অনেকেই ঘোড়া নিয়ে খরচ বাড়ায় নি। কেবল দেখতে পাচ্ছি না আমাদের দলের ঘোড়সওয়ারদের। ওরা এগিয়ে গিয়েছে। হয়তো বা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। ভালোই হয়েছে।

আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো বৈষ্ণোদেবীর দরবারে—তাঁর চরণপ্রান্তে। আমরাও জোরে জোরে পা ফেলে অক্লেশে এগিয়ে চলেছি। বাণগঙ্গার পরে আর এমন সমতল পাই নি।

পথ শুধু সহজ নয়, পথের প্রকৃতিও শীতলতর। এক পাশে পাহাড় আরেক পাশে খাদ—অনেক নিচে সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে প্রচুর গাছপালা—বড় বড় গাছ। তাদের ছায়া পড়েছে পথের বুকে। সেই সুশীতল পথ ধরে আমরা জোরকদমে চলেছি এগিয়ে।

—জয় মাতাদী!

সামনের যাত্রীদের মাতৃবন্দনা কানে আসে। পেছনের যাত্রীরা জয়ধ্বনি দেয়—জয় মাতাদী।

একদল দর্শন করে ফিরছেন, আরেকদল দর্শন করতে যাচ্ছেন। দু'দলের পথ ভিন্ন কিন্তু দেখা হলে সেই অভিন্ন মন্ত্র—জয় মাতাদী।

আমি যে মায়ের জগতে এসেছি—জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী মা। মা, আর কেউ নেই, কিছু নেই মাতৃতীর্থে। আমরা সেই তীর্থের যাত্রী। মাতৃসদন সমাগত। সুতরাং আমরাও মাঝখান থেকে মায়ের জয়গান গেয়ে উঠি—জয় মাতাদী।

চলতে চলতে আলাপ হয় ওদের সঙ্গে। কোনো যুবক প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধবৃদ্ধা নয়, কোনো রাগ শোক বা জরা [illegible], কোনো কামনা বাসনা অথবা অনুশোচনা নয়, চণ্ডীগড়ের একটা ডিগ্রি-কলেজের কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী। ওরা কলেজ এক্সকারশন-এ কাশ্মীর গিয়েছিল, ফেরার পথে তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে বৈষ্ণোদেবীর কথা শুনে চলে এসেছে কাটরা। ওদের যেমন কোনো প্রত্যাশা নেই, তেমনি নেই সময়ের অভাব। তাই ওরা গতকাল রাত কাটিয়েছে আদিকুমারীতে, আজ রাত্রিবাস করবে বৈষ্ণোদেবীতে। আগামীকাল [illegible] ফিরবে। ছেলে-মেয়েগুলোকে ভালো লাগে আমার। ওরা এক কলেজে পড়লেও ভিন্ন জায়গার ছেলে-মেয়ে—কেউ পাঞ্জাব,

কেউ হরিয়ানা, কেউ বা হিমাচল। কিন্তু একই মানসিকতা থেকে ওরা চলে এসেছে এখানে। সবাই সোচ্চার স্বরে বলছে, "বিশ্বাস করুন, ভীষণ ভালো লাগছে এই যাত্রা। আর বৈষ্ণোদেবীর গুহাটি সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে তো মনে হয় দারুণ interesting হবে। To be frank, we are enjoying this journey in every step."

এই ভালো লাগা, এই প্রতি পদে উপভোগ করাই তো তীর্থপথের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। এই তরুণ-তরুণীরাই তো ভাবী-ভারতের নাগরিক, আগামীদিনের ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। আসুক, এরা এমনি কামনা-বাসনাহীন হয়ে দলে দলে তীর্থে আসুক। ভারতের তীর্থ বিশ্বতীর্থে পরিণত হোক।

হঠাৎ ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করে ওঠে, "জয় মাতাদী।" ইশারা করে বলে, "ঐ দেখুন বৈষ্ণোদেবীর দরবার। আমরা এসে গিয়েছি।"

সত্যই তাই। আশ্চর্য! ওদেরই আগে নজর পড়ল, অথচ ওরা কিছু চাইতে আসে নি মায়ের কাছে।

তাড়াতাড়ি প্রণাম করি। ওরাও কপালে হাত ঠেকায়। তারপরে চলা থামিয়ে পথের পাশে এসে দাঁড়াই। পথচারীরা সবাই তাই করে। ভালো করে দেখে নেওয়া যাক একবার। আমরাও দেখি।

আমরা যে পাহাড়টির ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা অনেক নিচে গিয়ে একটা অসমতল সবুজ উপত্যকায় মিশেছে। সেই উপত্যকার শেষে আবার এমনি একটা সবুজ পাহাড়। তারই গায়ে বাড়ি-ঘর বাজার ও মন্দির—বৈষ্ণোদেবীর দরবার। এখান থেকে দেখাচ্ছে সুসজ্জিত খেলাঘরের মতো। তবে দুটি বাড়িকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না। এখানে এতবড় বাড়ি বিস্ময়কর।

জনৈক যাত্রী জানান, "বড় বাড়ি দুটো ধর্মশালা। সর্বদা কয়েক হাজার যাত্রী এখানে থাকেন যে!" একবার থামেন তিনি, তারপরে ইশারা করে বলেন, "ঐ যে ওপরে রঙীন টিনের চাল দেখা যাচ্ছে, ডাকবাংলো। দরবার দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, বাঁদিকের ধর্মশালাটিতে ঢাকা পড়েছে।"

আর এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট নয়। মাতৃসদন দেখা যাচ্ছে। অতএব চলা শুরু করি—প্রায় ছুটতে থাকি। শুধু আমরা নই, সবাই এমনকি চণ্ডীগড়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত।

কিন্তু কেন? কেন ছুটছি আমরা? আমরা তো কিছু চাইতে যাচ্ছি না, তাহলে এত অস্থির হয়ে পড়েছি কেন?

আমরা যে মায়ের কাছে চলেছি।

মায়ের স্নেহ আর আশীর্বাদের জন্য সন্তান ছুটে চলেছে মাতৃসদনে—বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। জয় মাতাদী।

সহসা করুণ সুর করে বলতে শুরু করে—

'সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

সে চণ্ডীপাঠ করছে। মাতৃসদনে প্রবেশের আগে মাকে বলছে—মা, তুমি

সর্ব-মঙ্গল-স্বরূপা, সর্ব অভীষ্ট সাধিকা। হে গৌরবর্ণা ত্রিভুবন-জননী, তুমিই আমাদের একমাত্র শরণযোগ্য, তুমি নারায়ণী—তোমাকে প্রণাম।

।। আট ।।

ভৈরবঘাঁটিতে। সামনেই ভৈরব মন্দির। পথের পাশে ছোট মন্দির। ইট আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি লাল হলুদ ও সাদা রঙের মঠাকৃতি মন্দির। মন্দির শিখরে পতাকা। পাশে ত্রিশূল ও সামনে ঘণ্টা রয়েছে। মাত্র পাঁচ-ছ' ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে ওঠা যায়। কিন্তু দর্শন করার উপায় নেই। বৈষ্ণোদেবীর আগে ভৈঁরোকে দর্শন করা যাবে না।

কথিত আছে—দেহচ্যুত হবার পরে দানবরাজ ভৈঁরোর মাথাটি এখানে এসে পড়ে। ছিন্নমস্তক বৈষ্ণবী মা-কে চিনতে পারে। আপন কৃতকর্মের জন্য সে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পরম করুণাময়ী ও ক্ষমাশীলা মা তাকে ক্ষমা করেন, বলেন—তুমিও আজ থেকে চিরস্থায়ী হলে এই পুণ্যতীর্থে। অনাগত যুগের অগণিত ভক্ত আমাকে দর্শন করে তোমার ঐ ভৈঁরোঘাঁটিতে গিয়ে তোমাকে দর্শন করবে। নইলে তাদের তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব এখন ভৈরবমন্দির দর্শন করলে অনিয়ম হবে। ফেরার পথে এ মন্দির দর্শন করতে হয়। জানি না, তখন সে সুযোগ পাবো কিনা? কিন্তু ফেরার ভাবনা এখন নয়। অতএব এগিয়ে চলি।

ভৈরবঘাঁটিতে দেখছি জলসত্র ও চায়ের দোকান রয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের ওর কোনোটিরই দরকার নেই। আমরা তাই দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

দেখতে কিন্তু একই রকম। সেই মূল-তীর্থের চেয়ে কিছু উঁচুতে বড় বড় গাছে ছাওয়া একফালি প্রায়-সমতল ভূখণ্ড, যেখান থেকে মূল-তীর্থের ওপরে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা যায়। হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি শিবক্ষেত্রে এমনি একটি করে ভৈরবঘাঁটি আছে, ভৈরবমন্দির। ভৈরব শিবক্ষেত্রের রক্ষক।

এখানে ভৈরব নন, ভৈঁরো। এবং এটিকে শিবক্ষেত্রও বলা যায় না। কারণ মা-বৈষ্ণবী শিবানী নন, তিনি আদিকুমারী—কল্কি অবতারের মহাশক্তি। তাছাড়া ভৈঁরো এই মাতৃতীর্থের রক্ষকও নয়। তবু পুণ্যার্থীরা ভৈরবঘাঁটি বলেছেন। কি জানি, তো ঠিকই বলেছেন। মোক্ষলাভের পরে দানবরাজ ভৈঁরো বোধকরি ভৈরবের ভূমিকা নিয়েছে। সে এখান থেকে মাতৃতীর্থকে রক্ষা করছে। তাই এ জায়গাটিকে সবাই ভৈঁরোঘাঁটি না বলে ভৈরবঘাঁটি বলছেন।

ভৈরবঘাঁটি ছাড়িয়ে এসেছি কিন্তু পথ এখনও তেমনি বনময়—চীর পাইন আর দেওদারের বন। তাদের ছায়ায় ফুটে আছে নানা রঙের জানা অজানা ফুল। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে জনৈক যাত্রী জানান—এই কাননের নাম 'মাতা কী বাগ'! আমরা মায়ের বাগানের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি।

আবার দেখা যাচ্ছে—মাতৃসদন, বৈষ্ণোদেবীর দরবার। খানিকটা সোজা সামনে।

দেখতে পাচ্ছি লোকজনের যাওয়া আসা, শুনতে পাচ্ছি মাইকের শব্দ—হিন্দী গান। গহন-গিরি-কন্দরে কর্মমুখর আনন্দলোক।

আবার দুটি পথ পৃথক হলো—ঘোড়া ও মানুষের পথ। অশ্বারোহীদের পথটি অনেকটা ঘুরে আস্তে আস্তে নিচে নেমেছে। আর পদাতিকদের পথ পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা নিচে নেমে গিয়েছে।

এবারে উতরাই। সুতরাং মানুষের পথ দিয়েই নামতে শুরু করি। বনময় পথ—কোথাও পাকদণ্ডি, কোথাও বা ধাপে ধাপে সিঁড়ি। আমরা এগিয়ে চলি।

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসি উপত্যকায়। সবুজ, প্রায় সমতল অপ্রশস্ত উপত্যকা। এখানে আবার দুটি পথ মিলিত হলো। মিলিত পথটি প্রশস্ততর হয়ে প্রসারিত হয়েছে সামনে—বৈষ্ণোদেবীর দরবারের দিকে।

পথের ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি সাধুদের কুটিয়া। কোথাওবা গুহার মধ্যে মহাত্মাদের আসন। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। অবিরত মাতৃবন্দনা কানে আসছে—জয় মাতাদী।

বেলা সওয়া এগারোটায় প্রথম ধর্মশালার সামনে এসে দাঁড়ালাম—পৌঁছলাম পুণ্যতীর্থে। ১৪ কিলোমিটার পথ আসতে আমাদের প্রায় পাঁচঘণ্টা লাগল। নিশ্চয়ই বেশি লেগেছে, আরও আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কি লাভ হতো অযথা তাড়াহুড়ো করে? তার চেয়ে ধীরে-সুস্থে দেখতে দেখতে পথ চলে পৌঁছে গিয়েছি মায়ের কাছে। এই ভালো হলো।

পথের ডানদিকে ধর্মশালা, বাঁদিকে দোকানের সারি। জনবহুল পথ—যাত্রীরা যাওয়া-আসা করছেন, গল্প-সল্প করছেন, হাসি-ঠাট্টা করছেন। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম ওদের—নন্দাদের। ওরা পুলিশ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদেরই পথ চেয়ে।

প্রথমেই তোতা চেঁচিয়ে ওঠে, "জেঠু, এই যে আমরা, এদিকে এসো!"

আমি ও করুণ ভিড় ঠেলে ওদের কাছে আসি। মহুয়া ও তোতা ছুটে এসে আমার দু-হাত ধরে। মহুয়া বলে, "আমরা কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাদের জন্য।"

আমি নন্দার দিকে তাকাই। সে বলে, "তা আধঘণ্টার বেশি হয়েছে, আমরা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে গিয়েছি।"

"দর্শনের স্লিপ নিয়েছো?"

নন্দা মাথা নেড়ে তার ব্যাগ খোলে। কয়েকটি লাল টিকেট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, "এই যে।"

আমি সেগুলো হাতে নিয়ে দেখি। লেখা রয়েছে—'Dharmartha Trust, Jammu & Kashmir. Holy Darshan Slip. Group B, Nos. 161.....166'.

"গ্রুপ বি" আমি বলি, "ভালোই তো হয়েছে। সকালে নিশ্চয়ই 'এ' গ্রুপ থেকে স্লিপ দেওয়া শুরু হয়েছে, আমরা 'বি' গ্রুপ পেয়ে গেছি।"

"তা বলতে পারব না" মীরাদি বলেন, "স্লিপ দেবার সময় ওঁরা বললেন, রাত দশটা নাগাদ আমাদের পালা আসবে।"

"রাত দশটা!" আমি ও করুণ সমস্বরে বলে উঠি।

"হ্যাঁ।" নন্দা উত্তর দেয়, "এখন গতকালের 'এন' গ্রুপের দর্শন চলেছে।"

"গতকালের 'N'! তার মানে গতকালের O P Q R S T U V W X Y Z হয়ে যাবার পরে আজকের A B?" করুণ হতাশ স্বরে জিজ্ঞেস করে।

মীরাদি বলেন, "হ্যাঁ। প্রতি গ্রুপের আড়াই শ' করে স্লিপ 'ইস্যু' করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার যাত্রী দর্শন করার পরে আমাদের পালা আসবে।"

"তাই ওঁরা বললেন, 'রাত দশটা বেজে যাবে দর্শন করতে।' নন্দা যোগ করে।

"তাহলে তো আজ আমরা কাটরায় ফিরতে পারব না।" করুণ বলে, "কাল জম্মু গিয়ে ট্রেন ধরব কেমন করে? বিপদে পড়া গেল দেখছি।" সত্যই তাই।

"বৃথা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।" মীরাদি বলেন, "এসেছি যখন, দর্শন করতেই হবে। দর্শনের পরে ফিরে যাবার কথা ভাবা যাবে। এখন ঘোড়াওয়ালাদের ভাড়া মিটিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যাক।"

ঠিকই বলেছেন মীরাদি। ঘোড়াওয়ালারা দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। তাদের পাওনা মিটিয়ে দিই। তারপরে সবাইকে নিয়ে এসে দাঁড়াই ধর্মশালার সিঁড়ির ওপরে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপরে সুপ্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার পরে সারি সারি ঘর—বহু ঘর, বিরাট ধর্মশালা। কিন্তু অধিকাংশ ঘরে তালা ঝুলছে, যে কয়েকটির দরজা খোলা তাতে লোক রয়েছে। সবচেয়ে বিপদের কথা বারান্দাটি লোকে লোকারণ্য। কোথাও একটু বসার জায়গা নেই। সতরঞ্চি ও কম্বল বিছিয়ে অগণিত মানুষ শুয়ে বসে আছেন। খুবই স্বাভাবিক। সর্বদা যদি তিন চার হাজার লোককে দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে ধর্মশালায় জায়গা থাকবে কেমন করে?

নন্দা বলে, "ওপরে যেতে পারলে বোধহয় জায়গা পাওয়া যেতো।"

আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওপরে যাই কেমন করে? বারান্দার দু-দিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। কিন্তু এতো মানুষকে ডিঙিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছব কেমন করে?

কেন, ঐ তো ওরা যেভাবে আসছেন! একদল লোক এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। তাঁরা জুতো হাতে নিয়ে বিশ্রামরত যাত্রীদের বলে কয়ে তাঁদের কম্বল-সতরঞ্চি মাড়িয়ে অক্লেশে এদিকে আসছেন। তাঁদের কেউই কিছু বলছেন না। ওঁরা বাইরে বেরুবেন।

একটু বাদেই ওঁরা পথে এসে জুতো পরতে শুরু করে দিলেন। অতএব আমরাও পথে বসে জুতো খুলতে শুরু করে দিই।

জুতো হাতে নিয়ে এগিয়ে চলি সিঁড়ির দিকে। আমাদেরও কেউ কিছু বলেন না। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসি। এখানেও দেখছি একই অবস্থা। অতএব তেতলায়।

এখানে ভিড় কিছু কম। দেখে শুনে একটা ঘরে খানিকটা জায়গা পেয়ে যাই। কিন্তু কি পেতে বসব! আমরা যে কিছুই সঙ্গে আনি নি!

ওরা কিন্তু মেঝেতেই বসে পড়ে—মীরাদি নন্দা ও করুণ, তোতা ও মহুয়া। সকলেই ক্লান্ত।

আলাপ হয় পাশের যাত্রীদের সঙ্গে। তাঁদের একজন বলেন, "নিচে অফিসঘরে টাকা জমা দিলে কম্বল ও সতরঞ্চি পাবেন।"

নন্দা বলে, "রাত দশটায় দর্শন। দশ-এগারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ছেলে-মেয়ে দু'টোকে একটু ঘুম পাড়িয়ে নিতে হবে। অফিসে যাবেন নাকি একবার?"

"তাছাড়া তোমাদের এখন একটু চা দরকার।" হেসে বলি, "তোমরা ব'সো। ভানু মীরাদির ফ্লাস্কটা নিয়ে আমার সঙ্গে চলুক। দেখি কি করতে পারি?"

আমি ও ভানু জুতো হাতে নিয়ে আবার নেমে আসি নিচে। রাস্তার ধারে এসে জুতো পরে নিই।

ধর্মশালার নিচের তলায় পথের ধারে অফিস। জনৈক কর্মচারীকে সব বলি। তিনি উত্তর দেন, "বেলা দু'টোর পরে আসবেন। তখন সতরঞ্চি ও কম্বল যা দরকার পাবেন। খালি থাকলে আলাদা ঘরও পেয়ে যাবেন।

বেলা দু'টোর অনেক দেরি, এখন সবে সাড়ে এগারোটা। এদের কাছে আবেদন করে কোনো লাভ হবে না বুঝতে পারছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না এখন কি করব, কোথায় যাবো?

সেকথা পরে ভাবা যাবে, আগে ওদের চা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

ধর্মশালার উল্টোদিকে পথের পাশে সারি সারি দোকান—মুদি, মনিহারী ও চায়ের দোকান থেকে এক ফ্লাস্ক চা নেওয়া গেল। তারপরে পাশের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে ভানুর হাতে দিয়ে বলি, "ওপরে দিয়ে আয়। তুই ফিরে এলে আমি চা খাবো। আমি এই পথের ওপরেই কোথাও থাকব।

ভানু মাথা নেড়ে চলে যায়। আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলি। চলতে-চলতে চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। প্রায় প্রত্যেকটি দোকান, বিশেষ করে মনিহারী দোকানগুলো ভারী সুন্দর করে সাজানো। ভিড়ও মন্দ নয়। এখানে এসে দর্শনের যাত্রীদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কতক্ষণ আর শুধু শুধু বসে থাকা যায়? তাই অনেকেই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাধ্যমতো কেনা-কাটা করছেন—পুণ্যতীর্থের কিছু স্মৃতি প্রিয়জনের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মশালা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে একটা পায়ে-চলা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। এটা ডাকবাংলোয় যাবার পথ। পাহাড়ের ওপরে ডাকবাংলো দেখা যাচ্ছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখানে থেকে। ওখানে গেলে হয়তো খালি ঘর দেখতে পাবো, কিন্তু বাস করার অনুমতি পাবো না। কারণ ওটি ওখানকার সবচেয়ে অভিজাত আবাস—ভি.আই.পি.-দের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব আমাদের মতো অভাগাদের ওখানে ঠাঁই নেই।

এগিয়ে চলি। পথটা বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। একটু এগিয়ে পথের বাঁদিকে দ্বিতীয় ধর্মশালা। এটি আরও বড় যাত্রীনিবাস—জম্মু ও কাশ্মীর ধর্মার্থ ট্রাস্টের পরিচালনাধীন। এই ট্রাস্ট এই রাজ্যের মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এমনকি অমরনাথ যাত্রাও এঁরাই পরিচালনা করে থাকেন।

পথের পাশে ধর্মার্থ ট্রাস্টের অফিস, তারপরে ক্লোক্ রুম—যাত্রীদের মালপত্র জমা রাখার জায়গা। ক্লোক্ রুমের পাশে স্টোর্স—কম্বল ও সতরঞ্চি ইত্যাদির ভাণ্ডার।

অফিসে আসি। জিজ্ঞেস করি, "আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, দলে সাতজন, একখানি ঘর পাওয়া যাবে।"

"এখন একখানাও ছোট-ঘর খালি নেই মহারাজ!" কর্মচারীটি উত্তর দেন, "তবে

বহু বড়ঘরেই জায়গা রয়েছে, একটু দেখে নিতে হবে।"

"আপনাদের এখান সতরঞ্চি পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়ই। টাকা জমা দিয়ে কম্বল-সতরঞ্চি যে ক'খানা দরকার নিয়ে যান। ফেরত দিলে পুরো টাকাটাই পেয়ে যাবেন, আমরা কোনো ভাড়া নিই না।"

এ ধর্মশালাটি মন্দিরের কাছে, খাবারের হোটেলগুলিও এখানেই। একবার খুঁজে দেখলে হতো, ভালো জায়গা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু এখন ভেতরে যাওয়া যাবে না। ভানু আসুক।

কয়েক মিনিট বাদেই ভানু আসে। তাকে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। ধর্মশালা ছাড়িয়ে একফালি ফাঁকা জায়গা। সেখানেই পথের পাশে নিচে নামার সিঁড়ি—এটাই ধর্মশালার বিচিত্র প্রবেশপথ। এ ধর্মশালাটি পাহাড়ের গায়ে নির্মিত। তিনতলার মেঝে পথের সমান্তরাল। তাই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দোতলায় পৌঁছনো গেল।

সত্যই সুবিশাল ধর্মশালা। সামনে অর্থাৎ উপত্যকার দিকে রেলিং দেওয়া চওড়া বারান্দা। তারই পাশে সারি সারি ছোট-বড় ঘর। কল-পায়খানা সবই রয়েছে, তবে একটু নোংরা। এখানে দিন-রাত ভিড় লেগে আছে। পরিষ্কার রাখা মুশকিল। তবু রাখা উচিত। তাছাড়া মাছির কবল থেকে যাত্রীদের রক্ষা করার জন্যও কিছু করা দরকার।

সামনের দিকে একাধিক ঘরেও দেখছি জায়গা রয়েছে। এ ঘরগুলো আলো-হাওয়া যুক্ত, কিন্তু বড্ড মাছি।

বাধ্য হয়ে পেছনের সারিতে অপেক্ষাকৃত আলোহীন একখানি ঘর পছন্দ করি। ঘরে অবশ্য টিমটিম করে একটি ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। তাতে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। অথচ ঘরখানি অসূর্যম্পশ্যা বলে মাছি নেই। অন্ধকার ও মাছির মধ্যে আমি অন্ধকারকেই বেছে নিলাম।

ভানুকে বলি, "আমি এখানে অপেক্ষা করছি। তুই ওদের ডেকে নিয়ে আয়। ওরা এলে সতরঞ্চি আনতে যাবো।"

আমি জায়গা দখল করে বসে থাকি। অন্ধকার বলেই বোধকরি খুব কম যাত্রীরই এদিকে নজর পড়ছে। তবে যাত্রী আসার বিরাম নেই। আসছে আর আসছে। তারা প্রায় সকলেই বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে। আলো পেলে কে আর অন্ধকারে আসে?

ওরা আসে একটু বাদে। ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু আপত্তি করে। কিন্তু মাছির ব্যাপারটা বলার পরে রাজী হয়ে যায়। আমি ওদের বসতে বলে করুণকে নিয়ে উঠে আসি ওপরে।

সতরঞ্চির জন্য পাঁচ আর কম্বলের জন্য পনেরো টাকা। পঞ্চাশ টাকা জমা রেখে চারখানি সতরঞ্চি ও দু'খানা কম্বল নিয়ে ফিরে আসি ঘরে। জায়গাটাকে যথাসাধ্য পরিষ্কার করে নিয়ে সতরঞ্চি পেতে দিই। গুছিয়ে বসি। আর ঠিক তখুনি সুরিন্দর আর ডলিকে দেখতে পাই। তাড়াতাড়ি ডাক দিই। ওরাও আমাদের দেখে খুশি হয়, ঘরে ঢোকে।

ডলির কোলে ছেলে, তার পেছনে সুরিন্দর ও পিট্টু। ডলি সহর্ষে বলে, "আপনারা এখানে উঠেছেন! জায়গাও রয়েছে, আমরা এখানেই থাকব।"

সে সুরিন্দরের দিকে তাকায়। সুরিন্দর সহাস্যে বলে, "তোমার কি ধারণা, দাদাকে পেয়েও আমি অন্য ঘরে চলে যাবো?"

ডলি লজ্জা পায়।

সুরিন্দরকে জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কম্বল-টম্বল কিছু সঙ্গে এনেছো?"

"না, দাদা!" ডলি বলে, "বড় একখানা তোয়ালে এনেছি শুধু বাচ্চার জন্য। শুনেছি এখানে কম্বল পাওয়া যাবে।"

"তা পাবে।" আমি বলি, "সুরিন্দর আমার সঙ্গে চলুক, কম্বল যোগাড় করে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের জায়গায় ব'সো।"

ডলি কোনো আপত্তি করে না। সে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আমাদের একখানি সতরঞ্চির ওপরে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তোতা ও মহুয়া তার দু'পাশে এসে হাজির হয়। বলা বাহুল্য, তাদের নজর ডলির ছেলের দিকে, কোলে নেবার মতলব আর কি! হবে না কেন, ছেলেটা যে দেবশিশুর মতো। বাপ-মা দু'জনেই সুন্দর, তার ওপর মা-বৈষ্ণোদেবীর আশীর্বাদ।

সুরিন্দর জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আর মালপত্র পাহারা দেবার জন্য পিট্টুকে আটকে রাখি কেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। ও খেয়ে নিক।"

সুরিন্দর টাকা দিয়ে পিট্টুকে বিদায় করে। ডলি আমাকে বলে, "আপনারা কি এখন খেতে যাচ্ছেন?"

"তাই তো যাব ভাবছি।"

"তাহলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যান।" সে সুরিন্দরকে দেখিয়ে বলে, "ও খেয়ে এসে বাচ্চাকে ধরবে, আমি তখন খেয়ে আসব।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই নন্দা বলে ওঠে, "আপনারা তাহলে তোতা ও মহুয়াকে নিয়ে খেয়ে আসুন। আমিও পরে যাবো ওনার সঙ্গে। উনি একা একা খেতে যাবেন!" সে ডলির কথা বলছে।

"তাতে কি হয়েছে?" ডলি আপত্তি করে, "আপনি যান না দিদি, খেয়ে আসুন। আমরা দিল্লীর মেয়ে, আমি ঠিক একা একা আসতে পারব।"

কিন্তু নন্দা রাজী হয় না।

সহসা মীরাদি বলে ওঠেন, "তোমাদের কাউকেই এখানে বসতে হবে না, তোমরা দু'জনেই গিয়ে খেয়ে এসো, আমি বাচ্চাকে নিয়ে বসছি। আমি খেতে গিয়ে কি করব? আমি তো আজ ভাত-রুটি কিছুই খাবো না।"

"কেন বলুন তো?" আমি বিস্মিত।

"মীরাদির আজ পূর্ণিমার উপোস। উনি শুধু মিষ্টি খাবেন, আদিকুমারীতেও তাই খেয়েছেন।"

"তাহলে তাই ক'রো।" আমি ডলিকে বলি, "মীরাদি বসুন এখানে, তুমি বাচ্চাকে ওঁর কাছে দিয়ে চলো খেয়ে আসবে। আমরা মীরাদির জন্য দুধ আর মিষ্টি নিয়ে আসব।"

না, মীরাদির কাছে ছেলেকে দিতে কোনো আপত্তি নেই ডলির। অথচ কতক্ষণেরই বা পরিচয় আমার সঙ্গে। আর মীরাদিকে তো সে এইমাত্র দেখল। কিন্তু এটা

যদি বৈষ্ণোদেবী না হয়ে বাঙ্গালোর হতো? ডলি কিছুতেই তার দু-চোখের মণিকে এইভাবে ভিনদেশী এক অপরিচিতার কোলে তুলে দিতে পারত না। তীর্থ মানুষকে কত কাছে নিয়ে আসে!

সদলবলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি পথে। বাঁদিকে একটা বেশ বড় চায়ের দোকান। এখানে দুধ ও মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে। যাবার সময় এখান থেকেই মীরাদির খাবার নিয়ে যেতে হবে।

চায়ের দোকানকে বাঁ দিকে রেখে আমরা সামনে এগিয়ে চলি। পথে ও পথের পাশে অগণিত মানুষ। নানা বয়সের নানা পোষাকের নানা ভাষার মানুষ। পথে মানুষ, দোকানে মানুষ, দাওয়ায় মানুষ। কেবল মানুষ আর মানুষ—প্রাণচঞ্চল আনন্দময় মানুষ।

মানুষ দেখতে দেখতে মানুষের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। আমরা মানুষ হলেও সাধারণত মানুষের ভিড় ভালো লাগে না আমাদের। বরং অনেক সময়েই দম আটকে আসতে চায়। কিন্তু এই মানুষের ভিড় ভালো লাগছে আমার। কেবলই মহাষ্টমীর কলকাতার কথা মনে পড়ছে। অথচ আজ তো এখানে কোনো বাৎসরিক উৎসব নয়। বৈষ্ণোদেবীতে বোধ করি বারোমাসই বাৎসরিক উৎসব লেগে থাকে। বৈষ্ণোদেবী যে মাতৃতীর্থ। মায়ের কাছে আসতে সন্তানের কি তিথিনক্ষত্র দেখবার দরকার হয়? ভাবতে খারাপ লাগছে, বৈষ্ণোদেবী বাঙালীর কাছে আজও তেমন সুপরিচিত হয়ে ওঠে নি। অথচ কাশ্মীরে এত বাঙালী আসেন!

কয়েক পা এগিয়েই পথটা ডাইনে বাঁক নিল, আর বাঁক ফিরেই দেখতে পাই ব্যাপারটা। এ তো দর্শন নয়, এ যে দেখছি মহোৎসব। পথের ডানদিকে মন্দিরের উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল থেকে ফুট চারেক দূরে পথের ওপরে ওপরে একটা শালবল্লার বেড়া—২৬ জানুয়ারী ভিড় ঠেকাতে রেড রোডের ধারে যেমন বেড়া দেওয়া হয়। সেই বেড়া ও পাঁচিলের মাঝে শত-শত নারী-পুরুষ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন:

লাউড স্পীকারে কেউ ক্রমাগত হিন্দীতে বলে চলেছেন—এখন 'পি' গ্রুপের দর্শন চলছে। 'পি' ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপের কোনো যাত্রী সামনের দিকে আসার চেষ্টা করবেন না। কেবল 'কিউ' গ্রুপের যাত্রীরা এঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন।

প্রচণ্ড রোদ, ওপরে কোনো আচ্ছাদন নেই, খুবই গরম, তবু যাত্রীরা নির্বিকার। কোলের শিশু থেকে লাঠি হাতে বুড়ো-বুড়ী পর্যন্ত সবাই আছেন লাইনে। কিন্তু শিশুরা কাঁদছে না, বুড়োরা ব্যস্ত হচ্ছেন না। কারও চোখে-মুখে নেই কোনো কষ্ট কিংবা বিরক্তি। বরং সবার মুখে হাসির পরশ—তৃপ্তির হাসি, সাফল্যের হাসি, আনন্দের হাসি। তাঁরও পালা আসছে। তিনি মায়ের দর্শন পাবেন, পুজো দেবেন, মাকে প্রণাম করবেন। পরম করুণাময়ী মা তাঁর সকল দুঃখ দূর করে দেবেন। তাঁর মনোস্কামনা পূর্ণ হবে।

কিন্তু এখন আর এসব ভাবনা নয়, এখন খেয়ে নেওয়া যাক। আরও অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে। সবে 'পি' গ্রুপের দর্শন শুরু হয়েছে, আমার 'বি' গ্রুপ। পরে এসে আরও ভালো করে দেখা যাবে।

পথের বাঁদিকে পর পর কয়েকটি হোটেল। দেখে-শুনে তারই একটায় উঠে

আসি। বেশ ভিড়। তবু আমরা জায়গা পেয়ে যাই।

বৈষ্ণোদেবী বৈষ্ণবতীর্থ। দেবীর কাছে ভৈরবনাথ মদ-মাংস খেতে চেয়েছিল। দেবী তার দাবী মেনে নেন নি। সুতরাং আমিষ অচল। কিন্তু নিরামিষ হলেও খাবার খারাপ নয়। গরম-গরম ডাল-ভাত তরকারি ভাজা, পাঁপড় আচার এবং দই। সুরিন্দর ও ডলি অবশ্য ভাতের বদলে চাপাটি নিল।

খেয়ে নিয়ে ফিরে চলি ধর্মশালায়। এখনও 'পি' গ্রুপের দর্শন চলেছে। আমাদের দেরী আছে।

সেই চায়ের দোকানে এসে মীরাদির জন্য মিষ্টি নেওয়া গেল। সবই ক্ষীরের মিষ্টি। এখানে ছানার মিষ্টির প্রচলন নেই।

মুশকিলে পড়া গেল দুধ নিয়ে। দোকানী দুধ দিতে রাজী হচ্ছে না। বলছে, "দুধ বড়দের খাবার জন্য নয়, বাচ্চারা খেলে দিতে পারি।"

সঙ্গে সঙ্গে নন্দা বলে ওঠে, "আমরাও বাচ্চার জন্য চাইছি। এই যে বাচ্চা।" সে তোতাকে দেখায়।

দোকানীও দু-চোখ দিয়ে তোতাকে দেখে অর্থাৎ পরীক্ষা করে। তারপরে তাকেই জিজ্ঞেস করে, "কেয়া খোকাবাবু, দুধ পীয়েগা?"

তোতা মায়ের দিকে তাকায়। বেচারী বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। নন্দা বাংলায় বলে, "বলো, খাবে।"

"আবার কি খাবো মা? এই তো খেয়ে এলাম।" তোতা মায়ের কথা মেনে নিতে পারে না।

নন্দা ধমক লাগায় ছেলেকে, "যা বলছি বল, বল যে খাবে।"

"বলো না কি খাবো?" তোতা তবু জিজ্ঞেস করে।

দোকানী বোধহয় বুঝতে পারে তার প্রশ্ন। তাই উত্তর দেয়, "দুধ। দুধ পীয়েগা খোকাবাবু?"

"নেহী।" তোতা সোজাসুজি হিন্দীতে জবাব দেয়।

কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। কেন নন্দা মিথ্যে কথা বলতে গেল? দুধ না হলে মীরাদির কি আর একটা অসুবিধে হতো? ছি ছি, ভারী লজ্জার ব্যাপার হলো।

না, শেষ পর্যন্ত লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। এবং দোকানী নিজেই মুক্তি দেয়। সে হাসতে হাসতে তোতাকে বলে, "পীয়েগা, খোকাবাবু জরুর পীয়েগা! দুধ পীনা আচ্ছা হ্যায়।" সে ভানুর দিকে হাত বাড়ায়। দোকানী ধরে নিয়েছে, অন্য ছেলে-মেয়েদের মতোই তোতা দুধ খেতে চাইছে না। অথচ তার দুধ খাওয়া একান্তই দরকার।

ভানু ফ্লাস্কটা এগিয়ে ধরে। দোকানী দুধ দিতে দেতে তোতাকে আবার বলে, "দুধ পী লেও বেটা। প্রেমসে পী লেও।'

আমরা দুধ নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সুরিন্দর বলে, "দাদা, কম্বল নিতে হবে।"

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বলি, "বেশ, চলো নিয়ে আসা যাক্।"

"আপনি ধর্মশালায় যান শঙ্কুদা!" করুণ বলে, "আমি সুরিন্দরজীর সঙ্গে যাচ্ছি।"

আপত্তি করার কিছু নেই। ওর ইচ্ছে হয়েছে, যাক্ ঘুরে আসুক। করুণ ও

সুরিন্দর চলে যায়। আমরা এগিয়ে চলি ধর্মশালার দিকে। হঠাৎ তোতা বলে ওঠে, "আমি কিন্তু দুধ খাবো না মা, আগেই বলে দিলাম।"

নন্দা আবার ধমক লাগায়, "চুপ করো! তোমাকে দুধ খেতে হবে না।"

"তাহলে দুধ নিলে যে বড়!" তোতা বোধহয় সুসংবাদটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

নন্দা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "তোমার জন্য নিই নি, মীরাদি খাবেন।"

"কি মজা, কি মজা, মীরামাসি দুধ খাবে! আমি খাবো না!" সে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলে।

আমি ভাবি অন্য কথা। ভাবি—কাজটা বোধ করি ঠিক হলো না। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী আসেন এখানে। তাঁদের অধিকাংশই নিরামিষভোজী! তাঁরা দুধ খান। কিন্তু এত মানুষের দুধের যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে গরু-মোষ কিছুই নেই। নিচের থেকে দুধ বয়ে আনতে হয়। তাই যাত্রীদের মঙ্গলের জন্য দোকানী নিয়ম করেছে—কেবল শিশুদের জন্যই দুধ বিক্রি করবে। কারণ দুধ না পেলে তাদের কষ্ট হবে। মাতৃতীর্থে বসে মিথ্যে কথা বলে আমরা সেই শিশুর খাদ্য কেড়ে নিয়ে এলাম।

কিন্তু এখন এই অনুশোচনা অর্থহীন। সুতরাং নতমস্তকে নেমে আসি ধর্মশালায়। ঘরে এসে দেখি—মীরাদি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন আর ডলির ছেলে দিব্যি তাঁর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্তান মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। সংসারে এর চেয়ে বড় আশ্রয় আর কী হতে পারে? ডলির ছেলে সেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে।

ওরা অবুঝ, তবু মায়ের পরশ বুঝতে পারে। ডলির ছেলে মীরাদির মাঝে মাতৃত্বের সেই সুমধুর স্পর্শ লাভ করেছে—যে মাতৃত্বের কোনো দেশ নেই, ভাষা নেই, জাতি নেই, যে মাতৃত্ব অনাবিল ও অনন্ত, সীমাহীন ও শাশ্বত। আর তাই আমরা ছুটে এসেছি এখানে—বৈষ্ণবী মায়ের এই পরমাশ্রয়ে। ডলির ঐ শিশুপুত্রের মতো। আমরাও মায়ের কোলে ঠাঁই নিয়েছি। আমরাও নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ, আমরাও আনন্দিত—জয় মাতাদী!

।। নয় ।।

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র-দুঃখ-ভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকার-করণায় সদার্দ্রচিত্তা।

"দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকবানগণ আপনার কথা চিন্তা করলে তাঁদের সুবুদ্ধি দান করেন। হে দারিদ্র্য-হারিণি, হে দুঃখ-বিনাশিনি, হে ভয়-নাশিনি, আপনি সকলের কল্যাণ বিধানের জন্য সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত, আমাদের আপনি ছাড়া আর কে আছেন?"

ওদের বিশ্রাম করতে বলে একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সেই সঙ্গে একবার মন্দিরের অবস্থাটি দেখে আসব। অবশ্য মন্দিরের অবস্থা দেখতে মন্দিরে যাবার দরকার পড়ে না। বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেই মাইকের ঘোষণা কানে আসে। কোন্ গ্রুপের দর্শন চলেছে, সর্বদা মাইকে বলা হচ্ছে। এখন 'ডাব্‌লু' চলেছে। তার মানে আমাদের পালা আসতে দেরি আছে।

ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি করুণ মুখে মুখে চণ্ডী থেকে আবৃত্তি করে বাংলায় অর্থ বলে দিচ্ছে। মীরাদি ও নন্দা মনোযোগ সহকারে শুনছে আর তাদের সঙ্গে সুরিন্দর আর ডলিও নিঃশব্দে করুণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা, ওরা কি করুণের কথা বুঝতে পারছে? কিন্তু ওরা যে বাংলা জানে না।

আমিও বসে পড়ি ওদের পাশে। করুণ বলে চলে—

'শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

"হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণা এবং সকলের দুঃখ-নাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।" করুণ বিস্ময়কর স্মরণশক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় বহু বছরের। একাধিক বইতে আমি একথার উল্লেখ করেছি। সুতরাং ওর এই মৌখিক চণ্ডীপাঠ শুনে আমি অবাক হই নি, অবাক হচ্ছেন মীরাদি, অবাক হচ্ছে নন্দা ডলি ও সুরিন্দর। তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে করুণের দিকে তাকিয়ে আছে। করুণ আবৃত্তি করে চলেছে—

'রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥'

"দেবি, আপনি সন্তুষ্ট হলে সকল প্রকার রোগ বিনাশ করেন। আবার রুষ্টা হলে অভীষ্ট বস্তুসমূহ নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদের বিপদ স্থায়ী হয় না। যাঁরা আপনার চরণাশ্রিত, তাঁরা অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হন।"

করুণ নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ চণ্ডীপাঠ চালিয়ে যেত, আমাদেরও শুনতে ভালই লাগছিল। কিন্তু তাকে থামতে হলো। একটি যুবক ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তার দলের লোকদের কাছে এসে চিৎকার করে বলে উঠল, "এক্‌স গ্রুপের দর্শন শুরু হবে এখন।"

আর যায় কোথায়! প্রৌঢ় কর্তা উঠে বসে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। যাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা চোখ মেললেন। যাঁরা শুয়েছিলেন, তাঁরা উঠে বসলেন।

কর্তা আবার হাঁক ছাড়লেন, "এখুনি দর্শন শুরু হবে, জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখে শিগ্‌গীর মন্দিরে চলো।"

একটি ছোট শিশু ঘুমিয়েছিল, তার মা তাকে হঠাৎ কোলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বাচ্চাটি কেঁদে উঠল। কিন্তু তার সেই কান্নাকে ছাপিয়ে কর্তার চিৎকার কানে আসে, "তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও সব। শিগ্‌গীর মন্দিরে চলো, নইলে দর্শন হবে না।"

"জিনিসপত্র তো সব এখানেই রেখে যাবেন?" সেই যুবকটি কর্তাকে প্রশ্ন করে।

"এখানে রেখে যাবো! কার কাছে?" কর্তা ক্ষিপ্তকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করেন।
"কেন, আমাদের তো দু'জন পিট্টু রয়েছে।" যুবকটি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়।

"না, না, ওসব লোকের ওপর ভরসা নেই। মালপত্র সব ক্লোক্রুমে রেখে যেতে হবে।"

কর্ত্রী অর্থাৎ কর্তার স্ত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে তিনি কর্তাকে বললেন, "তুমি তাহলে পিট্টুদের নিয়ে জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করো, আমরা মন্দিরে চলে যাচ্ছি।"

কর্তা কিঞ্চিৎ শান্তস্বরে বলে, "জিনিসপত্রগুলো ঠিকমত রেখে না গেলে খোয়া যেতে পারে।"

"যাকগে।" কর্ত্রী ধমক লাগান, "জিনিসপত্রের জন্য তোমার যদি এতই মায়া, তাহলে তীর্থে আসা কেন? সবাই পিট্টুদের বিশ্বাস করে মালপত্র রেখে যেতে পারছে, আর তুমি পারছ না?"

কর্তা কোনো প্রতিবাদ করেন না।

তাঁর কিশোরী কন্যা বলে, "মা যা বলছে, তাই কর বাবা! পিট্টুদের এখানে বসিয়ে রেখে চলো আমরা দর্শন করে আসি।"

তবু ভদ্রলোকের ভয় কাটে না। তিনি পায়ে পায়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের কোন্ গ্রুপ্?"

"বি।" আমি উত্তর দিই।

"তাহলে তো আপনারা এখানে আছেন?"

আমি মাথা নাড়ি।

ভদ্রলোক বলেন, "আমাদের মালগুলোর দিকে একটু নজর রাখবেন। মানে এই পিট্টুদের তো পুরো বিশ্বাস করা যায় না, বুঝতেই তো পারছেন।"

"ঠিক আছে।" আমি বলি, "আমরা আপনাদের মালপত্র দেখব।"

এবারে বোধ করি তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পিট্টুদের ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। কর্ত্রী পুত্রবধূ ও কিশোরী কন্যা পুজোর জিনিসপত্র হাতে নেয়। যুবকপুত্র তার শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে চলে। চলতে চলতে কর্ত্রী কর্তাকে আবার বলেন, "এতবার এখানে এসেছো, তুমি জানো এখানে কিছু চুরি হয় না, তবু তোমার চুরির ভয় গেল না। মা-বৈষ্ণোদেবী কবে যে তোমাকে সুমতি দেবেন, বুঝতে পারছি না।"

কর্তা নিঃশব্দে কর্ত্রীকে অনুসরণ করেন। তাঁরা সারি বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আর আমরা সমস্বরে হেসে উঠি। পিট্টুরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অথচ ওরা বুঝতে পেরেছে কর্তা ওদের বিশ্বাস করেন না! যাত্রীদের সঙ্গে থাকতে ওদের এসব গা-সহা হয়ে গিয়েছে। যাত্রীরা অনেকেই ওদের বিশ্বাস করেন না, তবু ওদের বিশ্বস্ত হতে হয়।

ওঁরা চলে যাবার পরে ঘরখানিতে শান্তি ফিরে আসে। করুণ আবার চণ্ডীপাঠ শুরু করে। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াই। বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে বড় রাস্তায় আসি।

সামনেই সেই রেস্তোরাঁ। পরে সবার সঙ্গে চা খাওয়া যাবে, এখন একা-একা এক কাপ খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু খাবো বললেই তো চা পাওয়া যায় না বৈষ্ণোদেবীতে। আর কেবল বৈষ্ণোদেবীর কথাই বা বলি কেন? ভারতের যে-কোনো জনবহুল তীর্থে যেমন হয়ে থাকে, এখানেও চায়ের জন্য তেমনি কাড়াকাড়ি লেগে আছে সর্বদা। যাই হোক, বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে এক কাপ চা পাওয়া গেল।

'লাইন' সেই একই রকম। কেবল মানুষগুলো পালটে গিয়েছে। যে-কোনো লোক যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে এখানে এলে এই একই লাইন দেখতে পাবেন। এই একই ব্যস্ততা, একই উৎকণ্ঠা, একই একাগ্রতা।

লাইনকে ডানদিকে রেখে আমি পথ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। আমার বাঁদিকে দোকানের সারি। অধিকাংশই খাবারের দোকান। আর সব দোকানে তেমনি ভিড়।

প্রধান তোরণের সামনে আসি। মোটেই মন্দিরতোরণের মতো নয়। বড় বাড়ির প্রবেশপথ যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেই রকম। কেবল বৈষ্ণোদেবীর দু'খানি ছবি ও একখানি ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো রয়েছে। তাতে লেখা আছে এখন কোন্ গ্রুপের দর্শন চলেছে এবং এই গ্রুপে কতজন যাত্রী আছেন? অবশ্য পাশের দোতলায় দাঁড়িয়ে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক ক্রমাগত মাইকে বলে যাচ্ছেন—এখন 'এক্স' গ্রুপের দর্শন চলেছে। 'ওয়াই' গ্রুপ পেছনে দাঁড়িয়ে যান।

আমাদের প্রতিবেশী পরিবারটি কিন্তু তাড়াহুড়ো করে এসে বেশ সামনের দিকেই জায়গা পেয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সমীচিন হবে না আমার পক্ষে। আমাকে এখন এখানে দেখলেই কর্তাটি ভেবে বসবেন, আমি তাঁর মালপত্র পাহারা না দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি। সুতরাং তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। ফলে তাঁর তীর্থদর্শনই বৃথা হয়ে যাবে।

তাই তাড়াতাড়ি তোরণ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবনাকে বিসর্জন দিতে পারি না। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সংসারে সাধারণতঃ কর্ত্রীদেরই জিনিসপত্রের ওপর মায়া বেশি হয়ে থাকে। এখানে কর্ত্রী সে মায়া কাটিয়ে উঠেছেন, অথচ কর্তা কিছুতেই মায়ামুক্ত হতে পারছেন না।

যাক্ গে ভদ্রলোকের ভাবনা। তার চেয়ে মন্দিরাঞ্চলটিকে একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। মন্দিরতোরণ পেরিয়েও বাঁদিকে কয়েকটি দোকান। তবে এখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, অনেকটা উঠোনের মতো। এদিকটায় তেমন ভিড় নেই। কেবল দু-চার দল যাত্রী এখানে-ওখানে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছেন। এখান থেকে মন্দিরের বাইরেটা বেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে।

এখানে মন্দির মানে গুহা আর তার বাইরেটা হলো শ্বেতপাথরে বাঁধানো একফালি খোলা ছাদ। ছাদটির একদিকে অর্থাৎ এই বাজারের দিকে কোমরসমান রেলিং, উল্টোদিকে পাহাড় অর্থাৎ গুহামন্দির। অপর দুটি দিকে দরজাযুক্ত উঁচু পাঁচিল। ছাদের একাংশে চন্দ্রাতপ টাঙানো আর অন্য অংশটিতে অসংখ্য পতাকা ও ঘণ্টা ঝুলছে। ছাদটিকে সংক্ষেপে নাটমন্দির বলা যেতে পারে।

গুহামন্দির দেখা না গেলেও গাছপালায় ছাওয়া সবুজ পাহাড়টিকে দেখা যাচ্ছে

এখান থেকে। তারই উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ফিরে চলি ধর্মশালার দিকে।

প্রধান তোরণ পেরিয়ে আসি। দর্শনার্থীদের লাইন ছাড়িয়ে মূলপথে এসে দাঁড়াই। বাড়ি-ঘরের ফাঁক দিয়ে নিচের উপত্যকাটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বহুদূরে ধূসর পাহাড়ের সারি—একটি নয়, অসংখ্য। সেখানে অনুক্ষণ মেঘ আর কুয়াশার খেলা চলেছে। দূর থেকে কাছে আসার পথে পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে ধূসর থেকে কালো হয়েছে। তারপরে কালো আস্তে আস্তে সবুজে রূপান্তরিত। ফিকে সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে ঘন সবুজ উপত্যকা। সেই অসমতল সবুজের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি আঁকাবাঁকা পাহাড়ী নদী।

উপত্যকায় বুনো ঝোপঝাড়ই বেশি। তবে কিছু ক্ষেতও রয়েছে। উপত্যকার শেষে অর্থাৎ এই পাহাড়টির পাদদেশে প্রচুর বড় বড় গাছপালা। পাহাড়ের গা বেয়ে তারা উঠে এসেছে এখানে। আর এখানেই বা বলি কেন? উঠে গিয়েছে ডাকবাংলো ছাড়িয়ে একেবারে পাহাড়টির ওপর পর্যন্ত। আমরা রয়েছি পাহাড়ের মাঝখানে। এখানেই দোকানপাট ধর্মশালা ও মন্দির। এর ওপরে আবার সবুজের সমারোহ। তাই বৈষ্ণোদেবীকে তখন দূর থেকে অমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সবুজ বাগানের বুকে কয়েকটি লাল সাদা আর সোনালী ফুল ফুটে রয়েছে।

উপত্যকার দিক থেকে চোখ ফেরাই, পথের দিকে তাকাই। ওখানে সবুজের সমারোহ আর এখানে মানুষের মেলা। আমার সামনে পেছনে ও পাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। মানুষ যাচ্ছে আর মানুষ আসছে। আগেই বলেছি দিল্লী পাঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল আর জম্মুর মানুষই বেশি। তবে মাঝে মাঝে মাড়োয়ারী পরিবার দেখতে পাচ্ছি। সবচেয়ে বিস্ময়কর, পথ চলতে চলতে কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই বয়স্ক। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে এখানে চলে এসেছেন।

ওঁদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ অফিস পর্যন্ত আসি। ওঁদের দর্শন হয়ে গেছে। ওঁরা এখন কাটরা ফিরে যাচ্ছেন। আমরা কখন ফিরতে পারব কে জানে!

আবার ফিরে চলি ধর্মশালার দিকে। সেই একই কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকি—কখন আমাদের পালা আসবে। এখনও যে 'একস্' গ্রুপের দর্শন চলেছে। মাঝখানে তিনটি গ্রুপ, প্রতি গ্রুপে আড়াইশ' যাত্রী। তাঁদের পরে আমাদের পালা। প্রায় পাঁচটা বাজে। সন্ধ্যারতির আগে আমাদের পালা আসবে কি? নইলে সেই রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। সন্ধ্যারতির জন্য আটটা থেকে দু-ঘণ্টা দর্শন বন্ধ থাকবে।

যখুনি পালা আসুক, দর্শন করেই কাটরা রওনা হতে হবে। গতকাল ঘুমের মায়ায় চড়াই ভাঙতে রাজী হই নি, কিন্তু আজ রাতে না ঘুমিয়ে উতরাই পেরোতে হবে।

উতরাই পথ। নন্দা আর মীরাদি হেঁটে যেতে পারবেন। কিন্তু তোতা আর মহুয়ার পক্ষে অত রাতে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। ওদের জন্য দু'জন পিট্টু দরকার। আসার পথে ওরা পিট্টুর কাঁধে চড়তে রাজী হয় নি, ঘোড়ায় এসেছে। কিন্তু রাতে ঘোড়া চলবে না। একে উতরাই পথ, ঘোড়ার পা ফসকাবে, তার ওপরে ওরা পড়বে ঘুমিয়ে।

অথচ পিট্টু কোথায় পাই? ঘোড়া দেখলে চেনা যায়। কিন্তু এত মানুষের মাঝে

কে পিট্টু তা বুঝব কেমন করে? দোকানে দোকানে জিজ্ঞেস করি, পথের পুলিশের সাহায্য চাই, ধর্মশালার অফিসে এসে খোঁজ করি—পিট্টু কোথায় পাবো? কেউ কোনো হদিস দিতে পারে না। সবাই বলে—দেখুন খুঁজে, পেয়ে যাবেন।

খুঁজি, কিন্তু পাই না। এবং খোঁজাখুঁজির পরে বুঝতে পারি, পিট্টু পাওয়া যাবে না; কারণ এখানে কোনো পিট্টু বাস করে না। আসাযাওয়ার চুক্তি করে ওরা নিচের থেকে আসে। যেমন এসেছে সুরিন্দ:রের সঙ্গে। তারা তো কেউ বেকার নয়।

মুশকিলে পড়া গেল। মহুয়ার আর তোতার পক্ষে হেঁটে কাটরা ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টকর। কিন্তু পিট্টু না পাওয়া গেলে কি করা যাবে?

না, এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই। আগে ভালোয় ভালোয় দর্শন হয়ে যাক। তার পরে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করা যাবে।

ফিরে আসি ধর্মশালায়। সে কি! এরা যে দিব্যি দিবানিদ্রা দিয়েছে। কেবল ডলি একপাশে বসে আছে। সে যে মা! ছেলে মাকে ঘুমোতে দেয় নি। মা ছেলেকে কোলে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে রয়েছে তাকিয়ে। সন্তানের সুখের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে মায়েরা যে সর্বদা সুখী হয়!

আমাকে দেখে ডলি মৃদু হাসে। তার পরে বলে, "দাদা, বসুন।" সতরঞ্চির ওপরে বসে পড়ি।

ডলি আবার বলে, "ঘুরে এলেন?"

আমি মাথা নাড়ি।

ডলি বলে, "আমারও ঘুরতে খুব ভালো লাগে। বিয়ের পরে আমরা ঘুরেছিও অনেক।"

"কোথায় গিয়েছো?"

"বম্বে-পুনা-গোয়া, কলকাতা-পুরী, মাদ্রাজ-পণ্ডিচেরী-বাঙ্গালোর-কন্যাকুমারী। কিন্তু এবারে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল।"

"কেন বল তো?"

একটু হেসে ছেলেকে দেখিয়ে বলে, "একে নিয়ে কি অত ঘোরাঘুরি করা সম্ভব?"

"এই যে এখানে এলে?"

"এখানে তো মানত আছে, আসতেই হবে। নইলে এতটুকু ছেলেকে নিয়ে কি আর বেড়ানো যায়, না বেড়ানো উচিত?" একবার থামে সে, তার পরে একটু হেসে আবার বলতে থাকে, "সবাই বলে, আরেকটু বড় হলে বেড়াতে পারব। কিন্তু আমি কথাটাকে মেনে নিতে পারি না।"

"কেন বল দেখি?"

"আরেকটু বড় হলেই যে ওকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। তখন তো আমাদের বাইরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

কথাটা সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সত্য। তাছাড়া ওকে কোনো সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। বেড়াতে না পারার জন্য ডলি মোটেই দুঃখিত নয়। বরং পুত্রগর্বে গরবিনী মা মনে মনে সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরম শান্তি লাভ

করছে।

সুতরাং প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বলি, "তোমাদের তো বিকেলের চা খাওয়া হয় নি?"

ডলি আবার একটু হাসে। বলে, "ওঁরা যে সবাই ঘুমোচ্ছেন। সত্যি বলতে কি কথাটা আমি বলব বলব করেও বলতে পাচ্ছিলাম না।"

"না, না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? এখনই চা না খেলে কখন খাবে? ভানুকে ডেকে তুলি। আর সে ডাকাডাকিতে সবারই ঘুম ভেঙে যায়। ওরা একে একে উঠে বসে।

সুরিন্দর বলে, "আমি চা নিয়ে আসছি দাদা!"

ভানু প্রতিবাদ করে, "না, না, আপনি বসুন, আমি নিয়ে আসছি।" সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

চায়ের সঙ্গে সুসংবাদ নিয়ে আসে ভানু 'ওয়াই' গ্রুপের দর্শন প্রায় শেষ হয়ে এলো, একটু বাদেই 'জেড্' গ্রুপ আরম্ভ হবে।

ঘড়ি দেখি, সবে সাড়ে পাঁচটা। এভাবে চললে সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমাদের পালা এসে যাবে। হে মা-বৈষ্ণোদেবী, তাই যেন হয়, সন্ধ্যারতির আগেই যেন আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। আমাদের যে আজই কাটরা ফিরে যেতে হবে। আমরা সারা রাত ঘুমোতে চাই না, অন্তত শেষ রাতটুকু তুমি আমাদের একটু ঘুমোতে দিও মা!

মনে মনে হাসি পাচ্ছে আমার। সবার কাছে সর্বদা বলে বেড়াই—তীর্থের দেবতাদের কাছে আমার কোনো কামনা নেই। আজও তো এখানে আসার পথে সেই পাঞ্জাবী বৃদ্ধাকে বলেছি—আমরা মায়ের কাছে কিছু চাইতে আসি নি, শুধু তাঁকে দর্শন করতে এসেছি। অথচ দেখো, দিন না ফুরোতেই তোমার কাছে প্রার্থনা পেশ করে বসলাম। কি করব বলো? সংসারে যে আমরা সবাই কাঙাল। কেউ সজ্ঞানে, কেউ অজ্ঞানে। কেউ অর্থের কাঙাল, কেউ যশের কাঙাল, কেউবা ভালোবাসার। মাগো, আমি শুধু ভালোবাসার কাঙাল হয়েই তোমার সংসারে বেঁচে থাকতে চাই। আর তাই তীর্থের ডাক আমাকে এমন আকুল করে তোলে।

আমাদের সেই প্রতিবেশী চলে গিয়েছেন। দর্শন করে ফিরে এসে মালপত্র সব অক্ষত দেখে কর্তাটি নাকি খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি ডলিদের বার বার 'মুবারকবাদ' জানিয়েছেন। তার পরে সবাইকে সহ নিশ্চিন্তে বিদায় নিয়েছেন। সেই থেকে জায়গাটা খালি পড়ে আছে।

কিন্তু এ যে মানুষের মুক্তিতীর্থ। এখানে তো কোনো জায়গা বেশিক্ষণ খালি থাকে না।

একদল চলে যায়, আরেকদল এসে তাদের জায়গা দখল করে নেয়। এখানেও তাই হলো। একদল যাত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। এঁদের দলেও ছ'-সাতজন এবং অনেক লট-বহর। যথারীতি কম্বল আর সতরঞ্চি এলো। কর্তা স্বয়ং 'বিস্তারা' বিছানো 'সুপারভাইজ' করলেন। বলা বাহুল্য, এঁদের সঙ্গেও একজন পিট্টু আছে আর রয়েছে রতন—বোধকরি কর্তার খাস খানসামা।

না, কর্তা নয়, রতন তাঁকে লালাজী বলে ডাকছে। অথচ ভদ্রলোকের পরনে

প্যান্ট-শার্ট, বয়স বছর পঞ্চাশেক, বেশ 'স্মার্ট' চেহারা। অর্থাৎ লালাজী বললে আমাদের মানসচক্ষে যে চেহারাটি ফুটে ওঠে, তিনি মোটেই তেমনটি নন। কিন্তু তাঁর খাস খানসামা যখন লালাজী বলে সম্বোধন করছেন, তখন আমার তাঁকে লালাজী ভাবতে আপত্তি কোথায়?

লালাজীর সঙ্গে দুটি তরুণ, একটি তরুণী ও একটি কিশোরী এবং তাঁর স্ত্রী। তিন তরুণ-তরুণীও প্যান্ট্-শার্ট পরেছে আর কিশোরীটির পরনে সালোয়ার-কামিজ। কেবল মিসেস লালাজী শাড়ী পরিহিতা।

লালাজীর বাড়ি বিহার উত্তরপ্রদেশ দিল্লী হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের যে-কোনো জায়গায় হতে পারে। তিনি হিন্দী বলছেন। কিন্তু নিবাস ও ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। শুধু বুঝতে পারছি লালাজী বেশ অবস্থাপন্ন সৌখীন মানুষ।

বিছানাপত্র হয়ে যাবার পরে ভদ্রলোক বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। স্ত্রী ও মেয়েদুটিকেও বসতে বললেন। তার পরে ছেলেদের আদেশ করলেন, "যা, চা-জলখাবার নিয়ে আয়।"

বিনা বাক্যব্যয়ে পুত্ররা নিষ্ক্রান্ত হয়, রতন দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধকরি নতুন কোনো আদেশের অপেক্ষায়।

কিন্তু না, তিনি কোনো আদেশ করেন না। তাঁর চোখ পড়ে আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?"

উত্তর দিই, "কলকাতা থেকে।"

"কলকাত্তা! বেশ বেশ, খুব ভালো। আসবেন, বছর বছর আসবেন। দেখবেন মা-লক্ষ্মী আপনাদের কৃপা করবেন।"

মা-লক্ষ্মী কৃপা করবেন! বিস্মিত হই। বৈষ্ণোদেবী তো মা-লক্ষ্মী নন। তিনি কল্কি অবতারের শক্তি আদিকুমারী—তিন মহাশক্তির মিলিত শক্তি।

কথায় কথায় কথাটা বলে ফেলি তাঁকে।

লালাজী হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, "বাবুজি! আমার কাছে, শুধু আমার কাছে কেন, যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছে বৈষ্ণোদেবী সরস্বতী কিংবা কালী নন, শুধুই লক্ষ্মী। তিনি ধন দান করেন। তাই তো ব্যবসায়ীরাই বেশি আসেন এখানে, বছর বছর আসেন।"

কথাটা জানা ছিল না আমার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লালাজী ঠিকই বলেছেন। গতকাল থেকেই দেখছি এ পথে ব্যবসায়ীদের ভিড় বেশি। এবং ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ অকারণে সময় ও অর্থ অপচয় করেন না। সুতরাং বৈষ্ণোদেবীতে অধিকাংশ যাত্রী লক্ষ্মীর কৃপালাভ করতে আসেন। এবং যাঁরা বছর বছর যাত্রায় আসেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করে থাকেন।

কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মীর কথা নিয়ে বেশি ভাবনার সুযোগ পাওয়া গেল না। সহসা ভানু এসে খবর দিল, "জেড্ গ্রুপের দর্শন শুরু হয়ে গিয়েছে। 'এ' গ্রুপ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।"

"আমাদেরও এবারে তাহলে লাইনের কাছে যাওয়া দরকার।" নন্দা বলে ওঠে, "এ গ্রুপের দর্শন শুরু হলেই আমরা তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ব। তাহলে আমরা 'বি' গ্রুপের প্রথম দিকেই দর্শন করে নিতে পারব।"

কথাটা ঠিকই বলেছে নন্দা। এক গ্রুপের পরে আরেক গ্রুপকে দর্শন করতে হয় কিন্তু স্লিপ-এর 'সিরিয়াল' নম্বর বিচার করা হয় না। আমাদের স্লিপ নম্বর ১৬১ থেকে। তার মানে এই নয় যে 'বি' গ্রুপের ১৬০ জনের পরে আমাদের মন্দিরে ঢুকতে হবে। আমরা আমাদের গ্রুপের ১ নম্বর হয়েও ভেতরে ঢুকতে পারি।

অতএব সুরিন্দর আর ডলির কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। ওদের 'সি' গ্রুপ, কিন্তু ওরা আজ রাতে এখানেই থাকবে, কাল কাটরা ফিরবে।

যথারীতি ঠিকানা বিনিময় হয়।

ডলি বলে, "দাদা, দিল্লী এলে আমাদের বাড়িতে আসবেন, আমরাও কলকাতা গেলে দেখা করব।"

"নিশ্চয়ই। খুব খুশি হব।" ডলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও বলে উঠি।

অবশ্য জানি, এসব কথা অর্থহীন। কবে দিল্লী যাওয়া হবে জানি না! যখন সত্যি যাবো, তখন ডলির এই ঠিকানা হয়ত হারিয়ে যাবে। ডলিরা কলকাতায় গেলেও আমার বাড়িতে যাবে বলে মনে হয় না। কেবল বলতে পারি—আমার বহুদিন মনে থাকবে ডলি আর সুরিন্দরের কথা। মনে থাকবে আজকের এই পথের পরিচয়ের আত্মীয়তায় পরিণত হবার কথা, যে পরিণতি কেবল তীর্থপথের নিজস্ব সম্পদ। আর তাই তীর্থের ডাক আমাকে এমন আকুল করে তোলে।

।। দশ ।।

কম্বল-সতরঞ্চি ফেরত দিয়ে টাকা পেতে দেরি হলো না। কিন্তু বিপদে পড়লাম আমাদের মালপত্র ক্লোক-রুমে জমা দিতে এসে। না, ক্লোক-রুম খোলা আছে, দিনরাত খোলা থাকে। আমরা মালপত্র নিয়ে ভেতরে এলাম। বৃদ্ধ কর্মচারী জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের কোন্ গ্রুপ?"

"বি।"

"তাহলে এখুনি মাল নিয়ে এসেছেন কেন?"

"আজ্ঞে!" তাঁর প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

তিনি আবার বলেন, "সবে তো 'জেড্' গ্রুপের দর্শন চলেছে, 'এ' গ্রুপের দর্শন আরম্ভ হয়ে গেলে মাল নিয়ে আসবেন। এখন বাইরে যান।"

সবিনয়ে বলি, "আমাদের আজ রাতেই কাটরা ফিরতে হবে, তাই 'বি' গ্রুপের প্রথম দিকে লাইন দিতে চাইছি।"

"বেশ তো, গিয়ে লাইন দিন।"

"আজ্ঞে মালপত্র নিয়ে..."

"দু'জন এখানে থাকুন, বাকিরা গিয়ে লাইনে দাঁড়ান। মাল জমা দিয়ে সেই দু'জন গিয়ে তাঁদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াবেন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মালপত্র এনে ক্লোক-রুমের বাইরে পথের ওপর জমা করি। মীরাদি নন্দা মহুয়া ও তোতাকে নিয়ে করুণ লাইন দিতে চলে যায়। আমি ও ভানু মালপত্র নিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাইকের ঘোষণা

শুনতে থাকি। মন্দিরের মাইক থেকে ক্রমাগত ঘোষণা করা হচ্ছে—এখন 'জেড্' গ্রুপের দর্শন চলেছে। 'এ' গ্রুপের যাত্রীরা এঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে যান।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা শুনি আর ভাবি—আশ্চর্য সুন্দর ব্যবস্থাপনা এঁদের। এত মানুষ প্রতিদিন দর্শন করছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র ঠেলাঠেলি অথবা হৈ-চৈ নেই। কাটরায় সেই অনুমতিপত্র নেওয়া থেকে এখানে দর্শন পর্যন্ত সর্বদা সর্বত্র একটা আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করছে। সেই নিয়মানুবর্তিতার জন্যই আমাদের এখানে এভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কারণ হাজার হাজার যাত্রী সর্বদা এখানে দর্শনের অপেক্ষায় বসে থাকেন, অথচ ক্লোক-রুমে বড় জোর তিন-চারশ' যাত্রী মালপত্র রাখা যেতে পারে। 'জেড্' গ্রুপের যাত্রীরা দর্শন করে ফিরে এসে মালপত্র ফেরত নিতে আরম্ভ করলে আমাদের মাল রাখার জায়গা হবে। তাই এই নিয়ম—'এ' গ্রুপের দর্শন আরম্ভ হলে 'বি' গ্রুপের মাল নেওয়া হবে।

মনে পড়ছে শ্রাবণ আর চৈত্র মাসের তারকেশ্বরের কথা। অব্যবস্থা আর অনিয়মের চূড়ান্ত সেখানে। অথচ তারকেশ্বর যাত্রা এখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমরা কি বৈষ্ণোদেবীর মতো নিয়মানুবর্তিতার প্রচলন করতে পারি না তারকেশ্বরে?

যথাসময়ে মালপত্র জমা দিয়ে আমি ও ভানু মন্দিরের সামনে এলাম। বলা বাহুল্য এখন 'এ' গ্রুপের দর্শন শুরু হয়ে গেছে। সবে ছ'টা বেজেছে। আশা করছি সাতটার মধ্যে আমরা দর্শন করতে পারব।

নন্দারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বেড়া ডিঙিয়ে আমরা দু'জনে ওদের সঙ্গে যোগ দিই। পেছনের যাত্রীরা কেউ কোনো আপত্তি করেন না। করুণ তাঁদের বলে রেখেছিল আমাদের কথা।

না বলে রাখলেও বোধ করি কেউ ঝগড়া করতেন না। সেই দুপুর থেকে তো বেশ কয়েকবার এখানে এসেছি কিন্তু কখনও লাইনে কাউকে ঝগড়া করতে দেখি নি।

শুধু ঝগড়া নয়, হৈ-চৈ চেঁচামেচিও নেই। লাইনে বেশ চাপ, অনেকের কোলেই ছোট ছোট বাচ্চা, এখনও রোদ রয়েছে। বেশ গরম। তবু বাচ্চাগুলো পর্যন্ত কান্নাকাটি করছে না। কেবল মাঝে মাঝে বড়রা বলে উঠছেন—জয় মাতাদী।

আর মন্দিরের মাইক ঘোষণা করে চলেছে—"এখন 'এ' গ্রুপের দর্শন আরম্ভ হয়েছে। অন্য কোনো গ্রুপের কেউ সামনের দিকে আসার চেষ্টা করবেন না। 'এ' গ্রুপের যাত্রীরা 'সিঙ্গল' লাইন করে আস্তে আস্তে সামনে আসুন। 'বি' গ্রুপের যাত্রীরা ইচ্ছে করলে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন। জয় মাতাদী!"

এঁরা সব কথার শেষে বলেন—জয় মাতাদী।

দু'জন ঘোষক। প্রধান তোরণের পাশে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পালা করে ঘোষণা করছেন। একজনের পরনে খাঁকি প্যান্টশার্ট, আরেকজন গেরুয়াধারী। দুজনের পোশাকই বোধ করি মন্দিরের ইউনিফর্ম।

গেরুয়াধারী ঘোষকের একহাতে একখানি বৈষ্ণোদেবীর ছবি রয়েছে। তিনি ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে বার বার ছবিখানি দেখছেন আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন। বোধহয় মাতৃবন্দনা করছেন।

ভক্ত যাত্রীরাও সমানে মাকে ডেকে চলেছেন। সেই সঙ্গে বলছেন কামনা-বাসনার

কথা। কেউ বলছেন—মাতাদী, আমার ছেলেটাকে ভালো করে দিন। কেউ বলছেন—এ বছর যেন গত বছরের থেকে বেশি লাভ হয় মা! আবার কেউ বলছেন—মেয়েটার একটা ভালো পাত্র জুটিয়ে দাও।

জানি না মা বৈষ্ণোদেবী এঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন কিনা? কিন্তু এই নির্ভরতা, এই নিষ্ঠা আর বিশ্বাস, এর যে কোনো তুলনা নেই। আমি তাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁদের চেয়ে দেখি আর মন দিয়ে তাঁদের সব কথা শুনি। ভাবি—এই বিশ্বাসই তো তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

'এ' গ্রুপ শেষ হয়ে গেল। এবারে আমাদের পালা। সেই দুপুর থেকে যে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছি, তা সমাগতপ্রায়। আমি আনন্দিত, আমি উত্তেজিত, আমি পুলকিত।

মাইক গর্জে উঠল—এবারে 'বি' গ্রুপের দর্শন আরম্ভ হবে। শুধু 'বি' গ্রুপের যাত্রীরা 'সিঙ্গল' লাইন করে সামনের দিকে এগিয়ে আসুন। 'বি' ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপ আসবেন না।

আগেই বলেছি মন্দির তোরণে একখানি ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে। তাতে সাদা রং দিয়ে পর পর হিন্দীতে লেখা রয়েছে—এখন কোন্ গ্রুপের দর্শন চলেছে? এতক্ষণ সেখানে লেখা ছিল—'A'। এবারে সেই 'A' মুছে 'B' লিখে দেওয়া হলো। নিচের লাইন দুটির লেখা কিন্তু অপরিবর্তিত থাকল। লেখা রয়েছে—গ্রুপের যাত্রীসংখ্যা ২৫০ এবং আজকের তারিখ। ঘোষণা হলেও আমাদের গ্রুপের কেউ এখনও পর্যন্ত ঢুকতে পারেন নি। এক-এক দলে দশ-পনেরোজন করে ঢুকতে দেওয়া হয়। আমরা দ্বিতীয় দলে সুযোগ পেয়ে যাবো আশা করি।

কিন্তু এখন একটা লোহার পাইপ দিয়ে প্রবেশ-পথটি বন্ধ রয়েছে। এখুনি খুলে দেবে নিশ্চয়ই। তখন ঠিকই হিসেব করেছিলাম, এখন বিকেল সাড়ে ছ'টা। সাতটা নাগাদ আমাদের দর্শন হয়ে যাবে। তাহলে রাত এগারোটার মধ্যে কাটরা পৌঁছে যাবো।

মাইকে আবার ঘোষণা—এখুনি 'বি' গ্রুপের দর্শন শুরু হচ্ছে। 'বি' ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপ লাইনে দাঁড়াবেন না। কারণ এই গ্রুপের দর্শন হতে হ'তেই সন্ধ্যারতির সময় হয়ে যাবে। তখন দু-ঘণ্টা মন্দির বন্ধ থাকবে। 'সি' গ্রুপ রাত দশটায় লাইন দেবেন।

তাহলে তো স্লিপ দেবার সময় পুলিশ কর্মচারীটি ঠিকই বলেছিলেন। কেবল তাঁর হিসবে সামান্য একটু ভুল হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন—'এ' গ্রুপের দর্শন হতে হতেই সন্ধ্যারতির সময় হয়ে যাবে। তাই তিনি নন্দাকে বলেছিলেন—রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা দর্শন করতে পারব। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো। আমরা সন্ধ্যারতির আগেই দর্শন করতে পারছি।

কিন্তু পাইপটা সরাচ্ছে না কেন? তাছাড়া গেটের সেই পুলিশ আর সর্দারজী কোথায় গেলেন?

"ঐ তো চা খাচ্ছে।" মহুয়া ইশারা করে দেখায়।

সত্যিই তাই। শ্রান্ত দ্বাররক্ষক দু'জন এই অবসরে বেড়া ডিঙিয়ে চায়ের দোকানে চলে গিয়েছেন। তা যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন! এদিকে যে পৌনে সাতটা

বেজে গেল।

ঘোষকরা মাইকে সেই একই কথা ঘোষণা করে চলেছেন—'বি' গ্রুপের দর্শন আরম্ভ হয়েছে। 'বি' ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপ লাইনে দাঁড়াবেন না। ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোথায় দর্শন আরম্ভ হলো! আমরা যে ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আমি তো সেই দুপুর থেকে কতবার এখানে এসেছি। কখনও যে এতক্ষণ দর্শন বন্ধ করে রাখতে দেখি নি।

সাতটা বেজে গেল। তাহলে কি সন্ধ্যারতির আগে আমরা দর্শন করতে পারব না? তীরে এসে তরী ডুববে?

কিন্তু ঘোষক যে সেই একই কথা বলে চলেছেন—'বি' গ্রুপ ছাড়া আর কোনো গ্রুপ এখন লাইনে দাঁড়াবেন না। এর পরে দু ঘণ্টা দর্শন বন্ধ থাকবে।...

যাক্‌গে, যে কথা ভাবছিলাম। আমি তো দুপুর থেকে কয়েকবার এখানে এসেছি। দেখেছি—এক-এক দলে এঁরা দশ-পনেরো জন যাত্রী ভেতরে ঢুকতে দেন। তারপরে দু-তিন মিনিট পাইপ দিয়ে পথ বন্ধ করে রাখেন। আবার একদল ভেতরে যায়। এইভাবে চলতে থাকে। আর এখন আধ ঘণ্টার ওপরে, না, প্রায় পৌনে একঘণ্টা দর্শন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এদিকে যে সওয়া সাতটা বাজে!

আমার সব অনুমান মিথ্যে হয়ে গেল। ভেবেছিলাম সাতটার মধ্যে দর্শন হয়ে যাবে। কি জানি মা কখন দয়া করবেন? বোধ করি এখনও সময় হয় নি। সময় না হলে যে তীর্থদর্শন হয় না।

না, হয়েছে। দ্বাররক্ষকরা ফিরে এসেছেন। সবিনয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করি, "কখন ভেতরে যেতে দেবেন?"

"এই তো এখুনি।" সর্দারজী সহাস্যে বলেন।

"আচ্ছা, এতক্ষণ বন্ধ করে রাখলেন কেন?"

"মন্দিরচত্বরে বসবার জায়গা ছিল না। এখন খালি হয়েছে, এবারে আপনারা ভেতরে যাবেন।"

এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজী পাইপটা সরিয়ে নেন। পুলিশ কর্মচারীটি বলেন, "আসুন, আপনারা ভেতরে আসুন।"

আমাদের আগের দলটি ভেতরে চলে গেলেন। এর পরে আমাদের পালা। মাত্র মিনিট দুয়েক। আবার পথমুক্ত হয়। সর্দারজী ইশারা করেন। আমরা ভেতরে আসি। পুলিশ পথ দেখিয়ে দেন।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে লম্বা বারান্দায় উঠে আসি, বাঁদিকে এগিয়ে চলি। বারান্দার শেষে শ্বেতপাথরের দেওয়াল ঘেরা মন্দিরচত্বর। কিন্তু দরজা বন্ধ। অতএব আবার সারি বেঁধে দাঁড়াতে হয়।

মাত্র মিনিটখানেক। তারপরেই দরজা খুলে যায়, ভেতরে আসি—বৈষ্ণোদেবী দরবারের বহিরাঙ্গনে অথবা নাট-মন্দিরে।

তখন নিচের থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই জায়গাটাই দেখছিলাম। সেই শ্বেতপাথরে বাঁধানো একতলার খোলা ছাদ। তখন শুধু পেছনের পাহাড়টা দেখেছি, এখন গুহামন্দির

দেখতে পাচ্ছি। শ্রীরামচন্দ্র নির্দেশিত সেই স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী বিধৌত বিচিত্র-সুন্দর গিরিগুহা আমার সামনে। ঐ গিরিগুহায় আদিকুমারী বৈষ্ণোদেবী তাঁর প্রাণপুরুষ কল্কি অবতারের তপস্যায় রত রয়েছেন। আমি প্রণাম করি। আপনা থেকেই বলে উঠি—জয় মাতাদী!

কর্মচারীরা ক্রমাগত বলছেন—বসে পড়ুন, সারি বেঁধে বসে পড়ুন।

সুতরাং শেষ সারির শেষে একজনের পেছনে আরেকজন বসে পড়ি। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা চারটি সারিতে বসে আছেন। আমরা বসেছি একেবারে ডানদিকের সারিতে, এটি শেষ সারি। বাঁদিক থেকে যাত্রীরা বৈষ্ণোদেবী দরবারে প্রবেশ করছেন।

আমার সামনে সেই সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে দরবারের প্রবেশ তোরণ। গুহামুখটির তিনদিকে পাহাড়ের গায়ে শ্বেতপাথরের সুদৃশ্য মন্দির তোরণ। মন্দিরের মতো করেই তোরণটি তৈরি করা হয়েছে। তোরণের ঠিক মাঝখানে গুহামুখ। সেখানে কয়েকজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন—যাত্রীদের তদারকি করছেন।

নাটমন্দিরটি যে এত সুন্দর, তা নিচের থেকে বুঝতে পারি নি। তখন শুধু পতাকা আর ঘণ্টা দেখেছি। এখন দেখছি বাঁদিকে দেওয়ালের ধারে একটি বেদির ওপরে মায়ের মূর্তি রয়েছে। জনৈক গেরুয়াধারী সেখানে বসে মন্ত্রপাঠ করছেন। যাত্রীরা অনেকে কাছে গিয়ে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে আসছেন। আমরা এখান থেকে মাকে প্রণাম করি।

আবার সামনে তাকাই—তোরণের দিকে। ওখানেই মা-বৈষ্ণবী দানবরাজ ভৈঁরোকে বধ করেছেন। তার দেহ আজও পাথর হয়ে গুহামুখ অবরোধ করে আছে। সেই পাথর ডিঙ্গিয়ে আমাদের মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে।

কর্মচারীদের নির্দেশে প্রথম সারি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা এগিয়ে চললেন গুহামুখের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষগুলো গুহার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় সারির যাত্রীরা তাঁদের জায়গা দখল করলেন। আমরা তৃতীয় সারিতে চলে এলাম। দরজা খুলে গেল। বাইরে থেকে আরেকদল যাত্রী এসে চতুর্থ সারি অধিকার করলেন।

এঁদের ব্যবস্থাপনা দেখে আবার মুগ্ধ হতে হয়। দলে দলে যাত্রী আসছেন, দর্শন করছেন। কিন্তু কোনো চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি হৈচৈ কিংবা ঝগড়াঝাটি নেই। একটা আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করছে। কালীঘাটের কর্মকর্তাদের অবশ্যই এখানে এসে 'ট্রেনিং' নিয়ে যাওয়া উচিত।

চেঁচামেচি না থাকলেও যাত্রীরা সবাই কিন্তু শব্দহীন নয়। অনেকে বিড় বিড় করে মায়ের কাছে তাঁদের প্রার্থনা পেশ করে চলেছেন, কেউ মৃদু কণ্ঠে ভজন গাইছেন, কেউবা মন্ত্রপাঠ করছেন। আমাদের করুণও আস্তে আস্তে চণ্ডী থেকে আবৃত্তি করছে—

'সর্ব্ববাধা-প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরি—বিনাশনম্॥'

অখিলেশ্বরি, আপনি এখন আমাদের শত্রু বিনাশ করে ত্রিভুবনের সকল বিঘ্ন নাশ করলেন, ভবিষ্যতেও আপনি এই রকম করে বিশ্বসংসারকে নির্বিঘ্ন করুন।

প্রথম সারি আবার উঠে দাঁড়ালেন, তাঁরা আস্তে আস্তে দরবারে প্রবেশ করলেন। আমরা এবারে দ্বিতীয় সারিতে উন্নীত হলাম।

করুণ কিন্তু জায়গা বদল করেই আবার চণ্ডীপাঠ শুরু করে—

'সর্ব-স্বরূপে সর্বেশে সর্ব-শক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে॥'

দেবি, আপনি সর্ব-কার্য-কারণ-রূপিণী, সর্বেশ্বরী সর্ব শক্তিময়ী এবং দুর্জ্ঞেয়া। আপনি আমাদের সকল আপদ থেকে রক্ষা করুন। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত সমাগত হলো। এবারে আমাদের পালা। আমরা সারি বেঁধে উঠে দাঁড়ালাম। প্রথমে করুণ। তার হাতে পূজার উপকরণ। তার পরে মহুয়ার হাত ধরে ভানু, নন্দা ও মীরাদি। সবার শেষে আমি আর তোতন।

তোরণে এসে থামতে হয়। জনৈক কর্মচারী করুণকে তার কোমর দেখিয়ে বলেন, "চামড়ার বেল্ট নিয়ে তো দরবারে যেতে পারবেন না মহারাজ!"

সর্বনাশ। এখন উপায়! করুণ বিভ্রান্ত। কর্মচারীটি নিজেই উপায় বাতলে দেন। করুণকে বলেন, "বেল্টটা খুলে আমার কাছে দিয়ে দিন, দর্শন করে এসে ফেরত নিয়ে যাবেন।"

করুণ সঙ্গে সঙ্গে বেল্টটা খুলে তাঁর হাতে দেয়। তার পরে আবার এগিয়ে চলে।

গুহামুখে এসে আবার থামতে হয়। সামনে সেই অবরোধ—প্রকাণ্ড একখানি পাথর পথ রোধ করে আছে। শুধু ওপরের দিকে খানিকটা ফাঁক রয়েছে। তারই ভেতর দিয়ে লম্বা করে শরীরটাকে গলিয়ে দিতে হবে ওপাশে।

কাজটা কষ্টকর। তা হলেও একে একে তাই করতে হয় সবাইকে। প্রভূত কসরত করে অবরোধ অতিক্রম করি।

এপাশে এসে নিচে পা রাখতেই শিউরে উঠি। তলা দিয়ে হিমশীতল জল বয়ে যাচ্ছে। তাই তো যাবে। শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন—স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী বিধৌত বিচিত্র সুন্দর গুহা।

সত্যই তাই। তবে একে গুহা না বলে ফাটল বা crack বলাই বোধ করি উচিত হবে। ওপর দিকটা চওড়া, নিচের দিক সরু। সেখানে কোনো মতে পাশাপাশি দু'খানি পা রাখা যায়। কিন্তু তুষার শীতল জলধারায় পা অবশ হয়ে আসতে চাইছে।

তোতা চেঁচিয়ে ওঠে, "জেঠু, পা অবশ হয়ে গেল, দাঁড়াতে পারছি না।" তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধে তুলে নিই। তার পরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি। কাজটা সহজ নয়। একে পায়ের তলায় বরফগলা ঠাণ্ডা জল, তার ওপরে ফাটলটা সোজা নয়, বাঁকা। ফলে কাত হয়ে এগোতে হচ্ছে। অবশ্য পুরনো 'মিনিবাস'-এর কল্যাণে কলকাতায় এইভাবে পথ চলার ট্রেনিং নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার গুহা, কিন্তু আলোর অভাব নেই। ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। শুনেছি এখানে 'লোডশেডিং' হয় না, তবু আমরা কলকাতার মানুষ, বিদ্যুৎকে বিশ্বাস করি না, তাই টর্চ সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু এখন সেটি বাড়তি বোঝায় পরিণত। একহাতে তোতন আরেক হাতে

টর্চ, অথচ পাথরের দেওয়াল না ধরে এগুনো অসম্ভব। তাই টর্চটা তোতনের হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি।

সামনে পেছনে লোক গিজগিজ করছে। একটু দাঁড়ালেই ধাক্কা খেতে হচ্ছে। এত সংকীর্ণ দুর্গম পথে এভাবে পথ চলা সম্ভব নয়। তাই করুণকে বলি, "একটু আস্তে আস্তে চলো, যাতে আগের লোকের সঙ্গে তোমার খানিকটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।"

করুণ তাই করে। আমরা একটুকাল দাঁড়িয়ে থাকি। পেছনের লোক এগিয়ে যাবার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। তাঁদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।

এবারে একটু সহজ ভাবে চলা যাচ্ছে। একটা জিনিস ভেবে অবাক না হয়ে পারছি না। এই যে অন্ধকার গুহায় আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি, আমাদের তো কোনো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। তার মানে এখানে আলো না এলেও হাওয়া আসছে।

তোতা আমার কোলে উঠে বসেছে কিন্তু তার চেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মা-বাপের হাত ধরে দিব্যি এগিয়ে চলেছে। তোতনকে কোলে নিয়ে আমার পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কোলে শিশু নিয়ে মায়েরা অক্লেশে পথ চলেছেন। বাচ্চাগুলিও কিন্তু চুপ করে আছে। কি বুঝছে কে জানে? সবই হয়তো মায়ের কৃপা।

সেই মোটা ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ছে। তিনি কি পারবেন এই পথ পেরিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছতে? না পারলেও মা কৃপা করবেন তাঁকে। মা যে তাঁকে ডেকে এনেছেন এখানে। মা নিশ্চয়ই তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলবেন।

প্রায় শ'খানেক ফুট আসার পরে আবার থামতে হয়। গুহাটি এখানে প্রায় সমকোণ হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। আমাদেরও বাঁদিকে ঘুরতে হবে। জায়গাটা বড্ড সরু। তাই তোতাকে দু'হাতে তুলে ফাঁকটুকু পার করে দিয়ে ওকে একটু দাঁড়াতে বলে নিজে বাঁকটা পেরিয়ে আসি।

তোতা আর কোলে উঠতে চায় না। বলে, "আমি হেঁটে যেতে পারব।" সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে।

আমি তাকে অনুসরণ করি।

আর বেশিদূর এগোতে হয় না। আমরা একটা সিঁড়ির সামনে এসে পৌঁছেছি—পরপর তিনধাপ সিঁড়ি। এখানে সোজাসুজি দাঁড়ানো যাচ্ছে এবং মাথায় ছাদ ঠেকছে না।

জায়গাটুকু তিনটি পথের সঙ্গম। একটি পথ দিয়ে আমরা এখানে এলাম, একটি পথ সামনে প্রসারিত, আরেকটি ডানদিকে উঁচু হয়ে হয়ে গিয়েছে। জনৈক কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। তিনি ডানদিকের পথটি দেখিয়ে বলেন, "চলে যান, সামনেই দেবীজীর দরবার।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলি। এপথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। তবু বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে, একসারিতে এগোতে হচ্ছে। কারণ এই একই পথ দিয়ে দর্শন শেষে যাত্রীরা নেমে আসছেন। তবে এখানে দু'জন লোক পাশাপাশি পথ চলা যায়। কাজেই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

কয়েক পা এগিয়েই উঠে আসি গুহামন্দিরে—বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। পনেরো-বিশ ফুট লম্বা ও চওড়া চৌকোমত একটি গুহা। গর্ভগুহাও বলা যেতে পারে। এখানেও

মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যাচ্ছে। কেনই বা যাবে না? এই তো বৈষ্ণোদেবীর দরবার। আদিকুমারী এখানে বসে তাঁর প্রাণপুরুষের প্রতীক্ষা করছেন।

আমরাও এসে দাঁড়াই তাঁর সামনে। না, তিনি এখানে একা নন। পাশাপাশি তিনটি পাথরের বেদি—মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন মহাশক্তি আপন আপন রূপে প্রকট হয়ে তাঁদের মিলিত মহাশক্তির মহিমা প্রকাশ করছেন।

রঙীন কাপড় আর মালা দিয়ে সুসজ্জিত বেদি। রুপোর ছত্র আর পুজোর উপকরণ চারিদিকে। ধূপের সুবাসে আমোদিত মন্দির। সামনে প্রসাদ আর নানা নৈবেদ্যর ডালি, একপাশে স্তূপ।

পূজারী করুণের হাত থেকে ভেন্তাস গ্রহণ করেন। মন্ত্রপাঠ করে আমাদের কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে দেন, গলায় পরিয়ে দেন লালসুতোর মালা। তার পরে নারকেলটি মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ছুঁইয়ে করুণের হাতে ফেরত দেন। করুণ নারকেলটি ঝোলায় রেখে মাকে প্রণাম করে। আমরাও লুটিয়ে পড়ি মন্দিরতলে। কায়মনোবাক্যে বলি—মা, তুমি সবার সব দুঃখ দূর করে জগৎকে আনন্দময় করে তোলো। আমার সকল সহযাত্রীর সকল কামনা পূর্ণ করো। আর আমার জীবনে তুমি চিরস্মরণীয়া হয়ে থেকো।

প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়াই। পূজারী প্রসাদ দেন—নকুলদানা শুকনো ফল ও কয়েকটি পয়সা।

এ তো সাধারণ মন্দির নয়, বৈষ্ণোদেবীর দরবার। মা তাঁর সন্তানদের প্রসাদের সঙ্গে খাজনা দান করলেন। ভারতের আর কোনো তীর্থে এমন আর্থিক-আশীর্বাদ পাবার প্রথা আছে বলে জানা নেই আমার। সকৃতজ্ঞ চিত্তে সযত্নে সেই আশীর্বাদী পকেটে রেখে দিই।

"সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে।"

করুণ চণ্ডীপাঠ শুরু করেছে। আমিও সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের মহাশক্তিকে পুনরায় প্রণাম করি। সনাতনী ত্রিগুণময়ীকে প্রণাম করি। নারায়ণীকে নমস্কার করি।

আরেকটুকাল দরবারে দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু চতুর পূজারীদের জন্য সে ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে গেল। তাঁরা কাঁধে হাত দিয়ে আদর করে আমাদের দরবারে থেকে বের করে দিলেন।

তেমনি সারি বেঁধে আবার নেমে এলাম তিনটি পথের সঙ্গমে। কর্মচারীটি এবারে ডানদিকের, মানে যে পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, তার বিপরীত দিকের পথ ধরে উল্টোদিকে যেতে বলেন।

কথাটা মনে পড়ে আমার—এটা মানুষের তৈরি নতুন পথ। আগে দরবার দর্শনার্থীরা যে পথে এখানে আসতেন, সেই একই পথে বাইরে যেতেন। ফলে দর্শনে তখন আরও বেশি সময় লাগত। কারণ একদল দর্শন করে গুহার বাইরে না বেরুলে আরেকদল ভেতরে ঢুকতে পারতেন না। তাই এখান থেকে গুহামুখের বিপরীত দিকে এই কৃত্রিম সুড়ঙ্গটি কাটা হয়েছে। শুনেছি এই সুড়ঙ্গপথটি ৩৯.৬১ মিটার

লম্বা, ১.৮২ মিটার চওড়া এবং ২.২১ মিটার উঁচু! ১৯৭৭ সালের ৩০ মার্চ যুবরাজ করণ সিং এই সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন করেছেন।

সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে—বৈষ্ণোদেবীর অন্ধকার আবাস থেকে আলোময় মাটির পৃথিবীতে। না, এখন আর আলো নেই মানুষের মাটিতে। গোধূলি এসেছে ঘনিয়ে। নেমে আসছে সন্ধ্যা। এখুনি মায়ের সন্ধ্যারতি শুরু হবে। আমরা মাকে আবার প্রণাম করি।

বাইরে বেরিয়েই একফালি পাথর বাঁধানো অঙ্গন। তাঁরই একপাশে পূজার ব্যবস্থা—মায়ের পূজা। পূজারীরা কাছে ডাকেন। আমাদের বলেন—মাতাজীকে পূজা চড়াও।

ওঁদের অবাধ্য হওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে গুটিদুয়েক করে টাকা প্রণামী দিতে হয়। তারপরে আকাশতলে পাণ্ডাদের সেই বৈষ্ণোদেবীর দরবারে প্রণাম করে ফিরে চলি নিজেদের পথে।

চলতে চলতে ভাবি—গতকাল কাটরায় আসার পথে এরকম জোর করে প্রণামী আদায় করার ঘটনা এই প্রথম। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটল বৈষ্ণোদেবী দরবারের চত্বরে! কর্তৃপক্ষ কি পাণ্ডাদের এই জুলুম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন?

পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আবার ফিরে আসি নাটমন্দিরে। এখানে একই দৃশ্য। একদল দর্শনার্থী সারি বেঁধে বসে আছেন, আরেকদল গুহামন্দিরে প্রবেশ করছেন। তবে নতুন দর্শনার্থী আর ভেতরে আসছেন না, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এঁদের দর্শন হয়ে গেলেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। প্রায় দু-ঘণ্টার জন্য মন্দির বন্ধ থাকবে। কারণ সন্ধ্যারতির আগে নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির পরিষ্কার করে গুহা জল দিয়ে ধোয়ানো হয়। তারপরে শুরু হয় দেবীর শৃঙ্গার। শৃঙ্গার শেষে আরম্ভ হয় আরতি।

কিন্তু মায়ের সন্ধ্যারতি দর্শনের সুযোগ নেই আমাদের। আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুহামন্দিরকে শুধু দেখি। জীবনে আর হয়তো এ দরবার দর্শনের সুযোগ হবে না। করুণ দ্বাররক্ষকদের কাছ থেকে তার চামড়ার বেল্টটি ফেরত নিয়ে আসে। বৈষ্ণোদেবী দরবারের উদ্দেশ্যে আরেকবার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে।

ফিরে আসি মন্দির-তোরণে। বেশ কিছু যাত্রী লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন! এঁরা কোন্ গ্রুপ?

জনৈক যাত্রী জানান—'বি'।

তাহলে 'বি' গ্রুপ শেষ হবার আগেই মন্দির বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবং যাঁরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো আমাদের আগে এখানে এসেছেন। কিন্তু প্রথম দিকে লাইনে না দাঁড়াবার জন্য এখন তাঁদের অন্তত দুটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

মনে মনে মাকে আবার প্রণাম করি। বলি—মা, তোমার অশেষ করুণা। মন্দির বন্ধ হবার আগেই তুমি আমাদের দর্শন দান করেছো। নইলে যে আজ রাতে আমরা আর কাটরায় ফিরতে পারতাম না। আগামী কাল জম্মু গিয়ে ট্রেন ধরা মুশকিল হতো।

ফিরে আসি মূল-পথে। ধর্মশালার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি—আমাদের ধর্মশালা। এটি ধর্মার্থ ট্রাস্টের ধর্মশালা। আমরা তখন প্রথম যে ধর্মশালায় উঠেছিলাম, সেটি শ্রীধর সভা নির্মাণ করেছেন। শুনেছি বৈষ্ণো সেবা সঙ্ঘের আরও একটি ধর্মশালা আছে এখানে। তিনটি ধর্মশালায় তিন হাজার যাত্রী রাত্রিবাস করতে পারেন। তবু ঠাঁই নেই বৈষ্ণোদেবীতে!

ক্লোক-রুমে এসে মালপত্র নেওয়া গেল। কিট্‌ব্যাগ, ওয়াটারবট্‌ল, জুতো প্রভৃতি সবই ঠিক আছে। কেবল পাওয়া গেল না দু'খানি লাঠি! মূল্য কিছুই নয়। ভাড়া একটাকা আর দাম দু'টাকা। তার মানে একটা টাকা বেশি দিতে হবে বাড়িওয়ালীর ছেলেকে। কিন্তু এখন লাঠি দু'খানি অমূল্য আমাদের কাছে। বিনা লাঠিতে এই রাতে এতখানি উতরাই ভাঙা খুবই কষ্টকর হবে। কিন্তু উপায় নেই, লাঠি চুরি গিয়েছে ধর্মার্থ ট্রাস্টের ক্লোক-রুম থেকে। এবং এখানে লাঠি কিনতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং পিঠে ব্যাগ নিয়ে তোতার হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে ভাবি, লাঠির অভাব পুষিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু মহুয়া ও তোতার জন্য যে দু'জন পিট্টু একান্তই দরকার। এতখানি পাহাড়ী পথ। রাতে চলতে হবে। ওদের দু'জনের পক্ষে যেমন হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমাদের পক্ষেও মহুয়া আর তোতাকে নিয়ে পথ চলা অসম্ভব।

শ্রীধর সভা ধর্মশালা ছাড়িয়ে এসে দেখি সেই ফাঁকা জায়গাটায় অনেকগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াওয়ালারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করে, "ঘোড়া নেবেন নাকি মহারাজ!"

"না, ভাই!" উত্তর দিই। বলি, "দু'জন পিট্টু দিতে পারো?"

ওরা মাথা নাড়ে। বলে, "ঘোড়া নিন, এখানে পিট্টু পাওয়া যায় না। পিট্টু নিচের থেকে নিয়ে আসতে হয়।"

তোতা আর মহুয়াকে দেখিয়ে বলি, "আমরা নয়, এরা দু'জন যাবে। এরা যে ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে পড়বে।"

"ঘুমিয়ে পড়বে কেন, মহারাজ!" জনৈক ঘোড়াওয়ালা বলে, "আমি ওদের জাগিয়ে রাখব।"

কথাটা অবাস্তব। একজন সাত বছরের মেয়ে আরেকজন চার বছরের শিশু। সারাদিন ওদের শরীরের ওপর দিয়ে প্রচুর ধকল গিয়েছে। উতরাই পথ, রাতে চলতে হবে। ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক এবং ঘুমোলেই ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে। ঘোড়াওয়ালার পক্ষে সে পতন রোধ করা কেমন করে সম্ভব বুঝতে পারছি না।

তবু জিজ্ঞেস করি, "এদের দু'জনকে একটা ঘোড়ায় নিয়ে যাবে, কত দিতে হবে?"

"বানগঙ্গা পর্যন্ত তিরিশ টাকা।"

সে কি! আসার সময় চড়াই পথে সাড়ে বাইশ টাকা নিয়েছে আর যাবার সময় উতরাই পথে তিরিশ টাকা!

"তার মানে যাবার ইচ্ছে নেই।" নন্দা মন্তব্য করে।

আমিও আর দরাদরি না করে এগিয়ে চলি। কিন্তু চলতে গিয়ে আবার ভাবনাটা

দেখা দেয়। এই রাতে এতখানি দীর্ঘপথ ওদের নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে তোতার পক্ষে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

মীরাদিও তাই বলেন, "কি করবেন? ঘোড়াওয়ালা ঠকিয়ে বেশি নিতে চাইছে।"

অগত্যা ভানুকে বলি, "যা, তিরিশ টাকা দিয়েই লোকটাকে নিয়ে আয়।" ভানু ফিরে যায়, আমরা আস্তে আস্তে এগোতে থাকি।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে ভানু ফিরে আসে। অবাক হই, সে একা! ভানু বলে, "না, ওরা যাবে না।"

"কেন?"

"বলছে, রাতে বাচ্চারা ঘোড়ায় বসে থাকতে পারবে না। ঘুমিয়ে পড়বে, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে।"

"তাহলে তখন ওকথা বলছিল কেন?"

কিন্তু কে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? ভানু নিঃশব্দে মহুয়ার হাত ধরে এগিয়ে চলে। আর আমি তোতার হাত ধরে বলি, "চল বাবা, আমরা হেঁটে যাই।"

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উতরে রাত নেমেছে বৈষ্ণোদেবীর দেশে। সেই সঙ্গে পথের মোড়ে মোড়ে টিউব ল্যাম্পগুলো উঠেছে জ্বলে। আসার সময় দুটি পথেই ইলেকট্রিক লাইট দেখেছি। তবে সিঁড়ির পথে আলোর সংখ্যা বেশি। সাঁজীছতের পরে আমরা সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করব। তাছাড়া আজ পূর্ণিমা, চাঁদ উঠছে। পথে আলোর অভাব হবে না।

ধীরে ধীরে পথ চলেছি। কারণ তোতা আমার সঙ্গে। এখন পর্যন্ত সে কোনো গোলমাল করছে না, বেশ হাঁটছে।

কাল কথাটা মিথ্যে বলে নি ওরা—ট্যুরিস্ট অফিসের কর্মচারী ও বাড়িওয়ালীর মেয়েরা। রাতে পথ চলা সত্যি আরামের। আসার সময় গরমে বড় কষ্ট পেয়েছি। আর এখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভারি ভালো লাগছে। কেবল লাঠিটা না থাকায় একটু অসুবিধে হচ্ছে এই যা।

গতকাল সেই কাটরা আসার পর থেকেই শুনে আসছিলাম—এখানে কিছু চুরি যায় না। আর শেষ পর্যন্ত কিনা বৈষ্ণোদেবীতে ধর্মার্থ ট্রাস্টের ক্লোক-রুম থেকে দু'টাকা দামের দু'খানি লাঠি চুরি গেল! এখন দু'টাকার জন্য একখানি ঠ্যাং না ভাঙে।

ভৈরবঘাঁটি আসা গেল। একটু আগে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তার রুপোলী আলো পথ আর পাহাড়, বন আর উপত্যকার বুকে স্বপ্নের মায়া বিছিয়েছে। কিন্তু এখানে গাছপালার চন্দ্রাতপ ভেদ করে তার সামান্যই আলো পথের ওপরে আছড়ে পড়তে পেরেছে। তবে করুণ ও আমার কাছে টর্চ রয়েছে। তারই আলোয় পথ দেখে দেখে আমরা ভৈরবমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই।

মন্দিরেও আলো নেই, নেই পূজারী। তিনি বোধকরি মন্দির বন্ধ করে চলে গিয়েছেন। তবু রক্ষে, দরজাটি কাঠ কিংবা টিনের নয়—লোহার। গরাদের ফাঁক দিয়ে টর্চের আলোয় আমরা ভৈরবমন্দির দর্শন করি। ভেতরে একখানি পাথর, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখার দরকারও নেই। ঐ পাথরখানাই দানবরাজ ভৈঁরোর

ছিন্ন মস্তক।

পরমকরুণাময়ী ক্ষমাশীল দেবী বৈষ্ণবী ভৈঁরোর প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলেছিলেন—তুমিও আজ থেকে চিরস্থায়ী হলে এই পুণ্যতীর্থে। অনাগত যুগের অগণিত ভক্ত আমাকে দর্শন করে তোমাকে দর্শন করবে: নইলে তাদের তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ভৈরবমন্দির দর্শন করে আমরাও তীর্থদর্শন সম্পূর্ণ করি। তারপরে আধো আলো আধো ছায়া পথ দিয়ে এগিয়ে চলি কাটরার পথে।

ভৈরবঘাঁটি ছাড়িয়ে আসার পরেই আবার চাঁদের সঙ্গে দেখা হলো—পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। তার স্নিগ্ধ-মধুর আলোয় পথ অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। আর শুধুই বা মায়াময় পথের কথা বলি কেন? নিচের উপত্যকা আর ওপরের পাহাড়? উপত্যকা স্বপ্নময়, পাহাড়গুলো মোহময়। আর আমরা? আমরা বাক্যহারা।

রাত নেমে এসেছে পথে কিন্তু পথ পথিকশূন্য নয়। দলে দলে যাত্রী যাচ্ছেন আর আসছেন। যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা শুধু বলছেন—জয় মাতাদী! যাঁরা আসছেন, তাঁরাও জয় মাতাদী বলছেন। সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করছেন—আর কতদূর ভাইসাব?

তাড়াতাড়ি তাঁদের ভরসা দিই, "আর দূরে নয়, এসে গিয়েছেন। সামনে ভৈরবঘাঁটি, তার পরেই বৈষ্ণোদেবীর দরবার।"

শ্রান্ত যাত্রীরা উৎসাহিত হন।—'জয় মাতাদি' বলে জোরে জোরে পা ফেলেন। তাঁরা মাতৃসদনের দিকে এগিয়ে চলেন।

জীবনে বহু তীর্থযাত্রায় অংশ নিয়েছি, কিন্তু এমন বিরামহীন দিবারাত্রের পদ যাত্রায় আর কখনও অংশীদার হয়েছি বলে মনে পড়ছে না। তার ওপরে এই জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ী পথ। পথ চলতে বড় ভালো লাগছে।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলেছি—বৈষ্ণবী মায়ের কথা। তিনি দুর্গা কালী সরস্বতীর মিলিতশক্তি। তাই তাঁর সন্তানগণ মনে পরেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন যে দুর্গাস্তব করেছিলেন, তা পক্ষান্তরে বৈষ্ণোদেবীর আরাধনা।

অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তখন কৃষ্ণার্জুনের সামনে আবির্ভূত হবে অর্জুনকে বরদান করে বলেছিলেন—হে বীর! তুমি অল্পকালের মধ্যে অরাতিগণকে পরাজিত করবে। তুমি নর, নারায়ণ তোমার সহায়। অন্য শত্রুর কথা কি, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করতে পারবেন না।*

সুতরাং বৈষ্ণবী মায়ের সন্তানগণ মনে করেন বৈষ্ণোদেবীর বরলাভ করেই অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সাঁজীছতে আসা গেল। এবারে শুরু হবে উতরাই। আমাদের সামনে দু'টি পথ, একটি মানুষের আরেকটি ঘোড়ার। ভানু মানুষের পথ বেছে নেয়। মহুয়াকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করে। এখন আমরা কি করি?

করুণ, বলে, "নামার সময় সিঁড়ি দিয়েই সুবিধে হবে। তাছাড়া সিঁড়িতে আলো বেশি।"

অতএব মানুষের পথই বেছে নেওয়া গেল। ভানুর পেছনে করুণ, তারপরে নন্দা ও মীরাদি। সবার শেষে তোতার হাত ধরে আমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি, বৈষ্ণোদেবীর দরবার থেকে মানুষের আদালতে।

* মহাভারত : ভীষ্মপর্ব, ২৩ অধ্যায়।

আগেই বলেছি, সিঁড়ির পথে প্রচুর টিউব ল্যাম্প। তার ওপরে চাঁদের আলো তো রয়েছেই। সুতরাং সিঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিকমতো। অতএব পথচলায় কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

তবু হচ্ছে। প্রথমত, আমার লাঠি নেই, দ্বিতীয়ত, শ্রীমান তোতা ঠিকমত চলতে পারছে না।

পারার কথাও নয়। চার বছরের ছেলে, সেই সকাল থেকে শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যাচ্ছে। এখন আর পারছে না। মাঝে মাঝেই নিচের সিঁড়িতে পা ফেলার সময় ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমি শক্ত করে ওর হাতখানি ধরে থাকছি। বলছি, "তোতা বাবা, সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে, "পারছি না জেঠু। বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

বাস্তবিকপক্ষে তোতা এখন ঘুমোতে ঘুমোতেই পথ চলেছে। খাড়া সিঁড়ি, আমার হাতে লাঠি নেই। কোনভাবে পা ফসকালে বহু নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। হয়তো আর ফেরা হবে না ঘরে!

তোতা গল্প শুনতে বড় ভালোবাসে। গল্প বললে নিশ্চয়ই সে জেগে থাকবে। তাই তাড়াতাড়ি গল্প বলতে শুরু করি।

কিন্তু এখন ওর কিছুই ভালো লাগছে না। গল্পতেও মন নেই। বলে বসে, "জেঠু, আমার ঘুম পেয়েছে, আমাকে কাঁধে নাও।"

পিট্টু যখন যোগাড় করতে পারি নি, তখন তাদের কাজ আমাকেই করতে হবে। চার বছরের ছেলে তোতা, হালাকা শরীর, তাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলার তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, লাঠিখানা খোয়া গিয়ে। লাঠি ছাড়া তো ওকে কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়!

অতএব পথ পালটাতে হয়। মানুষের পথ ছেড়ে ঘোড়ার পথ ধরি। তাকে কাঁধে নিয়ে পথচলা শুরু করি।

সত্যি বলতে কি, এই পথটাই ভালো। এপথে বৈদ্যুতিক আলো কম, কেবল পথের মোড়ে মোড়ে একটা করে টিউব ল্যাম্প জ্বলছে। কিন্তু এখন তো বৈদ্যুতিক আলোর দরকার নেই। চাঁদের আলোয় চারিদিক দিনের মতো পরিষ্কার। তাছাড়া রাতে দেখছি অশ্বারোহীদের সংখ্যা খুবই কম। পদাতিকই বেশি। তাই পথ চলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

সবচেয়ে সুবিধে হলো পথের ঢালটা তেমন খাড়া নয়, ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে নিচে নেমেছে। আমার পা দুখানিও নিজের থেকেই ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে। তারা যেন আপনা থেকেই পথ চলেছে, আমাকে কোনো কসরত করতে হচ্ছে না। অথচ সিঁড়ির পথে প্রত্যেকবার নিজের শক্তি ক্ষয় করে পা ফেলতে হচ্ছিল।

শুধু আমার নয়, নন্দা, মীরাদি ও করুণেরও নাকি এইপথে পথ চলতে সুবিধে হচ্ছে। আর তোতন?

সে আমার মাথার ওপরে নিজের মাথাটি রেখে দিব্যি কাঁধে বসে আছে। বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমোক। ঘুম এসে সরল শিশুর সকল শ্রান্তি দূর করে দিক।

।। বারো ।।

রাতে সাড়ে দশটায় আদিকুমারীতে পৌঁছন গেল। কে বলবে এখন প্রায় মধ্যরাত? কারণ আদিকুমারীর সেই একই চেহারা। সকালে যেমন দেখে গিয়েছি, এখনও তেমনি লোকে লোকারণ্য তেমনি কর্মব্যস্ত। দোকান মন্দির ও গুহা আলোয় আলোময়। সর্বত্র মানুষের ভিড়। দলে দলে যাত্রী ওপর থেকে নিচে নামাছেন, দলে দলে যাত্রী নিচের থেকে ওপরে উঠছেন। সবাই এখানে এসে বিশ্রাম করছেন, খাওয়া-দাওয়া করছেন, দর্শন করছেন।

মহুয়ার হাত ধরে ভানু দাঁড়িয়ে আছে সেই দোকানের দাওয়ায়। এখনও দোকানে তেমনি পুরী ও জিলিপি ভাজা হচ্ছে। সেই ডাকাডাকি কথাবার্তা খাওয়া-দাওয়া আর রেডিওর গান, সেই সকালের সঙ্গে এই রাতের নেই কোনো পার্থক্য।

আমরা দোকানে উঠে আসি। বসার জায়গাও পেয়ে যাই। মীরাদিরা মিষ্টি খান, আমরা পেট পুরে পুরী খেয়ে নিই, কাটরা পৌঁছে বোধ হয় খাবার পাবো না। তার আর দরকারও হবে না।

আবার পথে নেমে আসি। নন্দা বলে, “ভানু, এবারে তুমি তোতাকে নাও। শঙ্কুদার কষ্ট হচ্ছে।”

কথাটা মিথ্যে নয়। চার বছরের ছেলে হলেও, তাকে কাঁধে নিয়ে এই উতরাই ভাঙা আমার পক্ষে সত্যি কষ্টকর। বয়স হয়েছে, এখন আর আগের মতো দৈহিক পরিশ্রম করতে পারি না।

ভানু আপত্তি করে না। সে তোতাকে কাঁধে তুলে এগিয়ে চলে। আমি মহুয়ার হাত ধরে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি।

মহুয়া বলে বসে, “জেঠু, আমরা কিন্তু সবার আগে কাটরা যাবো। তুমি তাড়াতাড়ি চলো।”

সে প্রায় ছুটতে শুরু করে। উপায় নেই, আমাকে তার সঙ্গে তাল রাখতে হয়।

সাত বছরের মেয়ে মহুয়া। এই বয়সেই সে তার বাবা-বার সঙ্গে হিমালয়ের তাবৎ দুর্গম তীর্থ পাড়ি দিয়েছে। ওর বাবা বিভাস দাস পর্বতারোহী। মহুয়ার বয়স যখন বছরখানেক, তখুনি বিভাস ওকে কাঁধে করে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী গিয়েছে। তার পর থেকে মহুয়া প্রতিবছর হিমালয়ে এসেছে। সুতরাং আমার পক্ষে এই লেডি মাউন্টেনীয়ার-এর সঙ্গে তাল রাখা কষ্টকর বৈকি! বিশেষ করে রাতের পাহাড়ে।

রাতের পাহাড় হলেও নির্জন পথ নয়। দলে দলে যাত্রীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তাঁরা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা ক্লান্ত। তাই তাঁদের উৎসাহ দিই। বলি—এই তো এসে গিয়েছেন, সামনেই আদিকুমারী। স্থানীয়রা আদিকুমাকে আদকুমারী বলেন।

ওঁরা খুশি হন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন—জয় মাতাদী!

যাত্রীরা এগিয়ে চলেন চড়াই পথে, আমরা নেমে চলি উতরাই পথে। চলতে চলতে ভাবি এই ক্লান্তিহীন পথিকদের কথা। এঁরা বোধ করি আজই দিল্লী কিংবা

অন্য কোনো জায়গা থেকে জম্মু পৌঁছেছেন, আজই কাটরা এসেছেন, আজই বৈষ্ণোদেবীর দরবারে চলেছেন। বাস থেকে নেমেই পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন। এপথে যে দিনরাতের তফাৎ নেই উচ্চ-নীচ ভেদ নেই, চুরি নেই ছিনতাই নেই। এপথে সবাই ভক্ত, সবাই মায়ের সন্তান। সন্তান চলেছে মাতৃসন্দর্শনে। মুখে সেই অভয়মন্ত্র—জয় মাতদী!

দেখতে দেখতে চরণপাদুকা এসে গেল। মহুয়াকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। এতক্ষণ তোতাকে কাঁধে নিয়ে যেমন ধীরে ধীরে পথ চলেছি, এখন মহুয়া তেমনি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

তাই বলে মহুয়া কিন্তু খুশি হয় নি এই অগ্রগতিতে। কারণ ভানু আর তোতাকে আমরা এখনও ধরতে পারি নি।

আর তাই সে আমাকে চরণপাদুকায় বসতে দিল না। জল খেয়ে নিয়েই ওর সঙ্গে আবার সিঁড়ি ভাঙা শুরু করে দিতে হল। আমরা নেমে চললাম বাণগঙ্গার পথে।

কেন জানি না, পথের এই অংশটা জনশূন্য। কোনো যাত্রী নেই, নেই কোনো বাড়ি-ঘর কিংবা দোকানপাট। আর তাই বোধ পরি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথের স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমাকে আবার অভিভূত করে তোলে। শব্দহীন স্বপ্নময় জগতের ভেতর দিয়ে আমরা দুটি প্রাণী পায়ে পায়ে পথ চলেছি। চারিদিকে আর কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই, নেই কোনো জীবনের সাড়া। এই মোহময় জগতে আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। আমি অনন্তকাল ধরে তীর্থের পথে পথে পদচারণা করব। আমি যে মহাভারতের তীর্থযাত্রী, আমার অন্য কোন পরিচয় নেই।

"জেঠু, কুকুর!"

মহুয়ার ডাকে তীর্থের ভাবনা হারিয়ে যায়, ফিরে আসি বাস্তবে। মহুয়া ঠিকই বলেছে সামনে কোথাও কতগুলো কুকুর ডাকাডাকি করছে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ, কুকুর।"

"যদি কামড়ে দেয়!" মহুয়া ভয় পেয়েছে।

পাওয়াই উচিত। নিশুতি রাত, অপরিচিত পথ। আমরা দুটি প্রাণী, হাতে একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। যদি কুকুরে তাড়া করে? আর কি আশ্চর্য, ঠিক এই সময় এখানে কোনো যাত্রী নেই! কি করব, বুঝে উঠতে পারছি না।

মহুয়াই উপায় বাতলে দেয়। বলে, "চলো, আমরা পেছিয়ে যাই। মা মীরামাসি ও করুণ কাকা এসে গেলে একসঙ্গে চলা যাবে।"

অর্থাৎ কুকুরের ডাক শুনে মহুয়া সবার আগে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। তার ভানুকে ধরে ফেলবার উৎসাহ উবে গিয়েছে। কিন্তু ভানুইবা পরিত্যাগ নিয়ে একা একা চলে গেল কেন? ওকে যদি কুকুরে তাড়া করে? ওর কাছেও তো লাঠি নেই!

কিন্তু ভানুর ভাবনায় বিচলিত হওয়া অর্থহীন। আমি এখন তাকে কোনো সাহায্যই করতে পারি না।

কুকুরগুলো সমানে ডেকে চলেছে। অতএব পিছু হাঁটতে শুরু করা যাক।

কাজটা কাপুরুষোচিত। কিন্তু জীবনে যিনি কোনোদিন পথের কুকুরের কামড় খেয়েছেন, তিনিই কেবল আমাদের এই পশ্চাদপসারণের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবেন।

পথের কুকুর মানে পথের কুকুর। কামড়ে দিলে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে পেটে অন্তত গুটিদশেক এ.আর.ভি. ইঞ্জেকশন নিতেই হবে। এবং সে কাজটা কোনোমতেই সহজ নয়।

হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি চরণপাদুকায়। আর এখানেই দেখা হয়ে যায় করুণদের সঙ্গে। আমাদের সব কথা শুনে করুণ আর মীরাদি হাসেন কিন্তু নন্দা বলে, "ভালোই করেছেন, রাতে পথের কুকুরকে বিশ্বাস নেই।"

খুবই স্বাভাবিক। মায়ের মন। তার মেয়ে রয়েছে আমার সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে পথচলা শুরু করি। নির্ভয়ে পথ চলি। কারণ ওদের তিনজনের কাছেই লাঠি রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসি সেই জায়গায়। কিন্তু কোথায়? কোনো কুকুরের ডাক তো শুনতে পাচ্ছি না? অথচ আমি আর মহুয়া তখন স্বপ্ন দেখি নি, আমরা জেগে থেকেই পথ চলেছিলাম। তাহলে সেই কুকুরগুলো গেল কোথায়?

রাত সওয়া বারোটায় বাণগঙ্গা পৌঁছান গেল। এখানে এখনও বহু লোক।

যাঁরা ফিরে এলেন, তাঁদের অনেকে এখানেই রাত কাটাবেন। তারই আয়োজন চলেছে। যাঁরা কিছুক্ষণ আগে কাটরা থেকে এসেছেন, তাঁরা বিশ্রামের পরে এখন ওপরে রওনা হচ্ছেন।

তাঁদেরই একদলের একটা বছর দুয়েকের বাচ্ছা পিট্টুর কাঁধে চড়ে কাঁদছিল। বাবা এসে ছেলের পিঠে দু-ঘা বসিয়ে দিলেন। ছেলেটা প্রাণের দায়ে চুপ করল। কিন্তু চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে।

কাছে এসে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। স্বামী-স্ত্রী দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে বিকেল নাগাদ কাটরা এসেছেন। দু'জনেরই যুবা বয়স। কাটরাতে বিশ্রাম না করেই তাঁরা পথচলা শুরু করেছেন। সন্ধ্যের পরে এখানে পৌঁছেছেন। খাওয়া-দাওয়া করে একঘুম দিয়ে উঠেছেন একটু আগে। এখন রওনা হচ্ছেন বৈষ্ণোদেবী। মেয়েটা বড়, বছর পাঁচেক। সে ঘুমচোখেও চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে মায়ের হাত ধরে। কিন্তু ছেলে ছোট। অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে ক্ষেপে গিয়েছিল। সে তো আর জানে না, তারা তীর্থে চলেছে। এপথে অমন কান্নাকাটি করা ঠিক নয়।

এবারে বাপের চড় খেয়ে নিশ্চয়ই তীর্থের মহিমা অনুধাবন করতে পেরেছে। তাই এখন নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

যাক্ গে ওদের কথা। আমরা জল খেয়ে এগিয়ে চলি। বাণগঙ্গা কিন্তু এখনও বেশ জমজমাট। হবেই তো! রাত দুটো পর্যন্ত এখানে গেট খোলা থাকে।

তাই পথের পাশে অধিকাংশ দোকানে এখনও কেনাকাটা চলেছে। গরম খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। কিন্তু ভানুর দেখা পাই না। ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে সে কত তাড়াতাড়ি হাঁটছে! আগে পৌঁছে তো তার কোনো লাভ হবে না। ঘর বন্ধ, চাবি আমার কাছে। তোতাকে নিয়ে তাকে বাইরে বসে থাকতে হবে। বৈষ্ণোদেবীতে পিট্টু না পেয়ে নন্দার কিন্তু ভালোই হলো। তার ছেলে আমার ও ভানুর কাঁধে চড়েই কাটরা ফিরে এলো। অথচ পিট্টুর ভাড়াটা বেঁচে গেল।

ভানুর ভাবনার মাঝে আবার মনে পড়ে ঐ দম্পতির কথা। একটু আগে যাঁদের

ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাণগঙ্গায় যাত্রা করতে দেখে এলাম।

তীর্থের নামে এখনও আমরা কতখানি নির্দয় হতে পারি। অবুঝ ছেলে মাঝরাতে ঘুমুতে চাইছে বলে স্নেহময় পিতা সন্তানের পিঠে চপেটাঘাত করছেন। কেনই বা করবেন না? কিছুকাল আগেও যে আমরা তীর্থের দেবতাকে খুশি করতে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিয়েছি। সে তুলনায় এই নিষ্ঠুরতা যে কিছুই নয়!

মহুয়ার হাত ধরে আমি আগে আগে চলেছি। আমাদের পেছনে করুণ, নন্দা ও মীরাদি।

পাহাড়ী পথ গিয়েছে ফুরিয়ে, সুতরাং পথচলায় আর নেই কোনো কষ্ট। কেবল বড্ড পিপাসা পাচ্ছে।

দর্শনী দরওয়াজায় পৌঁছে গেলাম। দেখা হলো ভানুর সঙ্গে। সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে তোতা এবং সে জেগে আছে। শুধু তাই নয়, সে নাকি বাণগঙ্গা থেকে হেঁটে এসেছে। তাহলে কি তোতা সিঁড়ি ভাঙার ভয়েই ঘুমের ভাণ করেছে? নাহলে সমতলে পৌঁছে তার ঘুম চলে যাবে কেন? কে জানে, আজকালকার ছেলে বিশ্বাস নেই!

তোতাকে পেলাম কিন্তু জল পাওয়া গেল না দর্শনী দরওয়াজায়। সত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অতএব বুকভরা তেষ্টা নিয়েই এগিয়ে চলি।

অবশেষে সেই দোকানের সামনে আসা গেল, যে দোকানীর কাছে যাবার সময় ঘোড়া ও পিট্টুর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এখন দোকান বন্ধ, দোকানী নেই। সুতরাং জল পাবার প্রশ্ন ওঠে না।

পাছে যাত্রীদের পথ ভুল হয়, তাই পথের ধারে সেই সিঁড়ির কাছে একখানি সাইনবোর্ড রয়েছে। ইংরেজীতে লেখা—বাজার এই পথে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। পরিচিত পথ। সকালে এই পথে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে গিয়েছি, এখন বাসায় ফিরছি। তখন ছিল কৌতূহল, আর এখন শান্তি—বুকভরা শান্তি। আমি বৈষ্ণবী মা-কে দর্শন করেছি, ধন্য হয়েছি!

কিন্তু বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, পথ চলতে ভারী কষ্ট হচ্ছে। মাগো, একটু জল দাও, আর যে পারছি না!

না, বৈষ্ণোদেবী সত্যই করুণাময়ী। পথের পাশে একটা মন্দির। যাবার সময় ফিরেও তাকাই নি। কিন্তু এখন চাঁদের আলোয় মন্দিরটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, মন্দিরের সামনে একটা মস্ত বড় মাটির জালা—নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা জল রয়েছে।

জালার ধারে পথের পাশে দু'খানি খাটিয়ায় দু'জন শুয়ে আছেন। নিশ্চয়ই মন্দির ও মন্দিরের জল পাহারা দিচ্ছেন। এ অবস্থায় জালায় হাত দেওয়া উচিত হবে কী?

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সামনে জল, অথচ তেষ্টা মেটাতে পারছি না। অদ্ভুত অবস্থা!

কিন্তু মা-বৈষ্ণোদেবী যে পরম করুণাময়ী, আমাদের কথাবার্তাতেই বোধকরি জলরক্ষকদের ঘুম ভেঙে যায়। একজন জিজ্ঞেস করেন, "কৌন হ্যায়?"

সবিনয়ে বলি, "আমরা যাত্রী। বড্ড পিপাসা পেয়েছে।"

"তা জল নিন না! ঐ তো রয়েছে!" একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "আচ্ছা, আমি দিচ্ছি।"

লোকটি উঠে বসেন। খাটিয়া থেকে নেমে জালার ধারে এসে একমগ জল তুলে বলেন, "আসুন, জল নিন, তেষ্টা দূর করুন।

যেমন মিঠে, তেমনি ঠাণ্ডা জল। দেহে যেন জীবন ফিরে এলো। আমরা প্রত্যেকে প্রাণভরে জল খেয়ে নিই।

লোকটির নজর পড়ে মীরাদির ফ্লাস্ক ও নন্দার হাতের ওয়াটার বট্‌লের দিকে। বলেন, "জল নিয়ে যান মাইজী, ঘরে গিয়ে কি এত রাতে জল পাবেন?"

ঠিকই বলেছেন তিনি। রাতে পিপাসা পেলে জল কোথায় পাবো! মীরাদি ও নন্দা ফ্লাস্ক আর ওয়াটার বট্‌ল তাঁর হাতে দেয়। তিনি জল ভরে দেন। লোকটিকে ধন্যবাদ দিই।

তিনি বলেন, "সবই মায়ের কৃপা, জয় মাতাদী!"

আমরাও 'জয় মাতাদী' বলে এগিয়ে চলি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাজারে এসে যাই—কাটরা বাজারে। এই বাজার থেকে সকাল সওয়া ছ'টায় যে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম, তা এখুনি শেষ হবে। এখন রাত সওয়া একটা।

বাড়িওয়ালীর মেয়েরা কাল মিথ্যে বলে নি। এখনও বাজারের অনেক দোকান খোলা। সবচেয়ে বিস্ময়কর একদল যাত্রী এইমাত্র যাত্রা করলেন বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। তাঁদের সঙ্গে আধুনিক যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশু রয়েছে।

তাঁরা আমাদের দেখতে পেয়েই বলে ওঠেন—জয় মাতাদী!

আমরাও সাড়া দিই।

কমলা ভবনের সামনে পৌঁছই। শেষ হলো আমাদের সারাদিনের বৈচিত্র্যময় পদযাত্রা।

কড়া নাড়ি। একটু বাদে বাড়িওয়ালী নিজে এসে দরজা খুলে দেন। তিনি খুশি হলেন আমাদের দেখে। বলেন, "সত্যি অবাক করলেন আপনারা। আজকাল একদিনে কেউ বৈষ্ণোদেবী দর্শন করে আসতে পারেন না।"

মনে মনে ভাবি—বাড়িওয়ালী ঠিক বললেন কি? আমরা কি একদিনে বৈষ্ণোদেবী দর্শন করে ফিরে এসেছি?

না। কারণ আমরা ১৭ জুন সকাল সওয়া ছ'টায় কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে যাত্রা করেছিলাম আর ফিরে এলাম ১৮ জুন রাত দেড়টায়। বাড়িওয়ালী বোধ করি জানে না যে, রাত বারোটার পর থেকে তারিখ পালটে গিয়েছে।

ওপরে আসি, দরজা খুলি। জুতো-জামা ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে আসি। তারপরে জল খেয়ে শুয়ে পড়ি।

আঃ! কি আরাম, দিনের কাজ শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে সব সময়েই আরাম লাগে। কিন্তু এমন আরাম অনেকদিন আস্বাদন করি নি।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি আজকের দিনটির কথা—বৈচিত্র্যময় পদযাত্রার কথা আর করুণাময়ী বৈষ্ণোদেবীর কথা। তাঁকে বলেছিলাম—মা, আমরা যেন আজ রাতেই কাটরা ফিরে আসতে পারি। বলেছিলাম শেষরাতে আমাদের একটু ঘুমুতে দিও মা আর আমরা যেন কাল জম্মু গিয়ে হিমগিরি এক্‌সপ্রেস ধরতে পারি।

মা আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।

করুণাময়ী বৈষ্ণোদেবীকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করি। তারপর চোখ বুজি।

আমি এখন নিদ্রাদেবীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বিশ্রাম নেব—স্বপ্নহীন সুন্দর নিদ্রা, সুখ নিদ্রা, শান্তির নিদ্রা। স্বর্গীয় শান্তিতে আমার সর্বদেহ সিঞ্চিত, আমার সমস্ত মন এক অনির্বচনীয় অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ। কেবল মনে হচ্ছে, ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন—আমি মায়ের আশীর্বাদ লাভ করেছি।

মা-বৈষ্ণোদেবী কেবল করুণাময়ী ক্ষমাশীল ও ঐশ্বর্যশালিনী নন, তিনি পরমানন্দময়ী শান্তিদায়িনী। তাই তাঁকে শান্তিরূপে আবার আহ্বান করি এই মর্ত্যভূমিতে। বলি—মা, তুমি এই অশান্ত পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূতা হও। বিশ্বসংসারের সকল অশান্তি দূর হয়ে যাক—

"যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তি রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।'

——'হিমালয়' তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত——

শ্রী শঙ্কু মহারাজ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আপনার অগণিত পাঠক পাঠিকার একজন। আপনার লেখার মধ্যে দিয়ে আমি মানসভ্রমণ করেছি জাহ্নবী-যমুনার উৎস থেকে মধুময় বৃন্দাবন পর্যন্ত অনেক জায়গায়। নানা অজানাকে যেমন জেনেছি আপনার লেখনীর হাত ধরে, সেই সঙ্গে শরিক হয়েছি অসংখ্য তীর্থ যাত্রীর সুখ দুঃখ আশা নিরাশার আনন্দ-বেদনার।

সম্প্রতি "বৈষ্ণোদেবীর দরবারে" বইটি পড়লাম। আজীবন দিল্লীর বাসিন্দা বলে বৈষ্ণোদেবী আমাদের খুব নিকট এবং চেনা তীর্থ। আমাদের বহু পরিচিত লোক প্রতি বছর একাধিক বার ওখানে যান। সেই প্রসঙ্গে এই চিঠি। আপনি লিখেছেন "বৈষ্ণবী দেবী যেমন বৈষ্ণো দেবী হয়েছেন, তেমনি মাতাজী হয়েছেন মাতাদী।" এই ব্যাপারে বিনীত ভাবে জানাই, যে জয় মাতাদী শব্দের অর্থ এখানে "মাতার জয়"। হিন্দীতে "জয় মাতা কী।" এটা গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষায় হয়েছে মাতা দী"। বাংলায় যেমন "তার", "তাদের", হিন্দীতে ও পাঞ্জাবীতে যথাক্রমে উসকা/উসকী এবং ওদা/ওদী— এই বিভক্তি বসে। লিংগ ভেদে বিভক্তি আলাদা হয়। মাতা যেহেতু স্ত্রী লিংগ শব্দ, তাই তার শেষে 'দী' বসেছে। পিতার হলে হত পিতা দা বা প্যোও দা। যেহেতু বৈষ্ণোদেবীর পথে পাঞ্জাবী ভাষী তীর্থ যাত্রীই বেশী যাতায়াত করেন, তাই ওই ভাষার প্রচলনই সর্বাধিক।

আপনার মূল্যবান সময়ের দখল নেবার ধৃষ্টতার জন্যে আশা করি ক্ষমা করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

ইতি বিনীতা

উমা দত্ত

B-9/6475
Vasant Kunj
New Delhi-110 030

সুন্দরের অভিসারে-র বিষয়

লাদাখের পথে-র বিষয়

বৈষ্ণোদেবীর দরবারে-র বিষয়